''নাট্যকার মনোজ মিত্র ঃ
জীবনদৃষ্টি, সমাজচেতনা ও শিল্পবোধ''

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

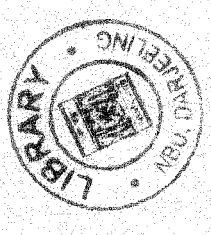

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০১২

Th 92.7
প্রনব/নাথ

261463

18 AUG 2013

ভূমিকা

নাটকের প্রতি আমার ভালোবাসা তৈরি হয়েছে অভিনয়ের পথ ধরে। অভিনয়ের সূত্রেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মনোজ মিত্রের নাটকের প্রতি। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি, কমেডির ধাঁচে তাঁর নাটকে কীভাবে প্রকাশ পায় সামাজিক দায়বদ্ধতা। 'সুন্দরম', থিয়েটার ওয়ার্কশপ', 'প্রতিকৃতি' প্রভৃতি দলের অভিনয়ে মনোজ মিত্রের একাধিক নাটকের মঞ্চরূপ দেখার পর সেগুলির নতুন নতুন ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হতে থাকে আমার কাছে। সম্পূর্ণ দেশজ উপাদানে মৌলিক নাটক গড়ায় তাঁর কৃতিত্ব এবং চিরন্তন মূল্যবোধের প্রতি তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস আমার আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে। একইসঙ্গে বিষয়ের গভীরতা ও জনপ্রিয়তার এই রসায়নের রহস্য আবিষ্কারের প্রয়াসেই তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনাক্রমে গবেষণার বিষয় হিসেবে স্থির হয় 'নাট্যকার মনোজ মিত্র ঃ জীবনদৃষ্টি, সমাজচেতনা ও শিল্পবোধ'।

যে কোনো জীবিত এবং সৃজনশীল স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মকে নিয়ে গবেষণার কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে। নিরন্তর তাঁর সৃষ্টিভান্ডার বেড়ে উঠতে থাকে বলে সমগ্র রচনাবলীকে গবেষণাকর্মে ধরা সম্ভব হয় না। একটি নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত রচনাকর্মের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। আমরা সেই বিন্দুটি ধরেছি ২০০৯ সাল অর্থাৎ মনোজ মিত্রের নাট্য রচনা শুরু (১৯৫৯) থেকে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সময়কাল। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এখনো তিনি লিখে চলেছেন, তাই এমনটা হওয়া অসম্ভব নয় যে, নিজের শ্রেষ্ঠ লেখাটি তিনি এখনো লেখেন নি বা তাঁর চেতনার বিবর্তনের আরো সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় নি। মনোজ মিত্রের নাট্যধারায় এখনো পর্যন্ত যে রচনাগুলি আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে অনেকগুলিই বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাবার যোগ্য। তাঁর নাটকের বক্তব্যে আমরা বেশ কিছু সাধারণ সূত্রেরও সন্ধান পেয়েছি। মূলত সেসব সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের গবেষণার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। ঐতিহাসিক সমালোচনা পদ্ধতির অনুসরণে মনোজ মিত্রের জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, নাটক রচনার সময়কালে রাজ্য তথা দেশ তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির ভিত্তিতে তাঁর নাটকের বিষয় ও বক্তব্যের সূত্র সন্ধান করেছি।

সম্পূর্ণ গবেষণাকর্মটিকে আমরা মূলত ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে নাট্যকার মনোজ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করে তাঁর সৃষ্টিকর্মে জীবন ও বেড়ে ওঠার পরিবেশের প্রভাবটিকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনোজ মিত্রের নাট্যসৃজন পটভূমিটি আলোচনা করে তাঁর সৃজনমুখর জীবনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে মনোজ মিত্রের নাটকের বর্গীকরণ করে প্রতিটি বর্গের পৃথক আলোচনা করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে নাট্যকার মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির সন্ধান করেছি তাঁর নাটকগুলিতে। পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর নাটকে প্রকাশিত সমাজচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁর শিল্পবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এছাড়া মনোজ মিত্র রচিত নাটকের তালিকা সন্নিবেশিত করেছি।

এই গবেষণার কাজে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি পেয়েছি আমার প্রিয় মাস্টারমশাই অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্টকে। তাঁর নিরলস প্রয়াস এবং একান্ত সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই কাজ শেষ করা

সম্ভব হ'ত না। আমার প্রতি স্নেহবশতই তিনি সময়-অসময়ের অনেক উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। শ্রীযুক্ত মনোজ মিত্র মহাশয় তাঁর চরম ব্যস্ততার মধ্যেও একাধিকবার আমাকে সময় দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বেশ কিছু তথ্য এবং ইঙ্গিত পেয়েছি। তাঁর প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। অধ্যাপক বিষ্ণু বসুর সঙ্গে আলোচনা আমাকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। তাঁর উদ্দেশ্যে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। পুরনো পত্রিকার কাটিং, দুষ্প্রাপ্য অনেক তথ্য প্রভৃতি পেয়েছি 'নাট্যশোধ সংস্থান'-এ। সেখানকার কর্মীদের সহৃদয় ব্যবহার এবং আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য নাটকের যোগান দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন নবগ্রন্থ কুটিরের স্বত্বাধিকারী। ন্যাশনাল লাইব্রেরী, অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার (শিলিগুড়ি), বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, 'সুন্দরম্' নাট্যদল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকেও নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। বিধি অনুযায়ী আট সপ্তাহের 'শিক্ষা ছুটি' মঞ্জুর করার জন্য বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বাবা, মা এবং স্ত্রী-র সম্পূর্ণ সহযোগিতা মুক্তমনে গবেষণাকর্মে মনোযোগী হ'তে সাহায্য করেছে। দুই ভাগ্নী শুচিস্মিতা-সুচরিতা তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করেছে। নানারকম জটিল তত্ত্বের ভারে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, তখন আমার 'চারি বৎসরের কন্যা' প্রণিহিতা আমাকে ওর খেলার সাথী করে সাময়িক relief দিয়েছে। প্রথমদিকে নগর কোলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতে সবসময়ের সঙ্গী ছিল কোলকাতায় চাকুরিরত বন্ধু অনিমেষ। ও সঙ্গে থাকায় অনেক কাজই দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভ ছাপার কাজে সাহায্য করেছে 'সফট্‌টাচ'-এর সুশান্ত (কেশব) এবং অনুপম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও নিরন্তর পরিবর্তনের ঝক্কি ওরা, বিশেষত কেশব, হাসিমুখে সামলেছে। ওদের কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রশ্নই নেই, কারণ ওরা বন্ধুজন। শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার সদস্য বন্ধুরা, বিশেষত নির্দেশক মলয়দা প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়ে এবং খোঁজখবর নিয়ে আমাকে সচল রেখেছেন বলে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

মনোজ মিত্র তাঁর একটি গ্রন্থে একটি উক্তি উদ্ধার করেছেন ঃ ''ঈশ্বর, আমার পৃথিবীটাকে নির্বান্ধব অকরুণ প্রতিকূল এবং নিন্দুক করে দাও, তবেই না আমি আমার কাজের প্রতি অনন্যচিত্ত হতে পারব।'' সবশেষে আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা আমার পৃথিবীটাকে 'অকরুণ প্রতিকূল এবং নিন্দুক' করে দিয়েছেন।

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	-	নাট্যকার মনোজ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী	১-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	-	মনোজ মিত্রের নাট্যসৃজন পটভূমি এবং সৃজনমুখর জীবনের পর্ব বিভাজন	১৭-২৬
তৃতীয় অধ্যায়	-	মনোজ মিত্রের নাটকের বর্গীকরণ ও আলোচনা	২৭-২০৩
		■ সামাজিক নাটক	৩১-৮০
		■ পারিবারিক নাটক	৮১-১৩৪
		■ রাজনৈতিক প্রসঙ্গযুক্ত নাটক	১৩৫-১৫৫
		■ পুরাণ-আশ্রিত নাটক	১৫৬-১৭০
		■ ইতিহাসের পটে লেখা নাটক	১৭১-১৭৮
		■ আঙ্গিক যখন রূপক	১৭৯-১৯৭
		■ রহস্য নাটক	১৯৮-২০৩
চতুর্থ অধ্যায়	-	মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টি	২০৪-২৩৪
পঞ্চম অধ্যায়	-	মনোজ মিত্রের নাটকে সমাজচেতনা	২৩৫-২৬৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	-	মনোজ মিত্রের নাটকে শিল্পবোধ	২৬৯-৩৮৭
		■ প্লট নির্মাণ	২৭২-২৮৯
		■ চরিত্র সৃজন	২৯০-৩০৮
		■ সংলাপ রচনা	৩০৯-৩৫৩
		■ সংগীত ব্যবহার	৩৫৪-৩৭৩
		■ রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক	৩৭৪-৩৮৭
উপসংহার			৩৮৮-৩৯৩
গ্রন্থপঞ্জী			৩৯৪-৪০৯

প্রথম অধ্যায়

নাট্যকার মনোজ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রথম অধ্যায়

মনোজ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

[এই অধ্যায়টি রচনায় প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে' (মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র / দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩ - জানুয়ারি ২০১১) গ্রন্থটি, 'আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র' (সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু - ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় সংখ্যা - নভেম্বর ২০১১) সাক্ষাৎকার এবং মনোজ মিত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় প্রাপ্ত তথ্য।]

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ধূলিহর (চলতি কথায় ধুলর) গ্রামে অশোককুমার মিত্র এবং রাধারাণী মিত্রের প্রথম সন্তান মনোজ মিত্রের জন্ম। ছোটোবেলায় তার ডাক নাম ছিল বুদ্ধদেব। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান রাড়ুলি গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাঁকা ভবানীপুর গ্রাম ছিল রাধারাণীর বাপের বাড়ি। সেই গ্রাম কপোতাক্ষ তীরে। আর কপোতাক্ষ নদের শাখানদী বেত্রবতী (বেতনা)-র কূলে ধূলিহর গ্রাম। খুলনা রেলস্টেশন থেকে স্টিমারে সাতক্ষীরা এবং সেখান থেকে যে কোনো গাড়িতে পৌঁছতে হ'ত ধূলিহরে। খুলনা জেলা এখন দু'ভাগ হয়ে গেছে। সাতক্ষীরা মহকুমা হয়েছে সাতক্ষীরা জেলা। এখন জেলাশহর সাতক্ষীরা থেকে দু-তিন কিলোমিটার দূরে ধূলিহর। ভৌগোলিক দিক থেকে টাকীর ঠিক ওপারে অর্থাৎ ইছামতীর ওপারটাই সাতক্ষীরা।

মনোজ মিত্রের চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র যাদবচন্দ্র, তাঁর পুত্র অন্নদাচরণ। অন্নদাচরণ-হেমনলিনীর তিন পুত্র — অশোককুমার, সৌরীন্দ্রকুমার এবং তারাপদ। একসময় প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল ধূলিহরের মিত্র পরিবারের। বেত্রবতীর দুইধারে ছড়ানো ছিল তাদের জমিজমা, খেতখামার, বাগান। যৌথ জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল মনোজ মিত্রের প্রপিতামহ যাদবচন্দ্র মিত্রের। এ প্রসঙ্গে মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ

> "দূর দূর অঞ্চলের আত্মীয়কুটুম বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে আম-কাঁঠাল-চালতা-সুপুরির বাগান লিখে দিয়ে ধূলিহরের বাসিন্দা বানিয়ে ছাড়তেন তাদের। ছোটবেলায় তাই দেখতাম আমাদেরই স্বজনপরিজনে সারা গ্রাম পরিকীর্ণ। যার সঙ্গেই দেখা হোক না কেন, সে আমার বড় আপনজন।"[১]

জল-জঙ্গলের দেশ খুলনা জেলার মাটি ছিল উর্বর, মানুষ ছিল শান্ত, সরল, সহিষ্ণু আর কিছুটা ঢিলেঢালা ধরণের। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও প্রায় ছিল না বললেই চলে। উদার প্রকৃতির গুণে সেখানকার মানুষও ছিল উদার। সেই উদার প্রকৃতি ও মানুষের সাহচর্যেই কেটেছে মনোজ মিত্রের শৈশব।

অশোককুমার-রাধারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোজ কুমার মিত্র (খাতায় কলমে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পর্যন্ত এই নামটিই ছিল)। ছোটো এক বোন ছিল, যার নাম ডিলডিল (দিলদিল)। তাঁরা যখন কোলকাতায় বেলেঘাটার বাসাবাড়িতে, তখন সেই বোনের অকালমৃত্যু ঘটে। পরের দুই ভাই উদয়ন মিত্র এবং অমর মিত্র। উদয়ন মিত্র ছিলেন স্টেট আর্কাইভসের ডেপুটি ডিরেক্টর। 'জানা অজানা

মহাফেজখানা' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অমর মিত্র বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক। ছোটো বোন অপর্ণা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনোর পর সংসারধর্মে ব্যাপৃত। এছাড়া আরেকটি ছোটো ভাইও তাঁদের ছিল, যে অকালমৃত। মনোজ মিত্রের স্ত্রী আরতি মিত্র এবং কন্যা ময়ূরী মিত্র (ঘোষ)। পিতা-মাতা দুজনেই প্রয়াত। বর্তমানে শ্রী মিত্রের ঠিকানা এ.জি.-৩৫, সল্টলেক, কোলকাতা-৯১।

মনোজ মিত্রের বাবা অশোককুমার মিত্র ছিলেন ধূলিহর গ্রামের প্রথম বি.এ. পাশ। ১৯৩৮ সালে তিনি ধূলিহর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক। বিয়াল্লিশের মন্বন্তরে বাংলার কৃষকেরা ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। মামলায় জড়িয়ে মহাজনদের হাতে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল তারা। সেই মামলার নিষ্পত্তির জন্য ঋণসালিশী বোর্ড যে বিশেষ আদালত গঠন করেছিল সেই ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ছিলেন অশোককুমার মিত্র। স্বাধীনতার পর তিনি ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং-এ। মেজকাকা সৌরীন্দ্রমোহন মিত্র তেমন কিছু করতেন না। ছোটোকাকা তারাপদ মিত্র ছিলেন ডাক্তার। ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি ওপার বাংলায় ছিলেন। '৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর চলে আসেন। নিজের বাবা-কাকাদের সম্পর্কে মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ

> "ঠাকুর্দাদার ছেলেরাও বিষয়ে উদাসীন বরাবর। আমার বাবা-কাকারা কোনো জমিজমার ধারকাছ ঘেঁষেন-নি। বড় অদ্ভুত তিনটি ভাই। জীবনে খেলাধুলো করেন নি, তাস-পাশাও নয়। নেশাও করেননি কেউ, পান-যোয়ানও না। থিয়েটার যাত্রাও দেখেন নি কোনোকালে। শুধু এক সমাজসেবামূলক কাজে তাঁদের উৎসাহ দেখেছি সেকালে। বাবা গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ছোটকাকা দাতব্য চিকিৎসালয়।"[২]

১৯৫০ সাল অর্থাৎ নিজের বারো বছর বয়স পর্যন্ত মনোজ মিত্র বাবার চাকরিসূত্রে অখন্ড ও খন্ডিত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন। অনেকসময় বাবা-মাকে ছাড়াই একান্নবর্তী পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে থেকেছেন। বংশের বড় ছেলে বলে হোক বা ছোটোবেলা থেকে রুগ্ন ছিলেন বলেই হোক, ঠাকুমা হেমনলিনী দেবীর অবাধ প্রশ্রয় ও স্নেহ পেয়েছেন তিনি। যে সময়ে এবং পরিবেশে বড় হয়েছেন মনোজ মিত্র, তখন জীবিকা, অর্থোপার্জন প্রভৃতি নিয়ে মানুষ আজকের মতো মাথা ঘামাত না। ফলে নিজের ছোটোবেলায় তিনি দেখেছেন একধরণের শিথিল, অলস, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা। সে জীবনে মানুষের সঙ্গী গাছপালা; সে জীবনে জীবজন্তু-পশুপাখির প্রতি মানুষের পরম মমতা; সে জীবনে চোর এসেছে জেনেও গৃহস্থ বিছানা ছেড়ে না উঠে চোরকে পরদিন মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ করে দেয় আর চোরও নিমন্ত্রণ পেয়ে 'হাতের মাল' ফেলে রেখে চলে যায়; সে জীবনে বাড়িতে নিত্য অতিথিসমাগম; সে জীবনে সকলের সঙ্গেই অদ্ভুত এক আত্মীয়তাবোধ। ছায়াময়, মায়াময় সেই পরিবেশ মনোজ মিত্রের জীবনের গড়ন নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যে সহজ আন্তরিকতা, সরল বিশ্বাসবোধ, উদার সম্প্রীতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শৈশবের জল-

হাওয়ায়, তাকেই পরবর্তীকালে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন নিজের লেখার মধ্যে।

একালের বাবা-মায়েদের মতো সন্তানের পড়াশুনো নিয়ে নিরন্তর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তাঁর বাবা-মায়ের ছিল না বলে অনেকটা শিথিলভাবেই তাঁর পড়াশুনো শুরু হয়েছিল। তাঁর ভাইয়ের লেখা (শিকড়ের খোঁজে / ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩ - জানুয়ারি ২০১১) থেকে জানা যায়, ১৯৪৫ সালের ৫ জানুয়ারি মনোজ কুমার মিত্র ধূলিহর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে তিনি সেভাবে যাতায়াত করেন নি বলেই মনে হয়। কারণ, তাঁর নিজের লেখায় এই বিদ্যালয়ের কোনো উল্লেখ নেই। বরং একটি সাক্ষাৎকারে (আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র — সাক্ষাৎকার ঃ ব্রাত্য বসু / ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় সংখ্যা - নভেম্বর ২০১১) তিনি জানিয়েছেন যে, ক্লাস সেভেন থেকেই তাঁর প্রথাগত স্কুলজীবন শুরু। তার আগের পড়াশুনো সবটাই বাড়িতে। ধূলিহরে যে গুরুমশাইয়ের কাছে তাঁর হাতেখড়ি, সেই মাদার পন্ডিত তাঁর বাবাকেও পড়িয়েছেন। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলায় আসতেন পন্ডিতমশাই। সেই পড়াশুনো সম্পর্কে একটি কৌতুককর স্মৃতির উল্লেখ করেছেন মনোজ মিত্র 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে' গ্রন্থে। হ্যারিকেনের আলোয় বাড়ির ছেলেদের পড়াচ্ছেন মাদারপন্ডিত। হঠাৎ সেই হ্যারিকেন টেনে নিয়ে পুরোহিতমশাই শুরু করে দিলেন মহাভারত পাঠ। পড়াশুনো লাটে উঠল, জমে গেল ধর্মসভা। এই মাদারপন্ডিত পড়াতেন অত্যন্ত উচ্চস্বরে। সেই চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘ রোগভোগে শয্যাশায়ী ঠাকুর্দা অন্নদাচরণ চিৎকার করতেন ঃ "তোমাকে আমি একটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি মাদার, আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করো।"[৩] মাদার পন্ডিত আশঙ্কিত ঃ "অশোকের ছেলেটা যে মুখ্যু হয়ে থাকবে কাকা।"[৪] ঠাকুর্দা উত্তর দিতেন ঃ "ছেলেরা তো মুখ্যুই থাকে — বড় হয়ে শিক্ষিত হবে।"[৫] এভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল মনোজ মিত্রের লেখাপড়া। লেখাপড়ায় অন্যতম অন্তরায় ছিল ঠাকুমার ভালোবাসা। বইখাতা খুলতে দেখলেই ঠাকুমার মনে হ'ত নাতিটা বোধহয় আর বাঁচবে না। তাড়াতাড়ি তাঁকে ঢাউস খাটের ওপর তুলে নিয়ে শুরু করতেন নিজের জীবনের গল্প। ফলে, পড়াশুনো যে তাঁর হচ্ছে না তা মোটামুটি ধরে নিয়ে সাত-আট বছর বয়সেই বিকল্প ভেবে রেখেছিলেন মনোজ মিত্র ঃ

> "সাত আট বছর বয়েসেই মোটামুটি ধরে ফেলেছিলাম, লেখাপড়া হচ্ছে না। তার জন্যে দুঃখ ছিল না। মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলাম বড় হয়ে কী হব। আট-দশ রকম ভেবেও রেখেছিলাম। জেলে হয়ে মাছ ধরব। তাঁতি হয়ে তাঁত চালাব। স্যাকরা হয়ে গয়না গড়ব। কুমোর হয়ে মাটির হাঁড়ি গড়ব। রাখাল হয়ে গোরু চালাব। ফকির হয়েও গাজনপীরের গান গাইতে পারি।"[৬]

কিন্তু ১৯৪৬ সালে তাঁর জীবনধারায় একটা পরিবর্তন এলো। বাবা দেশে ফিরে তাঁর স্বাস্থ্য, লেখাপড়া এবং আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং নিজেদের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের কর্মক্ষেত্র সিরাজগঞ্জে। ১৯৪৬ পর্যন্তই মনোজ মিত্রের পাকাপাকিভাবে ধূলিহর-বাস। এরপরও ধূলিহরে থেকেছেন, কিন্তু তা বাবার কর্মস্থল বদলের ফাঁকে ফাঁকে, নিরবচ্ছিন্নভাবে আর থাকা হয় নি।

সিরাজগঞ্জে মনোজ মিত্র মাত্র একদিন পড়েছিলেন এক গৃহশিক্ষকের কাছে। সুশ্রী সুশিক্ষিত সেই যুবক প্রথম দিনেই অঙ্কের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকে তিনি আর আসেন নি। পরদিনই তিনি নাকি পাগলাগারদে ভর্তি হয়েছিলেন। সিরাজগঞ্জ থেকে বাবার বদলির সূত্রে এলেন ময়মনসিংহ জেলার ঘাটাইল, সেখান থেকে কালিহাতি। ঘাটাইল আর কালিহাতিতে পালা করে থাকতেন তাঁরা। ঘাটাইলে তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন পুটুবাবু। সকাল-বিকেল দু'বেলাই আসতেন তিনি। একবেলা ইংরেজি-বাংলা, আর একবেলা ইতিহাস এবং মনীষীদের জীবনী। মনোজ মিত্রের রসিকতা ঃ "অঙ্কটা এড়িয়ে যেতাম আমরা দুজনেই। সিরাজগঞ্জের দুর্ঘটনা থেকেই অঙ্কে আমার আতঙ্ক। আর পুটুবাবু মনে হয় একটু কাঁচাই ছিলেন অঙ্কে।"[৭] কিন্তু পুটুবাবুর সাহচর্য অন্যদিক থেকে কাজে লেগেছিল তাঁর। যে কোনো বিষয়ে 'যা মনে আসে লেখা'র আগ্রহ তাঁর মধ্যে চারিয়ে দিয়েছিলেন পুটুবাবুই। 'জোছনারাত্রি', 'নদীর পাড়ে একা একা', 'ঘুড়ি না পাখি, কী হতে চাও তুমি' প্রভৃতি বিষয়গুলিও তিনিই বেছে দিয়েছিলেন। এক বালকের আত্মপ্রকাশের সূচনা সেই পুটুবাবুরই হাত ধরে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ পেল খন্ডিত স্বাধীনতা। সেদিন পর্যন্ত মনোজ মিত্রের বাবার কর্মস্থল ময়মনসিংহ পাকিস্তানে আর পৈতৃক বাসস্থান খুলনা জেলা ভারতে। ১৪ আগস্ট রাতে অশোক কুমার মিত্র পরিবার নিয়ে ময়মনসিংহ ছাড়লেন খুলনার উদ্দেশ্যে। সরকার থেকে তখন তাঁকে বলা হয়েছে তিন মাসের ছুটিতে যেতে, পরে ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তরের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ক দপ্তরে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে। সেই ১৪ আগস্ট রাতের বর্ণনা দিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ

> "ওই চোদ্দই রাতেই যখন আমরা মৈমনসিংহ ছাড়ছি, বঙ্গদেশের নানাদিকে তখন তান্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে। হানাহানি, লুটপাট, অগ্নিকান্ড। সর্বত্র দেশত্যাগের হিড়িক। কালিহাতির নদীতে সে রাতে যাত্রীবোঝাই নৌকোর মিছিল। ... নদীর বুকে কাছে দূরে নৌকোর লন্ঠনগুলো ভাঁটার টানে ছুটছে। যেন কার্তিক পূর্ণিমায় পিদিম ভাসানো হয়েছে।"[৮]

বাবার অফিসের কর্মী তায়েজ খাঁ একটা বড় পানসি আর দশ-বারোজন দেহরক্ষী নিয়ে তাদের পৌঁছে দিয়েছিলেন কোলকাতায়। পাকিস্তান তখন স্বাধীন হয়ে গেছে, রাত বারোটায় স্বাধীন হবে ভারত। সেই রাতে নৌকায় রুদ্ধশ্বাসে আরো অনেক মানুষের সঙ্গে দেশ ছাড়ছে, 'নিজের দেশ'-এ যাচ্ছে এক বালক। নদীর পাড়ে পাড়ে স্বাধীনতার কোনো উজ্জ্বল ছবি নেই, কেবল "নিথর রাত্রি ভূতের মতো ঝুলে আছে দু-পাড়ের ঝোপে, ঝাড়ে, ভাঙা মন্দিরে, শূন্য ঘরদুয়োর, গোয়ালঘরে। বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ।"[৯]

খুলনা জেলায় প্রকৃতিকে দেখেছিলেন এক রূপে, ময়মনসিংহে দেখলেন অন্য রূপে। ঘাটাইলের প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ "ঘাটাইলে বাসার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত ধানখেত। দিগন্তে গারো পাহাড়ের চুড়ো। মেঘ এলে, বৃষ্টি এলে ছবিটা অপূর্ব হয়ে উঠত।"[১০] খুলনা ছিল জলজঙ্গল

খালবিলের দেশ, কিন্তু ময়মনসিংহ খটখটে ঝকঝকে। যদিও সেখানে ছিল যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের মতো বিশাল নদী আর তাদের অজস্র শাখা-প্রশাখা। এমনিতে শুকনো জায়গা হলেও ব্রহ্মপুত্রের জলে হঠাৎ হঠাৎ বন্যা হ'ত ময়মনসিংহে। আকস্মিক সেই বন্যা মোকাবিলায় প্রত্যেকের বাড়িতেই প্রস্তুত থাকত ভেলা বা নৌকো। প্রকৃতির এই অন্যতর রূপও সমৃদ্ধ করেছে মনোজ মিত্রের জীবনকে, জীবনবোধকে। ময়মনসিংহের আর একটি বিষয় প্রভাব ফেলেছে তাঁর ওপর। তা হ'ল, রুক্ষতার ছদ্মবেশে গোপন রসিকতা। ফল্গুধারার মতোই রুক্ষ ব্যবহারের আড়ালে বহমান এই রসিকতা। পরবর্তীকালে 'সাজানো বাগান', 'পরবাস', 'কেনারাম বেচারাম', 'দম্পতি' প্রভৃতি নাটকে যে বক্র রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার বীজ নিহিত রয়েছে ময়মনসিংহের সেই ছদ্ম রসিকতার মধ্যে।

১৪ আগস্ট রাতে রওনা দিয়ে ১৫ আগস্ট প্রায় মধ্যরাতে তাঁরা পৌঁছলেন কোলকাতায়। সেখানে রাতটুকু শিয়ালদায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট চাপলেন খুলনার ট্রেনে। ট্রেনে এবং বিভিন্ন স্টেশনে সেদিন স্বাধীনতার বিপুল আনন্দ। ১৬ আগস্ট বিকেলে খুলনা স্টেশনে পৌঁছনো গেল। কিন্তু রাতে সাতক্ষীরা যাবার কোনো স্টিমার নেই। ভোরে যে স্টিমার যাবে রাতে সেটাতেই থেকে পিকনিকের আয়োজন করা হ'ল। স্বাধীনতার আনন্দে তখন সবাই মশগুল। বিশেষত নিজেদের জন্মভিটে প্রত্যাশিত দেশ ভারতেই পড়েছে। ছোটো রঙিন ছাতা স্বাধীনতার উপহার পেলেন মনোজ মিত্র। ভোরে স্টিমার ছাড়ল খুলনার উদ্দেশ্যে। ঘুম ভেঙে উঠে বালক মনোজ দেখলেন, অন্য একটা জায়গা, বাবা নেমে গেছেন চা খেতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে জানালেন দুঃসংবাদ — খুলনা চলে গেছে পাকিস্তানে, আর মুর্শিদাবাদ এসেছে ভারতে। মুহূর্তে স্বদেশ হয়ে গেল বিদেশ, আনন্দ পরিণত হ'ল বিষাদে। স্বাধীনতার উপহার মনোজ মিত্র হারিয়েছিলেন স্টিমারে, সেইসঙ্গে হারিয়েছিলেন স্বাধীনতার আনন্দও। সেদিন ১৭ আগস্ট, ১৯৪৭ সাল।

স্বাধীনতার পর আরো তিন বছর অর্থাৎ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মিত্র পরিবারের কেউ কেউ ওখানে ছিলেন। ছোটোকাকা তো ছিলেন ১৯৬৫ পর্যন্ত। মনোজ মিত্র সেইসময় কখনো থাকছেন বাবার কর্মস্থল ঢাকায়, কখনো নিজেদের গ্রাম ধূলিহরে। এই গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা শিক্ষিত হিন্দুদের ওপর এতটাই নির্ভরশীল ছিলেন যে, হিন্দুদের গ্রাম ছেড়ে যেতে দেখলে নির্ভরহীনতার ভয় থেকেই তারা কান্নাকাটি করছিলেন। তার ঠাকুর্দা অন্নদাচরণকে তারা বারবার মিনতি করতে লাগলেন গ্রাম ছেড়ে, দেশ ছেড়ে না যাবার জন্য। তাদেরই আগ্রহে মিত্র বাড়ির বন্ধ হতে বসা 'বড় পূজা' (দুর্গাপূজা) আবার হ'ল। বাইরের লোকের সাম্প্রদায়িক উস্কানি বন্ধ করতে 'সাজাহান' নাটকের অভিনয় হ'ল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই উপভোগ করল, ভেতরকার শ্লেষটা ধরতে পেরে দায়িত্বশীল হয়ে উঠল।

ওপার বাংলার মিত্র পরিবারে কেউ কোনোদিন থিয়েটার করেন নি, এমনকি দেখেনও নি। থিয়েটার তাঁদের কাছে একরকম বর্জনীয়ই ছিল। কিন্তু গ্রামে সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে সেই পরিবারকেই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হ'ত। প্রতি দুর্গাপূজা আর বসন্তকালে গ্রামে তিন-চার রাত্রি যে থিয়েটার হ'ত তার দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, মঞ্চ বাঁধার তক্তা-বাঁশ-দড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি

সবকিছু ডাঁই করা থাকত তাঁদেরই বাইরের ঘরে। গৃহবন্দী সেই অসংখ্য থিয়েটারই মনোজ মিত্রের মধ্যে প্রথম থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ জাগিয়ে তোলে। তাঁদেরই চন্ডীমন্ডপের উঠোনে থিয়েটার হ'ত আর মেজকাকু বেত হাতে ঘুরে বেড়াতেন, যেন বাড়ির ছেলেরা আশেপাশে উঁকিঝুঁকি না দিতে পারে। থিয়েটারকে এইভাবে নিষিদ্ধ জগতের বিষয় করে রাখাতেও তার প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ প্রবল হচ্ছিল। স্বাধীনতার পর খুলনা পাকিস্তানে পড়ায় মেজকাকার বেত নিয়ে ছেলেদের তাড়া করার ইচ্ছে মরে যাওয়ায় এবং 'রামের সুমতি'র মতো আপত্তিহীন নাটক অভিনীত হবে বলে ১৯৪৭ সালে নয় বছর বয়সে মনোজ মিত্র প্রথম নাটক দেখার সুযোগ পেলেন। সেই অভিনয়ে প্রপস্ হিসেবে জ্যান্ত দুটি মাছের ব্যবহার থিয়েটারে বাস্তবতার বিষয়টিকে তাঁর মাথায় যেভাবে গেঁথে দিয়েছে, পরবর্তীকালে নিজের অভিনয়ে সেই বাস্তবতা আমদানি করতে গিয়ে তিনি বহুবার বিব্রত এবং অপ্রস্তুত হয়েছেন। আরো দু'বছর পরে গ্রামেরই বিজয়া সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা' হাস্য কৌতুকটিতে মনোজ মিত্রের প্রথম অভিনয়। দুষ্টু ছেলে হারাধনের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন। নির্দেশক 'বড়দা'র তৈরি তুলোর হাঁসের পরিবর্তে জামার নিচে জ্যান্ত হাঁস বেঁধে মঞ্চে ঢুকেছিলেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়ে বাইরে থেকে বড়দা হাঁসের ডাক ছাড়ছেন, আর জামার নিচে আসল হাঁসও ডাক ছাড়ছে। সেই অভিনয় দর্শকদের চমৎকৃত করলেও বুকে-পেটে হাঁসের নখের অসংখ্য রক্তাক্ত আঁচড় তাকে সইতে হয়েছে। কিছু কুচক্রী মানুষের ষড়যন্ত্রে শান্ত জায়গা খুলনাতেও যখন সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াতে শুরু করেছে তখন সাংস্কৃতিক মোকাবিলার লক্ষ্যে মনোজ মিত্রের মেসোমশায়ের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে অভিনয় করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান'। এই নাটকে দারার ছেলে সুলেমানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মনোজ মিত্র। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এই অভিনয় কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯৫০ সালে বারো বছর বয়সে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকাপাকিভাবে ভারতে চলে এলেন মনোজ মিত্র। তাঁদের পরিবার তখন তিন টুকরো। বাবা ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে কর্মরত, ধূলিহরে ছোটোকাকার সঙ্গে ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আর কোলকাতা বেলেঘাটায় এক কাকা-কাকিমা এবং মায়ের সঙ্গে বারোয়ারিতলায় দশ নম্বর বাড়িতে মনোজ মিত্র। গ্রামের সহজ আন্তরিকতা, একান্নবর্তী পরিবার, মায়াময় পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে শিকড়ছিন্ন অবস্থায় কোলকাতায় আসতে হয়েছিল বলে সেই প্রথম থেকেই যেন নগর কোলকাতার প্রতি তাঁর একটা বিমুখতা। যদিও জীবনের অধিকাংশ সময় কোলকাতাতেই থাকছেন, তাঁর কর্মকান্ডও কোলকাতাকেন্দ্রিক, কিন্তু অন্তর থেকে তিনি কোনোদিনই এই শহরকে ভালোবাসেন নি। নগরে বাস করেও সবসময় অন্তরে লালন করেছেন গ্রামের জন্য মমতা। তাই তাঁর নাটকে মানুষ-মাটি-প্রকৃতির এত আন্তরিক এবং বিপুল আয়োজন। কোলকাতার প্রতি অননুরাগের কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন ঃ

> ''কলকাতা আমায় সেভাবে কোনওদিনই কাছে টানে নি — কেননা আমরা তো এক একজন এক এক জায়গায় ছিটকে গেলাম — ঠাকুরদা ঠাকুমারা রয়ে গেলেন দেশে — আমরা চলে এলাম এখানে — সব সময়ে একটা অনিশ্চয়তা, একটা আতঙ্ক — বাবা চলে গেলেন ঢাকায় — পরিবারটা তিনজায়গায় কিরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। — আরেকটা ব্যাপার ছিল — পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক লোকজন তখন এখানে চলে এসেছে — ... এইসব ছিন্নমূল লোকজনের দারিদ্র, অসহায়তা চোখের সামনে দেখেছি — ফলে কলকাতাকে যে খুব একটা ভালো লেগেছে সে সময় — তা বলা যায় না — আলাদা করে চেনারও ইচ্ছে জাগেনি।''[১১]

বেলেঘাটায় তাঁরা ছিলেন ছয় মাস। সেখানে ট্যাংরার কাছে ভূতনাথ মহামায়া ইনস্টিটিউশনে তিনি সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্কুলজীবন শুরু। দেশ ভাগ হয়ে গেলেও দেশের মায়া কাটানো যায় না, শিকড়ের টান এড়ানো যায় না। ঠাকুর্দা অন্নদাচরণ গ্রাম ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতেই পারেন না। তিনি ওপার বাংলার ধূলিহর গ্রামের সমস্ত মানুষজনকে উঠিয়ে এনে এপার বাংলার একইরকম একটি গ্রাম গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সে পরিকল্পনা সফল না হলেও তিনি এপারে বাড়ি করেছিলেন চব্বিশ পরগণা (অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগণা) জেলার বসিরহাট-টাকীর মাঝখানে দন্ডিরহাট গ্রামে। ধূলিহর থেকে দন্ডিরহাট খুব বেশি দূরত্ব নয় — সাইকেলেই যাতায়াত সম্ভব ছিল, যতদিন পর্যন্ত পাসপোর্ট ভিসা চালু হয় নি। বাধ্য হয়ে 'দেশ' ছেড়ে এলেও এ যেন দেশের কাছাকাছি থাকার আপ্রাণ প্রয়াস। ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে বেলেঘাটার বাসা থেকে সকলে গেলেন দন্ডিরহাটের বাড়িতে। সেখানে মনোজ মিত্র ভর্তি হলেন নগেন্দ্রকুমার উচ্চশিক্ষা নিকেতনে।

এই স্কুলে তিনি থিয়েটার চর্চার অবকাশ পেয়েছিলেন। স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই সুধীর বসু ছিলেন সেই স্কুলের থিয়েটারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও নির্দেশক। এই স্কুলে দুটি রবীন্দ্র-নাটকে অভিনয় করেছিলেন তিনি — 'ডাকঘর' এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। দু'টি নাটকেই থিয়েটারকে 'সত্যি' করে তুলতে গিয়ে তিনি চরম বিব্রত হয়েছিলেন। 'ডাকঘর'-এ দইওয়ালার ভূমিকায় অভিনয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে গিয়ে এক বন্ধুর বাবার তৈরি জমাট দইয়ের হাঁড়ি উপুড় করে ঝাঁকাতে গিয়েই বিপত্তি — মঞ্চে বিশ্বাসঘাতক দইয়ের ঢল এবং অভিনয়ের আকস্মিক সমাপ্তি। আরেকবার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে নস্যি টেনে হাঁচির প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হলে মাঝপথে ড্রপসিন ফেলে দিতে হয়। পরে যখন তাঁরা বেলগাছিয়ায় থাকছেন তখন টালা পার্কের যুব উৎসবে বেলগাছিয়া পাইকপাড়ার ছেলেমেয়েরা তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' অভিনয় করবে। সেই অভিনয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার ছোটো ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে আবার সেই সত্যের প্রতি ঝোঁক এবং আবার বিপত্তি। আসল ব্যান্ডেজ বেঁধে মঞ্চে ওঠার লোভে এক বৃদ্ধ কম্পাউন্ডারকে বেশি ফিস্ দিয়ে নিয়ে এসে মঞ্চের পাশে বসিয়ে আসল ব্যান্ডেজ বাঁধিয়ে নিলেন। অভিনয় জমল ভালোই, কিন্তু নির্জলা টিঞ্চার আয়োডিনে আধখানা মুখ পুড়ে কালো। তিন মাসের চিকিৎসায় সেই কালি দূর হয়েছিল। থিয়েটারের জীবন-ঘনিষ্ঠতার প্রতি আকর্ষণের এই বিষয়টিকে মনোজ মিত্র নিজে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

> "তবে জীবনের প্রথম থিয়েটার দেখাটা — প্রথম মুগ্ধতা — সেই দুটো মাছ — কেবলই যে আমাকে ঠকাল এমন তো নয় নিশ্চয়ই। জিতিয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশিবার। জীবনানুগ বা জীবনানুরূপ হয়ে উঠতে হবে, একজন অভিনয়-শিল্পীর এই যে প্রত্যয়, জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে পাল্টা জীবন গড়তে হবে চৌখুপি মঞ্চে — এই যে জিদ — এ যদি নাই থাকে কারও, তবে সে আর কোন্ কর্মে ঢুকবে মঞ্চে ?"[১২]

১৯৫৪ সালে নগেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা নিকেতন থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে তিনি কোলকাতায় পড়তে এলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলেন। এখানে পেলেন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত পরিসর এবং সঙ্গী। স্কটিশে তাঁর সহপাঠী ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সুভদ্র সেন,

প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রিয়ব্রত দেব, নৃপেন্দ্র সাহা, প্রতুল চৌধুরী, দেবকুমার ভট্টাচার্য, অতনু সর্বাধিকারী প্রমুখ। সুশীল মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ অধ্যাপকের পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল তাঁদের চর্চায়। আনন্দ বাগচী, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন তাঁদের সিনিয়র। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত মনোজ মিত্র প্রধানত গল্পকার হবার চেষ্টা করছেন। স্কুল এবং তারপর কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি 'মাসিক বসুমতী' ও 'মন্দিরা' কাগজে গল্প লিখেছেন। প্রথম বর্ষে যখন দর্শন সাম্মানিক নিয়ে পড়ছেন তখন আনন্দ বাগচী, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে 'মহুয়া' নামে যে দেওয়াল পত্রিকা বের করেছিলেন, সেখানে 'বেতনার চর' এবং 'বাঁশি' নামে দুটি ছোটোগল্প লিখেছিলেন। স্কটিশেরই অন্যতম সহপাঠী লালমোহন 'ছোটগল্প' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করতেন তাতেও বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন মনোজ মিত্র। বিজিত দত্ত, সুভদ্র সেন, নৃপেন্দ্র সাহা-র সঙ্গে 'যাত্রী' পত্রিকা চালানোতে তিনিও ছিলেন। সেই পত্রিকায় তিনি লিখতেনও। অনেকের গল্প নিয়ে 'অন্য স্রোত' নামে একটি গল্পসংকলন তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। এই সংকলনের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন অন্নদা মুন্সী, ভূমিকা লিখেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'জয়তী' সাহিত্য পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। এইসময় তাঁরা থাকছেন বেলগাছিয়া ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাসাবাড়িতে। ১৯৫৭ সালে যখন তিনি স্কটিশে বি.এ.পড়ছেন তখন পার্থপ্রতিম চৌধুরী, অতনু সর্বাধিকারী প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সুন্দরম্'। সেখানে 'পথের পাঁচালী' এবং 'সিঁড়ি' নাটকে তিনি পার্থপ্রতিম চৌধুরীর নির্দেশনায় অভিনয় করেন।

১৯৫৮ সালে বি.এ. পাশ করে মনোজ মিত্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন দর্শনে এম.এ. পড়তে। ১৯৬০ সালে তিনি এম.এ. পাশ করেন। স্কটিশ চার্চে পড়ার সময় থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে তিনি পুরোপুরি জড়িয়ে গেছেন। কলেজে থিয়েটার করছেন, কলেজের ছেলেমেয়েরা মিলে বাইরে রঙমহলে, শ্রীরঙ্গমে অভিনয় করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন কলেজের মধ্যে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ ছিল না। এইসময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার আকর্ষণে বাড়িতে পড়াশুনোর চাপের কথা বলে তিনি কিছুদিন হস্টেলেও থাকেন। ১৯৫৯ সালে থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'সুন্দরম্' যখন নাটক খুঁজে পাচ্ছে না তখন এম.এ. ক্লাসের ছাত্র ২১ বছর বয়সী মনোজ মিত্র লিখলেন তাঁর প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল'। 'সুন্দরম্' এই নাটকটি অভিনয় করে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। নিজের ব্যাধিগ্রস্ত জীবনপিয়াসী ঠাকুর্দাকেই তিনি এই নাটকে রূপ দেন। বঙ্কিম চরিত্রটিতে তিনি নিজেই অভিনয় করতেন। 'মৃত্যুর চোখে জল' লেখার পর থেকে তিনি নাটক ছাড়া আর কিছু লেখেন নি। নীতিগত বিরোধের কারণে তিনি ১৯৬০ সালে 'সুন্দরম্' থেকে বেরিয়ে আসেন, সঙ্গী অতনু সর্বাধিকারী। তখন কিছুদিন অভিনয় করেন 'গন্ধর্ব' নাট্যসংস্থায়। নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত 'গন্ধর্ব' নাট্য পত্রিকায় তাঁর 'মোরগের ডাক' আর 'নীলকণ্ঠের বিষ' নাটক দুটি ছাপা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আবার 'সুন্দরম্'-এ ফিরে আসেন।

'এসব লিখে জলঘোলা না করাই ভালো' — মনোজ মিত্র রচিত প্রথম নাটকের দু-একটা পৃষ্ঠা উল্টে একথাই বলেছিলেন তাঁর বাবা অশোককুমার মিত্র। তিনি ছিলেন দর্শনের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। জীবনে থিয়েটার-সিনেমা দেখেন নি, নাটক-নভেল পড়েন নি। ছেলেদের লেখালেখি নিয়েও তাঁর

কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল, বড়ছেলে পড়াশুনো নিয়েই থাকুক, দর্শনে গবেষণা করে শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত হোক। মনোজ মিত্রের নিজেরও পড়াশুনো করে অধ্যাপক হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, আবার থিয়েটার ছাড়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি উভয় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন, কিন্তু সেই সময়, ১৯৬০-৬১ সালে তিনি পড়াশুনো এবং থিয়েটার নিয়ে দোটানাতেই পড়েছিলেন। এই দোদুল্যমানতাকে নিজের চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি নিজেই। থিয়েটার এবং অধ্যাপনার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে তিনি চেয়েছিলেন কোলকাতার আশেপাশে কোনো কলেজের চাকরি। কিন্তু তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তাঁকে কোলকাতা থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে, কেবল তাহলেই 'থিয়েটারের ভূত' তাঁর মাথা থেকে নামানো যাবে, তিনি উচ্চতর পড়াশুনোয় মনোযোগী হতে পারবেন। বাবার এই চাওয়াটা এত প্রবল ছিল যে, কোলকাতার কাছে মগরা কলেজে মনোজ মিত্রের চাকরির নিয়োগপত্র তাঁর হাতে পড়লে তিনি গোপনে তা ছিঁড়ে ফেলেন। কারণ, মগরা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে থিয়েটার চালিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। এরপর সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ডাক এলে বন্ধু অতনুকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যোগ দিতে যান মনোজ মিত্র। যোগ দেবার পরদিনই ভোরবেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে,তখন হঠাৎ কোলকাতার জন্য, থিয়েটারের জন্য মন কাতর হয়ে পড়ায় তিনি বন্ধু অতনুর সঙ্গে ফেরার রিক্সায় চেপে বসেন, ফিরে আসেন কোলকাতায়। ১৯৬১ সালে তিনি যোগ দিলেন রানিগঞ্জের ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজে। ভারাক্রান্ত মনে কোলকাতা থেকে, থিয়েটার থেকে বিদায় নিয়ে চললেন অধ্যাপনার কাজে। সঙ্গে নিলেন শ্যামবাজারের বিশেষ একটি দোকান থেকে কেনা পোকায় কাটা রুলটানা খাতা, যাতে লিখতেই তিনি তখন স্বচ্ছন্দ।

থিয়েটারই যখন ছেড়ে দিতে হ'ল, তখন তীব্র অভিমানে তিনি স্থির করলেন, আর নাটক লিখবেন না। পোকায় কাটা খাতা গবেষণার কাজে ব্যয় করার সংকল্প নিয়ে গবেষক হিসেবে নাম নথিভুক্ত করলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় Ethical Scepticism বা নৈতিক সংশয়বাদ। তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু থিয়েটার যাকে নেশাগ্রস্ত করেছে তিনি আর কতদিন অভিমান করে থাকবেন। গ্রীষ্মের ছুটি, পুজোর ছুটি তো বটেই, সপ্তাহান্তে কোলকাতায় এসেও তিনি তখন 'সুন্দরমে'র অভিনয়ে অংশ নিচ্ছেন। রানিগঞ্জে একবার তাঁর ওখানে বেড়াতে যান নাট্যকার মন্মথ রায়। মূলত তাঁরই প্রেরণায় রানিগঞ্জে থাকতেই মনোজ মিত্র লিখলেন পুরাণাশ্রিত নাটক 'অশ্বত্থামা' (১৯৬৩)। রানিগঞ্জ কলেজের অধ্যাপকেরা এই নাটকের অভিনয়ও করেছিলেন। গবেষণা যতারীতি স্থগিত থেকে যায়। তত্ত্বাবধায়কের চিঠি আসে, লজ্জায় কোলকাতা যাওয়া হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই অধ্যাপক প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় অকালে দেহত্যাগ করে গবেষক ছাত্রকে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দেন।

১৯৬৪ সালে রানিগঞ্জে স্থায়ী চাকরি ছেড়ে তিনি অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ নিয়ে আসেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজে। সেখানে তাঁর সহকর্মী ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সব অধ্যাপকরা মিলে এখানে 'অলীকবাবু' অভিনয় করেন। 'অলীকবাবু'র ভূমিকায় মনোজ মিত্র। কোলকাতায় তখন শ্যামল ঘোষ 'গন্ধর্ব' থেকে বেরিয়ে তৈরি করেছেন 'নক্ষত্র'। তিনি সেখানে ডাকলেন, পার্থপ্রতিম চৌধুরী ডাকলেন

'সুন্দরম্'-এ। কিন্তু কোথাও যোগ না দিয়ে কয়েকজন মিলে গড়লেন নতুন দল 'ঋতায়ন'। এখানে তিনিই নাট্যকার এবং নির্দেশক। অভিনয়ও করেছেন সব নাটকেই। 'অবসন্ন প্রজাপতি', (১৯৬৫), 'নীলা' (১৯৬৫), 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৬৬), 'সিংহদ্বার' (১৯৬৬), 'ফেরা' (১৯৬৬), 'লঘুগুরু' (১৯৬৭), 'নেকড়ে' (১৯৬৮) প্রভৃতি নাটক এখানে অভিনীত হয়। কিন্তু ঋতায়নে অভিনয় জমছে না দেখে ১৯৭০ সালে সভা ডেকে এই দলের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৬৫ সালে তিনি যোগ দিয়েছেন নিউ আলিপুর কলেজে। এখানে থাকার সময় আর একবার (১৯৬৭-৬৯) তাঁর গবেষণার ঝোঁক চেপেছিল। বিষয় 'Configuration Theory of Art' বা 'শিল্পে রূপসর্বস্বতাবাদ'। সে সময় প্রায় দু-আড়াই বছর থিয়েটার ভুলে পড়াশুনো নিয়েই লেগে ছিলেন। কিন্তু এবারও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের অকালপ্রয়াণে গবেষণা শেষ হ'ল না। তাঁর নিজের কৌতুক— "এরপর আর গবেষণা কর্মে মাথা গলানো সাহসে কুলোয় নি।"[১৩] এখানেই তাঁর প্রথাগত পড়াশুনোর সমাপ্তি।

'ঋতায়ন' বন্ধ হয়ে যাবার পর 'দলহীন' মনোজ মিত্র বাড়িতে বসে লেখালেখি করছেন। 'চাক ভাঙা মধু' এই সময় লিখেছেন। পার্থপ্রতিম চৌধুরী নাটকটি চাইলেন 'সুন্দরম্'-এর জন্য। সেখানে নাটকটি দিয়ে দেবার পর মনোজ মিত্র বুঝতে পারলেন, 'সুন্দরম্' এই নাটক অভিনয় করতে পারবে না। দলের অবস্থা ছন্নছাড়া। পার্থপ্রতিম ছবির কাজে ব্যস্ত, থিয়েটারে সিরিয়াস নন। বেশ কিছুদিন মনোজ মিত্র (মাতলা) এবং অপর্ণা সেন (বাদামী) দুজন মিলেই রিহার্সাল দিয়েছেন। কিন্তু শেষে বোঝা গেল, 'সুন্দরম্' এই নাটক অভিনয় করতে পারবে না। ১৯৭২ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ এই নাটক প্রয়োজনা করে। 'চাক ভাঙা মধু' হাতছাড়া হাওয়ায় পার্থপ্রতিম চৌধুরী খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। ১৯৭০-৭৪ মনোজ মিত্র কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন। 'সুন্দরম্'ও তখন বন্ধ। ১৯৭১ থেকে ৭৩ মনোজ মিত্র কোনো নাটক রচনা করেন নি। দলহীনতাই এর কারণ হওয়া সম্ভব। ১৯৭৫-এ মনোজ মিত্রের নেতৃত্বে আবার 'সুন্দরম্'-এর যাত্রা শুরু হয় 'পরবাস' নাটক দিয়ে। তখন থেকে তিনিই এই দলের প্রধান নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা। তাঁর সঙ্গে তখন ছিলেন দুলাল ঘোষ, মানব চন্দ্র, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অরণ্য ঘোষাল প্রমুখ। ২০০৭ সালে তাঁরই নেতৃত্বে 'সুন্দরম্' নিজেদের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। 'পরবাস'-এর পর ১৯৭৭-এ এল সেই সন্ধিক্ষণ, লেখা হ'ল বাংলা নাটক ও থিয়েটারের মাইলস্টোন 'সাজানো বাগান'। ৫ এপ্রিল ১৯৭৭ তারিখে অবনমহলে 'সাজানো বাগান'-এর প্রথম অভিনয় দর্শক-প্রশংসিত হলেও নাট্যকারের পছন্দ হয় নি সেই নাটক। শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বটাই প্রবল হয়ে ভেতরের রসবোধ হারিয়ে গিয়েছে বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। তাই নতুনরূপে লেখা হ'ল নাটকটি, অভিনয় হ'ল ৭ নভেম্বর ১৯৭৭, মুক্ত অঙ্গনে। এই অভিনয়ের পর থেকেই মূলত 'সুন্দরম্' এবং মনোজ মিত্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৮০ সালে 'সাজানো বাগান' অবলম্বনে 'তপন সিংহ' ছবি করেন 'বাঞ্ছারামের বাগান'। নাম ভূমিকায় মনোজ মিত্র। সেই প্রথম মনোজ মিত্রের সিনেমায় অভিনয় এবং প্রথম অভিনয়ই ইতিহাস। বাঞ্ছারামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে গেছেন মনোজ মিত্র। বাঞ্ছারাম যেন তাঁরই অন্যতর সত্তা। এই চরিত্রটিকে নিয়ে তিনি বহুবার বহুরকমভাবে ভেবেছেন, বাঞ্ছারামকে, বাঞ্ছারামের জীবনবোধকে নিজের জীবনে বহুভাবে উপলব্ধি করেছেন। 'বাঞ্ছারামের

বাগান'-এ অভিনয়ের পর থেকে তিনি সমানতালে থিয়েটার ও সিনেমায় অভিনয় হয়ে চলেছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে নাটক রচনা এবং নির্দেশনার কাজ। মূলত 'শত্রু' সিনেমার পর থেকে তিনি বাংলা সিনেমার খ্যাতিমান কমিক ভিলেন। নিজের একাধিক সত্তার মধ্যে নাট্যকার সত্তাটিকেই এগিয়ে রাখতে চেয়েছেন তিনি নিজে।

কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি থিয়েটারে অভিনয় করতে কোনো সংকোচ বোধ করেন নি মনোজ মিত্র। কারণ বাংলাদেশের সমাজে নাটক-থিয়েটার বরাবরই গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষিত মানুষের পক্ষে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকাই ছিল সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু সিনেমা সম্পর্কে একথা খাটে না, বিশেষত বিশ শতকের সেই সত্তর-আশির দশকে। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি নিজেই এ বিষয়ে রক্ষণশীলদের দলে। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনার সঙ্গে সিনেমায় অভিনয়কে মেলানোর মতো মানসিক প্রসারতা যে তাঁর নেই, সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। অথচ অনেকদিন পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে দুটি বিষয়ই একসঙ্গে চালিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর সকুণ্ঠ কৈফিয়ৎঃ "আমার দিক থেকে বলার এইটুকু, কোনোটাকে ছাড়তে মন চায় না। দুটোকেই আমি ভালোবাসি। আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে।"[১৪] ১৯৮০ সালে 'বাঞ্ছারামের বাগান' মুক্তি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। দ্বিধা কিছুটা ঘোচে। ১৯৮৬ সালে দর্শন বিষয় এবং নিউ আলিপুর কলেজ ছেড়ে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত হন। অভিনয় ও নাট্যচর্চার সঙ্গে অধ্যাপনাকর্মের বিবাদ এবার পুরোপুরি ঘুচল। সিনেমা করা নিয়ে এরপর আর সংকুচিত থাকতে হয় নি তাঁকে। কারণ কর্মক্ষেত্রের আনুকূল্য পেয়েছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার মনে করতেন যে, নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভাগের অধ্যাপকদের পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে প্রায়োগিক উৎকর্ষতা থাকা জরুরি। সেজন্য তাঁদের নিয়মিত পেশাদারি অনুষ্ঠান করা উচিত। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পাকাপাকিভাবে চলে আসার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের তৎকালীন প্রধান তরুণ রায়। ১৯৯৪ সালে তিনি উক্ত বিভাগে 'শিশির কুমার ভাদুড়ী অধ্যাপক' পদে যোগ দেন। ২০০৩ সালে সেখানে থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৫ সালে তাঁর বাইপাস হার্ট অপারেশান হয়।

মনোজ মিত্র একইসঙ্গে নাটক রচনা, অভিনয়, নির্দেশনার পাশাপাশি সিনেমাতেও চুটিয়ে অভিনয় করছেন। তপন সিংহ, সত্যজিৎ রায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মতো প্রখ্যাত পরিচালকদের পাশাপাশি অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী, প্রভাত রায়, রাজা সেন, রাজ চক্রবর্তী প্রমুখ অসংখ্য প্রবীণ-নবীন চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। বেশ কয়েকটি দূরদর্শন ধারাবাহিকেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর নাটক ও থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা। এ পর্যন্ত ছোটো, বড়ো, রূপান্তর মিলিয়ে তাঁর নাটকের সংখ্যা নব্বই-এর অধিক। এর মধ্যে একটি নাটকও কোনো বিদেশি নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর নয়। অর্থাৎ তাঁর নাটক রচনার শিকড় প্রোথিত দেশজ মাটিতে। এই বিপুল সংখ্যক নাটকের বাইরেও তিনি আকাশবাণীর জন্য অনেক প্রখ্যাত লেখকের গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন। 'সাজানো বাগান' ছাড়াও তাঁর 'কেনারাম বেচারাম', 'নরক গুলজার',

'দম্পতি' ও 'বৃষ্টির ছায়াছবি' নাটকগুলি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। কয়েকটি সিনেমার চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেছেন। এছাড়া 'বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায়', 'মনের কথা নাট্যকথা', 'বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ', 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে' (ছোটোভাই অমর মিত্রের সঙ্গে একত্রে) প্রভৃতি সুখপাঠ্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। আজও তিনি সমানভাবে সৃজনশীল, নতুন নতুন ভাবনা এবং আঙ্গিক প্রকাশে সাবলীল।

দীর্ঘ সৃজনশীল জীবনে তিনি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল ১৯৭৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র পুরস্কার (এই পুরস্কারের প্রাপক নির্বাচনের ভার ছিল সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ওপর), ১৯৮০ সালে চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার, ১৯৮১ ও ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে নাটক রচনার জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের জন্য সত্যেন মিত্র পুরস্কার, ১৯৯১ সালে নান্দীকার জাতীয় নাট্যোৎসব সম্মাননা, ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম জার্ণালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার, ২০০৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক, ২০১০ সালের দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার (প্রাপ্তি ২০১২ সালে) প্রভৃতি।

মনোজ মিত্রের বিভিন্ন লেখা, রচিত নাটক, প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, ঘনিষ্ঠজনেদের লেখা প্রভৃতি থেকে যে মানুষটির পরিচয় ফুটে ওঠে তিনি চিরন্তন মূল্যবোধে আস্থাশীল, মানুষের শুভবোধে বিশ্বাসী, শিকড়সন্ধানী, ঐতিহ্যপ্রিয়, গ্রামীণ সহজতায় স্বস্তি পাওয়া, আধুনিকতার অতিরেকের প্রতি বিরূপ, কৌতুকপ্রিয়, অন্তর্মুখী, নম্রস্বভাব, আদ্যন্ত থিয়েটারপ্রেমী একজন মানুষ। অন্য মাধ্যমে কাজ করলেও থিয়েটারই তাঁর প্রথম প্রেম। নাটক-থিয়েটারের কাজে কোনো ফাঁকি না পড়ে, সে বিষয়ে সবসময় তিনি সচেতন থেকেছেন। 'সুন্দরম্'-এ পার্থপ্রতিম চৌধুরী সিনেমায় বেশি ঝুঁকে পড়ায় দল একসময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই মনোজ মিত্র যখন সিনেমায় নামলেন তখন দলের আশঙ্কা তীব্র হয়েছিল। সেজন্যই তিনি ছিলেন অতিরিক্ত সতর্ক ঃ

> "বাঞ্ছারামের বাগান করার সময় আমি তটস্থ ছিলাম — আমার সম্পর্কে সুন্দরমের বন্ধুদের সন্দেহ যেন সত্যি না হয়। সিনেমা যেন আমার থিয়েটারকে গিলে না ফেলে। সত্যি বলতে কী, থিয়েটারে বেশি মনোযোগ দিয়েছি সিনেমা করার পরেই।"[১৫]

'শত্রু' সিনেমা করার পর সেই সিনেমার হিন্দি ভার্সানে অভিনয় করার জন্য তাঁর কাছে মুম্বই যাবার প্রস্তাব এসেছিল। সেই সময় পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা পাওয়া ছাড়া আরো কয়েকটি হিন্দি ছবিতে হয়তো অভিনয়ও করতে পারতেন। কিন্তু থিয়েটারকে (এবং অধ্যাপনাকেও) ভালোবেসে এবং থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার বাসনায় সেই আহ্বান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে ('আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র') এই কথাটিও তিনি কিন্তু ব্যক্ত করেন কোনোরকম গর্ব বা অহঙ্কার করে নয়, বরং নিতান্ত কুণ্ঠা ও বিনয়ের সঙ্গে থিয়েটারের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবেই । থিয়েটারে দীর্ঘ সময় পার করেও আজও তিনি যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন ঃ "তোমার কি মনে হয় আমি ফাঁকি দিয়েছি ?"[১৬] এই অতন্দ্র জিজ্ঞাসাই তাঁকে থিয়েটারের প্রতি তন্নিষ্ঠ রেখেছে। সেই তন্নিষ্ঠা নিয়েই তিনি নিজের নাটকে

রক্ষা ও পরিচর্যা করেছেন মূল্যবোধকে। সমাজে যখন গভীরতর অসুখ, মানুষ যখন সবরকমভাবেই আশ্রয়হীন, তখন মনোজ মিত্র সব বিপর্যয়ের শেষেও মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করেন শুভচেতনা। তলিয়ে যেতে থাকা মানুষের হাত ধরে তাকে উত্তীর্ণ করে দেন আলোর দিকে। নিজের নাট্যরচনার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনোজ মিত্র বলেছেন ঃ "My focus has always been on preservation and nourishment of values, of human resources."[১৭] থিয়েটারের সবরকম কাজের মধ্যে নাটক লেখাকেই তিনি প্রথম স্থান দিতে চেয়েছেন ঃ " নিশ্চিতভাবে প্রথমেই নাট্যকার তারপর অভিনেতা ও শেষে পরিচালককে রাখব। কারণ, লেখাই আমার ফার্স্ট লাভ।"[১৮] আদ্যন্ত এই মঞ্চ-মানুষের সঙ্গে যাঁরা বিভিন্নসময় কাজ করেছেন তাঁদের লেখা থেকে জানা যায়, মনোজ মিত্র সবসময়ই একটু অন্তর্মুখী, কিছুটা যেন লাজুক। নিজের কাজকর্ম নিয়ে তিনি কখনোই উচ্চকণ্ঠ নন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে একটু দূরের মানুষ বলে মনে হলেও প্রথম আলাপের গন্ডি পার হলেই তিনি একেবারে বন্ধুজন। সেই বন্ধুজনোচিত স্বভাবের স্বীকৃতি মেঘনাদ ভট্টাচার্যের লেখায় ঃ

> " এক দরদী মনের মানুষ মনোজদা খুব সহজেই বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশে গেছেন। তাই নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা মনোজ মিত্র আমার কাছে সাধারণের চেয়ে অনেক বড় মাপের মানুষ।"[১৯]

ব্যক্তি মনোজ মিত্র যে দরদী মনের অধিকারী সেই দরদই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নাট্যরচনায়। অসহায়, দুর্বল, প্রান্তিক মানুষের জন্য তাঁর দরদ এবং সহানুভূতি প্রায় প্রতিটি নাটকেই লভ্য। তাঁর নায়কেরা প্রায় সকলেই জীবনের নিম্নস্তরের মানুষ, তারা সমাজের বিশিষ্ট কেউ নয় — তাদের জন্যই মনোজ মিত্রের দরদ ও সহানুভূতি। বন্ধু অশোক মুখোপাধ্যায় ধরিয়ে দিয়েছেন মনোজ মিত্রের রসবোধ ও দরদের দিকটি ঃ

> "তার রসবোধ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও খুঁজে পায় মজার বা উপভোগের অফুরন্ত উপাদান। যে কোনও মানুষের মধ্যে, যে কোনও ঘটনার মধ্যে, যে কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে এত যে রঙ্গের সম্ভাবনা ছিল, মনোজের সঙ্গে না থাকলে তা বোধহয় ধরাই পড়ত না। কিন্তু শুধু রঙ্গ নয়। ... কাছ থেকে দেখলে ধরা পড়বেই, মানুষের জন্য গভীর মমতা ও ভালবাসায় ভরে আছে মনোজের ভেতরটা।"[২০]

এই মমতা ও ভালোবাসাই মানুষের দুঃখে তাকে ব্যথিত করে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রণোদিত করে — যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি নিজের লেখায়। বাহ্যত যে মনোজ মিত্র রঙ্গপ্রিয় ও মজাদার, তার ভেতরে রয়েছে একটি গভীর মন। সেই গভীরতাও উন্মোচিত করেছেন অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ "রঙ্গ ও মমতার বিচিত্র মিশেলে তৈরি যে আকর্ষণীয় মনোজ, আর একটু ভেতরে ডুব দিলেই তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় একজন নিঃসঙ্গ লোককে, একজন কবিকে।"[২১] এই নিঃসঙ্গতা, এই কবিজনোচিত অনুভূতিও একজন প্রকৃত শিল্পীর সম্পদ। সেই শিল্পীই অভিনেতা হিসেবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন বাঞ্ছারাম, ('সাজানো বাগান'), গজমাধব ('পরবাস') যম ('নরক গুলজার') দ্বৈপায়ন ('ছায়ার প্রাসাদ') প্রভৃতি চরিত্রে, যে চরিত্রগুলি 'কান্না-হাসির মাঝখানে, কৌতুক-বিষাদের মাঝখানে একটি ধূপছায়া জগতের বাসিন্দা'। শিল্পী মনোজ মিত্র, স্রষ্টা মনোজ মিত্রের আছে আর এক সত্তা — মননশীল প্রাজ্ঞ সত্তা। সেই সত্তাটি ঃ "প্রবন্ধ রচনায়, বক্তৃতায়, গ্রন্থ-সমালোচনায়, নাট্যপ্রশিক্ষণে পারদর্শী এবং জঙ্গম।"[২২] কিন্তু এই সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মানুষদের কাছে মনোজ

মিত্রের প্রধানতম পরিচয় — তিনি বন্ধু। বয়স বা মর্যাদার গন্ডি অতিক্রম করে তিনি একান্ত নিকটজন। সেই বন্ধুজনের প্রতি নিজের মুগ্ধতা ব্যক্ত করেছেন অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ ''মতান্তরকে সে সম্যক শ্রদ্ধা করে অথচ মনান্তর ঘটতে দেয় না। ক্ষমতা ও খ্যাতিকে অবহেলায় পেছনে রেখে সে মনের সঙ্গে মনের সেতুকে মজবুত করে তোলে।''[২৩] 'শিল্পস্রষ্টা'র চেয়েও তিনি বড় 'সম্পর্কের স্রষ্টা' হিসেবে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র - দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা - ৭৩, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ.১৫

২) ঐ, পৃ.১৬

৩) ঐ, পৃ.১৯

৪) ঐ, পৃ.১৯

৫) আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র - সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু - ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় খন্ড - নভেম্বর ২০১১, পৃ.৫৯৩

৬) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ.২০

৭) ঐ, পৃ.২১

৮) ঐ, পৃ.২৯

৯) ঐ, পৃ.৩০

১০) ঐ, পৃ.২১

১১) আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র - সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু - ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৬০৩

১২) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ. ৫০

১৩) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০,শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ - মাঘ ১৪০৬, পৃ.১২২

১৪) ঐ, পৃ.৪৪

১৫) ঐ, পৃ.৫৪

১৬) আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র - সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু - ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৬১৮

১৭) To preserve and nourish values - Interview to Sankar Majumder - The Statesman - 28/10/2005

১৮) মঞ্চের মানুষ - রবিশঙ্কর মিশ্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকার - আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৮/১২/১৯৯৩

১৯) একজন বড় মাপের মানুষ - মেঘনাদ ভট্টাচার্য - আজকাল - ০৯/০৮/১৯৯২

২০) মতান্তরকে শ্রদ্ধা করে, মনান্তর ঘটতে দেয় না - অশোক মুখোপাধ্যায় - আজকাল - ০৯/০৮/১৯৯২

২১) ঐ

২২) ঐ

২৩) ঐ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাট্যসৃজন পটভূমি এবং সৃজনমুখর জীবনের পর্ব বিভাজন

261463

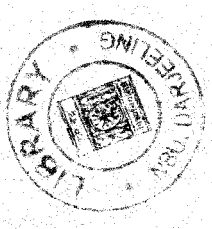

18 AUG 2013

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাট্যসৃজন-পটভূমি এবং সৃজনমুখর জীবনের পর্ব বিভাজন

১৯৫৯ সালে মনোজ মিত্র যখন নিজের প্রথম নাটকটি লিখলেন, গণনাট্যের পথ বেয়ে নবনাট্যের আবির্ভাবের পরও তখন কেটে গেছে অনেকটা সময়। নাট্যজগতে তখন দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের টানাপোড়েন — শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্ত। স্থূল বিভাজনে এঁদের একজনের কাজে অনুভূতির প্রাধান্য, অপরজনের কাজে বক্তব্যের। এই দুই ধারাকে মেলালেন মনোজ মিত্র নিজের নাটকে। তাঁর নাটক রচনার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে চমৎকার চিহ্নিত করেছেন কুমার রায় মহাশয়ঃ

> ''স্বাধীনতার পর যে নতুন ভাবনা, যে নতুন দায়িত্ববোধ, যে নতুন উত্তেজনা — তখন তার অবসান ঘটেছে। রাজনৈতিক আকাশ সমাকীর্ণ নানান সুবিধাবাদের জঞ্জালে। মানুষের বাঁচার সমস্যা নতুন মাত্রা পেয়েছে। অনুভূতিশীল আধুনিক মানুষের অসহায় এবং নিঃসঙ্গ আর্তি ফুটে উঠেছে তখন ধনবাদী সভ্যতার ব্যাধি নিয়ে। সে এক ক্ষুব্ধ-অস্থির উৎকেন্দ্রিক সময়। যে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা মানুষের মুক্তি দিতে পারে — সেই বিশ্বাসের আধারে বেনোজল ঢুকে পড়েছে — বিশ্বাস টুকরো হয়ে গেছে। ... প্রথম যুক্তফ্রন্ট, নকশালবাড়ি আন্দোলন পর পর দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। ... এরই মধ্যে সত্তর দশকের টালমাটাল অবস্থা, জরুরী অবস্থা, মৃত্যু, বিভীষিকা, বামফ্রন্টের বিজয়, প্রতিষ্ঠা, শাসন ও রাজত্বকাল। এই সময়কালে মনোজ মিত্র নাটক লিখেছেন।''[১]

সমাজ-রাজনীতির নিপুণ পর্যবেক্ষণ এবং উপস্থাপন আছে মনোজ মিত্রের নাটকে। বিশেষ সামাজিক অবস্থায় পতিত মানুষের সমস্যা এবং সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি, তবে তা কোন রাজনৈতিক তত্ত্বের অনুগামী হয়ে নয়। কারণ ঃ ''মনোজ গণনাট্য সংঘ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার দাবী করেন নি কখনো। বরং তিনি এসব থেকে নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখতে চেয়েছেন।''[২] স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ তা তখন ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছে নিঃসঙ্গতাবোধ, আশ্রয়হীনতার সমস্যা। নিজের কালের সেই সমস্যা মনোজের মিত্রের নাটকে বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ক্রমাগত প্রতিবাদ এবং শত্রু সংহার করতে গিয়ে বাংলা নাটক যখন রূপের দিক থেকে ক্রমশ দীন হয়ে পড়ছে, তখন তিনি বাংলা নাটকে নিয়ে এলেন 'আলো ছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ'কে। তাঁর প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই কেন্দ্রে আছে একজন অসহায় গড় মানুষ। তাঁর ভাষায় ঃ "My protagonists are always from a lower strata of life. From matla in Chak Bhanga Modhu to Munni who is just a nobody in the world, all are rootless, useless fellows."[৩] সে মানুষ কখনো পরিবার, কখনো সমাজ, কখনো বা রাজনীতি দ্বারা নির্যাতিত। সহজ ইচ্ছাপূরণ নয়, নাট্যিক শর্ত মেনেই তিনি দেখান সেই মানুষের ঘুরে

দাঁড়ানো। এই ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে উচ্চকিত রাজনৈতিক তত্ত্ব নেই, আরোপিত আদর্শবাদ নেই – আছে মানুষের জন্য মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা আর সহমর্মিতা। কোনো বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া নয়, পাঠক-দর্শকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা নয়, এ যেন শুধু নিজের অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। বিশিষ্ট সমালোচক তাঁর নাটকের মূল সুরটিকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে ঃ

> "দেশ, কাল, ইতিহাস, সমাজ, ব্যক্তির সঙ্কট, অসহায়তায় তিনি অবিরত আলোড়িত, ব্যথিত হয়েছেন। জীবন কেন এত দুঃখময়, মানবিক সম্পর্কগুলো কেন ভেঙে পড়ছে, কোথায় চলেছে মানবসভ্যতা, অস্তিত্বে বিজড়িত এই মৌলিক প্রশ্নগুলি বাঙালি দর্শকদের তিনি ভুলতে দেন নি।"[৪]

সমগ্র নাট্যজীবনে মনোজ মিত্র চেষ্টা করেছেন ভেঙে যাওয়া মূল্যবোধের রক্ষণ ও লালনের ঃ "My focus has always been on preservation and nourishment of values, of human resources. And then the three elemental realities – sickness, inability and death."[৫]

মানুষের ক্ষুধা, অস্তিত্বের সংকট, লোভ, বেঁচে থাকার প্রবল বাসনা, স্বার্থপরতা, সহমর্মিতা নিয়েই তাঁর নাটক। নিজের কালের সামাজিক-রাজনৈতিক অভিশাপ ও ব্যভিচারের নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ করেছেন তিনি। কিন্তু সে ব্যবচ্ছেদ করেছেন কৌতুকের আশ্রয়ে আর সে কৌতুক অনেক সময়ই চোখের জলের কাছাকাছি। যে প্রবল সহানুভূতির বশে আফিমখোর এক ভূয়োদর্শী বৃদ্ধ স্বদেশ ও স্বজাতিকে অশ্রুসজল কৌতুকের তীরে বিদ্ধ করে সংশোধনের পথ দেখাতে চেয়েছিলেন, মনোজ মিত্রের কৌতুক সেই সহানুভূতি-সঞ্জাত। এই কৌতুকের উপাদান আছে তাঁর নিজেরই চরিত্রে। নিজের কৌতুকপ্রিয়তা প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণ ঃ

> "আমার কৌতুকের ঢং খুলনার। ... খুলনার অধিকাংশ মানুষজন রসিক হন। জীবনকে হাল্কা ও সহজ চালে দেখেন। কঠিন ঘটনার মধ্যেও এখানকার মানুষ রসিকতা করেন। খুব দুঃখের মধ্যেও হাসির কথা বলেন। আসলে খুলনা জায়গাটা উর্বর। প্রাচুর্যে ভরা। ফলে এখানকার মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য, চিন্তাহীনতা মানুষকে অলস রসিকতার মেজাজ দিয়েছে। খুলনার রসিকতা খুব জ্বালা ধরায় না, কিন্তু বক্তাকে প্রকাশ করে। অথচ তার বক্তব্যকে উঁচু করে তোলে না। আমার এই মানসিকতাটা আছে।"[৬]

তাঁকে যাঁরা খুব কাছে থেকে দেখেছেন তাঁরা তাঁর রঙ্গপ্রিয়তার গভীরে আবিষ্কার করেছেন মানুষের জন্য গভীর মমতা ও ভালোবাসা। এই রঙ্গ ও মমতার স্তর পার হয়ে আর একটু ভেতরে যাবার সুযোগ পেলেই দেখা যায় "একজন নিঃসঙ্গ লোককে, একজন কবিকে।"[৭] ব্যক্তিজীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি মিলেমিশে কীভাবে পূর্ণতা পান শিল্পী তা ধরা পড়ে ঘনিষ্ঠ জনের অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে ঃ "রঙ্গময়তার সঙ্গে, কান্নার সঙ্গে কবিতার মিশেল ... যেমন মানুষ মনোজের চরিত্রের তিনটি প্রধান দিক, তেমনি এই তিনের মিশেলেই গড়ে উঠেছে ওঁর শিল্পীচরিত্র"।[৮] সেই শিল্পীর সহানুভূতি বিস্তৃত হয়, এমনকী 'কাঁঠাল চোরের সঙ্গে চুরির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ' শিয়ালের প্রতিও। সেই সহানুভূতিকে অভিনন্দিত করেছেন সমালোচক ঃ "প্রাণিজগৎ, নিসর্গপ্রকৃতি, বস্তুজগতের সমন্বয়ে চরাচর উপলব্ধির যে ঐতিহ্য বাঙালির মৌলিক স্বভাবে ঢুকে গেছে, মনোজ মিত্র সেই স্বভাবের প্রতিনিধি।"[৯] দীনবন্ধু

মিত্রের নাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় ব্যঙ্গপ্রণালীকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন – রসিক লাঠিয়ালের মোটা লাঠির বাড়ি এবং ডাক্তারের সরু ল্যানসেটের সূক্ষ্ম আঘাত। একালের সমালোচক মনোজের নাটকে এই দুয়েরই উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন ঃ"প্রয়োজনে মোটা লাঠি ব্যবহার করেছেন– আবার প্রয়োজনে সূক্ষ্ম ল্যানসেট; জঞ্জাল যখন পর্বতপ্রমাণ তখন খোলাখুলি আক্রমণে মনোজ সিদ্ধহস্ত; তখন সে (তিনি) মোটা লাঠি-ই বেছে নিয়েছেন।" [১০]

'খাঁটি বাঙালি নাট্যকার' অভিধাটি মনোজ মিত্র সম্পর্কে অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন। এর প্রধান কারণ সম্ভবত মনোজ মিত্রের নাট্যবিষয়ে দেশজ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এবং সবগুলিই একান্তভাবে মৌলিক নাটক। সচেতনভাবে দেশি বা বিদেশি কোনো নাট্যকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে তিনি নিজে মনে করেন নি। তবে যে কোনো স্রষ্টার মনেই তাঁর পূর্বপাঠ যে কোনো না কোনো ভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাও অস্বীকার করেন নি। এ বিষয়ে দেশীয় নাট্যকারদের মধ্যে তিনি বলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গিরিশ ঘোষের কথা ঃ "Plays by D.L. Roy were fascinating. He painted the scene with impeccable dialogues. His stage direction was fantastic. Girish Chandra Ghosh was also great"[১১] বিদেশি রচনার মধ্যে মনোজ মিত্র উল্লেখ করেছেন রাশিয়ান গল্প-নাটক লেখক, বিশেষত চেকভের কথা। কারণ চেকভ ঃ "suited the Indian or rather Bengali context very well. At least in my eyes."[১২] 'শোভাযাত্রা' নাটকে 'চেকভীয়ান ধাঁচে'র পাশাপাশি ইবসেনীয় স্বাদও যে একেবারে অনুপস্থিত নয়, তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার ঃ

> "ইবসেনের নাটকে যেমন অতীত বড় বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে, অতীতটাই অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির চালিকাশক্তির ভূমিকা নেয় এক্ষেত্রেও তো খানিকটা সেরকম হয়েছে। প্রাচীন বংশের ঐতিহ্য চরিত্রগুলির চালিকাশক্তির ভূমিকা নিয়েছে।" [১৩]

ব্রেখটও যে কোনো না কোনোভাবে তাঁর নাটকে প্রভাব বিস্তার করেছেন, সেকথাও স্বীকার করেছেন তিনি ঃ

> "চরিত্রের থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, আপন মানসিক পরিচয় দেওয়া, এগুলো ব্রেখ্‌টের নাটকে যেমন আছে হুবহু তেমন অবস্থা আমার নাটকে সৃষ্ট না হলেও আমি ঐ বিচ্ছিন্নতাসূত্রের মধ্যে একটা নতুন মজা পেয়েছি। ... আমি Naturalistic Pattern এর মধ্যে সেই মজাটুকু চারিয়ে দেব, হয়ত এখনই দিচ্ছি। ... রীতি এবং প্রকরণ বাদ দিলেও ব্রেখ্‌টের নাটকের আর একটা যে লক্ষণীয় গুণ আমাকে আকৃষ্ট করে, উত্থান-পতনময় একটা নিটোল গল্প। বহু ঘটনা, বহু চরিত্র নিয়ে খুব সোজা এবং রূপকথার মত আকর্ষণীয় কাহিনী বিন্যাস।"[১৪]

কিন্তু তিনি একথাও জানেন যে ঃ "আসলে হুবহু কিছু হয় না, হুবহু কাউকে করাও যায় না।"[১৫]

দীর্ঘ প্রায় পঞ্চান্ন বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে মনোজ মিত্র একষট্টিরও বেশি নাটক রচনা করেছেন। এই সৃষ্টিমুখর জীবনকে কয়েকেটি পর্বে বিন্যস্ত করা যেতে পারে ঃ

প্রথম পর্ব (১৯৫৯-৭০) ঃ ***পথ সন্ধান*** ঃ এই পর্বে পূর্ণাঙ্গ নাটক বারোটি এবং একাঙ্কের সংখ্যা আট থেকে নয়টি। 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯) একাঙ্ক দিয়ে যে পারিবারিক জীবনের কাহিনি বয়ন

শুরু করলেন, তা ক্রমে প্রসারিত হ'ল 'পাখি' (১৯৬০), 'টাপুর টুপুর' (১৯৬৭) ও 'কোথায় যাবো' (১৯৬৯) নাটকে। 'নীলকন্ঠের বিষ' (১৯৬০), 'মোরগের ডাক' (১৯৬১), 'আলোক ঝরণা' (১৯৬২), 'অবসন্ন প্রজাপতি' (১৯৬৩), 'ব্ল্যাক প্রিন্স' (১৯৬৪), 'নীলা' (১৯৬৫), 'আরক্ত গোলাপ' (১৯৬৫), 'সিংহদ্বার' (১৯৬৬) প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে এই পর্বে নাট্যকার হিসেবে তৈরি হয়ে উঠছেন মনোজ মিত্র। এর মধ্যে অনেকগুলি নাটকই তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, অনেকগুলিই আজ বিস্মৃতপ্রায়, কিন্তু তার মধ্যেও 'নীলকন্ঠের বিষ', 'অবসন্ন প্রজাপতি', 'আরক্ত গোলাপ' প্রভৃতি নাটকে ভবিষ্যতের সফল নাট্যকারের পূর্বসূচনা লক্ষণীয়। তাছাড়া ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত তিনি থাকছেন কোলকাতা থেকে দূরে রাণিগঞ্জে। ফলে তাঁর নাটকের মঞ্চসংযোগ এই সময় সেভাবে ঘটেনি। মঞ্চ-আনুকূল্যের অভাবও উল্লেখযোগ্য নাটক সৃষ্টি না হওয়ার অন্যতম কারণ। এই সময় গবেষণার দিকেও তাঁর ঝোঁক চেপেছিল। ফলে নাটক-থিয়েটার না পড়াশুনো — এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। এরই মধ্যে ১৯৬৩-তে আমরা পেলাম 'অশ্বত্থামা', যা তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। 'অশ্বত্থামা' ১৯৬৩ সালে লেখা হলেও ১৯৭২-৭৩-এ পুনর্লিখিত। এরই মাঝে তিনি মহাভারতীয় বিষয় আশ্রয়ে লিখেছেন আরেকটি একাঙ্ক 'তক্ষক' (১৯৬৭)। ধ্বংস ও মৃত্যুর বিপ্রতীপে সুস্থ সৃজনভাবনা ব্যক্ত হয়েছে এই দু'টি নাটকে। এই পর্বেই তিনি লিখেছেন 'বেকার বিদ্যালঙ্কার' (১৯৬৬)-এর মতো হিউমার-প্রধান রহস্যনাটক। অর্থাৎ বিভিন্ন দিকে লেখনী চালনা করে নিজের ঠিক পথটি চিনে নেবার চেষ্টা চলছে। এই পর্বেই তাঁর দৃষ্টি পরিবারের গন্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ মনোজ মিত্রকে দেখি 'নেকড়ে' (১৯৬৮) ও ' চাক ভাঙা মধু ' (১৯৬৯) পূর্ণাঙ্গ নাটক দু'টিতে। বিশেষ একটি মতাদর্শ-অনুসারী সমাজ বদলের ভাবনার আভাস ফুটে উঠেছে এই নাটক দু'টিতে। শোষক-শোষিতের চিরন্তন লড়াই এবং পরিণামে শোষিতের প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে শোষণের অবসান ঘটানোর ছকই এগুলিতে রূপ পেতে থাকে। তবে তার মধ্যে 'নেকড়ে' নাটকে শোষিতের জয় ঘোষণায় তিনি যতটা তীব্র, 'চাক ভাঙা মধু'তে তার পরিবর্তে তাঁর অবলম্বন শোষিতের অসহায়তা, আত্মবিদ্রূপ, হাস্যকর জ্বালা ও যন্ত্রণা। সংঘশক্তির পরিবর্তে অঘোর ঘোষের বিরুদ্ধে বাদামীর একক প্রত্যাঘাত সমালোচিত হলেও উৎপল দত্ত এবং পবিত্র সরকারের মতে, পুরো নাটকের ঘটনাক্রম পেছনে নিয়ে এই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া শ্রেণিসংগ্রামের মূল লক্ষ্যকেই সমর্থন জানায়। কিন্তু এই পথ যে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকবেন না তিনি, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর পরবর্তী দু'টি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০) ও 'পরবাস' (১৯৭০) নাটকে। একই বছরে লেখা এই দু'টি নাটকে তিনি শোনালেন দু'জন অসহায় মানুষের গল্প। 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকে যে অসহায়তা ছিল পারিবারিক ক্ষেত্রে তা এখানে বিস্তৃত হয়েছে সামাজিক ক্ষেত্রে। প্রথম নাটকে অসহায়তা শুধু কেনারামের নয়, নগেন পাঁজারও। আর দ্বিতীয় নাটকে অনিকেত গজমাধবের আশ্রয়হীনতার সমস্যা হাসি-অশ্রুর মিশেলে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই শুরু হ'ল মনোজ মিত্রের নাটক রচনার বিশিষ্ট ধরণটি। কৌতুকের আড়ালে টলটলে অশ্রুর মুক্তোবিন্দুটি এখান থেকেই দেখা গেল। ট্রাজি-কমেডি, যা তাঁর মানসমুক্তির প্রধান পথ, তার সন্ধান যেন তিনি পেলেন এখান থেকেই।

১৯৭১-৭৩ কোনো নাটক রচনার সংবাদ নেই, যদিও তিনি তখন কোলকাতাতেই। সম্ভবত

আগামী কয়েকটি বড় সৃষ্টির জন্য তাঁর মানসপ্রস্তুতি চলছে এই সময়। তাছাড়া এইসময় তিনি কোনো থিয়েটার দলের সঙ্গে যুক্ত নন, ফলে বাস্তবের তাগিদও তেমন নেই।

দ্বিতীয় পর্ব (১৯৭৪-৮১) ঃ ***সৃষ্টি মুখর*** ঃ এই পর্বে মনোজ মিত্র পুরোমাত্রায় সৃষ্টিশীল। মাঝে কেবল ১৯৭৫-এ কোনো নাটক নেই। এই পর্বে তাঁর প্রধানতম সৃষ্টি 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭), যা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এই নাটকটি 'বাঞ্ছারামের বাগান' নামে তপন সিংহের পরিচালনায় চলচ্চিত্রায়িত হয়ে বহুল প্রচার লাভ করে। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন নাট্যকার। তবে চলচ্চিত্রায়ণের পরও নাটকের জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। এই নাটকেও আমরা দেখি এক অসহায় বৃদ্ধের ক্রমশ কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়ানো। 'তোমার ফলিডল না হয় তুমিই ...' বলে জমিদারের দিকে বাঞ্ছারামের বিষের শিশি বাড়িয়ে ধরা বিশুদ্ধ মনোজীয় ভঙ্গিরই প্রতিবাদ। একেবারে শেষে ঘোষিত হয়েছে, নতুন জীবনের আগমনবার্তা। এই পর্বে তিনটি রাজনৈতিক Satire রচনা করেছেন তিনি -- 'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪), 'নরক গুলজার' (১৯৭৪) এবং 'রাজদর্শন' (১৯৮১)।

সমকালীন রাজনীতির আদর্শহীনতা, ভ্রষ্টাচার, শোষণ, আত্মসর্বস্বতা এসব নাটকে তাঁর শ্লেষ-ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। 'শিবের অসাধ্যি'তে তিনি সমাজ-বদলের জন্য শোষিত মানুষের জাগরণের ওপরই নির্ভর করেছেন আর 'নরক গুলজার' নাটকে তীব্র ক্রোধে সব শয়তানকে গো-জন্ম দিয়েছেন। 'শিবের অসাধ্যি'তে রাজনীতি-প্রাধান্যের কারণে নাটকত্ব ক্ষুণ্ণ হলেও 'নরক-গুলজার' বক্তব্যপ্রধান হয়েও নাট্যিক শর্ত পূরণ করেছে। 'রাজদর্শন' নাটকে যে রাজনীতি আছে তা কোনো দল বা শ্রেণিকে জোর করে জিতিয়ে দেবার সরল মঞ্চভাবনা নয়। এই রাজনীতি মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে। বহু আশায় যে ক্ষমতা বদল ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে, তা যে সবসময় সুফল দিচ্ছে না, গদি যে মানুষকে কীভাবে বদলে দিচ্ছে তার আভাস যেন আছে 'রাজদর্শন' নাটকে ঃ

> '' 'চাক ভাঙা মধু'র শংকর বা অঘোর, 'শিবের অসাধ্যি'র হাঁদু সিংহি, 'সাজানো বাগান'-এর ছকড়ি-নকড়ির মতো নয় হীরামন বা লম্বোদর, তারা উঠে আসে আমাদেরই আকাঙ্ক্ষার জমি থেকে এবং তারপর লোভে তাদের পা পিছলে যায়। ''[১৬]

এই পর্বে মনোজ মিত্র পেশাদারি মঞ্চের প্রয়োজনে লিখেছেন পারিবারিক নাটক 'দম্পতি' (১৯৭৮), আবার 'পাহাড়ী বিছে' (১৯৭৬-৭৭)-র মতো রহস্য নাটকও সৃষ্টি করেছেন। 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯) নাটকে ব্যবহার করেছেন রূপকথার আঙ্গিক। সাতটি একাঙ্ক নাটকের মধ্যে মদন সিরিজেই তিনটি (আমি মদন বলছি - ১৯৭৪, মদনের পঞ্চকান্ড - ১৯৭৪, বাবুদের ডালকুকুরে - ১৯৮১),'দম্পতি' এবং 'নরক গুলজার'কে একাঙ্ক রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে 'সন্ধ্যাতারা' (১৯৭৯-৮০) এবং 'সত্যি ভূতের গপ্পো'(১৯৮১) নামে। এছাড়া আছে 'তেঁতুলগাছ' এবং প্রধানত 'চোখে আঙুল দাদা' (১৯৭৬)। এই নাটকটি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছে প্রচুর। মনোজ মিত্রের নাটক যে যে কোনো রাজনীতির ভ্রষ্টাচারকেই আঘাত করে তার প্রমাণ ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের শাসনের সময় তাদের বিপরীত মতাদর্শের মানুষের দ্বারা এই নাটকের প্রবল সমালোচনা। একসময় জরুরি অবস্থার সমর্থক বলে এই নাটক সমালোচিত হয়েছে, আবার পরবর্তীকালে বামপন্থী শাসনের সময় বামবিরোধীরা একে বাম-শাসনের সমর্থক বলে সমালোচনা করেছেন।

তৃতীয় পর্ব (১৯৮২-৮৬) ঃ ***অলস কলমচালনা ঃ*** ১৯৮২-৮৩-তে কোনো বড়ো নাটক নেই, কেবল একাঙ্ক 'কাকচরিত্র' (১৯৮২)। সৃষ্টির অপ্রাচুর্যের সেই আক্ষেপই যেন ধ্বনিত হয়েছে এই নাটকের অন্যতম চরিত্র নাট্যকার ব্যোমকেশ বক্সীর সংলাপে ঃ "তুমি তো শালা জানো না, বাংলা থিয়েটারে নাটকের কী ক্যানট্যাংকারাস্ অবস্থা।... মৌলিক নাটক... অরিজিন্যাল প্লে বছরে দেড়খানাও পয়দা হয় না!... পুরো ফ্যামিলি প্ল্যানিং।"[১৭] ১৯৮৪-৮৫ সালে একটিই বড় নাটক – 'নৈশভোজ'। সমাজ-রাজনীতির ভন্ডামির স্বরূপ উন্মোচনে মনোজ মিত্র এখানে নির্মম। ১৯৮৫ সালে রচিত একাঙ্ক 'পাকে-বিপাকে'র বিষয় জোতদার ও চাষীর লড়াই। ভীতুর হদ্দ জনার্দনও শেষ পর্যন্ত স্বজাতিদের জন্য জেগে উঠেছে। 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকায় প্রকাশিত এই নাটকে অনর্থক বক্তৃতা নেই, নাট্যিক শর্ত মেনেই কৌতুকের মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্যসাধন করেছেন নাট্যকার। জনার্দনের পক্ষে স্বাভাবিক পথেই প্রতিবাদ করেছে, প্রতিশোধ নিয়েছে জনার্দন। ১৯৮৬-৮৭-তে আবার পূর্ণাঙ্গ নাটকের খরা। মাঝে মাঝেই এরকম বিরতি আসলে বড়ো কোনো সৃষ্টির জন্য মানসপ্রস্তুতির কাল। এই বিরতির সময় অভ্যাস রেখে যাওয়ার কারণেই যেন দু'একটি একাঙ্ক লিখে যাওয়া। যেমন ১৯৮৬ সালে লিখলেন দু'টি একাঙ্ক 'মহাবিদ্যা' এবং 'ঘড়ি আংটি ইত্যাদি'। দ্বিতীয়টিতে চরিত্র মাত্র দু'জন। তার মধ্যে একজন, অর্থাৎ বৌ নির্বাক। প্রকৃতপক্ষে এটি একক অভিনয়। বিরতি পর্বে এ যেন আঙ্গিক নিয়ে কৃৎকৌশল।

চতুর্থ পর্ব (১৯৮৮-৯৮) ঃ ***ঐশ্বর্য পর্ব ঃ*** দশটি পূর্ণাঙ্গ এবং নয়টি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন এই পর্বে এবং প্রায় সবগুলিই সৃষ্টি হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রথম প্রবণতাটি হ'ল পারিবারিক জীবন-আশ্রিত নিটোল দুঃখ-সুখের গল্প বয়ন। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' (১৯৮৮) এই প্রবণতার সার্থক প্রকাশ। এছাড়া 'স্মৃতিসুধা' (১৯৯৩) এবং আত্মগোপন'কে স্থূলভাবে এই ধারারই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। একাঙ্ক সৃষ্টির মধ্যে 'প্রভাত ফিরে এসো'(১৯৮৮), 'আঁখিপল্লব' (১৯৯০), 'দন্তরঙ্গ' (১৯৯২), 'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩), 'আকাশচুম্বন' (১৯৯৫) প্রভৃতিও পারিবারিক জীবনের টানাপড়েন, স্নিগ্ধ সহানুভূতি বা জটিল নাগরিক সমস্যার রূপায়ণ। এই পর্বে মনোজ মিত্রের দ্বিতীয় প্রবণতাটি হ'ল অতীত সন্ধান। 'কিনু কাহারের থেটার' (১৯৮৮) থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, তাঁর এবারের প্রবণতা পেছন ফেরার দিকে, শিকড় সন্ধানের দিকে। এখান থেকে 'শোভাযাত্রা' (১৯৯০), 'দর্পণে শরৎশশী' (১৯৯১) হয়ে 'গল্প হেকিমসাহেব' (১৯৯২-৯৩) 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫), 'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭-'৯৮) পর্যন্ত যেন শিকড় সন্ধানের দশ বছর। এর মাঝখানে অন্য ধারার নাটক একেবারেই নেই এমন নয়, তবে এই পর্বে মনোজের প্রধান সৃষ্টিগুলিই অতীত-আশ্রিত। এই অতীত চর্চার কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন ঃ

> "বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীতচর্চা করেছি। নইলে আর পুরাতনে কী প্রয়োজন? কিছু একটা অনুসন্ধানের জন্যই মাটি খোঁড়াখুড়ি। ...শেকড় জ্যান্ত থাকলে তাতে জলসিঞ্চন করা। তাকে জাগানো, বাড়ানো, ফুল-ফলের স্বপ্ন দেখা।"[১৮]

এই স্বপ্ন দেখা, এই অনুসন্ধান বর্তমানের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মানসিক বিশ্রাম পেতেই। আরও বাস্তব প্রয়োজনের কথা তিনি বলেন একই সাক্ষাৎকারে ঃ

> " মানুষ কিন্তু পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার জন্যই ঘাঁটে না, তার প্রয়োজনে বর্তমানে লাগে বলেই সে অতীতকে টানে। অনেকসময় বর্তমানকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে ধরতে গেলে নানারকম চাপের

মুখোমুখি হতে হয়। বাহ্যিক এবং মানসিক। এরকম একটা প্রয়োজন থেকেও নাট্যকার ফিরে যেতে পারেন অতীতে।" [১৯]

এই বক্তব্যের সূত্রেই অতীত লগ্ন হয়ে গেছে বর্তমানের। সমকালের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তাপের আঁচকে কিছুটা সহনীয় করে তোলার জন্যই মনোজ মিত্র সময়ের ব্যবধান রচনা করেন। তৃতীয় আর একটি প্রবণতার ইঙ্গিতও এই পর্বে আছে, তা হ'ল রূপকের আশ্রয়ে সমাজ-বিশ্লেষণ। 'পুঁটি রামায়ণ' (১৯৮৯-৯০) এই ধারার পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। 'রাজার পেটে প্রজার পিঠে' (১৯৮৮) এই পর্বে রচিত কিশোর-নাটক। একাঙ্কগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯১), 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' (১৯৯২)। ১৯৬৬ সালে লেখা একাঙ্ক 'বেকার বিদ্যালঙ্কার'কে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন এই পর্বে (১৯৯১)।

পঞ্চম পর্ব (১৯৯৯-২০০৯) ঃ ***সৃজনের প্রান্তসীমায়*** ঃ এই পর্বে পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা দশটি। 'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯) নাটকে সেই 'rootless, useless fellow' রূপচাঁদের গল্প – যা এক অদ্ভুত বিষণ্ণতাবোধ চারিয়ে দেয়। পরের বছর লিখলেন 'নাকছাবিটা' (২০০০), তার পরের বছর 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' (২০০১)। কৌতুকের আবরণে এই নাটকে মনোজ মিত্রের নারী ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ধারাটির সূচনা 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' থেকে। শেষ পর্বে রচিত তাঁর তিনটি নাটকে একটি মৌল সূত্র আবিষ্কার করা যায়। 'অলকানন্দা' য় যে নারীর গল্প বলতে শুরু করেছিলেন, 'পালিয়ে বেড়ায়', 'নাকছাবিটা' এবং 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে যেন তারই বিস্তার – নারীকে বিভিন্নরূপে দেখা। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকের অসাধারণ মঞ্চসাফল্যের মধ্যেই লেখা হ'ল 'যখন কুলীন ছিলাম' (২০০০)। 'প্রতিকৃতি' নাট্যদল এটি অভিনয় করে, তবে অভিনয় তেমন জমেনি। ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত যথাক্রমে লিখেছেন 'কুহুযামিনী' (২০০২), 'অপারেশন ভোমরাগড়' (২০০৩), 'রঙের হাট' (২০০৪), 'যা নেই ভারতে' (২০০৫), 'ব্রিজের ওপর বাপি' (২০০৬)। এসব নাটকে বলার কথাটি মোটামুটি এক। মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জীবনকে ইতিবাচকতায় উত্তীর্ণ করে দেওয়া প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলিকে তিনি দেখেছেন জীবনের বিচিত্র প্রেক্ষাপটে। 'কুহুযামিনী'র প্রেক্ষাপট ন্যাশনাল হাইওয়ে, 'রঙের হাট'-এ হাটখোলা, 'ব্রিজের ওপর বাপি'-তে নতুন তৈরি হওয়া একটি ব্রিজ। 'অপারেশন ভোমরাগড়'-এ ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে শ্লেষ-ব্যঙ্গের তীব্র নিক্ষেপ করেছেন। 'যা নেই ভারতে' নাটকে মহাভারতের কাহিনিতে আবিষ্কার করেছেন নতুন সত্য। 'মহাভারত' মহাগ্রন্থে যা নেই, অথচ বর্তমান ভারতে যা সহজলক্ষ্য তাকেই ধরেছেন মনোজ মিত্র মহাভারত-কাহিনির নতুন যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণে। যে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য দেখা গিয়েছিল 'অশ্বত্থামা' বা 'তক্ষক' নাটকে, তা আবার ফিরে এল পঞ্চম পর্বের এই নাটকে। এই ধারাতেই এর পর লিখলেন 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৭) এবং 'হনুমতী পালা বা মন্দোদরী হরণ' (২০০৯)। এর মধ্যে দ্বিতীয়টিতে কৌতুকরসের প্রাধান্য। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য একাঙ্কগুলি হ'ল 'চমচমকুমার' (২০০২), 'জয়বাবা হনুনাথ' (২০০৪), 'রূপের আড়ালে' (২০০৬), 'বনজোছনা' (২০০৬), 'গন্ধজালে' (২০০৯) প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রথম দুটি ছোটোদের নাটক। 'রূপের আড়ালে' নাটকটি মনোজ মিত্রের নাট্যধারায় বিরলতম নেতিবাচক দৃষ্টির অন্যতম দৃষ্টান্ত। 'বনজোছনা' নাটকে গ্রামবাংলার সাহিত্যসম্পদ সংরক্ষণের কথা বলেছেন তিনি সম্পূর্ণ নাট্যিক শর্ত রক্ষা করে।

১৯৫৯ থেকে ২০০৯ – দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবন পার করে মনোজ মিত্র আজও বিষয় এবং আঙ্গিক সম্পর্কে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানী। আজও তাঁর লেখনী সমভাবে সক্রিয়। হয়তো নিজের শ্রেষ্ঠ লেখাটি এখনো তিনি লেখেন নি, হয়তো আরও অনেক অমূল্য রত্ন প্রসব করবে তাঁর কলম। কিন্তু গবেষণাকর্মে কোনো একটি বিশেষ বিন্দুতে গিয়ে থামতে হয়। আমরা সেই বিন্দুটি ধরেছি ২০০৯ সাল, অর্থাৎ তাঁর নাট্যরচনার পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সময়কালকে। এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী সৃজনকর্মে তাঁর নাট্যধারায় পুনরাবৃত্তি প্রায় নেই বললেই চলে। তাঁর রচনাধারা বিবর্তিত হয়েছে, বিবর্ধিত হয়েছে, কিন্তু মৌল লক্ষণগুলি একই থেকেছে। সেই মৌল লক্ষণের কথা মনে রেখেই তাঁর অনুজ নাট্যকার চন্দন সেন লিখেছেন ঃ

> ''সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোন সংবেদনশীল সৃজকের আকাশ তো সূর্যকে সাক্ষী রেখেই রঙ বদলায়। অনিবার্য সেই বদল, – ভেতরের মানুষটার দয়া-মায়া-প্রেম-ভালোবাসা আর সেসবের সঙ্গে গায়ে গা লেপটে থাকা রাগ-ঘৃণা-অভিমান-প্রতিবাদের লালন-মৃত্তিকা কিন্তু বদলায় না।''[২০]

সেই 'লালন-মৃত্তিকা'তেই মনোজ মিত্র লালন করেন বহু বিচিত্র মানুষকে, 'আলোছায়ায় ঘেরা অন্তর্লোকের বাসিন্দা' মানুষকে। বিশেষত যে মানুষেরা প্রান্তিক, যারা অবহেলিত, অপ্রয়োজনীয় বা শারীরিকভাবেপঙ্গু, তাদের প্রতিই মনোজ মিত্রের সহানুভূতি প্রবল। সারাজীবন ধরে এই সহানুভূতির কথা, এই সমানুভূতির কথাই তিনি লিখে চলেছেন। আমাদের আশা এবং কামনা, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন সুস্থ থেকে তিনি করে চলুন ধ্বস্ত মানবতাকে সুস্থ করার কাজ, সব ধুলো ঝেড়ে মানুষকে উজ্জ্বল করে তোলার কাজ।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) মনোজের মনোভূমি -- কুমার রায় -- স্যাস্ -- ১৯৯০, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

২) ঐ, পৃ. ৩৫৪

৩) 'To preserve and nourish values'-Interview to Sankar Majumder-The Statesman - 28/10/2005

৪) বিষ্ণুশর্মার মত দুর্যোগেও তাঁর স্মিত হাসি ঃ শৈবাল মিত্র ৯ আগস্ট ১৯৯২, আজকাল

৫) 'To preserve and nourish values' মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, The Statesman - 28/10/2005

৬) "চেষ্টা করে নাটককে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখব কীভাবে?" - মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার ঃ সঞ্জয় সিংহ।

৭) "মতান্তরকে শ্রদ্ধা করে, মনান্তর ঘটতে দেয়না" - অশোক মুখোপাধ্যায়; আজকাল, ০৯.০৮.১৯৯২

৮) ঐ

৯) বিষ্ণুশর্মার মত দুর্যোগেও তাঁর স্মিত হাসি ঃ শৈবাল মিত্র ৯ আগস্ট ১৯৯২, আজকাল

১০) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস্ - ১৯৯০, পৃ.৩৫০

১১) 'To preserve and nourish values' - Interview to Sankar Majumder-The Statesman - 28/10/2005

১২) ঐ

১৩) "থিয়েটার যদি পণ্যের চেহারা নেয় তাতে ক্ষতিটা কী : মনোজ মিত্র" সাক্ষাৎকার - প্রতিদিন - ৮.১০.১৯৯২

১৪) চেতনা নাট্যোৎসবে মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার - ১৯৭৬

১৫) ঐ

১৬) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস্ - ১৯৯৩, পৃ.৯০

১৭) কাকচরিত্র -- মনোজ মিত্র -- মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-প্রথম খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩, পৃ. ৩৫৭

১৮) কথোপকথন ঃ নাট্যভাবনা - মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার - অনুষ্টুপ নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা ২ - ১৪০৭

১৯) ঐ

২০) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ -- মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-পঞ্চম খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪১৩-এর ভূমিকা -- চন্দন সেন

তৃতীয় অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাটকের বর্গীকরণ ও আলোচনা

তৃতীয় অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাটকের বর্গীকরণ ও আলোচনা

মনোজ মিত্র যখন বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে পথচলা শুরু করলেন তখন ভারতের স্বাধীনতার বয়স দু'দশকেরও বেশি। গণনাট্য আন্দোলনের সূচনার সময়কার সমাজ-বাস্তবতা তখন আরো কিছুটা পরিবর্তিত। নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে গণনাট্যে ভাঙন ধরেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। 'বহুরূপী'র নেতৃত্বাধীন নতুন ধারাটিকে 'সৎনাট্য', কখনো বা 'নবনাট্য' বলা হচ্ছে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যেও চলছে একটা দোলাচল। এই দ্বিধার কথা ব্যক্ত করেছেন মনোজ মিত্র তাঁর একটি লেখায় ঃ

> ''শম্ভু মিত্রের বহুরূপী, উৎপল দত্তের এল টি জি তখন আমাদের লক্ষ্যে। বলতে দ্বিধা নেই, দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের কাকে যে আমরা ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেব, তা নিয়েও আমাদের মধ্যে ছিল টানাপোড়েন।''[১]

'ক্রুদ্ধ ক্ষুধার্ত প্রতিষ্ঠান-বিরাধিতায় সংকল্পবদ্ধ' সেই সময়ে মনোজ মিত্রের নাট্যরচনার সূত্রপাত। নিজের প্রথম নাট্যরচনা 'মৃত্যুর চোখে জল'(১৯৫৯)-কে 'খুব একটা বৃহৎ দায়বদ্ধতা থেকে লেখা' নয় বলে নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন। এরপর ক্রমে যেসব নাটক তিনি লিখতে থাকলেন সেগুলির মধ্যে কোনোটি ব্যক্তিগত সমস্যা (পাখি', 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'টাপুর টুপুর'), কোনোটি পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা ('অশ্বত্থামা', 'তক্ষক'), কোনোটি বা রহস্য-রোমাঞ্চ বা রোমান্স-আশ্রিত ('ব্ল্যাকপ্রিন্স', 'অবসন্ন প্রজাপতি', 'বেকার বিদ্যালংকার','আরক্ত গোলাপ')। ১৯৬৭ পর্যন্ত এই নাটকগুলি রচিত হয়েছে। থিয়েটারই তখন পর্যন্ত তাঁর নাটক রচনার প্রেরণা। কিন্তু ১৯৬৮ সালে লেখা 'নেকড়ে' থেকে তিনি নাটককে করে তুললেন বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম। এইসময় থেকে রচিত তাঁর নাটকের বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন নাট্য-সমালোচক ড.পবিত্র সরকার ঃ

> ''তিনি ফিরে এসেছেন মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে, ব্যক্তিমানুষ ও ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক বিষয়ে, ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী শোষণের বিরুদ্ধে অসহনীয়তার চূড়ান্ত মুহূর্তে মানুষের ফেটে পড়া বিষয়ে, মধ্যবিত্ত পরিবারের অ্যালিয়েনেশন ও ব্যক্তিবিচ্ছেদ, এই শ্রেণীর স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ ভন্ডামি বিষয়ে তাঁর গভীর ও সরস অনুধ্যানে।''[২]

এখান থেকেই তাঁর লক্ষ্য নিজের চারপাশের সমাজ ও সেই সমাজের মানুষ। সামাজিক দায়বদ্ধতা যে নাট্যকারের থাকা উচিত, সেকথা তিনি বিশ্বাস করেছেন এবং নিজের নাটকে সেই দায়বদ্ধতার প্রকাশই ঘটিয়েছেন। কিন্তু এই দায়বদ্ধতা যদি শিল্পরূপের অন্তরায় হয় তাহলে নাটক হয়ে উঠবে নীরস বক্তব্যমাত্র। তাই বক্তব্যকে শিল্পরূপের আধারে প্রকাশ করতে তিনি নাটক রচনায় বহু বিচিত্র আঙ্গিক এবং ফর্ম ব্যবহার করেছেন। বিষয়ের নিরিখেও তাঁর নাটক বিচিত্রপথগামী।

প্রথমদিকে মনোজ মিত্রের নাট্যরচনা শুরু হয়েছিল Serious বক্তব্য দিয়েই। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি প্রধানত অবলম্বন করেছেন কমেডির ভঙ্গি। তাঁর এই পথ পরিবর্তনটি ধরিয়ে দিয়েছেন ড.পবিত্র সরকার ঃ

> '' 'মোরগের ডাক', 'টাপুর টুপুর', 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'মৃত্যুর চোখে জল' ইত্যাদি নাটক পরবর্তীকালের উজ্জ্বল সিরিয়োকমিক নাট্যকার মনোজ মিত্রের বিষয়ে তেমন অগ্রিম ইঙ্গিত দেয় না; আবার ব্যক্তি-সমস্যা থেকে সমাজ-সচেতন সমালোচনাতে তাঁর উত্তরণের আভাসও বহন করে না। এই মনোজ মিত্রকে আমরা পাই 'শিবের অসাধ্যি', নরক গুলজার','পরবাস'(১৯৭৫), 'বাবাবদল'(কেনারাম-বেচারাম), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৭),'রাজদর্শন', 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৮০) ও 'নৈশভোজ'(১৯৮৪)-এ ।''[৩]

কিন্তু ব্যক্তি-সমস্যা কখনোই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে না তাঁর নাটকে, বরং ১৯৮৮ বা তার পরবর্তীকালে লেখা অনেক নাটকেরই বিষয় পরিবার বা ব্যক্তির সমস্যা, বিশেষ সামাজিক অবস্থায় পতিত ব্যক্তিমানুষের সংগ্রাম বা অসহায়তা ।

আধুনিক নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের যে কোনো নাটকেরই বিষয় প্রবলভাবে সামাজিক । কিন্তু সেই বিষয়কে প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো তিনি ব্যবহার করেছেন ইতিহাস বা মহাকাব্য-পুরাণের প্রেক্ষাপট, কখনো বা বক্তব্যকে সরাসরি না বলে রূপকের আকারে ব্যক্ত করেছেন । বক্তব্যের প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার চেয়ে আঙ্গিকগত এসব কৃৎকৌশলের ব্যবহার অনেকসময় বেশি কার্যকরী হয় । কারণ নাটক বা থিয়েটারকে বক্তব্য প্রকাশের পাশাপাশি দর্শককে আকৃষ্ট এবং তৃপ্ত করার কথাও ভাবতে হয় । কেবল দর্শক-মনোরঞ্জনের জন্য নাটক লেখা যেমন অনুচিত, তেমনি দর্শককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও যুক্তিপূর্ণ নয় । বক্তব্যের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে সার্থক শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করার প্রতিভা আছে মনোজ মিত্রের । বিষয়ের দিক থেকে দেখলেও তাঁর নাটক কখনো ধরেছে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব, কখনো দেখিয়েছে মানুষের ব্যবহৃত হবার ইতিহাস , কখনো বা আলো ফেলেছে সমাজের লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, ক্রূরতার প্রতি । সামাজিক যে সত্যগুলিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের চারপাশে, সেগুলিকে কখনো দেখিয়েছেন একটি বা দু'টি পরিবারের মাধ্যমে, কখনো বা সামাজিক শ্রেণির মাধ্যমে । প্রত্যক্ষত কোনো দলীয় রাজনীতির প্রতি আস্থা বা কোনো রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার বহন না করলেও বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর আছে এবং সামাজিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণের পেছনে সেই মতবাদ কার্যকরী থেকেছে বলে তিনি নিজেই জানিয়েছেন । ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি ও তার সমালোচনা মনোজ মিত্রের নাটকে স্থান পেয়েছে । সাহিত্যতত্ত্বে যাকে 'রাজনৈতিক নাটক' বলা হয় , সেরকম প্রচারমূলক বা বিশেষ আদর্শ-অনুসারী নাটক হয়তো তিনি লেখেন নি, কিন্তু প্রথম দিককার বেশ কিছু নাটকে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত প্রখর এবং পরের দিকেরও অনেক নাটকে রাজনীতির সাধারণীকৃত সমালোচনা লক্ষণীয় । এই সমস্ত দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মনোজ মিত্রের নাটকগুলির নিম্নোক্তরূপ বর্গীকরণ করেছি ঃ

ক) সামাজিক নাটক

খ) পারিবারিক নাটক

গ) রাজনৈতিক প্রসঙ্গযুক্ত নাটক

ঘ) ইতিহাসের পটে লেখা নাটক

ঙ) পুরাণ-নির্ভর নাটক

চ) রহস্য নাটক

যে কোনো বর্গীকরণের মতোই এই বর্গীকরণও অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত । কারণ অনেক নাটককেই যেমন এক বর্গ থেকে অনায়াসে স্থানান্তরিত করা যায় অন্য বর্গে তেমনি আবার মনোজ মিত্রের নাট্যতালিকায় এমন দু'একটি নাটকও আছে ('দন্তরঙ্গ', 'সাহেববাগানের সুন্দরী', 'তেঁতুলগাছ'), যাদের বিশিষ্টার্থে কোনো বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না । কিন্তু তবু একটি সাধারণ কাজ-চলা-গোছের ধারণা গড়ে উঠতে পারে এধরণের বর্গীকরণে । প্রত্যেক বর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এবং সেই বর্গের নাটক রচনায় নাট্যকারের বিশিষ্ট চেতনার ধারণা গড়ে উঠতেও এরকম বর্গীকরণ অপরিহার্য ।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন - কলকাতা - ০৯ - প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ২০০১, পৃ. ১৩-১৪

২) নাট্যকার মনোজ মিত্র - পবিত্র সরকার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩ - এর ভূমিকা, পৃ.।৪।

৩) ত্রিশ বছরের বাংলা নাটক - পবিত্র সরকার - নাটমঞ্চ নাট্যরূপ - প্রমা প্রকাশনী - কলকাতা-১৭ - দ্বিতীয় সংস্করণ - বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ.২৩৩

সামাজিক নাটক

নাটকের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণের অন্যতম শ্রেণি হ'ল 'সামাজিক নাটক'। নাটক যেহেতু মানুষের জীবনের কথা বলে এবং মানুষমাত্রেই সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ, সেহেতু বৃহত্তর অর্থে যে কোনো নাটকই সামাজিক নাটক। কিন্তু 'সামাজিক নাটক' অভিধায় যখন কোনো বিশেষ শ্রেণিকে চিহ্নিত করা হয় তখন সেই শ্রেণি বিশেষ চরিত্রলক্ষণ দাবী করে। বিশিষ্ট সমালোচক সামাজিক নাটকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

> ''সামাজিক নাটক বলতে আমরা বুঝি কোনো একটি যুগ বা সময়ের সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে লেখা নাটক। সমাজের অন্তর্গত শক্তি সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কিংবা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্ব এ জাতীয় নাটকের উপজীব্য।'''[১]

নাট্যকারের সমকালের সামাজিক সমস্যা সামাজিক নাটকে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি চরিত্রের সমস্যাও সামাজিক নাটকে থাকতে পারে। সমাজ-সমস্যার মুখোমুখি হয়ে এই শ্রেণির নাটকে নাট্যকার সমাজের যুযুধান পক্ষগুলির কোনো একটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়তে পারেন। এই শ্রেণির নাটকে নাট্যকার কখনো সমস্যা সমাধানের পথের ইঙ্গিত দেন, কখনো বা সমাধানের পথ খোঁজার দায়িত্ব দেন পাঠক-দর্শকের ওপর। নাটকের ভরকেন্দ্রে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা থাকলে তাকে বলা হয় সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্যে এই শ্রেণির নাটককে বলা হয়েছে 'Problem Play'. Marjorie Boulton এই শ্রেণির নাটক সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> " It is usually somewhat tragic in tone in that it naturally deals with painful human dilemmas ; it is the kind of play that, by implication, asks a definite question and either supplies an answer or leaves it to us to find one."[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যে এই ধরণের নাটকের আবির্ভাব ঘটে। বার্ণার্ড শ-এর 'Mrs. Warrer's profession', 'Major Barbara', গোর্কির 'The Lower Depths', গলসওয়ার্দির 'Justice', ইবসেনের একাধিক নাটক এই শ্রেণির নাটকের দৃষ্টান্ত। সমাজ-সমস্যাকে এসব নাটকে দেখা হয়েছে মানুষের জীবনের ট্রাজিক পরিণতির সঙ্গে অন্বিত করে। M. Boulton শেক্সপীয়রের 'Measure for Measure', 'Hamlet', এবং 'Antigone', 'Electra', 'Choephoroe' প্রভৃতি গ্রীক নাটককে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচক সামাজিক নাটক ও পারিবারিক নাটককে একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁরা মনে করেছেন, সমগ্র সমাজের রূপ যদি দুটি বা একটি পরিবারের কাহিনিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় তবে সে নাটককে 'সামাজিক নাটক' বলায় আপত্তি থাকতে পারে না। বাংলায় অধিকাংশ সামাজিক নাটকই এরকম এক বা একাধিক পরিবার-আশ্রিত।

বাংলা নাটক তার জন্মলগ্ন থেকেই সমাজসংস্কারের স্বেচ্ছাবৃত দায় গ্রহণ করেছে। ফলে প্রথম থেকেই বাংলা নাটকে সমাজচিত্র এবং সামাজিক সমস্যা স্থান পেয়েছে। বাংলা সামাজিক নাটক

এগিয়েছে প্রধানত দুটি ধারায় – একটি ধারায় Serious ভঙ্গিতে সামাজিক নানা সমস্যার কথা বর্ণিত ও আলোচিত হয়েছে, অন্য ধারাটিতে লঘু ভঙ্গিতে বাংলাদেশের সমাজের নানা অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। এই দ্বিতীয় ধারাটি প্রধানত প্রহসনের ধারা। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)-ই বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। এই নাটকেই প্রথম বাঙালির বাস্তব জীবন ধরা দিল। অর্থাৎ মৌলিক বাংলা নাটক রচনা শুরু হবার দু'বছরের মধ্যেই বাংলা নাটক সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করল। এরপর উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে এই ধারাটি অগ্রসর হতে থাকে। 'নীলদর্পণ' বাংলা সামাজিক নাটকের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সমকালীন সমাজের একটি জ্বলন্ত সমস্যাকে অবলম্বন করে রচিত এই নাটক সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম পর্বে বাংলা সামাজিক নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে কৌলীন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা। এরপর ইয়ং বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতা, স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে আলোড়ন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, প্রাচ্য রক্ষণশীল সভ্যতার অন্ধ গোঁড়ামি প্রভৃতি সামাজিক বিষয় নাটকে উঠে এসেছে। বাংলা সামাজিক নাটক রচনার ধারায় আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সমকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন - একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, পণপ্রথা, মদ্যপান, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে। গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সামাজিক নাটক মোটামুটিভাবে সামাজিক সমস্যার নিখুঁত চিত্রাঙ্কনেই আবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু তারপর থেকে বাংলা সামাজিক নাটকের গঠনবিন্যাস ক্রমশ জটিল হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> ''বাস্তব সমাজটি রঙ্গমঞ্চে আনিয়া নিখুঁতভাবে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিলেই সেকালের নাট্যকারদিগের দায়িত্ব শেষ হইয়া যাইত; কিন্তু আধুনিক কালে এই নিতান্ত সহজ উপায়ে দর্শকের চোখ ভুলাইবার রীতি একেবারেই অচল হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিমনের জটিলতা, তাহার অনন্ত জিজ্ঞাসা – এইসকল নিপুণ ভাবে কথোপকথনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া লইয়া নাট্যিক চরিত্রের বিকাশ এই যুগে দেখাইতে হয়।''[৩]

গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে আধুনিক বাংলা নাট্যধারার সূত্রপাত, সেখানে নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি মানুষকে আন্দোলন ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। চারপাশের বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং সেই সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের উপায় সন্ধানই ছিল সমকালীন নাট্যকারদের লক্ষ্য। বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হয়ে সমাজকে শোষক ও শোষিত শ্রেণিতে বিভক্ত দেখে এই দুই শ্রেণির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শোষিত শ্রেণির জয় ঘোষণাই ছিল এই সময়কার সামাজিক নাটকের উপজীব্য। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক এই নাট্যাদর্শকে সকলে দীর্ঘদিন মেনে নিতে পারলেন না। শম্ভু মিত্রের গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করে বহুরূপী গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হ'ল নতুন নাটকের ধারা, যেখানে গণনাট্যের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়েও মানুষের জীবনকে দেখা হ'ল আরো সমগ্রভাবে। কেবল শ্রেণিসংগ্রাম নয়, জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা ও গভীরতাকে ধরতে চাইল এই সময়কার সামাজিক নাটক। মানুষের কেবল শ্রেণিপরিচয় নয়, গুরুত্ব পেল ব্যক্তি-পরিচয়টিও। স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সংকট মধ্যবিত্ত

মানুষের জীবনে যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তাই গুরুত্ব পেতে থাকল সমকালীন সামাজিক নাটকে। একালের সামাজিক নাটক রচয়িতাকে অনেক বেশি সতর্ক ও সচেতন থাকতে হয়। কারণ একালের সামাজিক নাটকে যে সমস্যার অবতারণা করা হয় তা বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ, মদ্যপান বা পণপ্রথার মতো কোনো সামাজিক সমস্যা নয়, বরং তা হ'ল বিশেষ কোনো সামাজিক পরিস্থিতিতে পতিত ব্যক্তিমানুষের জীবনসমস্যা। এযুগে তাই সামাজিক নাট্যকারকে কেবল সামাজিক উপকরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হলেই চলে না, মানবচরিত্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীও হতে হয় : ''ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর মানব-চরিত্রের জটিল রহস্য সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলে সামাজিক নাটক রচনায় কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না।''[৪]

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষ বছরটিতে নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের আবির্ভাব। সেই সময়কে মনোজ মিত্র চিহ্নিত করেছেন এইভাবে ঃ

> '' তখনকার সেই সময়টার মধ্যেই এমন একটা কিছু ছিল, যার টানে আমাদের সহপাঠী কবি গল্পকার বন্ধুরা চাইছিল তাদের গল্প-কবিতার জন্যে একটি পৃথক ভূমির দখল, চিত্রকর বন্ধুরাও চাইছিল নতুন রূপ, নতুন প্রকাশ, রাজনীতিক বন্ধুদের সন্ধানও ছিল সেইরকম। সময়টাই ছিল ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতায় সংকল্পবদ্ধ। জন্ম নিচ্ছিল নতুন থিয়েটার, নবনাট্য।'' [৫]

সমকালের নাট্য তথা মঞ্চজগতে দুই প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিলেন উৎপল দত্ত এবং শম্ভু মিত্র। স্থূলভাবে উৎপল দত্তের নাট্যধারাকে বক্তব্যপ্রধান এবং শম্ভু মিত্রের ধারাটিকে অনুভূতিপ্রধান বলা যেতে পারে। মনোজ মিত্র নিজের নাট্য রচনায় এই দুটি ধারাকে মেলালেন। বক্তব্য তাঁর নাটকে আছে কিন্তু তা ভার হয়ে ওঠেনি, মানুষকে ছাপিয়ে ওঠেনি। বক্তব্যের ভারে, শত্রু চেনানোর দায়ে, অত্যাচারীর মুখোশ ছেঁড়ার দায়িত্বে বাংলা নাটক থেকে যখন ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছিল মানুষ, তখন তিনি নিজের নাটকে ফিরিয়ে আনলেন 'আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ', 'অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ'কে। তাঁর সামাজিক নাটক বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখ, লড়াই-যন্ত্রণা, আশা-আনন্দের প্রতিফলন। বৃহত্তর অর্থে মনোজ মিত্রের সব নাটকই সামাজিক। নিজের দেশ-কাল-সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ তাঁর সৃষ্টি । সামাজিক মানুষের জীবনকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কখনো আশ্রয় করেছেন ইতিহাস বা কাল্পনিক ইতিহাস, কখনো ব্যবহার করেছেন রূপক বা রূপকথার আঙ্গিক, কখনো বিচরণ করেছেন পুরাণের পটভূমিতে। এইসব পর্যায়ের নাটকগুলিকে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। রাজনীতির প্রসঙ্গযুক্ত এবং পরিবার-জীবন-আশ্রিত নাটকগুলিকেও আমরা পৃথক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এগুলিও আসলে সাজাজিক নাটক। আধার যাই হোক, বিষয় সমকালের সমাজ। এগুলির বাইরে 'সামাজিক নাটক' বর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছি আমরা এই নাটকগুলিকে – 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭), রাজদর্শন (১৯৮৮), 'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫), 'কিন্তু কাহারের থেটার' (১৯৮৮), 'দর্পণে শরৎশশী' (১৯৯১), 'আত্মগোপন' (১৯৯৪), 'নাকছাবিটা' (২০০০) এবং 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' (২০০১)। একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে এই বর্গের আওতায় আসবে 'কালবিহঙ্গ' (১৯৬৮), 'আমি মদন বলছি' (১৯৭৪), 'মদনের পঞ্চকান্ড' (১৯৭৪), 'কাকচরিত্র' (১৯৮২), 'প্রভাত

ফিরে এসো' (১৯৮৮), 'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩)। বলাবাহুল্য এই বর্গীকরণ কখনোই চূড়ান্ত নয়। রাজনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক নাটকগুলিকে যেমন একগুচ্ছে রাখা চলে তেমনি পৃথক গুচ্ছে রাখলেও 'রাজদর্শন', 'নৈশভোজ', বা 'কিনু কাহারের থেটার'-এর মতো নাটককে সামাজিকের পরিবর্তে রাজনৈতিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, আবার 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'কে পারিবারিক বর্গ থেকে অনায়াসেই নিয়ে আসা যায় সামাজিক বর্গে।

'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭) কেবল মনোজ মিত্রের নয়, সমগ্র বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। মৃত্যুর বিপ্রতীপে জীবনের এ এক অদ্ভুত রসায়ন। আরোপিত বিপ্লব এখানে নেই কিন্তু কমেডির মধ্য দিয়ে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের উত্থানের এ এক আশ্চর্য আলেখ্য। কোথায় পেলেন তিনি এই নাটকের ভাববীজ, কোথায় পেলেন জীবনরসিক বাঞ্ছারামকে? সে জিজ্ঞাসার উত্তর আছে তাঁরই গদ্য রচনায়। ১৯৬১ সালে ২৩ বছর বয়সে তিনি রানিগঞ্জে কলেজে যোগ দিলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে। শ্রী নারায়ণ পান্ডে ছিলেন লোকসাহিত্যের গবেষক। তাঁর সংগ্রহে ছিল দেশবিদেশের অসংখ্য লোককথা উপকথা নীতিকাহিনীর বই। মনোজ মিত্র বলেছেন ঃ

> " সাজানো বাগানের মরতে মরতে না মরা বুড়োর গল্পোটা পাই এখানেই কোনো একটা সংকলনের মধ্যে। ... বুড়োটাকে খুব চেনা ঠেকেছিল। যেন সে আমাদের ওপার বাংলার লোক আমাদের খুলনা জেলার বাসিন্দা। হয়ত ছেলেবেলায় আমাদের সেই ছোট্ট গাঁয়ে দেখেছি তাকে, এও মনে হয়েছিল"। [৬]

মাথায় থেকে গিয়েছিল দু-তিন পাতার সেই ছোটো শিশুপাঠ্য কাহিনিটি। বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদটা এলো প্রায় তেরো-চোদ্দ বছর পরে - ১৯৭৬ এর শেষদিকে। 'সুন্দরম্'- এর রিহার্সাল থেকে তুলে নিয়ে 'নরক গুলজার' নাটকটি থিয়েটার ওয়ার্কশপে বিভাস চক্রবর্তীকে দিয়ে দেবার পর সুন্দরমের বন্ধুদের 'শান্ত' করতে খুব তাড়াতাড়ি একটা নতুন নাটক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনই উস্কে দিল স্মৃতিকে। দেখা গেল, শিশুপাঠ্য নীতিকথার সেই বুড়ো মাথায় কেবল জায়গাই করে নেন নি, তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্যে, শৈশবের পরিচিত দেশকালের মধ্যে বেড়েও উঠেছেন ক্রমশ। বাঞ্ছারামের বাগান এবং সেই বাগানের ভূত কোনোটিই তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। তিনি লিখেছেন ঃ

> " গাঁয়ের একটা বড় বাগান ঘিরে ভূতপ্রেতের গল্পোগাছা ছিল। শৈশবে ঠাকুমার মুখে সে গল্প শুনতাম। দিনের বেলা সে বাগানে আমরা ঢুকতামও না। একজন বুড়ো মানুষ, সাদা ফকফকে, সে বাগানে চালা বেঁধে থাকত। হাঁটতে পারত না। মাটিতে বসে বসে চলত। তার নাম ছিল বাঞ্ছারাম ! গাছপালাকে সে বড় আদরযত্ন করত"। [৭]

পূর্ববঙ্গের সেই গ্রামের ভূত এবং বাঞ্ছারামের পাশাপাশি মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে স্থান দিয়েছেন নিজের চোখে দেখা সেই চোরকেও, যে কিনা গৃহস্থের নাতির ম্যালেরিয়া শুনে 'হাতের মাল' ছেড়ে যায় এবং পরদিন দুপুরে গৃহস্থের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে অবলীলায় বলে ঃ " কাল রাতে তুমি আমায় নিজ মুখে নেমন্তন্ন করেছ। নাতির জ্বর শুনে হাতের মাল ফেলে রেখে গেছি, এখন শুনব কেন ?" [৮]

ওপার বাংলার সেই সহজ সরল ঢিলেঢালা জীবনটাকেই মনোজ মিত্র ধরতে চেয়েছিলেন

'সাজানো বাগান' - এ। কিন্তু ৫ এপ্রিল, ১৯৭৭ ঢাকুরিয়া পুল সংলগ্ন 'অবন মহল' - এ 'সুন্দরম্' প্রযোজিত যে 'সাজানো বাগান' নাটকের অভিনয় হ'ল তা দর্শকের বাহবা পেলেও নাট্যকারের মনোমত হ'ল না। তিনি লিখেছেন ঃ

> '' সেদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি বুঝে গিয়েছিলাম, নাটকটা কিছুমাত্র উতরোয়নি। গরিব আর বড়োলোক — শোষক আর শোষিতের দ্বন্দ্বটা এতোটাই প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে যে হারিয়ে গেছে আমার শৈশবে দেখা সেই আপাত টেনশানহীন বিশেষ ধরণের জীবনযাত্রা ''। [৯]

তাই পরদিন সকালেই সে নাটক সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে আবার নতুন করে লিখতে বসলেন। 'সাজানো বাগান'-এর নতুন রূপের প্রথম অভিনয় হ'ল মুক্ত অঙ্গনে, ৭ নভেম্বর ১৯৭৭। নাটকের সেই চেহারাই অদ্যাবধি রক্ষিত হয়েছে। এখানেই মনোজ মিত্রের স্বাতন্ত্র্য। বক্তব্যকে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ভার করে তুলতে না পারছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিতে জীবন মূর্ত হয়ে না উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বদলে চলেন তাঁর সৃষ্টিকে। সমস্যার চরিত্রগত দিক থেকে 'সাজানো বাগান' নাটকটি 'নেকড়ে', 'চাক ভাঙা মধু' 'নরক গুলজার' বা 'শিবের অসাধ্যি'র সমধর্মী। শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে শোষকের জয় এই নাটকেরও কেন্দ্রীয় বিষয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানে স্থিত মানুষের জীবনের সহজ চলন। যে রসবোধ মনোজ মিত্রের অন্বিষ্ট, এই নাটকে তার পরিচয় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। নকড়ির 'পল্লী উন্নয়ন সমিতি', তার ছেলের 'যুব পার্টি', হাতে ঘড়ি আর ঠোঁটে চারমিনারসহ নতুন যুগের পুরোহিত — প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সময়কালকে চিহ্নিত করার চেষ্টা হলেও সেই সময়কে ছাপিয়ে যাওয়াতেই এই নাটকের কৃতিত্ব। মনোজ মিত্র জানেন, পৃথিবীর যেখানে যত ফসল তার দিকে ওঁৎ পেতে বসে আছে হিংস্র হায়েনারা। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে তিনি উপস্থাপিত করেছেন বাঞ্ছার প্রবল জীবনাসক্তিকে। কেবল নিজের প্রবল বেঁচে থাকা দিয়েই বাঞ্ছা হারিয়ে দিয়েছে নকড়িকে।

'চাক ভাঙা মধু'তে শোষক অঘোর ঘোষ ছিল মহাজন, আর 'সাজানো বাগান'- এ ছকড়ি দত্ত জমিদার, তার ছেলে নকড়ি জোতদার। অঘোর ঘোষের মতোই গায়ের জোরে সম্পত্তি আত্মসাৎ করতো ছকড়ি দত্ত। কিন্তু বাঞ্ছারামের লাঠির কাছে হার মেনেছে ছকড়ির লাঠিয়ালেরা। বন্‌বন্ করে লাঠি ঘুরিয়ে বাঞ্ছা রক্ষা করেছে বারো বিঘে তেরো ছটাক জমির ওপর বাগানকে। তিল তিল করে গড়ে তোলা এই বাগান তার প্রাণ। জীবনের বেশিরভাগ সময় সে ব্যয় করেছে এই বাগানের পেছনে। জীবিত অবস্থায় জমিদার ছকড়ি, যার যে জমির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে তাই গ্রাস করে নিয়েছে। পারেনি কেবল বাঞ্ছারামের বাগান। এই ব্যর্থতায় মরে গিয়েও মুক্তি পায়নি , ঠাঁই নিয়েছে গাছের ডালে। বাঞ্ছাকে সে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে কাবু করতে চায়। আজ আর বাঞ্ছার সেই লাঠির জোর নেই, মাজা পড়ে গেছে, মাটিতে ঘষটে চলে সে। ভূতের পাশাপাশি বাগান রক্ষায় আর এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ছোটোমেয়ের ছেলে গুপি। বাগান বেচে দিয়ে সে চুল ছাঁটার সেলুন, দর্জির দোকান বা ভাটিখানা খুলতে চায়। একাল বোঝে মুনাফা, মাটির প্রতি কোনো টান তাদের নেই। কিন্তু বাঞ্ছার কাছে যে এই মাটিই জীবন। নাতির হাত থেকে বাঁচতে তার আর্ত চিৎকার শুনে প্রবেশ করে জোতদার নকড়ি আর তার পারিষদেরা। বাবার মতোই বাগানটার ওপর দীর্ঘদিনের লোভ নকড়ির। লাঠির যুগ গেছে, বুদ্ধির প্যাঁচই এখন ভরসা। সেই প্যাঁচেই বাঞ্ছাকে বাঁধতে চায় নকড়ি। বাঞ্ছার সঙ্গে সে চুক্তি

করে, প্রতি মাসের পয়লা তারিখে বাঞ্ছাকে দুশো করে টাকা দেবে, বিনিময়ে বাঞ্ছার মৃত্যুর পর বাগানের মালিক হবে সে। প্রথমে আঁতকে উঠলেও ক্রমে বাঞ্ছাকে তারা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, এই ব্যবস্থায় বাঞ্ছার দুদিক থেকে লাভ। বেঁচে থাকা পর্যন্ত বাগানের অধিকারও থাকল, আবার মাসে মাসে দুশো করে টাকাও পাওয়া গেল। নকড়ি দত্তের কোনো সংশয় নেই যে, এক দু'মাসের মধ্যেই বাঞ্ছা পটল তুলবে আর বাগান হবে তার। বাঞ্ছাকে রাজি করতে তার সামনে তুলে ধরে দীর্ঘ সচ্ছল জীবনের ছবি, সে জীবন দুধ-ঘি আর কাশ্মীরি শালে উজ্জ্বল। তাদের কথায় শীর্ণ বাঞ্ছার বুকে লাগে জীবনের দোলা, জাগে বাঁচার লোভ। নিজের মনে সে বিড়বিড় করে ঃ " বাঁচবো ... আমি বাঁচবো..." [১০] বাঞ্ছার এই অস্তিত্ব ঘোষণাই চারিয়ে গেছে গোটা নাটক জুড়ে। নকড়ি দত্তের আশা ক্রমশ কুহকিনী হয়ে উঠেছে।

খুশি নকড়ি, খুশি ছকড়ির প্রেতাত্মাও। এতদিনে বাঞ্ছাকে কব্জা করা গেছে। কিন্তু কে যে কাকে কব্জা করেছে বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে। তিনমাসের কিস্তির টাকা দেওয়া হয়ে গেলেও বাঞ্ছার মরার নাম গন্ধ দেখা যায় না। তীব্র আক্রোশে বাঞ্ছাকে তৃষ্ণার জলটুকুও এগিয়ে দেয় না তারা, ডাক্তারকে ওষুধ দিতে দেয় না। তবু সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বাঞ্ছা বেঁচে থাকে – তীব্রভাবে বেঁচে থাকে। গণৎকার বাঞ্ছার দীর্ঘ আয়ুরেখা দেখতে পায়, ডাক্তারি রিপোর্টেও কোথাও কোনো দোষ পাওয়া যায় না। নকড়ি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে ওঠে। এদিকে গুপী নতুন বিয়ে করা বৌ পদ্মকে নিয়ে এসে ওঠে বাঞ্ছারামের কাছে। বিয়ে করে সে বুঝেছে আশ্রয়ের মূল্য, মাটির টান। পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে বাগান আরো বড়ো করে তোলার স্বপ্ন তার চোখে। কিন্তু বাগান তো এখন প্রায় নকড়িরই সম্পত্তি, বাঞ্ছারাম মরে গেলেই তো সব শেষ। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে গুপী-পদ্মর, আর সেইসঙ্গে পাড়ার সেই ছিঁচকে চোরটির, বাঞ্ছারামের বাগানের মাল গেঁড়িয়েই যার সংসার চলে। বাগান নকড়ির দখলে চলে গেলে তারও যে অস্তিত্বের সংকট। তখন বাগানে কাঁটাতারের বেড়া বসবে, মালী-চৌকিদার বসবে, চোর ঢুকবে কোন্ ফাঁকে? কিন্তু এ সবই তো বাঞ্ছার মৃত্যুর পরের কথা। যদি বাঞ্ছা না মরে, যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়? তাহলে তো থেকে যাবে বাগানের অধিকার। তাই এবার শুরু হয় গুপী-পদ্ম আর চোরের লড়াই জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এ জীবন শুধু বাঞ্ছার নয় – তাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলির জীবনও আজ বাঞ্ছার বেঁচে থাকা-না-থাকার সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত। তাই পদ্ম জলের ঘটি এনে বাঞ্ছার মাথায় জলের থাবড়া দেয়। একজন বগলে বৌ আর একজন বগলে নারকেল নিয়ে বাঞ্ছার মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। পদ্ম জল ঢেলে দেয়, আর ঃ " তৃষিত বাঞ্ছা একে একে গুপি, চোর ও পদ্মের মুখের দিকে চেয়ে চক্ চক্ করে জল খায়।" [১১] এই জল জীবনের রসদ, জীবনের প্রতীক।

দুই যমজ ছেলে হোঁৎকা-কোঁৎকাকে নিয়ে বিব্রত নকড়ি। হোঁৎকা সিনেমার প্রোডিউসার হতে চায়, আর কোঁৎকা গ্রামে 'যুবপার্টি' তৈরির চাঁদা চায়। দু'ভাই-ই বাবার ওপর ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছে। এদিকে বাঞ্ছার বাগানের চিন্তায় বাবার অবস্থা করুণ। তারই দেওয়া কিস্তির টাকায় দুধ-ঘি খেয়ে বাঞ্ছা বসা থেকে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, এরপর তীরের মতো সোজা হবে। কিস্তির টাকা চাইতে সে নিজেই এখন চলে আসে নকড়ির বাড়িতে। পদ্ম আর চোর মিলে তাকে খাওয়াচ্ছে হরলিকস্ আর মুরগির ডিম। 'যুব' করা ছেলে কোঁৎকাকে দিয়ে নকড়ি কড়কে দিতে চায় বাঞ্ছাকে।

কিন্তু ডাগর পদ্মের দিকে চোখ পড়ে বাবা-ছেলে দুজনেরই। সেই সুযোগটাই কাজে লাগায় বাঞ্ছা। একবার বাবাকে আর একবার ছেলেকে নিতে বলে 'মেয়েমানুষটা'-কে। বাবা-ছেলের দ্বন্দ্বে বাঞ্ছার বাড়িতে গুপীর অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত হয়। বশীকরণ, যজ্ঞ কোনোকিছুই বাকি রাখে না নকড়ি বাঞ্ছার মৃত্যু কামনায়। কিন্তু বাঞ্ছা তো মরবে না, আর তো সে একা নয়। ছকড়ি বুঝতে পেরেছে ঃ " বাঞ্ছা কাপালির ন্যাচারাল ডেথ হবে না ! ওর পেছনে যে মানুষ ভীড় করেছে ! লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ... এর পর ওই লাঠি ও তুলবে।"[১২]

যখনই বাঞ্ছাকে 'খতম্' করতে গেছে নকড়ি তখনই কোনো না কোনো রূপে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জীবন। সে জীবন কখনো পদ্ম, কখনো চোর, কখনো বা গুপি। বাঞ্ছার মৃত্যু কামনায় যেদিন যজ্ঞ হচ্ছে নকড়ির বাড়িতে তখন লাঠি ভর দিয়ে এসে উপস্থিত হয় বাঞ্ছারাম। নকড়ির বাড়িতে পুরনো বাসন-কোসন বিক্রি হবে শুনে বাঞ্ছা এসেছে। সে কিনতে চায় জমিদার ছকড়ি দত্তের রূপোর গড়গড়াটা। সেটার ওপর বড় লোভ তার। ঐ গড়গড়াটা ফাটিয়ে সে মরতে চায়। বাঞ্ছা ক্রমে সোজা হয়ে উঠছে আর নকড়ি কুঁকড়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কেবল জীবনের জোরে প্রবল শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে এনেছে বাঞ্ছা। নকড়ি আগেই মরে গেলে চুক্তির কী হবে সে প্রশ্নও উঠে এসেছে। তখন বাগান আবার তার হাতে ফিরে আসবে শুনে বাঞ্ছা আনন্দিত। নকড়ি বাঞ্ছার কাছে করুণ ভিক্ষা চায় বাঞ্ছারই মৃত্যু। এখন কে জোতদার আর কে খাতক বোঝা দায় ! নকড়ির জীবন আজ বাঞ্ছার হাতে। দয়াপরবশ হয়েই যেন বাঞ্ছা মরতে রাজী হয়। নকড়ির দেওয়া ফলিডল সে হাতে নেয় রাতে 'ছুইছাইড' করার জন্য। কিন্তু মরতে রাজি হওয়ার বিনিময়ে অনেকগুলি শর্তে সে রাজি করিয়ে নেয় নকড়িকে। 'বডি' যেন কাটাছেঁড়া না করা হয়, শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় যেন গুজিয়া ছড়ানো হয়, বাঁশে না বেঁধে বোম্বাই খাটে যেন নেওয়া হয়, 'কেত্তন' যেন অবশ্যই হয়, বডিতে 'গব্যঘেত্য' যেন মাখানো হয়, আর পেছনে তার নামে দেগে একটা ষাঁড় যেন 'উচ্ছুগ্য' করা হয়। বাঞ্ছা আজ শর্ত দেবার জায়গায়, আর অসহায় নকড়িকে সেই শর্ত মেনে নিতে হচ্ছে। কথা হয়ে যায়, মাঝরাতে বাঞ্ছা বিষ খাবে আর ভোর-ভোর তাকে খাটে বেঁধে শ্মশানের পথে বেরিয়ে পড়বে নকড়ির লোকেরা।

বাঞ্ছা বেইমান নয়। কথা যখন দিয়েছে, বিষ সে খাবেই। তার জন্য একটা লোক শুকিয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে এ বাঞ্ছার সহ্য হচ্ছে না। সুতরাং ফলিডল খেয়েই সে প্রাণ দেবে। ছকড়ির প্রেতাত্মা উল্লসিত। তার এতদিনের বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। আজ তার আত্মা মুক্তি পাবে। ঐ তো বুড়ো ফলিডলের শিশি বের করেছে – এইবার খাবে – হাঁ করেছে। হঠাৎ পদ্মর আর্তনাদ ঃ " ও দাদু - দাদুগো - কোথায় গেলে - "[১৩] ইতিমধ্যে কোঁৎকার নেতৃত্বে যুবদল শববহনের খাটিয়া নিয়ে এসে উপস্থিত। নকড়ি দত্তও প্রবল উৎসাহে উপস্থিত। এতদিনে 'বাগান' তার হয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে আসে বাঞ্ছারাম! বোতল খুলে যখন সে ফলিডল মুখে ঢালতে যাবে তখনই যে নাত বৌ পদ্মর প্রসব বেদনা উঠল। মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়াল জীবন। আর সে কি করে মরে। তার যে তখন অনেক কাজ। তারই শব বহনের জন্য যে ধূপ অগুরু আনা হয়েছিল তা সে তুলে নিয়ে যায় শিশুর জন্য। কারণ ঃ " এসব জিনিস মরণেও যেমন লাগে জনমেও তেমনি লাগে।" [১৪] নকড়িকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মরা তার হবে না। যে শিশুকে নিজে নাড়ি কেটে পৃথিবীতে এনেছে

তাকে ভাসিয়ে দিয়ে তো সে মরতে পারে না । মরতে তো যায় বাঞ্ছা, কিন্তু ঃ " গাছপালা ... নাতিপুতি ... পুঁইপোনা ... সব মাথা ঝাঁকায় ... বলে বুড়ো, তোমা হতে আমরা সব হয়েছি ... তুমি আমাদের নক্ষে করেছো ... তুমি চলে গেলে আমাদের বাঁচাবে কেডা !" [১৫] বাঞ্ছা এখন আর একক নয়, সে বহু, সে সমগ্র। এভাবে রক্তচোষা বাদুড়ের মতো অন্যের রক্ত খেয়ে খেয়ে উঠে দাঁড়াতে ভালো লাগে না বাঞ্ছার, কিন্তু চারপাশের সবাই যে তাকে ছাড়তে চায় না। তাই নকড়ির দিকে ফলিডলের শিশি বাড়িয়ে ধরে সে বলে ঃ "তোমার ফলিডল - তুমিই বরং -"[১৬] নাটকের শুরু থেকে এই উক্তি পর্যন্ত এমন স্বাভাবিকতায় পৌঁছে দেন মনোজ মিত্র যে, বাঞ্ছার এই উক্তিকে একটুও আরোপিত বা অস্বাভাবিক মনে হয় না। জীবনের কাছে হেরে গেছে মৃত্যুর পরোয়ানাধারী নকড়ি, তাই তাকে সরে যেতেই হবে। কিন্তু ফলিডলের আগেই তার মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে। বাঞ্ছার জন্য আনা খাটেই সে ঠলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। মনোজ মিত্র কিন্তু এখানেই নাটক শেষ করেন নি। তাঁর প্রায় সব নাটকের শেষেই যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাঞ্ছা যখন নকড়ির মৃত্যু নিশ্চিত কিনা পরীক্ষা করে দেখছে, তখনই ঘরের ভেতর শোনা যায় নবজাতকের কান্না। মৃত্যু অতিক্রম করে এ যেন জীবনের ঘোষণা, অস্তিত্বের ঘোষণা। বাঞ্ছারাম কাপালি ঘরের দরজায় গিয়ে শিশুর উদ্দেশ্যে বলে নিজের বাগানের গাছ-পাখির কথা, বলে মৌমাছির গুঞ্জনের কথা, বলে মুক্তোর দানার মতো আমের বোল আর জলপাই পাতা বেয়ে ঝরে পড়া শিশিরের কথা। নকড়ির মৃত্যুতে যে বাগান ফিরে এসেছে বাঞ্ছার হাতে, সেই বাগান, সেই মাটি, সেই প্রাণ সে দিয়ে যাবে উত্তরপুরুষকে। শেষ সংলাপে পাঁচবার 'হ্যাঁ হ্যাঁ' এই অস্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঞ্ছা প্রতিষ্ঠা দেয় জীবনকে, মনোজ মিত্র প্রতিষ্ঠা করেন সদর্থক অস্তিত্বকে।

" একটি ভালো নাট্যের জন্ম হয় তার সেই সময় ও সমাজের প্রধান দ্বান্দ্বিক চিহ্নগুলির আলপনা গায়ে জড়িয়ে। "[১৭] বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বের এই উচ্চারণ 'সাজানো বাগান' নাটকের পঁচিশ পেরনো উপলক্ষ্যে । কেমন ছিল সেই সময় ও সমাজ, যখন 'সাজানো বাগান' লেখা হচ্ছে ? রচনাকালের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, মনোজ মিত্রের কলমে যখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে বাঞ্ছারামের অবয়ব তখন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করছে বিংশ শতাব্দীর সেই সত্তরের দশককে, যে দশক মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসহীনতা, ষড়যন্ত্র, গুপ্ত হত্যা, রাজনৈতিক হানাহানি, জরুরি অবস্থা প্রভৃতি নেতিকেই স্মরণ করায়। মানুষের জীবনে তখন চরম অনিশ্চয়তা, বাতাসে বারুদের গন্ধ। কে কতক্ষণ বেঁচে থাকবে তার কোনো স্থিরতা নেই। সেই মৃত্যুগন্ধময় আবহে মনোজ মিত্র নিয়ে এলেন বাঞ্ছারামকে, যার জীবনের আসক্তি তীব্র। নিজের প্রবল বেঁচে থাকা দিয়েই যে হেলায় উপেক্ষা করে যায় সব প্রতিকূলতা। সব ষড়যন্ত্র, সব বিরুদ্ধ শক্তি অসহায় হয়ে পড়ে তার বেঁচে থাকার কাছে। সত্তরের দশকে এই নাটকের ব্যতিক্রমী ভূমিকা সম্পর্কে তাই সমালোচক বলেছেন ঃ

> " সেই সত্তর দশকে আমাদের প্রতি দৈনিকে বেঁচে থাকায় মৃত্যু এবং হত্যা সমাজকে ক্রমশ ছায়ার আবর্তে সংকীর্ণ করে তুলতে চাইছিল। তারই বিপরীতে দাঁড়িয়ে যখন বেঁচে থাকা এক বৃদ্ধকে দেখি তখন কোথাও আমাদের জীবনের বিস্তারের ইঙ্গিতকেই স্পষ্ট করে তোলে।"[১৮]

'সাজানো বাগান' নাটকে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের একটা প্যাটার্ণ আছে, কিন্তু তা কখনোই বড় হয়ে ওঠেনি। কমেডির মধ্য দিয়ে এখানে জীবনের সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। সে কমেডিও জীবনের

স্বাভাবিক চলন থেকেই উদ্ভূত। এই জীবন মনোজ মিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন ওপার বাংলায়। জীবনের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, বক্র রসিকতা ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

> " বক্র রসিকতার জায়গাটা এ নাটকে একটা মারাত্মক ব্যাপার। 'সাজানো বাগান' একটা মারাত্মক রসিকতা । মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা, হাসিঠাট্টার কথা এখানে ছুরি হয়ে বিঁধতে চেয়েছে। ঢাকার কুট্টি, সাতক্ষীরার চাষিদের নিজস্ব কথাবার্তায় এটা আমি গভীর ভাবে লক্ষ করেছি। " [১৯]

সমসাময়িক বাংলা নাটক যখন বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর বিদেশী নাটকের অনুবাদে মগ্ন তখন মনোজ মিত্র সম্পূর্ণ দেশজ উপাদানে নির্মাণ করলেন দেশজ জীবনের উপভোগ্য দলিল। এই জীবন ভূমিলগ্ন, এই জীবন বৃক্ষনির্ভর। গাছ-মাটি মিলে যে শিকড়ের টান তাকেই তিনি তুলে ধরতে চাইলেন এই নাটকে। বাঞ্ছারাম সেই ভূমিলগ্ন মানুষ, নিজের জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই যে কাটিয়েছে গাছ-গাছালির পরিচর্যা করে আর জমিদারের শ্যেনদৃষ্টি থেকে বাগান রক্ষা করে। এই ভূমিলগ্নতার আর এক অর্থ মরণাপন্ন ভূমিজীবী মানুষেরাই জীবনের লড়াইয়ে জিতবে। বাঞ্ছার মধ্য দিয়ে সে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় নিঃসঙ্গ বাঞ্ছারামের পরম মমতার ধন বাগানখানি। অনেক লোভ, অনেক স্বার্থপরতার হাত থেকে এই বাগানকে রক্ষা করতে হয় অশক্ত বাঞ্ছার। অশক্ত বাঞ্ছা এখানে সাধারণ কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধি। জমিদার-জোতদার তার জমি কেড়ে নিতে চায়। এ চিরকালের প্রথা। 'সাজানো বাগান' সেই প্রথার বিরুদ্ধে জেদি লড়াই — যে লড়াইটা তাত্ত্বিক মতে আরম্ভ হবে কোনোদিন এবং শেষ হবে এই পরিণামে। বাঞ্ছাকে কত অনায়াসে পাঠক-দর্শকের সঙ্গে একাত্ম করে দেন মনোজ মিত্র। কোনো স্লোগানে বা বক্তৃতায় নয়, নিছক অনাড়ম্বর বাস্তব জীবনের ছবি এঁকেই সকলকে করে তোলেন বাঞ্ছার লড়াইয়ের সহমর্মী। বাঞ্ছাকে সরিয়ে দেবার জন্য স্বার্থন্বেষীদের যে চক্রান্ত তা হাসাতে হাসাতেই চোখে জল এনে দেয়। হাসির আড়ালে এই নাটকে অশ্রুর যে মুক্তোবিন্দু টলমল করে ওঠে তাই একক বাঞ্ছারামকে করে তোলে বহু মানুষের সহযাত্রী।

নকড়ির সঙ্গে বাঞ্ছার মাসকিস্তির চুক্তি হবার পর থেকেই নকড়ি উদ্‌গ্রীব বাগানের দখল পেতে। কিন্তু ক্রমেই বাঞ্ছার মৃত্যু পিছিয়ে যাচ্ছে, তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে আরো অনেকের স্বার্থ। তাই বারবার সময় বাড়াতে হচ্ছে — প্রথমে চারমাস – তারপর পৌষ পর্যন্ত – তারপর ফাল্গুন। বাঞ্ছা ক্রমেই বাড়িয়ে নেয় জীবনের সীমা। সে তো আর নিজের জন্য বাঁচতে চাইছে না, চাইছে তার ওপর নির্ভরশীল অসহায় মানুষগুলির জন্য। সে মরে গেলে তারা যে আশ্রয়হীন। কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকতেও বাঞ্ছার ভালো লাগে না। চোর ছ্যাঁচোড়ের জন্য এই ঘেন্নার পরমায়ু তাকে ধোপার গাধার মতো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে, বারবার কথার খেলাপ হয়ে যাচ্ছে। বাঞ্ছার এই কুণ্ঠা সে যেভাবে প্রকাশ করে তা মনোজ মিত্র কথিত সেই 'বক্র রসিকতা' ঃ

> " টাকাটা দেবেন কত্তা ! (কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ) হে হে, কী অনাচার ! কী অনাচার ! চেরটাকাল আপুনারাই লোকের দরজায় তাগাদায় গেছেন — নোকে দিয়েছে — আপুনারা নিয়েছেন — আজ আপুনারা দেবেন — আমরা নেবো! (নকড়ি পকেট থেকে টাকা বার করে) ভাববেন না বাবু, ধরণী এ অনাচার বেশিদিন সইবে না ।" [২০]

নকড়ির টাকায় কেনা দস্তানাপরা হাত নকড়ির মুখের সামনে বাড়িয়ে ধরে বাঞ্ছা যখন মাসকিস্তির

টাকা চায় তখন কে শোষক আর কে শোষিত তাই যেন গোলমাল হয়ে যায়। বাঞ্ছার ক্রমশ সোজা হয়ে ওঠাকে চোর উপমিত করেছে ধনুক এবং তীরের সঙ্গে। সেই তীর যেন বিদ্ধ হচ্ছে নকড়ির হৃদয়ে। নিজের বেঁচে থাকা দিয়েই বাঞ্ছা হারিয়ে দিচ্ছে নকড়িকে। বাঞ্ছা খুব সরল বা আদর্শবাদী চরিত্র নয়, সে দোষে-গুণে ভরা মানুষ। মনোজ মিত্রের নাটকের চরিত্ররা কেউই এর বাইরে নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাঞ্ছা ধূর্ত না সরল সেটা নকড়ির মতোই পাঠকও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। পদ্মর প্রতি নকড়ি এবং কোঁৎকার আকর্ষণকে যখন সে কৌশলে স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহার করে তখন তাকে ধূর্ত বলে চেনা যায় কিংবা সুইসাইড করতে রাজি হওয়ার আগে নকড়িকে একাধিক শর্তে আবদ্ধ করে নেওয়ার মধ্যেও তার কৌশলী পরিচয়ই প্রকাশ পায়। কিন্তু বাঞ্ছা যখন বলে ঃ " এই মরি এই মরি – আজ মরি না কাল মরি বারবার লোকটার কাছে আমার কথার খেলাপ হচ্ছে – আর নোকটা এইরকম রোগা হয়ে যাচ্ছে ! লজ্জায় তার দিকে আমি চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত পারিনে।"[২১] তখন সত্যি সত্যি বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে যে, এ বাঞ্ছার সত্যিকারের গ্লানি অথবা চাপা ব্যঙ্গ। এই নাটকে বাঞ্ছা শেষপর্যন্ত আর কোনো চরিত্র থাকেনি, হয়ে উঠেছে বিশেষ একটি idea-র দ্যোতক। সেই idea উচ্চারণ করে ঃ " আজ্ঞে ফলের আশায় কেউ কি সাজায় বাগান ! মাটি মাটি ! মাটি বলে আমারে সাজাও ... নিষ্কাম সাজাও ।"[২২] এই যে বারবার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা এবং মৃত্যুকে নিয়ে রসিকতা করা - এ আসলে জীবন- রসিকতারই ফল। নিজের পরিচিত এক নাটকের বন্ধু দেবাশিস দাশগুপ্ত আর বাঞ্ছারাম চরিত্রের মধ্যে এই জীবন-রসিকতা দেখেছেন বলে জানিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ

> "না জানি ওরা কেমন করে বুঝতে পেরেছিল, ওদের জীর্ণ রূপ দুঃখদুর্দশা আধি ব্যাধি ত্রাস লাজ ভয় – কোনওটাই ওদের নিজেদের নয়। সব আর এক জনের। ওরা কেবল ভাণ করছে ওদের বলে। ভাণ করছে মরবে বলে। আসলে মরবে আরেকজন। নিজেরা ওরা সবকিছুর বাইরে – সুন্দর পবিত্র সুখী শিশু। ওরা যেন – লীলয়া দ্বিতীয়ম ঐচ্ছৎ।"[২৩]

নিজেকে এভাবে নিজের থেকে পৃথক করে নিতে পারলেই জীবনকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব, যেমন দেখেছে 'সেঞ্চুরি বুড়ো' বাঞ্ছারাম। সমকালের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চে অভিনন্দিত হয়েছে এই জীবনদৃষ্টিই। সব জটিলতা-স্বার্থপরতা-হানাহানির মাঝেও জীবনের যে সহজ প্রবাহ বহমান তাই এই নাটকের অন্বিষ্ট। ওপার বাংলায় নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ সহজ জীবনপ্রবাহকে মনোজ মিত্র সঞ্চারিত করে দিয়েছেন 'সাজানো বাগান'-এ, যে জীবনে চোর গৃহস্থকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় এবং বাগান নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হবার আগে মালিক তার সঙ্গে 'কনসাল' করেনি বলে অভিযোগ জানায়। কারণ সে মনে করে, দীর্ঘদিন চুরি করার সুবাদে বাগানের ওপর তারও একটা 'নাইট' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসন্ন জীবনদৃষ্টির কারণেই গুপী-পদ্ম-চোরের বাঞ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা স্বার্থপরতা বলে চেনা গেলেও তা ক্রূর বলে মনে হয় না। বাগান থেকেই চুরি করা মুরগির ডিম যখন চোর বাঞ্ছাকে খাওয়াতে চায় তখন স্বার্থপরতার চেয়ে অসহায়তার দিকটিই বেশি করে প্রকাশ পায়। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তখন চোরেরও সহমর্মী হয়ে পড়েন পাঠক-দর্শক। এ নাটকে লোভ আছে, লোভের প্রতিরোধ আছে, স্বার্থপরতা আছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে আছে প্রবল জীবনাসক্তি। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে তারই স্বীকৃতি ঃ " লোভ, বেঁচে থাকার ইচ্ছে, স্বার্থ, ভালবাসা – সব নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত -টলস্টয়ের স্টাইলে এমন লুডো খেলা আর দেখিনি। সেই সঙ্গে বারাসত-বসিরহাট-টাকী-মালতীপুরের বাংলা উচ্চারণ। হাসি দুঃখ । আক্ষেপ।" [২৪] এই জীবনাসক্তির পাশাপাশি

স্বকীয় ভঙ্গিতেই মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন সমকালীন সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি-ভন্ডামিকে। সরকারি অফিসে কালীপূজা, ডাক্তারের অপচিকিৎসা, যুবপার্টি বা পল্লী উন্নয়ন সমিতির নামে রাজনৈতিক খবরদারি এবং নেতৃত্বস্থানীয়দের অধঃপতিত চরিত্র কোনোকিছুই নাট্যকারের কটাক্ষ থেকে রেহাই পায়নি। 'চাক ভাঙা মধু'র পর পরিবর্তিত গ্রামজীবনের চিত্র তিনি আবার আঁকলেন 'সাজানো বাগান'-এ। এই নতুন গ্রামজীবনের জটিল বিন্যাস নাটকে উপস্থাপিত করার কৃতিত্বকে অভিনন্দিত করেছেন সমালোচক ঃ

> " বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বিজন ভট্টাচার্যের গ্রামকে পেছনে রেখে এসে নতুন গ্রাম জীবনের জটিল ছককে বাংলা সাহিত্যেও আয়ত্ত করার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা খুব বেশি নেই। সেদিক থেকেও আধুনিক নাটকে 'সাজানো বাগান' স্মরণীয় প্রয়াস হয়ে রইল। " [২৫]

এই নাটকের চরিত্রসৃজন, সংলাপ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি সবই পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হবে, তবে এখানে কেবল এটুকু বলার যে, এসব কিছুর যথাযথ সমবায়ে মনোজ মিত্র যে যথাযথ নাটক গড়ে তুলতে পেরেছেন সেটাই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। সমকালের বাংলা নাটকে বক্তব্যের চাপে রূপনির্মাণ যখন গৌণ হয়ে পড়েছে তখন মনোজ মিত্র দেখালেন, শিল্পরূপ অক্ষুণ্ণ রেখেও কীভাবে বক্তব্যকে প্রোথিত করে দেওয়া যায়। বাইরে হাসির আবরণ থাকলেও ভেতরে বক্তব্য গভীর এবং সে বক্তব্য হাসির তোড়ে হারিয়ে যায় না। বরং অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে, মুখর হাসির পর কত সহজেই উচ্চারিত হয়ে গেছে গভীর কথাটি। জমিদার-জোতদারের দীর্ঘ শোষণের কথা যখন বলে বাঞ্ছা কিংবা নকড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরে ফলিডলের শিশি, তখনও তার বক্তব্যকে ভার মনে হয় না বক্র রসিকতার কারণেই। সোস্যাল স্যাটায়ার রচনানৈপুণ্যে কোন চরম মাত্রা পর্যন্ত যেতে পারে তার সার্থক দৃষ্টান্ত 'সাজানো বাগান'। সমকালে এই নাটক তাই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করেছে। 'দেশ' পত্রিকার বক্তব্য যেন 'সাজানো বাগান' সম্পর্কে সমকালের জনমানসের প্রতিফলন ঃ

> " এমন একটা নাটক যেখানে বক্তব্য অন্তঃ সলিলা, হাসির স্রোতে ভাসতে ভাসতে দর্শকের মনে অজান্তেই গভীর নাটকীয় বক্তব্য প্রোথিত হয়ে যায়। যে ধরণের মৌলিক নাটকের জন্য আমাদের অহল্যা-প্রতীক্ষা, সাজানো বাগান সেই প্রার্থিত নাটক।" [২৬]

শুধু সমকাল নয়, 'সাজানো বাগান'-এর আবেদন চিরকালীন। কারণ জীবনের আবেদন কোনো দেশ-কালের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়, সেই চিরকালীন মূল্যই স্বীকৃতি পেয়েছে নাটক রচনার পঁচিশ বছর পর ঃ " শিলালিপির মতো এই নাটক, কালের পটে উজ্জ্বল এর অক্ষরগুলি, স্থির বাণীতে চিরকালের গীতি, কালসমুদ্র পেরোনোর একটি ডানা।"[২৭]

'রাজদর্শন' (১৯৮১)-এর লম্বোদর ভট্ট বাঞ্ছারামের মতোই জীবনপিয়াসী কিন্তু বাঞ্ছারামের মতো সে উৎপাদক নয়, সে সংগ্রাহক। ভালো খাওয়ার প্রতি দরিদ্র এই ব্রাহ্মণের অপরিসীম লোভ, কিন্তু বিরাট সংসার প্রতিপালন করাই দুঃসাধ্য, ভালো খাবার জুটবে কোথা থেকে? ক্রোধ এবং হতাশায় সে সন্তানের জন্ম দেবার জন্য স্ত্রীকে দোষারোপ করে, নিজেই নিজেকে নির্বংশ হবার অভিশাপ দেয়। অযোধ্যা রাজ্যের এক প্রত্যন্ত গ্রামে লম্বোদরের বাস। গাঁয়ের কামার অভিরাম লম্বোদরের স্ত্রীকে মা ডেকেছে। সেই সুযোগে লম্বোদর মাঝে মাঝেই অভিরামের কাছে হাত পাতে। অযোধ্যার

সিংহাসনে আসীন রাজা নন্দ। রাজকার্যে তার বিন্দুমাত্র মন নেই, দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, কেবল স্বার্থরক্ষা এবং রমণীবিলাস। রাজার দুর্বলতার সুযোগে রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়েছে বিদ্রোহ, রাজ পরিবারের মহলে মহলে চলছে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র । সেই ষড়যন্ত্রে রাজার ভাই চন্দ্রকেতু এবং ছোটোরাণী যশোমতীও যুক্ত, রাজাকে হত্যা করে চন্দ্রকেতু চায় রাজত্ব আর রূপবতী রাণীকে। এদিকে রাজকর্মচারীরা হয়ে উঠেছে স্বেচ্ছাচারী। রাজ্যের জলসত্রে মদ বিক্রি হচ্ছে আর সেখানে বিনে পয়সায় তা পান করছে রাজার সৈন্যরা, প্রত্যন্ত গ্রামেও মুরলীধরের মতো কর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের নামে অত্যাচার চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর। সর্বোপরি নন্দ রাজার ওপর পড়েছে শনিদেবের কোপদৃষ্টি। এক অজানা রোগে নন্দরাজা ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছেন, সব চিকিৎসক জবাব দিয়ে গেছেন। এখন ব্রাহ্মণদের দান করে তাদের আশীর্বাদের জোরে নিজের আয়ুর সীমা বাড়াতে চান নন্দ, যদিও দানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হবে প্রজাদের ওপর 'বিশেষ কর' চাপিয়েই। দিন নির্দিষ্ট হয়েছে আগামী শুক্লা পঞ্চমী। এই সংবাদ পেয়ে লম্বোদর ভট্ট উল্লসিত। সেও যাবে অযোধ্যায়। কিন্তু অতদূরে নিজের পায়ে হেঁটে যাবার সাধ্য তার নেই। তাই অভিরামই একমাত্র ভরসা। পরজীবী এই ব্রাহ্মণকে কাঁধে করে অযোধ্যায় নিয়ে যেতে হবে অভিরামের এবং পথের খরচও জোগাড় করতে হবে নিজের কামারশালা আর হাপর বেচে। অভিরাম প্রথমে রাজি না হলেও মুরলীধরের ভয় দেখিয়ে তাকে গ্রাম ছাড়তে রাজি করিয়েছে লম্বোদর আর তার কাঁধে সওয়ার হয়ে তারই পয়সায় পথের সব খরচ চালিয়ে শুক্লা পঞ্চমীর আগের রাতে তারা এসে পৌঁছেছে অযোধ্যায়। ভাঁড়ুদাসের জলসত্রে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে রাজার দুই সৈন্য ব্যাঘ্রমল্ল-ভীমভল্লের। অভিরামকে তারা পীড়ন করতে গেলে লম্বোদর ছাতা ঘুরিয়েই তাদের হটিয়ে দেয়। অভিরামের শেষ সম্বল একটি কড়ি দিয়ে একঘটি মদ খেয়ে গরিব জীবনের শেষ দিনটাকে তারা বড়লোকের মতো বিদায় করতে চায়। কিন্তু কপালের লিখন খন্ডাবে কে ! হঠাৎ সেই রাতেই মারা যায় নন্দরাজা। অথৈ জলে পড়ে লম্বোদর-অভিরাম। সেই ঘোর বিপদে তাদের সামনে উপস্থিত হন সাক্ষাৎ মহাশনি। তাদের দুঃখের কথা শুনে তিনি ব্যবস্থা দিলেন- লম্বোদর বা অভিরামের মধ্যে যে কোনো একজন মরলে তিনি সেই আত্মাকে মৃত নন্দের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। এদিকে দেহ রক্ষিত থাকবে, নন্দের বেশে দানধ্যান করে আবার মৃত্যুবরণ করলেই আত্মা পুরনো দেহে ফিরে আসতে পারবে। দু'জনের মধ্যে কে মরবে তা নিয়ে টানাপোড়েনের পর গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুবরণ করে লম্বোদর আর তার দেহ পাহারার দায়িত্বে থাকে অভিরাম।

যে কুব্জা দাসী ছিল নন্দরাজার ধাই, যে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে নন্দরাজাকে, সে-ই চন্দ্রকেতুর ভয়ে বিষ দিতে বাধ্য হয়েছে রাজা নন্দকে। নইলে চন্দ্রকেতু হত্যা করবে কুব্জার সন্তানদের। রাজার মৃতদেহ পড়ে আছে অনাদরে, রাণীরা সব রত্নভান্ডারের চাবি সন্ধানে ব্যস্ত। এমত সময়ে হঠাৎ উঠে বসে নন্দরাজার মৃতদেহ, হৈচৈ পড়ে যায় রাজবাড়িতে। কেউ চূড়ান্ত হতাশ, কেউ বা নবজীবনপ্রাপ্ত রাজাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আখের গোছাতে ব্যস্ত। নন্দের দেহধারী লম্বোদরের অবস্থা এদিকে করুণ। ভয়ে সে দিশেহারা। তার আচরণের অস্বাভাবিকতা কারো নজর এড়ায় না। প্রথম সে আত্মসমর্পণ করে দুই দেহরক্ষী ব্যাঘ্রমল্ল-ভীমভল্লের কাছে। তারা প্রশিক্ষণ দিয়ে লম্বোদরকে রাজার উপযোগী মাপের করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। যতদিন পর্যন্ত রাজার পাগড়ি মাথায় ঢলঢল

করছিল ততদিন পালাতে চাইছিল লম্বোদর, কিন্তু যেদিন পাগড়ি বসল আঁট হয়ে সেদিন সে অনুভব করল রাজত্ব করার সুখ। এদিকে অভিরাম আর মড়া আগলে রাখতে পারছে না। রাজপ্রাসাদে সে ঢুকতেও পারে না। অনেক কষ্টে চুরির দায়ে ধরা পড়ে একদিন সে নীত হ'ল নন্দর দেহধারী লম্বোদরের কাছে। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করলেও লম্বোদরকে তখন গ্রাস করেছে ক্ষমতার মোহ, নারীর মোহ। তাছাড়া নিয়ে যাবার মতো কিছু সে গোছাতেও পারেনি। তাই আরো কিছুদিন মৃতদেহ আগলাতে হবে অভিরামকে। এদিকে ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, নন্দরাজার দেহে আসলে লম্বোদর। কিন্তু এই জাল নন্দকে সামনে রেখেই সকলে কাজ হাসিল করে নিতে চায়। তাই গাঁটছড়া বাঁধে জাল নন্দের সঙ্গে! নন্দরূপী লম্বোদর চালটা ধরতে পারেনি, তাই সেও উল্লসিত। আর পুরনো দেহে সে ফিরবে না। নিজের মৃতদেহ সে এখন নষ্ট করে ফেলতে চায়। কিন্তু অভিরাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ধর্মবাপকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেই, মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবেই। তাই অভিরাম ছুটতে থাকে লম্বোদরের ধড় নিয়ে আর পিছু পিছু ছোটে নন্দরাজার বাহিনী। ধড়ের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। মগধ নগরীর পথ ধরেছে অভিরাম। তাকে ধরতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সন্দেহজনক ঘরবাড়িতে, শস্যক্ষেত্রে, গ্রামের পর গ্রামে। দ্রুতবেগে আগুন ছুটছে আর মড়া কাঁধে অভিরাম ছুটছে বন জঙ্গল নদী ডিঙ্গিয়ে। এদিকে রাজ্যে চরম অরাজকতা। বন্যায় বিধ্বস্ত একটি অঞ্চল, দুষ্কৃতীর শাস্তির বিধান প্রায় উঠেই গেছে, রত্নের লোভে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে পাঠিয়েছিলেন যে বাহিনীকে,তারা পরাজিত হয়েছে। কেবল সেনাপতি ভাঙা পা নিয়ে ফিরেছেন, বিশাল বাহিনী ধ্বংস হয়েছে। এদিকে রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে। মৌর্য বৃষল বিদ্রোহের নেতা। সে এগিয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। আক্রমণ করেছে প্রাসাদ, জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুন। সেনাপতি মহামাত্য সকলেই পালিয়ে গেছে রাজাকে ছেড়ে। রাজা এখন জাঁতাকলে পড়েছেন। চারদিকে আগুন। জ্বলছে রাজার বাহন অশ্ব ধূম্রকেশর। প্রাণপণে রাজা এখন অভিরামকে ডাকছেন কিন্তু অভিরামের বদলে এসে উপস্থিত হয়েছে কুব্জা। নিজের সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে এবার ছুরিকাঘাতে হত্যা করবে জাল নন্দকে। কিন্তু নিজেরই দেহের বিরুদ্ধে নন্দ ওরফে লম্বোদর যে লেলিয়ে দিয়েছেন সৈন্য। সুতরাং এদিকে মরলে ওদিকে বেঁচে ওঠা যবে কিনা তাও নিশ্চিত নয়। তাই মরতে সে ভীত। কুব্জাকে সে 'মা' বলে ডাকে কিন্তু কুব্জা আজ নির্দয়। এই জাল লোকটির জন্যই সে হারিয়েছে সন্তানদের। তাই ছুরি হাতে সে ধাওয়া করে নন্দকে। এদিকে অভিরাম লম্বোদরের মৃতদেহ নিয়ে আবার ফিরে এসেছে সেই গ্রামের গাছতলায়। আর তখনই এসে তাকে ধরেছে মুরলীধর। এ মড়া মহামূল্যবান। পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এর পুরস্কার। মুরলীধর যখন লম্বোদরের মৃতদেহের পা ধরে টানতে থাকে তখনই হঠাৎ বেঁচে ওঠে লম্বোদর। আত্মা এবার নন্দের দেহ ছেড়ে ফিরে এসেছে নিজের দেহে — বগলের ফোঁড়ায় টাটানো উপলব্ধি করে লম্বোদর নিশ্চিত হয়েছে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। কিন্তু আত্মীয়-পরিজন বাসস্থান সব জ্বলে পুড়ে গেছে নন্দরাজার লাগানো আগুনে। শকট ভরে দান আনার লোভে গিয়েছিল যে লম্বোদর, আজ সে নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল। কিন্তু মনোজ মিত্র শেষ পর্যন্ত আশাবাদী। তাই অনুতপ্ত লম্বোদরকে আশার বাণী শোনায় অভিরাম। অভিরামের ধর্ম মা অর্থাৎ লম্বোদরের স্ত্রী মরেননি, তিনি পদ্মপাতায় মালপো ভেজে অপেক্ষা করছেন। নাটকের এই মধুর সমাপ্তিতে সত্য হয়ে থাকে অভিরামের উক্তি ঃ

> ''কেন কাঁদছ বাপ, কেন কাঁদো ? দুখানা হাত রয়েছে! আবার ঘর গড়বে! হাত দুখানা তো ভিক্ষে করার তরে পাওনি, পেয়েছ চালনা করার জন্যে ... তাই করবে! নিজের ঐশ্বর্য নিজে গড়বে!... কেন মিছে হাত বাড়াও! যা তোমার, তারে তুমি চিনে নাও! ... ও ঠাকুর বাবা, চেয়ে দ্যাখো তোমার ন্যাড়া গাছেও কেমন পাতা বেঁধেছে ... কেমন ঝুপসি হয়েছে ... ফল আসছে গো ... শিগগিরই ফল আসছে ...'' [২৮]

এই উক্তিতেই চিরদিনের শেকড়হীন পরগাছা লম্বোদরের চেতনা জাগে। অভিরামের কাঁধে চেপে যেতে যেতে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে ঃ ''ওরে ও অভিরাম, নামা....আমায় নামিয়ে দে! ঐ দ্যাখ সবাই আমার দিকে কিরকম কটমট করে তাকাচ্ছে। না, আর তোর পিঠে না, এবার হেঁটে যাবো।''[২৯] লম্বোদরের এই মাটিতে নেমে আসাতে, এই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠাতেই নাটক শেষ করেন মনোজ মিত্র।

বাইরের দিকে থেকে রাজাকে দর্শন বলে মনে হলেও এই নাটক আসলে বলে রাজার দর্শনের কথা। সেই দর্শন হ'ল ক্ষমতা উপভোগ এবং স্বার্থপরতার দর্শন। এই দর্শন কোনো ব্যক্তিনির্ভর নয়, পদনির্ভর। পাগড়ি যেই আঁট হয়ে বসে মাথায়, অমনি জেগে ওঠে মোহ, জেগে ওঠে ক্ষমতার দম্ভ। এই ব্যবস্থার কাছে দেবতাও অসহায়। তাই শনিদেব নন্দের প্রাণ নেবার পর লম্বোদরকে সেই দেহে প্রবেশ করালেও প্রজাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়। 'শিবের অসাধ্যি'তে আমরা দেখেছিলাম, জোতদারকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ শিব এই আশা করেছিলেন যে, ছিদেমরাই একদিন লড়াই করে সুদিন ফিরিয়ে আনবে ঃ ''পারবি পারবি... পারলে তোরাই পারবি ! কিছু করতে হলে তোদেরই করতে হবে! লেগে পড় ! উল্টেপাল্টে দে।''[৩০] 'রাজদর্শন'-এও শনিদেব শেষপর্যন্ত বলেছেন ঃ ''দেবতা যদ্যপি পারে বদলাতে রাজা.... পারে না বদলাতে শাসন, এমনি এ মজা!''[৩১] এই শাসন বদলাতে হবে সাধারণ মানুষকেই। তাই দেবতার অহং ত্যাগ করে শনিদেব আহ্বান জানিয়েছেন বৃষলকে। আশা করেছেন, দরিদ্রের এই সন্তান দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হবে, হতশ্রী আত্মসুখসর্বস্ব অযোধ্যাপুরীকে ধ্বংস করে সেখানে যে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 'শিবের অসাধ্যি'-তে 'পরের কাছা'কে বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন মনোজ মিত্র, এখানেও সেই একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণের প্রতিনিধি বৃষলের সিংহাসন লাভের মধ্য দিয়ে নতুন জীবনাদর্শের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। এদিকে রাজা হয়েই লম্বোদর নিজের পুরনো জীবন ভুলে যেতে চেয়েছে, নিজের মৃতদেহ ধ্বংস করে ফেরার সম্ভাবনা রুদ্ধ করতে চেয়েছে কিন্তু তা হতে দেয় নি অভিরাম। নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে লম্বোদরের মড়া আগলেছে, যখন রাজার জীবন দুর্বিষহ মনে হয়েছে তখন লম্বোদর যে আবার পুরনো দেহে ফিরে আসতে পেরেছে সে অভিরামের জন্যই। মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে এই অভিরামদের গুরুত্বই প্রতিষ্ঠা করতে চান। কাল্পনিক ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত এই নাটকে তিনি আসলে ধরতে চেয়েছেন সমাজকেই। অযোধ্যার রাজা হিসেবে নন্দের কথা বলে তিনি আসলে রামরাজ্যের ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের অত্যাচারী রাজা নন্দের বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছে। রাজা তথা সিংহাসনের যে বৈশিষ্ট্য এবং রাজপুরীর যে ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন তা আসলে সমসাময়িক জীবন থেকেই উদ্ভূত। ইতিহাসের সূত্রে এভাবে সমসাময়িকতাকে গেঁথে মনোজ দেখাতে চান, অতীত আর বর্তমানে জীবনের মৌলিক বৃত্তিগুলি আসলে একই। রাষ্ট্রব্যবস্থা যে অপরাধীকে অপরাধ করার সুযোগ দিয়ে তারপর নিজে সুযোগ নেয় তা দেখানো হয়েছে ব্যঘ্রমল্ল-ভীমভল্ল চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রাজা নন্দ মারা যাবার

পর পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যেও মনোজ মিত্র দেখেছেন সমকালের কূটনীতি। যে চন্দ্রকেতু বিষ প্রয়োগে রাজাকে হত্যা করেছে সেই দিয়েছে সবচেয়ে বড় পুষ্পার্ঘ্য। নন্দবেশী লম্বোদর কোনো ব্যয়ের মধ্যে যেতে চান না, যতটা পারেন গুছিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার লক্ষ্য, রাজত্ব এবং রাজসিংহাসন রক্ষার দায় তার নেই। এই সূত্রেই তিনি কটাক্ষ করেন সমসাময়িক অস্থির রাজনৈতিক অবস্থাকে ঃ ''যে সব রাজার অন্তরে ভয় থাকে, সিংহাসন যখন তখন ওল্টাতে পারে, তারা শুধু গোছানোর পথ ধরে।''[৩২] রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিকতা, স্বজনপ্রীতি, ত্রাণ তহবিলের দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। নন্দরাজার স্পষ্ট কথা, নিজের লোক ছাড়া কাউকে তিনি কাজ দেবেন না। আর ঃ ''নিজের লোক হলে কোনরকম যোগ্যতার দরকার নেই। মাসান্তে মনে করে বেতনটি নিয়ে যেও বৎস।''[৩৩] স্মর্তব্য যে, মনোজ মিত্র একথা বলছেন ১৯৮১ সালে, যখন কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গে শাসক-বদল ঘটেছে। কিন্তু দূরদর্শী নাট্যকার বুঝে গিয়েছেন, শাসক বদলালেও আসলে শাসনব্যবস্থার গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটে না। রাজা যে রঙের জামা গায়েই আসুক না কেন, প্রজার 'দিন বদলায় না'। ঐ পাগড়ি আঁট হয়ে বসা পর্যন্তই যেটুকু অপেক্ষা। রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখার চেয়ে অনেক বড় যে গদি রক্ষা করা, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নাট্যকার মহামাত্যকে দিয়ে বলিয়ে নেন ঃ ''রাজত্ব রক্ষা করতে গেলে পিশাচের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধতে হয়।''[৩৪] এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব কেবল আত্মার জাগরণে, শুদ্ধ চৈতন্যের জাগরণে। সেই জাগরণ ঘটাতে পারে অভিরামের মতো মানুষেরাই। যতদিন লম্বোদরের মতো মানুষের আত্মা লোভের বশে বাঁধা থাকবে সিংহাসনের কাছে ততদিন চৈতন্যের জাগরণ সম্ভব নয়। মনোজ মিত্র বিশ্বাস করেন, মানুষের চৈতন্যের জাগরণ ঘটবেই। সেই জাগরণের ছবিতেই তিনি নাটক শেষ করেন। একে সদর্থক ইচ্ছেপূরণ বলে মনে হতে পারে কিন্তু এটাই মনোজীয় বৈশিষ্ট্য। তবে এই পর্যায়ে তিনি নাটককে নিয়ে যান সব নাটকীয় শর্ত রক্ষা করেই।

'নৈশভোজ' (১৯৮৪-'৮৫) রচনার বাস্তব প্রয়োজনাত্মক দিকটির কথা উল্লেখ করেছেন মনোজ মিত্র তাঁর একটি রচনায়। দীর্ঘদিন থেকে এই নাটকের ভাববীজ ছিল তাঁর মনে কিন্তু একটি বাস্তব পরিস্থিতি এর রূপগ্রহণকে ত্বরান্বিত করল। ১৯৮২ সালের দিকে কয়েকটি নাট্যদল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর বিপরীতের ময়দানে খোলা আকাশের নিচে নাট্যাভিনয়ের সিদ্ধান্ত নেন। সেই আয়োজনে মনোজ মিত্রের দল 'সুন্দরম্'ও ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> "A spot was chosen. There was a solitary not-very-tall tree on the site. I decided to make use of the tree in its natural setting and to take all the characters there." [৩৫]

সেই গাছকে কেন্দ্রে রেখেই রচিত হ'ল একাঙ্ক 'নৈশভোজ'। পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার সময়ও নাট্যকার জঙ্গলের মধ্যে কাঁঠাল গাছটিকেই একমাত্র 'সেট' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কুন্ডু বাবুদের সেই কাঁঠাল গাছের তলাতেই মধ্যরাতে হাজির হয়েছে একজোড়া শেয়ালসহ অনেকগুলি মানুষ। গাছে পেকে আছে রসভরা কাঁঠাল। উপবাসী শেয়াল হুক্কা এবং হুয়া অপেক্ষায় আছে সেই কাঁঠাল মাটিতে পড়ার। কিন্তু ভাগীদার সেখানেও। চোর ছকু নয়নতারাকে নিয়ে এসেছে সেই কাঁঠালগাছের নীচে। নিজের বৌ রেলে কাটা পড়ে মারা যাবার পর নয়নতারাকে সে ভালোবাসে। নয়নতারা তুষ্টু চামারের

মেয়ে। এই মেয়ে ছাড়াও তুষ্টুর আছে এক পঙ্গু ছেলে। কিন্তু সংসারের দিকে নজর নেই তুষ্টুর। মাথায় জটা পড়েছে বলে তাকে বলে 'সাধু তুষ্টু'। এই নামের মোহে পড়ে ভগবান নিয়ে ক্ষেপে উঠেছে তুষ্টু। জীবনধর্ম উপেক্ষা করে সে আচার-ধর্ম নিয়ে মেতেছে। চেয়ে-চিন্তে পঙ্গু ভাইয়ের খাবার এবং চিকিৎসার খরচ যোগাতে হয় নয়নতারাকেই। সময়ে-অসময়ে ছকুই তাকে দু-একটা টাকা দেয়। তাই ছকুর ডাক সে উপেক্ষা করতে পারে না। আজও ভাইয়ের চিকিৎসার পয়সার জন্য সে এসেছে ছকুর পিছুপিছু। ছকুর আর নিজের পয়সা কোথায়। কুন্ডুবাবুদের কাঁঠাল গাছই ভরসা। এই গাছ থেকে গোটাকয়েক কাঁঠাল নামিয়ে বেচে দিতে পারলেই টাকা। ছকু আর নয়নতারা মিলে সবে একটা কাঁঠাল নামিয়েছে তখনই উপস্থিত তুষ্টু। নিজের মেয়েকে সে কিছুতেই চৌর্যবৃত্তি করতে দেবে না, এতে যে 'সাধু তুষ্টু'র অপমান। ছকুর সঙ্গে মেয়ের বিয়েও সে দেবে না। কারণ ছকু মদ খায়, জুয়া খেলে, চুরি করে এবং নিজের বৌকে সে ধাক্কা দিয়ে রেল লাইনে ফেলে দিয়েছে বলেই তুষ্টুর বিশ্বাস। চুরি করা কাঁঠাল আবার বেঁধে রাখতে গাছে ওঠে তুষ্টু। এই সুযোগে ছকু প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে। নয়নতারার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় 'সাধু তুষ্টু'কে অপদস্থ করার সুযোগ সে ছাড়বে না। চিৎকার করে সে লোক জড়ো করেছে। তুষ্টু তখন গাছের ওপর, হাতে তার ছেঁড়া কাঁঠাল — তাকে চোর প্রমাণ করতে আর কী লাগে। ঢ্যাঙা চৌকিদার এবং তারপর একে একে স্বর্গীয় নারায়ণ কুন্ডুর তিন পক্ষের তিন ছেলে চক্রধর, গদাধর এবং ধ্বজাধর এসে উপস্থিত হয়েছে। যে জমির ওপর এই গাছ সেই জমি এবং গাছ আসলে কোন্ ভাইয়ের ভাগে তা নিয়েই বিবাদ আছে। প্রত্যেকেরই দাবী, তাদের নিজের নিজের মাকে এই গাছ ভোগের অধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন স্বর্গীয় নারায়ণ কুন্ডু। ফলে চক্রধরের ধরা 'চোর' তুষ্টুকে গদাধর আবার গাছে তোলে নিজে ধরে রাইট এস্টাব্লিশ করবে বলে। গাছের অধিকার নিয়ে তিন ভাইয়ের দ্বন্দ্ব যখন চরমে তখনই ঢ্যাঙা হঠাৎ আবিষ্কার করে গাছের ওপর থেকে ঝুলছে তুষ্টু চামারের নিরালম্ব দুই পা — তুষ্টু অপমান থেকে বাঁচতে 'গলায় দড়ি দিয়েছে'।

হুক্কা এবং হুয়া কাঁঠালতলায় সুবিধে না পেয়ে গিয়েছিল তুষ্টুর বাড়িতে। তুষ্টুর পঙ্গু ছেলেটাকে টেনে নিয়ে আসার মুহূর্তে নয়নতারা দিয়েছে ঠ্যাঙার বাড়ি। লেজের আঘাত নিয়ে গাছতলায় ফিরে আসার পরই তাদের চোখে পড়েছে তুষ্টুর ঝুলন্ত দেহ। ব্যথা ভুলে তারা আনন্দে মেতে উঠেছে। আজ রাতে জবর ভোজ হবে তুষ্টুর দেহ দিয়ে। তুষ্টুর হাঁড়িতে ভাত ছিল না বলে কোনোদিন তার হাঁড়ি মারা যায় নি, আজ নিজেই আত্মহত্যা করে সে ভোজের আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু মানুষের লাশে শেয়ালের চেয়ে মানুষের লোভ আরো বেশি। আর সে লোভ কী একজনের! দীর্ঘদিন থেকে তুষ্টুর ভিটের ওপর নজর ছিল চক্রধরের। এতদিন সফল হয় নি, আজ মৃত তুষ্টুর আঙুলের ছাপ নিয়ে ভিটেমাটি গ্রাস করবে বলে লাশটা তার প্রয়োজন। মেজভাই গদাধর কঙ্কাল পাচারের ব্যবসা করে, সুতরাং লাশটা তার চাই। ছোটোভাই ধ্বজাধর ভোটে জিতে পঞ্চায়েত প্রধান হতে চায়, তাই লাশটা তার সবচেয়ে বেশি দরকার। কে না জানে, যে যত বেশি লাশ জোগাড় করতে পারে, রাজনীতিতে তার সম্ভাবনা তত বেশি উজ্জ্বল। লাশের ওপর নজর আছে তান্ত্রিকেরও, সে চায় নরমুন্ডের ওপর বসে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে। এদিকে সব লাশের অলিখিত মালিক পেশাদার মস্তান বাবলা মুখার্জী এসে উপস্থিত। এই লাশ তার কাছে 'আমদানি'র উপায়। তিন ভাইয়ের কাছ থেকেই টাকা খায় বাবলা এবং এক লাশ থেকেই তিন ভাইয়ের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করে দেয়। সে তিন ভাইকে বোঝায় ঃ ''তোমাদের

তিনজনের মা আলাদা আলাদা কিন্তু বাপ তো একজন! ঈশ্বর নারায়ণ কুন্ডু। কেন ভুলে যাও, তোমরা সেই একই নারায়ণের হাতের ধ্বজাগদাচক্র।''[৩৬] বাবলা মিলিয়ে দেয় হিসেব -- প্রথমে চক্রধর নেবে মৃত তুষ্টুর টিপছাপ, তারপর ধ্বজাধর সেই 'বডি' নিয়ে মিছিল করবে আর শেষে গদাধর তুষ্টুর দেহ চালান করবে। সকলে যখন সাফল্যের আনন্দে মশগুল তখন বেঁকে বসে ঢ্যাঙা। এক গরিব দাঁড়ায় আর এক গরিবের পক্ষে। তুষ্টুর দেহ সে কাউকে নিতে দেবে না। সে সরকারি চৌকিদার। তার সামনে থেকে তুষ্টুর লাশ কেউ নিতে পারবে না। এই সময় সকলকে চমকে দিয়ে গাছ থেকে নেমে আসে জ্যান্ত তুষ্টু। গাছের ওপর থেকে তার সত্যদর্শন ঘটেছে। নিচে তাকিয়ে দেখেছে জগতের স্বার্থপরতা আর ওপরে দেখেছে সন্তানের জন্য শকুনের মমতা। নিজের সন্তানদের ক্ষতি করতে গেছে ভেবে শকুন তুষ্টুর জটা খাবলে ছিঁড়ে দিয়েছে, তুষ্টুকে করেছে নির্ভার। সে বুঝেছে, সবচেয়ে বড় ধর্ম নিজের সন্তানদের রক্ষা করা। তীব্র আক্রোশে সে বলেছে ঃ

> ''এই খ্যাতায় তোরা আমার টিপছাপ নিবি ... তো এই খ্যাতায় আমি আমার জুতোর হিসেব রাখব। এই ব্যাগে আমার মড়া ভরবি ... তো এই ব্যাগে আমি আমার জুতো সেলাই এর যন্ত্রপাতি ভরব। (ফ্ল্যাগটা তুলে) আর এটা থাকবে তুষ্টু চামারের জুতোর দোকানের মাথায়।''[৩৭]

সাধের ভোজ ভেস্তে যায় শেয়ালের, ভেস্তে যায় শেয়ালরূপী মানুষের। শেয়াল এবং মানুষের গলাজড়াজড়ি করে কান্নার দৃশ্যে নাটক শেষ করে তীব্র রাগের প্রকাশ ঘটান মনোজ মিত্র।

থিমের দিক থেকে মোটামুটি এক হলেও 'সাজানো বাগান'-এ মনোজ মিত্র ছিলেন রসিক, আর 'নৈশভোজ'-এ তিনি প্রচন্ড রাগী। লোভী, স্বার্থপর মানুষ কীভাবে জন্তুর মতো প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ে তা দেখাতে গিয়ে তিনি একজোড়া শেয়ালকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গাছের তলায় নৈশভোজের কল্পনায় শেয়াল আর মানুষ একাকার হয়ে গেছে। উভয়ের কাছেই 'সবচেয়ে ভালো খেতে গরিবের রক্ত'। নাট্যকারের রাগ এখানে এত তীব্র যে, অন্যান্য নাটকের মতো কৌতুক বা অসহায়তার মিশ্রণে মন্দ চরিত্রগুলিকে সহনীয় করে তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি। চক্রধর-গদাধর-ধ্বজাধর--বাবলা-নিত্য--পলাশ চরিত্রগুলি এখানে অবিমিশ্র মন্দ। তিন পক্ষের তিন ভাইকে পিতা নারায়ণ কুন্ডুর হাতের চক্র-গদা-ধ্বজা বলে উল্লেখ করে পুঁজিবাদী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ঘুণ ধরা রাজনীতির অশুভ আঁতাতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি। চরিত্রের এই একমাত্রিকতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> "The three characters, Chakradhar, Gadadhar and Dhwajadhar, depict three evil motives in man. They don't represent any class as such. That is why no positive human aspect is shown about them."[৩৮]

পক্ষান্তরে, ছকু বা ঢ্যাঙার মতো চরিত্রগুলি মানবিকগুণে ভূষিত। ছকু নিজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে যেমন 'সাধু তুষ্টু'কে চোর অপবাদ দেয়, তেমনি আবার তুষ্টুর মৃত্যুতে নিজেকে অপরাধী জেনে অনুতপ্ত হয়। ঢ্যাঙা সরকারি চৌকিদার হয়েও চক্রধরের কাছ থেকে প্রতিদিন চারটে করে রুটি পেয়ে থাকে কাঁঠাল গাছ পাহারা দেবার জন্য কিন্তু সে অন্তরের সাযুজ্য অনুভব করে তুষ্টুর সঙ্গে। তুষ্টুকে চোর

হিসেবে আবিষ্কার করে ঢ্যাঙার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। যে তুষ্টুকে এতদিন সে সাধু বলে জেনেছে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে সেই তুষ্টুর অবনমন তাকে আহত করেছে। কারণ তুষ্টু যে ছিল তার বিশ্বাসের জায়গা, গরিব মানুষের বিশ্বাসের জায়গা। সেই বিশ্বাস আহত হয়েছে বলেই ঢ্যাঙার ক্ষোভ ঃ ''নিজে আমি চাউকিদার হয়ে চোট্টামি করে খাই! তোরে দেখে ভাবতাম, আছে ... গরিবের ঘরে এখনো ধম্মো আছে! মার্ শালারে ... মার্।''[৩৯] সমাজ-রাজনীতির ভন্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ এবং ক্ষোভ এই নাটকে কটু ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণভাবে রাজনীতির বিচ্যুতির প্রতি খোঁচা আছে ঢ্যাঙার সংলাপে ঃ ''নিজের দোষ তুমি ওপর মহলে চাপাতে চাইছ! চুরি করতে এসে তুমি রাজনীতি করছ! লোকে রাজনীতি করতে গে যা যা করে ... তুমি শালা চুরি করতি এসে তাই তাই করছ।''[৪০] ধ্বজাধরের উপস্থিতির পর মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, শোষিত, নিপীড়িত, সর্বহারা মানুষের প্রতি সহমর্মিতার কথা বলে যে রাজনীতি, সেই রাজনীতির লোকেরাও কীভাবে সর্বহারা মানুষকে ব্যবহার করে। শাসক পরিবর্তনে যে শাসন পরিবর্তন হয় না, ফলিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য বদলায় না, তা উপলব্ধি করেছেন মনোজ তখনই। তাই তাঁর নাটকে পলাশ-নিত্য-রফির মতো মস্তানদের ঘাড়ে ভর দিয়ে জননেতা ধ্বজাধর হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন আর তার মাথার ওপর ঝুলতে থাকে হদ্দ গরিব তুষ্টু চামারের নিরালম্ব পা। সাধারণভাবেই মনোজ মিত্র দলীয় রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ বলে ধ্বজাধরের প্রতিদ্বন্দ্বী যে টেকো ব্রহ্মের কথা নাটকে বলা হয়েছে তার সম্পর্কেও কোনো উন্নততর ধারণা সৃষ্টি হয় না, তাকেও মুদ্রার অন্য পিঠ বলেই চিনিয়েছেন তিনি। রাজনীতির নীতিহীনতায় ক্ষুব্ধ নাট্যকার নিজের ক্ষোভ প্রকাশে কোনো আগল রাখেন নি, রাজনীতিকেরা তাঁর দৃষ্টিতে ধূর্ত শেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই তারা 'পলিটিশিয়াল'। দলীয় সংঘর্ষে মারা যায় সাধারণ মানুষ আর নেতারা দূরে বসে আঁচ পোহান। সংঘর্ষ বন্ধে তারা কখনোই আন্তরিক নন, কারণ এরকম সংঘর্ষই টিঁকিয়ে রাখে তাদের অস্তিত্ব। সেদিকেও কটাক্ষ করেছেন ঃ

''হুক্কা ।। দলীয় সংঘর্ষ! সেটা কী!

হুয়া ।। মহোচ্ছব ... মহোচ্ছব রে ছুঁড়া! তবে কিনা খরা বা বন্যেতে আমরা লাশ পাবো গোটা গোটা ... দলীয় সংঘর্ষে কাটা কাটা।

হুক্কা ।। ... দলীয় সংঘর্ষ কবে হবে বুড়ো।

হুয়া ।। হবে কিরে ... সংঘর্ষ চলছে অবিরত। ওটাই তো শেয়ালদের বাঁচিয়ে রেখেছে মুখ্যত।''[৪১]

রাজনীতিতে বাহুবলের অনুপ্রবেশ, মৃতদেহকে দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা প্রভৃতি সবকিছুই নাট্যকারের কটাক্ষের বিষয় হয়েছে। দরিদ্র মানুষ যে কেবল ভণ্ড রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং পচনশীল সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারাই পীড়িত হয় তা নয়, ধর্মীয় কুসংস্কারও যে তাদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ তা দেখিয়েছেন তিনি তুষ্টুর জীবনের মধ্য দিয়ে। জুতো সারাইয়ের তেল-কালি মাথায় ঘষতে ঘষতে যে জট বেঁধেছে, সংস্কারবশে তাকে 'জটা' বলে ধরে নিয়ে তুষ্টু সংসার বিস্মৃত হয়ে ঈশ্বরে দেহ-মন সমর্পণ করেছে। জীবন-বিচ্যুত এই ধর্মসাধনা যে কখনো সার্থক হতে পারে না, শেষ পর্যন্ত তা উপলব্ধি করেছে তুষ্টু। শকুনের বাৎসল্য দেখে সে বুঝতে পেরেছে নিজের কর্তব্য। উপলব্ধি করেছে যে, নিজের সন্তান এবং সংসার আগলে রাখাই সব চেয়ে বড় ধর্ম।

এই নাটকের বক্তব্য বলিষ্ঠ, নাটকীয় কৃৎকৌশল যথেষ্ট, মনোজ-সুলভ রঙ্গ-ব্যঙ্গ-রসিকতারও অভাব নেই, তা সত্ত্বেও যে 'নৈশভোজ' সৃষ্টি হিসেবে অবিস্মরণীয় হতে পারল না, তার প্রধান কারণ অতি প্রত্যক্ষতা। শোষক-শোষিতের যে লড়াই প্রকট হয়ে পড়েছিল বলে মনোজ মিত্র 'সাজানো বাগান'-এর প্রথম অভিনয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন, সেই লড়াই-শোষণ এবং শেষ পর্যন্ত শোষিতের জয় দেখানোটাই 'নৈশভোজ' নাটকে খুব বেশি করে চোখে ঠেকে। জোড়া শেয়াল প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত কিন্তু সে ব্যবহার স্থূল। একেবারে শেষে তুষ্টুর সংলাপও কেমন যেন আরোপিত মনে হয়। আসলে এই নাটক তাঁর প্রচন্ড রাগের বহিঃপ্রকাশ। আর শিল্পী হিসেবে তিনি যেখানে রাগী তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি সফল, যেখানে তিনি নিরাসক্ত অথচ জীবনের প্রতি প্রসন্ন কৌতুকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন।

বাঞ্ছারাম বা সাধু তুষ্টকে ব্যবহার করতে পারে নি স্বার্থান্বেষীরা, কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে ঘন্টাকর্ণ। নিজের ছোট্ট গ্রামে যে কিনু কাহার আর তার থিয়েটার দেখেছিলেন মনোজ মিত্র ছোটো বেলায়, সেই দেশজ আঙ্গিককেই তিনি তুলে ধরেছেন 'কিনু কাহারের থেটার'-এ। কিনুর দলে সে নিজেই নট নাট্যকার এবং মোশন মাস্টার। খোলা আকাশের তলায় ছেঁড়া চটের 'জাজিম' পাতা আসরে কিনুর দল অভিনয় করে স্বল্প আলো আর চড়া মেক-আপে। আধুনিক নাটকে যাকে 'অ্যালিয়েনেশন' বলা হয়, কিনুর দলের অভিনয়ে তা সবসময়ই ঘটত। নাটক থেকে জীবনে এবং জীবন থেকে নাটকে অনায়াস যাতায়াত কুশীলবদের। জীবন আর নাটক একাকার এই অভিনয়ে। পুরাণ-ইতিহাসে স্বচ্ছন্দ বিচরণ অশিক্ষিত কিনুর। এই কিনুর দলের একরাতের অভিনয়কেই তিনি হাজির করেছেন 'কিনু কাহারের থেটার'(১৯৮৮) নাটকে। পুরাণ বা ইতিহাস নয়, কিনু একবার লিখেছিল আদ্যন্ত কল্পকাহিনি 'ঘন্টাকর্ণ'। কিন্তু কোনোদিনই এই নাটক তারা সম্পূর্ণ অভিনয় করতে পারে নি। কারণ রসিক কিনু স্বভাবসুলভ তির্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছে মানুষের লোভ-লালসা-রুচি-সংস্কার, এমনকি শাসনব্যবস্থাকে পর্যন্ত। তাই কখনো রাজরোষ, কখনো গাঁয়ের জমিদারের শাসন, কখনো ভদ্রপাড়ার বাবু থিয়েটার, কখনো বা ধর্মগুরুর রক্তচক্ষু লন্ডভন্ড করে দিয়েছে 'ঘন্টাকর্ণ'-এর আসর। তেমনই এক অসমাপ্ত অভিনয়ের দৃশ্যরূপ এই নাটক। পাটের ফেঁসোর মশালের আলোয় সচিত্র পর্দার সামনে শুরু হয়েছে ঘন্টাকর্ণপালা-র অভিনয়।

কিনু কাহারের এই পালায় রাজা-উজির আছে, সাধু আছে, গণিকা আছে, ইংরেজ লাটসাহেব আছে আর আছে ঘন্টাকর্ণরূপী কিনু কাহার এবং ঘন্টাকর্ণের বৌ, বাস্তবেও যে কিনু কাহারের স্ত্রী। অন্য দুই স্ত্রীর মতো এই তৃতীয় পক্ষের জগদম্বাও কিনুকে ছেড়ে যাবার আগেই কিনু তাকে নিজের থিয়েটারের সঙ্গে 'বেন্ধে' ফেলেছে। কাল্পনিক পুতনা রাজ্যে অন্য সব কিছুর দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের, কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুতনার রাজার। সেই কাজে রাজার সাফল্য-ব্যর্থতা বিচারের জন্য রাজসভায় আছেন লাটসাহেব, যার একমাত্র লক্ষ্য কোনো না কোনো ছুতোয় আইন-শৃঙ্খলার সঙ্কট দেখিয়ে বা সৃষ্টি করে রাজার সিংহাসন ফেলে দিয়ে নিজে সেই সিংহাসনে আসীন হওয়া। দিন কে রাত দেখেন যে উজির, তিনি দিনের বেলায় লন্ঠন হাতে উপস্থিত উদাসিনীর ঘরে। নাটকের উজিরের

মতো বাস্তবের অভিনেতা বদ্যিনাথও সুযোগসন্ধানী। উদাসিনী চরিত্রের অভিনেত্রীকে সে অভিনয়ের সুযোগ নিয়ে বুকে টেনে ধরেছে, এমনকি একটা চিমটিও কেটেছে। অভিনেত্রীও সপাটে কষিয়েছে এক চড়। নাটকের মধ্যে ঢুকে গেছে জীবন, অভিনয় পন্ড হবার জোগাড়। ডাকা হয়েছে মোশনমাস্টার কিনুকে। কিন্তু একদিকে শিষ্য বদ্যিনাথ আর অন্যদিকে শ্যালিকা – নিরপেক্ষ বিচার কিনু করে কি করে! তাই বিচারের ভার সে দিয়েছে পুতনার রাজাকে। শেষ দৃশ্যের রাজসভাকে নিয়ে এসেছে সামনে। সেই ভোররাতে 'পাট' বলে রাজা নিশ্চিন্তেই ছিলেন, হঠাৎ ডাকাডাকিতে হেঁচকি তুলতে তুলতে এসে উপস্থিত হলেন। তার ওপর বিচারের ভার দিয়ে অন্য সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে কিনু গেছে পর্দার পেছনে। জীবন আবার ঢুকে গেছে নাটকের মধ্যে।

উজির যা করেছে তা অন্য কেউ করলে চোদ্দ ঘা চাবুকের শাস্তি হত, কিন্তু পুতনা রাজ্যে রাজা আর উজির পরম মিত্র, উভয়ে উভয়ের গোপন কথা জানেন – সুতরাং রাজা কিছুতেই উজিরকে শাস্তি দিতে পারেন না। বকেয়া কুড়ি হাজার মামলার সুরাহা হবার পর উজিরের মামলা ধরা হবে বলে তিনি উজিরকে সময় পাইয়ে দেন। এমনকি, তিনিই পরামর্শ দেন সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করে প্রমাণ করে দিতে যে, যা ঘটেছে তা করেছে অন্য কোনো লোক, উজির নন। শুরু হ'ল খোঁজ, কে নেবে উজিরের অপরাধের দায়, কে পুতনা রাজ্যকে রক্ষা করবে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা থেকে। আছে সাংসারিক বোধশূন্য, স্ত্রীগতবুদ্ধি বোকা ঘন্টাকর্ণ। কোনো কাজই সে পারে না, পেয়েছিল এক উলু দেবার চাকরি কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তার গলায় উলুধ্বনি আর জাগছে না। সেই সময়ই উজির সাহেব এসেছেন টাকার থলি নিয়ে। তার অপরাধের দায় নিতে হবে ঘন্টাকর্ণকে। দরদস্তুর হয়েছে ঘন্টার বৌ-এর সঙ্গেই। চার থলি টাকার বিনিময়ে ঘন্টা গেছে উজিরের অপরাধ স্বীকার করে সাজা নিতে। নতুন চাকরি তার, তর যেন আর সয় না। যখন ফিরেছে তখন সে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত – হাতে টাকার থলি। বোকা মানুষের কাছে এই চাকরি খুব সোজা – মাথা খাটতে হয় না, শুধু পিঠ পেতে দিতে হয়। ঘন্টার আবদারে বৌ এই চাকরির একটা নামও দিয়েছে – 'সাজাখেগো অফিসার'।

ঘন্টাকর্ণের মহা আহ্লাদ, পুতনা রাজ্যেও আইন-শৃঙ্খলার কোনো সমস্যা নেই। প্রতিদিন সকালে পেট ভরে ভাত খেয়ে জামার নিচে তুলোর জামা পরে, গালে পান দিয়ে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায় ঘন্টাকর্ণ। চোর, ডাকাত, দাগী আসামীরা এসে ঘন্টার বৌ-এর সঙ্গে দরদস্তুর করে ঘন্টাকে ভাড়া নিয়ে যায়। সকলের অপরাধ মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়ে সাজা ভোগ করে ঘন্টা। যেভাবে নিজের দেহে মানুষের পাপ ধারণ করে গণিকা উদাসিনী, সেভাবেই ঘন্টা নিজের দেহে ধারণ করে অসংখ্য অপরাধের বোঝা। তার জীবনের প্রথম উপার্জন এক দুষ্ট লোক আত্মসাৎ করেছিল উদাসিনীর নাম করে। সেই থেকে কেন যেন এই বোকা লোকটির প্রতি উদাসিনীর সহানুভূতি। ঘন্টা বেঁচে থাকলে যার সবচেয়ে বেশি অসুবিধে সেই লাটসাহেব উদাসিনীকে দায়িত্ব দিয়েছে ঘন্টাকে হত্যা করার। কিন্তু উদাসিনী পারে না ঘন্টাকে হত্যা করতে, এসে উপস্থিত হয় পুতনার রাজা। ঘন্টাকে বাঁচিয়ে রাখা যে তার নিতান্ত প্রয়োজন। দেড় হাজার মামলা সাত দিনে নিষ্পত্তি করার চরম সময়সীমা দিয়েছেন লাটসাহেব। সেইসব মামলার ভার চাপানো হয়েছে ঘন্টাকর্ণের ওপর। ঘন্টা অপরাধ স্বীকার করে যাচ্ছে, আর তার ওপর সাজা চাপানো হচ্ছে। এদিকে জগন্নাথের স্বপ্নাদ্য ছাগল মেরে ফেলার

অপরাধে রাজা নিজেই অভিযুক্ত। লাটসাহেব বিচার করে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এখন তো ঘন্টাকে আরো বেশি প্রয়োজন।

মরতে ঘন্টাকে হবেই – হয় লাটসাহেবের হাতে, নয় রাজার হাতে। লাটসাহেব তাকে মেরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজার প্রধান সহায়কে সরিয়ে দিতে চান, আর রাজা নিজের অপরাধের দায়ে তাকে ফাঁসিতে চড়াতে চান। 'সাজাখেগো অফিসার' ঘন্টাকর্ণের সামনে চাকরিতে চরম উন্নতির সুযোগ। এতদিন সে ছোটখাট সাজা ভোগ করেছে, এবার একেবারে চরম শাস্তি – ফাঁসি। এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেবার ভার ঘন্টার বৌ-এর। যে বৌ-এর ঘর মণিমাণিক্যে ভরে যাবে বলে ঘন্টা ফাঁসিকাঠে মরতে রাজি হ'ল, সেই বৌ-কে লোভ দেখিয়ে বশ করেছেন রাজা। পৃথিবীর উঁচু লোকেদের দাবি নিয়ে গেছে নারীকেও। ঘন্টার বৌ এখন মহারাণী। আর সহ্য করতে পারে নি ঘন্টাকর্ণ। কোনো পাপ না করেও সে পাপী। তাই আজ সবচেয়ে বড় পাপ করে সব পাপকে সে হার মানাতে চেয়েছে। উদাসিনীর হাত থেকে ছুরি ছিনিয়ে নিয়ে বলেছে ''আয়রে রাজা আয়রে উজির আয়রে লাটসাহেব ... তোদের বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিই এ জীবনের যত ঘেন্না ... আয় আয় আয় ...''[৪২] কিন্তু ঘন্টার প্রতিশোধ গ্রহণ আর হয়ে ওঠে না। অন্য অনেক দিনের মতো এদিনের অভিনয়ও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাটকে ব্যবহারের জন্য যে ছাগল আনা হয়েছিল এবং নাটকের শেষে 'ফিস্টি'র জন্য যাকে নাটকের মধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছিল সেই ছাগল ছিল দারোগাবাবুর। তাই কিনুর আসরে পুলিশ ঢোকে। বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে আসর লন্ডভন্ড করে দেয়। নির্জন শূন্য প্রান্তরে ভেঙেচুরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে কিনু কাওরার সঙের আসর। 'বিধ্বস্ত নৌকার ছেঁড়া পালের মতো' চাঁদের আলোয় ভেসে যেতে থাকে ছেঁড়া পর্দা – কিনুর আসরের পৃষ্ঠপট।

১৯৮৩ সালে লেখা 'কিনু কাহারের থিয়েটার' নামক প্রবন্ধের মধ্যেই আছে এই নাটকের বীজ। মনোজ মিত্রের ছোটোবেলায় নিজের চোখে দেখা কিনু মাস্টারের থিয়েটার ছিল একালের 'ওয়ান-ওয়াল থিয়েটার'-এর সমধর্মী, চিরন্তন থিয়েটারের মতোই প্রতিবাদী। জীবন আর থিয়েটার কিনুর আসরে একাকার ঃ ''নাটক না জীবন, বিলিফ না মেক-বিলিফ, রিয়েল না মাইমেসিস, মায়া না মতিভ্রম – সব গুলিয়ে দিয়ে কিনু কাহার হামেশাই আশ্চর্য এক ভুলভুলাইয়া সৃষ্টি করত।''[৪৩] কিনুর থিয়েটারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বক্রোক্তি ছিল, কিন্তু বোঝা যেত না যে, সে বুঝে খোঁচা দিচ্ছে না বোকামি করে কোনো কথা বলে ফেলছে। কিনুর এই ভঙ্গিটিই মনোজ মিত্র গ্রহণ করেছেন তাঁর নাটকে। বোকা ঘন্টাকর্ণ মাঝে মাঝেই এমন কথা বলেছে, যা শুনে বোঝা কঠিন, সে ভেবে বলে না হঠাৎ বলে ফেলে। নিজেকে তার মনে হয়, মন্দিরের সেই ডালিম গাছটার মতো, যার গায়ে মানুষ মানত করে অজস্র ইট-পাথর ঝুলিয়ে দিয়েছে। মানুষের পাপের মানত ঝুলছে ঘন্টাকর্ণর সর্বাঙ্গে। সে পাপের ভারে নড়তে-চড়তে পারে না। আকস্মিকভাবেই ঘন্টা বলে ফেলে চরম সত্য – প্রতিটি মানুষই আসলে কোনো না কোনোভাবে ব্যবহৃত। তার মুখেই উচ্চারিত হয় ঃ ''পশুতে তো চেষ্টা করেও মানুষের পাপ ধারণ করতে পারে না ... মানুষ ছাড়া মানুষের গতি নাইরে ... পুণ্যেও নাই পাপেও নাই।''[৪৪] আধুনিক নাটকে যেখানে দর্শককে নাটকের অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখা যায়, তখন কোনো চেষ্টা ছাড়াই বোকা ঘন্টাকর্ণ পাঠক-দর্শকের সহানুভূতি পেয়ে যায়। চাকরিতে যাবার জন্য উৎসুক ঘন্টা।

পৃথিবীতে সেও যে কিছু কাজ করতে পারে, তা প্রমাণ করার জন্য ঘন্টার মরিয়া চেষ্টায় জাগে বিষণ্ণ কৌতুক। 'দুহাতে অন্ধকার ঠেলে'রক্তাক্ত শরীরে ঘন্টাকর্ণ যখন টাকার থলি হাতে 'চাকরি' থেকে ফেরে তখন জেগে ওঠে নিজেদের ব্যবহৃত হবার যন্ত্রণা। দরজা ধরে রাস্তামুখো হয়ে দাঁড়ানো ঘন্টাকর্ণ যেন হয়ে ওঠে মানুষের ব্যবহৃত সত্তার প্রতীক। সংসারে সকলেই যেন দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেরের আশায়। চাকরিতে যেন নেশা ধরে গেছে ঘন্টার। খদ্দের আসতে দেরি হলে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বউকে অনুযোগ করে ঃ ''তোর বড্ড খাঁই! একটা পয়সা কমাতে চাস না! সেই কখন থেকে সেজেগুজে রেডি হয়ে রয়েছি! ... আজ আমারে একটু কম দামে ছাড়বি ...''[৪৫] ইঁদুরে কাটা দেড় হাজার মামলা রাজা চাপাতে চান 'সাজাখেগো অফিসার' ঘন্টার ওপর। চাকরিতে এই উন্নতি দেখে ঘন্টা মহা উল্লসিত কিন্তু তার উল্লাসে পাঠক-দর্শকের চোখের কোণে ঘনিয়ে ওঠে অশ্রুবিন্দু ঃ ''বৌ, একসঙ্গে দেড় হাজার মামলার আসামি আমি! আমি দেড়হাজারি সাজাখেগো অফিসার। উঃ কার মুখ দেখে দরজা ধরেছিলুম রে! চলেন মহারাজ ...''[৪৬] এই হিউমারই মনোজের প্রধান অবলম্বন। এই হিউমার প্রয়োগই সার্থক হয়ে ওঠে ফাঁসি যাওয়া নিয়ে বৌ-এর যুক্তি এবং বিরুদ্ধ যুক্তির মাঝে হাঁফিয়ে ওঠা ঘন্টার সংলাপে ঃ

> ''আর বুঝতে পারিনে। ওগো তুমি মোরে একটা সিদ্ধান্ত দাও ! ... একবার ফাঁসিকাঠে চড়ে মরো, একবার নেমে বাঁচো ... বাঁচা মরার মধ্যে আমি যে আর বাঁদরের মতো ওঠানামা করতে পারিনে গো। কোন্‌টা করবো বলো ... একটা বলো ...''[৪৭]

কিনুর এই থিয়েটারে রাজা-উজির আছে, সাধু আছে, গণিকা আছে, স্বপ্নে পাওয়া ছাগল আছে। এদের সকলকে নিয়ে মনোজ মিত্র গেঁথেছেন চিরন্তন শোষণ ও স্বার্থপরতার কাহিনি। গেঁথেছেন ঠিক সেইভাবে, যেভাবে ইংরেজ শাসনের শেষদিকে গাঁ-ঘরে তিনি শুয়োর চরানো কিনু কাহারকে 'থিয়েটার'করতে দেখেছিলেন। নাটকের মধ্যে নাটক নির্মাণের কৌশলটি তিনি চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। বৈদ্যনাথ, পঞ্চা, নজরুল প্রভৃতি যাদের নিয়ে কিনুর থিয়েটারের দল তাদের কেউ ছিঁচকে চোর কেউ বা হতদরিদ্র। কিনুর থিয়েটারে তারাই রাজা-উজির-লাটসাহেব। এই থিয়েটার নিতান্ত অশিক্ষিতের দীন-দরিদ্র থিয়েটার। সিংহাসন এখানে রংচটা টিনের বাক্স, চামড়ার বেল্টের কাজ এখানে চলে পাটের দড়িতে। অর্থ সংগ্রহের জন্য থিয়েটারের মধ্যেই লখিন্দরের চিকিৎসা বা কামছাগলের দুধের বিনিময়ে 'কালিকশান' করতে হয়। কিন্তু মনোজ মিত্র দেখাতে চান, যতই দীন হোক না কেন – প্রতিবাদী বক্তব্যে এই থিয়েটারও পিছিয়ে ছিল না। এই থিয়েটারও দেখিয়েছে শক্তিশালীর সঙ্গে দুর্বলের সেই চিরন্তন লড়াই, যে লড়াই উদাসিনীর ষাঁড়ের সঙ্গে ঘন্টাকর্ণের লড়াই এর মতো, ঘন্টাকর্ণ যেখানে 'যুঝতে ও পারে না – পালাতেও পারে না'। থিয়েটারের সমস্যা, লোকশিক্ষায় থিয়েটারের ভূমিকা ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয় এসেছে এই নাটকে, এসেছে মূল কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। নাটকে কুসংস্কারে বিশ্বাস দেখাতে নেই, আবার স্বপ্নাদ্য ছাগলের কথা বলে 'কালিকশান' না করলেও পেট চলে না। এই উভয়সঙ্কটের সমাধানে এগিয়ে আসে কিনু কাহার ঃ ''তবে আমি দিলে দোষ নাই। আমি তো ঘন্টাকর্ণ! পরের পাপ নিজ অঙ্গে বহন করি! গুরুদেবের এই পাপটা আমি বহন করলাম।''[৪৮] মুহূর্তে বাস্তবের কিনু ঢুকে যায় নাটকের ঘন্টাকর্ণের মধ্যে। জীবন আর নাটক মিলেমিশে যায়। থিয়েটারের ছেলেদের 'ফিস্টি'র প্রয়োজনে নাটকের মধ্যেই ছাগল মেরে ফেলা হয়, সেই ছাগল মারার অপরাধেই পুতনার রাজার ফাঁসির আদেশ হয়। কোরাস বা জুড়ির দলের মতো বাজনদারেরা কিনুর থিয়েটারে

কখনো সভাসদ, কখনো কিনুর প্রতিবেশী, কখনো বা ডাকাত। আধুনিক কালের ব্রেখ্‌ট-অনুসারী নাটকের মতোই এরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্ররূপে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। বাংলা থিয়েটারে যখন বিদেশী নাট্যকলার প্রতিধ্বনি তোলাটাই অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন একান্তভাবেই দেশজ নাট্যকার মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, এই নাট্যকলা আমাদের দেশের মাটিতেই ছিল অনেক আগে থেকে। তাঁর আক্ষেপ ঃ

> ''অতিরিক্ত বিদেশমুখিনতায় একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ আমরা অবহেলা করেছি। দেশের মাটিতে ছড়িয়ে থাকা দেশজ নাট্যকলার পুনরুদ্ধার সাধন করিনি, তার বিবর্ধনে সচেষ্ট হই নি। তার মৌলশিক্ষা গ্রহণ করে তাকে আমাদের নবনাট্যের বার্তাবহ করে তুলিনি।''[৪৯]

এই আক্ষেপ থেকেই তিনি দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। অশিক্ষিত দরিদ্র নিম্নবর্ণের জীর্ণ মলিন থিয়েটারকে ধুলো ঝেড়ে উপস্থিত করেছেন পাঠক-দর্শকের দরবারে। কিনু কাওরার সঙের tone এবং tune অক্ষুণ্ণ রেখেছেন মনোজ। অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতার ওপর কোনোরকম মার্জনার প্রলেপ দেন নি। বেশ কিছু গান ব্যবহার করে এই ধরণের দেশজ নাট্যাঙ্গিকের আবহটি রক্ষা করেছেন। ঐতিহ্যের মধ্যে মনোজ সন্ধান করেছেন চিরন্তন সত্য – থিয়েটারের প্রতিবাদী রূপ। যুগে যুগে থিয়েটার যে মানুষের ভণ্ডামির মুখোশ ছিঁড়েছে, সীমিত ক্ষমতা নিয়েও রুখে দাঁড়িয়েছে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বারবার আক্রান্ত হয়েও যে বিচ্যুত হয়নি নিজের আদর্শ থেকে, তা-ই এই নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র।

থিয়েটারের এই প্রতিবাদী সত্তার পাশাপাশি ব্যবস্থার কাছে অসহায় এবং ব্যবহৃত মানুষের যন্ত্রণা ফুটিয়েছেন তিনি ঘন্টাকর্ণ চরিত্রের মাধ্যমে। ঘন্টার মতো চরিত্ররা সব যুগে সব সমাজেই থাকে, যারা অন্যের পাপ নিজের দেহে ধারণ করে, যাদের বুদ্ধিহীনতার সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ অবলীলায় অপরাধ করে চলে। উদাসিনী আর ঘন্টাকর্ণকে পাশাপাশি স্থাপন করে ব্যবহৃত হবার গল্প গেঁথে তুলেছেন। দরজা ধরে রাস্তামুখো হয়ে দাঁড়ানো ঘন্টাকর্ণের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের identity করি। ঘন্টাকর্ণের মতোই আমরা সামাজিক ষাঁড়েদের আক্রমণে দিশেহারা – যুঝতেও পারি না, পালাতেও পারি না – শুধু পড়ে পড়ে মার খাই। কিন্তু মার খেতে খেতে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন ব্যবহৃত মানুষই রুখে দাঁড়ায়। যেমন দাঁড়িয়েছে ঘন্টাকর্ণ। রাজা-উজির-লাটসাহেবের বুকের রক্তে নিজের ধিক্কৃত জীবনের সব পাপ-ঘৃণা ধুয়ে দিতে চেয়েছে। আকস্মিকভাবে ঘন্টাকর্ণের এই রুখে দাঁড়ানো আরোপিত মনে হতে পারে কিন্তু এই নাটককে বিচার করতে হবে কিনু কাওরার সঙের মাপে, আধুনিক নাগরিক থিয়েটারের সূক্ষ্মতা আশা করা যেখানে সঙ্গত নয়। এখানেও গ্রামীণ স্থূলতাকেই রক্ষা করেছেন মনোজ মিত্র, কিন্তু সেজন্য বক্তব্য তরল হয়ে যায়নি। ঘন্টাকর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু কিনু তার থিয়েটারকে ব্যবহৃত হতে দেয় নি। এর ফলে তার আসর ধ্বস্ত হয়ে গেছে, কোনোদিন সম্পূর্ণ অভিনয় করার সুযোগ সে পায়নি। ব্যবহৃত হবার গল্প বলে কিনুর থিয়েটার আসলে ব্যবহৃত না হবার কথা বলতে চায়। এই প্রতিবাদের সূত্রেই কিনু কাওরার সঙ হয়ে ওঠে আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সহযোদ্ধা।

ঘন্টাকর্ণ ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে, আর 'আত্মগোপন' নাটকে অর্পণ-স্বপ্নময়রা স্বেচ্ছায় ব্যবহৃত হয়েছে। সামাজিক যে মূল্যবোধের অবক্ষয় মনোজ মিত্রকে ব্যথাতুর করেছে, 'আত্মগোপন'(১৯৯৪) নাটকে সেই অবক্ষয়কেই দেখেছেন ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে। ফুটবল মাঠের নোংরামির পাঁকে জড়িয়ে গিয়ে কিভাবে নষ্ট হচ্ছে প্রতিভা, নিজেদের দর বাড়াতে গিয়ে কিভাবে বেশ্যার মতো হাপ্‌সে মরছে ফুটবলাররা, স্বজনের আত্মত্যাগ বিস্মৃত হয়ে কিভাবে আত্মকেন্দ্রিকতার আবর্তে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে, নিজের দর বুঝতে না পেরে অপেক্ষা করতে করতে কিভাবে শেয়ার বাজারের মতো মুখ থুবড়ে পড়ছে – এসব কিছু নিয়েই এখানে নাটক গেঁথে তুলেছেন। দেখিয়েছেন, সংসার আসলে এক বিরাট বাজার। এখানে প্রত্যেকেই নিজের দর যাচাই করছে, সুযোগ বুঝে দর বাড়িয়ে নিচ্ছে। যারা সুযোগ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে তারা হারিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যেই উঠে এসেছে বাজার, একে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু এই বাজারসর্বস্বতার মধ্যেও তিনি খুঁজে পান এমন কিছু শুভানুধ্যায়ীর হাত, যা পঙ্কিল আবর্তে তলিয়ে যেতে থাকা মানুষকে টেনে তোলে আত্মপ্রত্যয়ের একখন্ড দৃঢ় ভূমিতে ।

ময়দানের চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল আগমনী এবং দিগ্বিজয়ীর ফুটবল ম্যাচের একটি টেলিবর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটক শুরু হয় আগমনীর দুর্দান্ত স্ট্রাইকার অর্পণ ওরফে অপার ড্রয়িংরুম থেকে। খেলা দেখছে অপার স্ত্রী পাঞ্চালী এবং কাজের লোক যমুনা। অর্পণ কিন্তু আজ খুবই খারাপ খেলছে, সামনে শূন্য গোল পেয়েও গোল করতে পারছে না। আগমনীর সমর্থকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। নিশ্চিত জেতা ম্যাচ আগমনী হেরেছে ৩-০ ব্যবধানে। পাঞ্চালী কাজের মাসিকে সাবধান করেছে, একরাশ মন খারাপ নিয়ে ফিরবে অর্পণ। অর্পণ বাড়িতে এসেছে, কিন্তু মনখারাপ নিয়ে নয়, ববং প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের দুই কর্মকর্তা তুষার সেন আর লাড্ডু ঘোষের সঙ্গে হাসতে হাসতে। পাঞ্চালীকে বিস্মিত এবং আহত করেছে এই সংবাদ — অর্পণ ঘুষ খেয়ে ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছে দিগ্বিজয়ীকে এবং আসন্ন দলবদলে সে আগমনীর দ্বিগুণ টাকায় দিগ্বিজয়ীতে সই করতে চলেছে। দিগ্বিজয়ীর কর্তারা পাঞ্চালীকে তুষ্ট করতে পাঁচ হাজার টাকা দামের কাঁথা স্টিচের একটি শাড়িও এনেছে। কিন্তু পাঞ্চালী তো স্বপ্নময়ের স্ত্রী নমিতা নয়, সে অন্য ধাতুতে গড়া। সে জানে, অর্থের লোভে প্রতিভা কিভাবে অপচিত হয়। তাই অর্পণকে সে আগলে রাখতে চায় মাঠের নোংরামি থেকে, পাঠাতে চায় জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরে। অর্পণকে ঘিরে যে অনেক স্বপ্ন তার।

নাট্যকাহিনি এগিয়ে চলার মধ্য দিয়েই উঠে আসে অনেকগুলি তথ্য। পাঞ্চালী প্রথমে বিয়ে করেছিল রাজর্ষিকে, যার মধ্যে একজন বড় চিত্রপরিচালক হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে ভেবেছিল, তার একের পর এক ছবি ফ্লপ করলেও বড়লোক বাবার মেয়ে পাঞ্চালী নতুন ছবি তৈরির অর্থ যোগান দিয়ে যাবে। এই নিশ্চিন্ততাই তার সর্বনাশ করেছে। লড়াই, জিদ সব শিথিল হয়ে পড়েছে। ক্রমে সে সেক্স-ভায়োলেন্সের রগরগে ছবির জগতে নেমে গেছে। রাজর্ষির গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছে পাঞ্চালী ডিভোর্সের মাধ্যমে, তবে সন্তান বুবাইকে ছাড়তে হয়েছে সেজন্য। রাজর্ষির সঙ্গে যখন মামলা চলছে ডিভোর্সের, তখনই একদিন পাঞ্চালীর নজরে পড়ে খোলা মাঠের প্লেয়ার অর্পণ। এক নজরেই সে চিনেছে অর্পণের ভেতরের আগুনকে। নিজের গাড়িতে তুলে নিয়েছে প্রথম দিন আর তারপর নিজের

জীবনেও। বয়সে প্রায় সাত-আট বছরের ছোট অর্পণকে সে বিয়ে করেছে। নিজে চাকরি করে, সংসারের সব ঝামেলা মাথায় নিয়ে অর্পণকে সে এগিয়ে দিতে চেয়েছে খেলার জগতে। বেহালার একান্নবর্তী পরিবার থেকে তুলে নিয়ে এসেছে ভি.আই.পি. রোডের ওপর ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলায়। বেহালার বাড়িতেও বেশি যেতে দেয় না তাকে। দারিদ্র্য এবং দাদার অসুস্থতা দেখে ডিপ্রেশনে ভোগে অর্পণ, এর ছাপ পড়ে তার খেলায়। গভীর রাতে ফাঁকা রাস্তায় খুন হতে দেখে গুন্ডাদের শায়েস্তা করতে গিয়েছিল অর্পণের সাহসী দাদা। সাতদিন পর ওকে একটা ভাঙাবাড়ির ঘুপচি ঘর থেকে উদ্ধার করে এনেছিল পুলিশ। সেই আতঙ্ক থেকেই মানুষটা অস্বাভাবিক। কখনও গলা খুলে কথা বলে না, শ্রোতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে। এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-প্রতিকূলতা থেকে আড়াল করে অর্পণকে ফুটবল-সাধনায় মগ্ন দেখতে চেয়েছিল পাঞ্চালী। কিন্তু সে আশা তার সফল হয় নি। দুনিয়াজোড়া গড়াপেটার খেলায় জড়িয়ে পড়েছে অর্পণও। পাঞ্চালীর অভিভাবকত্ব এখন তার কাছে অসহ্য। পাঞ্চালীর জন্যই নিজের উপযুক্ত দাম আদায় করতে পারছে না — এমনি তার ধারণা। সেই ম্যাচ হারার রাতেই তাই স্বপ্নময়কে এগিয়ে দিতে গিয়ে স্বপ্নময়ের ট্যাক্সিতে সে চড়ে বসে — গিয়ে ওঠে এক গোপন ডেরায়। পাঞ্চালীকে ফোন করে জানায়, কোন ক্লাবকেই চূড়ান্ত কথা না দিয়ে কৌশলে যেন সে অর্পণের দর বাড়াতে থাকে, যেভাবে স্বপ্নময়ের দর বাড়াচ্ছে তার স্ত্রী নমিতা।

বিশাল এক অট্টালিকার ছাদের কুঠুরিতে এরপর দেখা যায় অর্পণ আর স্বপ্নময়কে। এই বাড়ির প্রতিটি খোপে খাপে চলে পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা। সন্ধ্যার পর এই বাড়িতেই যেন উঠে আসে বাজার। এখানেই লুকিয়ে থেকে নিজেদের দর বাড়াতে চায় অর্পণ-স্বপ্নময়, ঠিক যেভাবে এই বাড়িতে লুকিয়ে থেকে শেয়ারের দর বাড়ার জন্য অপেক্ষা করেন বিভূতিবাবু। কিন্তু কতক্ষণ অপেক্ষা করবে মানুষ? নিজের কোন্ দামকে চূড়ান্ত বলে বুঝবে? নির্দিষ্ট সেই মুহূর্তটি ধরতে পারাতেই মানুষের লাভ, সেই মুহূর্তটি ফসকে গেলেই দাম পড়তে শুরু করবে। বাজারের হাওয়া চিনতে পারা, বুঝতে পারাটাই আসল কথা। স্বপ্নময়ের স্ত্রী নমিতা এই বাজার ধরার খেলায় স্বামীর সহযোগী আর অর্পণের স্ত্রী পাঞ্চালী স্বামীকে এই বাজারের নোংরামি থেকে মুক্ত রাখতে মরিয়া। তাই নমিতা যখন বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তাদের কাছে স্বপ্নময়ের দর বাড়িয়ে চলেছে তখন পাঞ্চালী মিথ্যে করে কাগজে জানিয়ে দিয়েছে, অর্পণের পায়ে চোট আছে। কৃষ্ণ মল্লিক এবং লাড্ডু ঘোষ যত টাকা করে অ্যাডভান্স দিয়েছিল, তার দ্বিগুণ টাকার রসিদ লিখে দিয়েছে পাঞ্চালী। সে এই শয়তানি, এই জোচ্চুরি সহ্য করতে পারে না। একবার রাজর্ষির ব্যাপারে সে ঠকেছে, আর ঠকতে চায় না ঃ ''যারা এতটুকু শয়তান, তাদের আমি এতোবড় করে দেখাবো। দেখি তোরা কি করে দাঁড়াস বাজারে ! এসব রাজর্ষিদের আমি ছাড়ব না।''[৫০] বাজারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে এ যেন পাঞ্চালীর জীবনপণ লড়াই। এই লড়াই বাজারে দর নামিয়ে দেয় অর্পণের। এদিকে বিভূতিবাবুও নির্দিষ্ট মুহূর্তটি চিনতে ব্যর্থ হন। দাম বাড়ার আশায় থাকতে থাকতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তার শেয়ারগুলি বাতিল হয়ে যায়। ছোটো মেয়ের বিয়ের বকেয়া পাওনাগন্ডা এই শেয়ার বিক্রি করেই করবেন বলে ভেবেছিলেন। সেই আশায় শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেও মেয়েটি বেঁচে ছিল। কিন্তু শেয়ার বাতিল হতে সেই মেয়ে আত্মহত্যা করে, অথবা শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই তাকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারে। টুনির গণিকালয়ে বসে এ সংবাদ পান বিভূতি আর পাঁচতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। শেয়ারের পড়ে যাওয়া মূল্য

চোকান নিজের জীবন দিয়ে। মাঠে দাম না পেয়ে হতাশ, ভাঙাচোরা অর্পণও হয়তো বেছে নিত এই পথ, বিশেষত বিভূতির মৃত্যু যখন তার মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, কিন্তু মনোজ মিত্র মানুষকে হেরে যেতে দেন না, সবসময়ই আর একটা সুযোগ দেবার পক্ষপাতী তিনি। তাই দাদা, মেজদা, পাঞ্চালী – সবাই পৌঁছে যায় সেই গণিকালয়ে – আগলে দাঁড়ায় অর্পণকে। রূপোর বলপরী দাদা এগিয়ে ধরে অর্পণের দিকে আর সকলের হয়ে পাঞ্চালী উচ্চারণ করে ঃ

> "না, কিছু হয়নি তোমার। তুমি আবার খেলবে। আমরা তো আছি। আমি, মেজদা, তোমার দাদা। সবাই মিলে তোমায় দাঁড় করাব। যা চাও তুমি সব হবে অপা। গোধূলিবেলায় যে ছেলেটাকে জল কাদার মাঠে দাপিয়ে বেড়াতে দেখেছিলাম, তাকে আমি হারিয়ে যেতে দেব না। কিছুতেই না।"[৫১]

মনোজ মিত্র নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেন নিজের চারপাশের জীবন থেকে। সে জীবনে যখন দেখেন মনুষ্যত্বের অবমাননা, মূল্যবোধের অবক্ষয় - তখন দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবেই সেদিকে আঙুল তোলেন তিনি। এই নাটকে সেই অবক্ষয়কে তিনি দেখেছেন ফুটবল মাঠের নোংরামির প্রেক্ষাপটে, ফুটিয়ে তুলেছেন বাজার সর্বস্ব যুগের মূলমন্ত্র ঃ "দুনিয়াজোড়া গড়াপেটার খেলা চলছে, ... খেলাটা যেমন খেলা, না-খেলাটাও খেলা ... অল্ ইন দ্যা গেম্।"[৫২] খেলার মাঠের নোংরা রাজনীতি, ব্যর্থ রাজনীতিক এবং ব্যর্থ প্লেয়ারদের মাঠে জাঁকিয়ে বসা, গদি বাঁচাতে খেলোয়াড়দের পাঁকে নামানো, দর বাড়াবার লোভে খেলোয়াড়ের নৈতিক অধঃপতন – প্রভৃতি সবকিছুকেই মনোজ মিত্র আক্রমণ করেছেন এই নাটকে। দিগ্বিজয়ী, আগমনী এবং ইস্পাহানির কর্মকর্তাদের মধ্যে অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া কোলকাতার তিন প্রধান ফুটবল দলের কর্মকর্তাদের। কর্মকর্তারা গুম করে দেবে আশঙ্কায় খেলোয়াড়রাই গুম হয়ে গিয়ে নিজেদের দর বাড়িয়ে নিতে চেয়েছে। গণিকালয়ে তাদের আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি নাটকে দ্বিমাত্রিক ব্যঞ্জনা পেয়েছে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেশ্যার যে কোনো পার্থক্য নেই, তাই দেখাতে চেয়েছেন তিনি। বেশ্যার মতোই নিজের অঙ্গ বিক্রি করে এই খেলোয়াড়রা কোনো নীতি-নৈতিকতার দিকে না তাকিয়ে। বেশ্যার পক্ষে তবু যুক্তি আছে যে, দেহ ছাড়া তাদের কিছুই নেই। কিন্তু যারা জীবনে অনেক কিছু পেয়েছে তারা যখন দাম না পাবার জন্য আফশোষ করে তখন নাট্যকারের চরিত্র তাদের তিরস্কার করে ঃ "দাম দর নিয়ে দিবারাত্তির হাপসে মরছ কেন বাপু? হাপসায় আমার মেয়েরা। যাদের কিচ্ছু নেই, তারাই বাজারে বিকোবে বলে হাপসে মরে। জীবনে এতো পেয়েছ, তবু হাপসানি থামে না তোমাদের !"[৫৩] আবার অর্পণের মেজদার মুখে এই বিষয়টির আরেক মাত্রা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ঃ "আত্মীয় স্বজন কারো সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই – বাড়ি থেকে পালিয়ে সে আর কোথায় গিয়ে উঠবে ? অসামাজিক পতিত অঞ্চলই খুঁজবে। সমাজের সঙ্গে যোগ না থাকলে সেটাই তো স্বাভাবিক!"[৫৪] এই সূত্রেই মনোজ মিত্র আঘাত করেন আধুনিক কালের প্রতিভার আত্মকেন্দ্রিকতাকে। ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে দারিদ্র্য আজও প্রধান সমস্যা , তখন বিপুল অর্থমূল্যে খেলার মাঠের প্রতিভা-পুজো সমকালীনতা পেয়ে যায় মেজদা ফটিকের সংলাপে ঃ

> "ট্যালেন্ট – প্রতিভা – জিনিসটা কি সৃষ্টিছাড়া কিছু? তার কোনো সামাজিক দায় কিংবা বন্ধন থাকবে না? সবকিছুকে অস্বীকার করে কেবল প্রতিভা-পুজোর ফল কিন্তু এই হয় পাঞ্চালী। প্রতিভাবানরা তখন নিজেদের ভাবে অলৌকিক! ... কেবল পেতেই চায়, কেবল নিজের বিক্রয়যোগ্যতা দেখে বেড়ায়! কোন্ দেশে জন্ম তার – তার পাশের মানুষটা কী কাজ করে কতো পাচ্ছে, কী খাচ্ছে কিচ্ছু তার মাথায় থাকে না!"[৫৫]

চরিত্র সৃজনে বহুমাত্রিকতা এই নাটকেও বর্তমান। অর্পণ-পাঞ্চালীর মতো প্রধান চরিত্রগুলি তো বটেই, স্বপ্নময়, মেজদা ফটিক, অপ্রকৃতিস্থ দাদা, বিভূতি, টুনি, এমনকি থাকোহরি পর্যন্ত নাট্যকারের সযত্ন লালনে চরিত্রগুণে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ মল্লিক, তুষার সেন, লাড্ডু ঘোষ ময়দানি নোংরামির type চরিত্র। এই নোংরামির সঙ্গেই পাঞ্চালীর লড়াই। প্রতিভাকে সে লালন করতে চায় সব নোংরা থেকে বাঁচিয়ে, সব প্রতিকূলতা থেকে আগলে রেখে। একবার প্রতিভার অপমৃত্যু সে খুব কাছে থেকে দেখেছে বলে অর্পণের ক্ষেত্রে সে অনেক বেশি সতর্ক। কিন্তু একমুখী ভাবনার ফলে মাত্রাতিরিক্ত সতর্কতার কুফলের দিকটি সে খেয়াল করে নি। সব কিছু থেকে মুক্ত রাখতে গিয়ে অর্পণকে সে যেন করে তুলেছে আত্মকেন্দ্রিক সমাজ-বিচ্ছিন্ন এক জীব। নিজের পরিশ্রম, ভালোবাসা, মমতা দিয়েও অর্পণকে পণ্য হয়ে ওঠা থেকে বাঁচাতে পারে নি সে। বল হাতে যে পরী অর্পণকে উপহার দিয়েছিল পাঞ্চালী, সেই পরীর হাতের বলটি লোফালুফি করতে করতে স্বপ্নময়ের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া নাটকে প্রতীকী হয়ে উঠেছে। ঐ বলটি যেন অর্পণ, যে বেরিয়ে যাচ্ছে পাঞ্চালীর হাত থেকে, আর পাঞ্চালী রয়ে যাচ্ছে ঠুঁটো পরীটির মতো। মেজদা ফটিক যখন পাঞ্চালীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রতিভাকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন করার কুফল, তখন শিউরে উঠেছে পাঞ্চালী। নিজের কৃতকর্মের শোচনীয় ফল দেখে হতাশায় ভেঙে পড়েছে। একেবারে শেষে অর্পণকে ফিরিয়ে আনতে যখন গণিকালয়ে গেছে পাঞ্চালী, তখন আর সে একা নয় – দাদা এবং মেজদাও তার সঙ্গে আছে। অপ্রকৃতিস্থ দাদাই মেঝে থেকে বলটি কুড়িয়ে বসিয়ে দিয়েছে পরীর হাতে – এগিয়ে ধরেছে অর্পণের দিকে। যে দাদার জন্য ডিপ্রেশনে ভোগে অর্পণ, সেই দাদাই অর্পণকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে চায়। মানুষের এই যৌথভাবে ঘুরে দাঁড়ানোতেই জোর দেন মনোজ মিত্র, মানুষকে তিনি দেখতে চান পরস্পরের সহমর্মী হিসেবে। এই সহমর্মিতাই আমরা দেখি গণিকালয়ের মাসি টুনির মধ্যে, পাঞ্চালীর কাজের লোক যমুনার মধ্যে। যেখানে সম্পর্ক নিছকই আর্থিক, সেখানেও কোথা থেকে যেন সৃষ্টি হয় সহানুভূতি। দীর্ঘদিনের যাতায়াতের ফলে বিভূতি সে সম্পর্ক অস্বীকার করলে অভিমানও জাগে তার ঃ ''জানি জানি, টাকার টানে ভাবতে পারেন ... মানুষের টানে পারেন না! যাবেন যান, আর এমুখো আসবেন না!''[৫৬] মেয়ের মৃত্যুর খবর সে বিভূতিকে দেয়নি মমতাবশেই, বাইরের ঝামেলা থেকে বাঁচাতে পায়ে পড়েও তাকে এই বাড়িতে আটকাতে চেয়েছে। বিভূতি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার পর পুলিশের আতঙ্কে ঘর থেকে বিভূতির সব চিহ্ন সরাতে গিয়েও সে আবেগ অনুভব করেছে। একই সহানুভূতির প্রকাশ পাঞ্চালীর কাজের লোক যমুনার মধ্যে। যুক্তিবোধ এবং আবেগের সংযম দেখা গেছে মেজদা ফটিক চরিত্রে। কখনো কখনো মেজাজ হারালেও অপ্রকৃতিস্থ দাদা এবং তার সংসারের দায়িত্ব নিয়েছে ফটিক। খুব উচ্চাশা মধ্যবিত্ত ফটিকের নেই, নিশ্চিন্ততা তার অনেক বেশি কাম্য। সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকেই সে বলেছে ঃ ''খেলা আজ আছে কাল নেই। গেল বছর ভাল ফর্মে ছিল -এফ.সি.আই. বড় চাকরির অফার দিয়েছিল। বুঝতে পারছ, রাজি না হয়ে তোমরা কি ভুল করেছিলে..''[৫৭] আপাতদৃষ্টিতে ফটিকের কথাবার্তা একটু তির্যক ও কটাক্ষপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু বাক্‌ভঙ্গির এই বিশিষ্টতা তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যে 'ছাপোষা গেরস্ত' নিত্যদিনের সমস্যা নিয়ে জেরবার, সমাজ-সংসার-বিচ্ছিন্ন প্রতিভা-পুজো তার দৃষ্টিতে কীভাবে প্রতিভাত হতে পারে, তাই দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র ফটিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সামান্য অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র দাদার মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে যেমন মাস্তানির মতো দুষ্কর্মের সামাজিক অভিঘাতকে চিত্রিত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অর্পণের

চরিত্রটিকে ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছেন। দাদাকে দেখে অর্পণ ডিপ্রেশনে ভোগে, দাদার ঘর মেরামতের জন্য টাকা প্রয়োজন। দাদাকে সে সুস্থ দেখতে চায়। দাদা গুন্ডাদের সঙ্গে লড়াই করে অসুস্থ, আর অর্পণ গুন্ডাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভালো আছে। নিজের এই ভালো থাকার গ্লানি অর্পণকে কুরে কুরে খায় বলেই সে পেয়ে যায় পাঠকের সহানুভূতি। এক অসহায় আত্মগ্লানির মধ্যে ফেলে নাট্যকার দেখিয়ে দেন তার ভেতরের মানুষটিকে ঃ

> ''আজ আমি কতো চান্স পেয়েছিলাম - পা ছোঁয়ালে গোল! আমি কিচ্ছু করিনি, ইচ্ছে করে করিনি। ... ফুটবল মানুষ কদিন খেলে ? পাঁচ বছর ... দশ বছর ... পনেরো বছর। কত ছোট্ট সময়। তার মধ্যে একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল !''[৫৮]

অর্পণের ক্ষোভ, অসহায়তা গ্লানি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে স্বপ্নময়ের বিপরীতে। স্বপ্নময়ের সঙ্গী হয়েও অর্পণ মানসিকভাবে তার সঙ্গে মিশে যেতে পারে না, কোথায় যেন সে আলাদা থেকে যায়, সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারে না পাঞ্চালীকে। Type চরিত্রগুলির সাহায্যে খেলার মাঠের নোংরামি, মস্তানিকে ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র। জীবনে যারা কোনোদিন বলে পা লাগান নি, সেই সব রাজনীতিক আর এক সময়ের ব্যর্থ খেলোয়াড়রা মাঠের রাশ ধরেছেন বলে বাংলার ফুটবলের এই দুর্গতি। এরাই খেলোয়াড়দের টেনে নামায় নোংরামির পাঁকে, আর তারপর তাদের দোষারোপ করে। নিজেদের গদি রক্ষা করতে খেলোয়াড়দের সর্বনাশ করতে এদের বাধে না।

'আত্মগোপন' নাটকে খেলার মাঠের পটভূমির উপযোগী সাদামাঠা সংলাপ এবং সাধারণ পরিচিত কিছু চরিত্রের সাহায্যে নাট্যকাহিনি গেঁথেছেন। মূল্যবোধের যে অবক্ষয়ের প্রতিফলন এবং তার পুনর্স্থাপন তাঁর লক্ষ্য, এই নাটকেও সেই বিষয়ই উঠে এসেছে একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের চেহারাটা পাঠক-দর্শকের সামনে তুলে ধরে নষ্ট, ভ্রষ্ট হবার হাত থেকে তিনি মানুষকে বাঁচাতে চান মানুষেরই সাহায্যে। ধুলো ময়লা তো মানুষের গায়ে লাগবেই। মনোজ মিত্রের নাটকে দেখা যায়, সেই ধুলো মুছিয়ে মানুষকে শুদ্ধ করে তোলার প্রয়াস। আলোচ্য নাটকটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

'নাকছাবিটা'(২০০০) নাটকে তিনি ব্যবহার করেছেন স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী কালখণ্ডকে। স্বাধীনতা আন্দোলনে সহিংস পথ বেছে নিয়েছিলেন জমিদার বরদাপ্রসন্নের ঔরসে ঝি-এর গর্ভজাত সন্তান বীরেশ্বর। ধরা পড়ে জেল খেটেছেন বীরেশ্বর। স্বাধীনতার পর মুক্তি পেয়েছেন কিন্তু তখন তিনি পঙ্গু, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইংরেজের চোখে 'সন্ত্রাসবাদী' ছেলেকে প্রশ্রয় দিলে জমিদারি চলে যায়, তাই বরদাপ্রসন্ন বীরেশ্বরকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন। ঝি-এর ছেলেকে 'স্যাক্রিফাইস' করার বিনিময়ে পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' খেতাব। একমাত্র মেয়ে নুকু-র জন্ম দিয়েই বীরেশ্বরের স্ত্রী মারা গেছে। নুকুকে মানুষ করেছে তার ছোটমাসি চিত্রা, যে কিনা নুকুর চেয়ে মাত্র ন'বছরের বড়ো। জেল থেকে বেরোনোর পর বীরেশ্বরকে জোর করে বিয়ে করেছে চিত্রা, অবশ্য বীরেশ্বরেরও যে ইচ্ছে ছিল তা পরে জানা গেছে। নুকু অবশ্য মনে করে নিজের স্বভাব অনুযায়ী এক্ষেত্রেও স্টান্ট দিতে গিয়ে ফেঁসে গেছে ছোটমাসি। নুকুর মুখে 'মা' ডাক শোনার বড় আকাঙ্ক্ষা চিত্রার, কিন্তু নুকু কিছুতেই ছোটমাসিকে মা ডাকবে না। এই নুকুর বড়বেলা জানকী। নিজের ছোটোবেলাকে জানকীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে থেকেই গড়ে উঠতে থাকে নাটক। ষাটোর্ধ্ব অবিবাহিতা জানকী-ই এই নাটকের সূত্রধর।

তারই অভিজ্ঞতার পরিচয়সূত্রে নাটকে একে একে এসে উপস্থিত হয়েছে কাব্যতীর্থ, রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন, তমাল, তান্ত্রিক, হেমন্ত, রেন্টু প্রভৃতি চরিত্র। নিজের জীবনটাকে আর একবার ফিরে দেখেছে জানকী, ফিরে দেখেছে নিজের নুকু সত্তাকে।

সমুদ্রের তীরে মোহনপুরে এক বাংলো বাড়ি ভাড়া করে বীরেশ্বর এবং নুকুকে নিয়ে হাওয়াবদল করতে এসেছে চিত্রা। সমুদ্রের তীরে আরো অনেক জায়গা হয়তো ছিল, কিন্তু মোহনপুরে আসার পেছনে চিত্রার উদ্দেশ্য অন্য। এখানেই বীরেশ্বরের পিতা বরদাপ্রসন্নের বাড়ি অর্থাৎ চিত্রার শ্বশুরবাড়ি। চিত্রা চায় শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে বীরেশ্বরের চিকিৎসা আর নুকুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে, সে চায় একটা ভরসার জায়গা। বরদাপ্রসন্নেরও এখন বীরেশ্বরকে প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর জমিদারি ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, ক্ষমতার নতুন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে মন্ত্রিসভা। সেই কেন্দ্রে পৌঁছতে গেলে নির্বাচনে জিতে আসতে হয়। বরদাপ্রসন্নের মতো যে জমিদারেরা দীর্ঘদিন ক্ষমতা ভোগ করেছেন, এখন তারা নির্বাচনে জিতে আবার অধিষ্ঠিত হতে চান ক্ষমতার নতুন কেন্দ্রে। যদিও বরদাপ্রসন্ন গ্রামে একজোড়া স্কুল, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি শ্মশানঘাট তৈরি করেছেন তবু ও 'ইমেজ' তার মোটেই ভাল নয়। বিশেষত এই ভোটের মুখে বীরেশ্বর সপরিবারে এসে মোহনপুরে বাসা নেওয়ায় লোকের মনে পুরনো স্মৃতি জেগে উঠছে। জমিদারি রক্ষার জন্য রায়বাহাদুরের পুত্রত্যাগের বিষয়টি স্বাধীন ভারতে মানুষ ভালভাবে নিচ্ছে না। ফলে বীরেশ্বরের সমর্থন এখন রায়বাহাদুরের বিশেষ প্রয়োজন। চিত্রা এবং রায়বাহাদুরের প্রয়োজন একসূত্রে মিলে যেতেই গাড়িতে করে বীরেশ্বরের জন্য ফলের ঝুড়ি আসে, ভালো ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হয়, নুকুর পাত্র হিসেবে স্থির হয় রায়বাহাদুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক তমাল, পাকা দেখার ব্যবস্থা রায়বাহাদুরের বাড়িতে। চিত্রার আবদার এড়াতে না পেরে বীরেশ্বর রাজিও হয়ে গেছে বিকেলে রায়বাহাদুরের প্রাসাদে যেতে, সেখানেই নুকুর পাকাদেখা। কিন্তু অকস্মাৎ এসে উপস্থিত মোহনপুরের ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের কাব্যতীর্থ মশাই। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হলেও তার পোশাক এবং আচরণ প্রাচীন মানুষের মতো। ছাত্রীরা মান্য করে না বলে এ তার কামোফ্লেজ। এই কাব্যতীর্থ মশাই বা শুধু মশাই বা আরো ছোটো করে 'মশা' এসেই সব গোলমাল পাকিয়ে তোলে।

বাস্তুহারা কাব্যতীর্থ এপার বাংলায় এসে ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের অঙ্কের টিচার। তার এই উপার্জনের ওপর নির্ভর করে আছে ওপার বাংলার অনেকগুলি প্রাণী। কাব্যতীর্থ হয়তো মশার মতোই ক্ষুদ্রপাণ, এক চাপড়ে তাকে নিকেশ করা যায় কিন্তু তার মধ্যে আছে আদর্শবাদের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের প্রতি আবেগ। তাই দেশমাতৃকার বীর সন্তান বীরেশ্বরের আগমনবার্তা পেয়ে সে ছুটে এসেছে দেখা করতে, অভিনন্দিত করতে। বীরেশ্বরকে কাছে টানার জন্য রায়বাহাদুরের চেষ্টার প্রকৃত কারণ সেই বুঝিয়েছে বীরেশ্বরকে। বীরেশ্বর যেতে রাজি হয় নি রায়বাহাদুরের প্রাসাদে, ফলের ঝুড়িও ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে কাব্যতীর্থর সঙ্গে নুকুর সম্পর্ক অম্লমধুর। এদিকে বীরেশ্বর না যাওয়ায় রায়বাহাদুরের আর এক ছেলে রেন্টু মাতাল অবস্থায় এসে বীরেশ্বরকে শাসিয়েছে, কেঁদে পড়ে অনুরোধ করেছে বাবার সঙ্গ দেবার জন্য। ক্ষমতা চলে যাবার আশঙ্কায় রেন্টুরা বিভ্রান্ত। মাতাল ভাইকে তাড়ালেও বীরেশ্বর কিন্তু তমালের মতো ঝকঝকে ডাক্তার ছেলেকে সহজে এড়াতে পারেন নি। এই তমালের সঙ্গেই রায়বাহাদুর নুকুর বিয়ের ব্যবস্থা করছেন, বিয়ের পর দু'জনকে বিলেত পাঠাবার

ব্যবস্থাও করেছেন। মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বরের ভাঙন শুরু হয়েছে। নিজে না গেলেও চিত্রা আর নুকুকে রায়বাহাদুরের বাড়িতে পাকাদেখায় যেতে দিতে রাজি হয়েছেন। এক মিস্টি সকালে চিত্রা নুকুকে তৈরি করছে প্রাসাদে যাবার জন্য। শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছে, কীভাবে তাকাতে হবে, কথা বলতে হবে, কোন্ প্রশ্নের কী উত্তর দিতে হবে, নির্জনে তমাল হাত চেপে ধরলে কী করতে হবে। দ্বারভাঙায় মানুষ হওয়া নুকুকে শেখাচ্ছে বাংলা মুলুকের 'কালচার।' হঠাৎ বড় এক হাঁচির সঙ্গে বগলে বেডিং, হাতে টিনের বাক্স, কাঁধের ঝোলায় বইপত্র নিয়ে কাব্যতীর্থর আবির্ভাব। এই লোকটি কি নুকুর জীবনে কুগ্রহ? সব কাজে বাধা সৃষ্টির জন্যই কি এর উপস্থিতি?

কাব্যতীর্থ হারিয়েছে ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরি, কারণ ফলের ঝুড়ি সেই তো তুলে দিয়েছিল গাড়িতে। তিন ঘন্টার মধ্যে তাকে মোহনপুর ছাড়ার আলটিমেটাম দিয়েছে রায়বাহাদুরের পারিষদেরা। নুকুকে একটা নাকছাবি উপহার দিয়ে বিদায় নেয় কাব্যতীর্থ। তার জন্য নুকুর মন কেমন করে ওঠে, এমনকি চিত্রাও সহানুভূতি বোধ করে। কিন্তু তার সহানুভূতি বিরক্তিতে বদলে যায় বীরেশ্বর কাব্যতীর্থকে নিয়ে এসে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিলে। চিত্রা জানে, এরফলে শ্বশুরের বিরূপ দৃষ্টিতে পড়তে হবে, তার পরিকল্পনা সব ভেস্তে যাবে। এসব নিয়ে কথা কাটাকাটিতে বীরেশ্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন, চিত্রা তাকে নিয়ে ছোটে ডাক্তারখানায়, নুকুর পাকাদেখা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। নুকু সবকিছুর জন্য দায়ী করে কাব্যতীর্থকে, তার ব্যাকরণ কৌমুদী ইঁদারায় ফেলে দেয়। বাইরে মোটরের শব্দ, সম্ভবত তমাল। কাব্যতীর্থকে এখন লুকোতে হয়, কারণ দুপুরবেলা বাইরের লোকের সঙ্গে নুকু বাড়িতে একা রয়েছে — এটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। নুকুর পরামর্শে ইঁদারায় নেমে আত্মগোপন করে কাব্যতীর্থ, নুকু ইঁদারার ওপর টিনের ঢাকনি চাপায়। কিন্তু দরজা খুলতে দেখা যায় তমাল নয়। রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন এসেছেন হেমন্ত নায়েবকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমে ভালোমুখের চেষ্টা বিফল হলে জোর করে নুকুকে তুলে নিয়ে যেতে চান রায়বাহাদুর। মেয়ের জন্য যদি নরম হয় বীরেশ্বর। বিপন্ন নুকু আর্ত চিৎকার করে ডাকে কাব্যতীর্থকে। হট্টগোলের ভয়ে পালিয়ে যায় বরদাপ্রসন্ন এবং হেমন্ত। কিন্তু কাব্যতীর্থ যে ইঁদারা থেকে উঠছে না। নুকু 'মশাই-মশাই' ডাকতে ডাকতে ইঁদারার চারপাশে ঘুরছে। তাহলে কি...

উৎকন্ঠার মধ্যে নাটকের প্রথম অর্ধ শেষ করেন মনোজ মিত্র। দ্বিতীয় অর্ধে ক্রমশ গ্রন্থিমোচন। রায়বাহাদুরের কাছে খবর পেয়ে তান্ত্রিক (পূর্বের দারোগা) এসে কুয়ো থেকে ওঠায় অচেতন কাব্যতীর্থকে। নুকুর নাকছাবির দিকে তার নজর পড়ে। রেন্টু আর সাধন কাব্যতীর্থকে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছিল বীরেশ্বর, তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়। কাব্যতীর্থর কিছু হয়ে গেলে নুকু বিপদে পড়বে। এদিকে কাব্যতীর্থকে উদ্ধারের দৃশ্য দেখে শক পেয়ে চিত্রার পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়, আন্তরিক চিকিৎসায় তাকে সুস্থ করে তোলে তমাল। 'মশাই'-এর জন্য নুকুর মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। রেন্টু এসে কাব্যতীর্থর মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে পুলিশের ভয় দেখিয়ে বীরেশ্বরকে টানতে চায় নিজেদের দিকে, বরদাপ্রসন্ন আবার উল্টো প্যাঁচ দেন রেন্টুকে আঘাত এবং বীরেশ্বরের প্রশংসা করে। কিন্তু কোনো কৌশলেই বীরেশ্বরকে রাজি করানো যায় না। আগে একবার বরদাপ্রসন্নের গাড়িতে তুলে দিয়েছিল ফলের ঝুড়ি আর এবার দিয়েছে ওষুধের ঝুড়ি। এদিকে তান্ত্রিক লোভে পড়েছে নাকছাবির, দারাগোর দৃষ্টিতে সে বুঝেছে, নাকছাবির পাথর দুর্মূল্য। শঙ্খমুক্তা জোর করে সে ছিঁড়ে নিতে চায়। নাকছাবি রক্ষা করতে নুকু তা ছুঁড়ে দেয় ইঁদারার মধ্যে। কিন্তু ইঁদারায় জল নেই, তান্ত্রিক নেমে গিয়ে

উঠিয়ে নিয়ে আসে শঙ্খমুক্তা। যে পবিত্র, দুর্লভ শঙ্খমুক্তা দিয়েছিল কাব্যতীর্থ তা রক্ষা করতে না পেরে অসহায় ক্ষোভে দীর্ণ হয়েছে নুকু। প্রবল মানসিক যন্ত্রণায় উন্মাদপ্রায় হয়ে ওঠে নুকু, বাবার মৃত্যুর পর তার স্থান হয় উন্মাদ-আশ্রমে। সেরে ওঠার পরও সে সেখানেই থাকে, রোগিণীদের দেখভাল করে, হাতের কাজ শেখায়, গান শেখায়।

নাটকের শেষে ফিরে আসে একেবারে প্রথমের দৃশ্য। নুকু এখন বৃদ্ধা জানকী। নিজের মিথ্যে অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে চিত্রা তাকে আনিয়েছে মোহনপুরে। যে বাড়িতে দু'মাসের জন্য হাওয়া বদলাতে এসেছিল চিত্রা, সেখানেই রয়ে গেছে পঞ্চাশ বছর। রায়বাহাদুরের বাড়িতে সে যায় নি। হতে পারে, এও তার এক 'স্টান্ট', কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে সেই 'স্টান্ট' রক্ষা করাও কম কথা নয়। বিপ্লবীর বিধবা হিসেবে পাওয়া ভাতা দিয়েই তার সংসার চলে, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে পেয়িং গেস্টও রাখে। কিন্তু সেই পেয়িং গেস্টকে চিনতে পেরে যে জানকীর পুরো জীবনের হিসেবটাই গোলমাল হয়ে যায়। সে যে সেই কাব্যতীর্থ মশাই, যে মরে গেছে জেনে নুকুর জীবনটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শেষবেলায় কেন সে আবার ফিরে এল জানকীকে ঠাট্টা করতে। সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগ যে আজ মিথ্যে হয়ে গেল, মাঝখান থেকে হারিয়ে গেল জীবনের অমূল্য সময়। নিজেকে আজ জানকীর মনে হচ্ছে প্রতারিত, রিক্ত। কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটক রিক্ততার মধ্যে শেষ হয় না। তাই কাব্যতীর্থ জানকীকে আহ্বান জানান জীবনের দিকে ঃ ''জীবন সহজে শ্যাষ হইবার নয়। ফুরাইবার নয়। তুমি অহনো জানো না, পর মুহূর্তে তোমার জন্য কী আছে। হ, লাইফ ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজ! আসো না, নতুন কইর‍্যা বাঁচি। সবাই মিলা।''[৫৯] নাকছাবিটা হারিয়ে গেছে। নতুন নাকছাবি গড়েছে চিত্রা আর কাব্যতীর্থ। নুকুর জন্য সব সাজিয়ে রেখেছে। এই নাকছাবির পাথর হয়তো ঝুটা, কিন্তু ঃ ''আগামীকাল কেউ আবিষ্কার করতেও পারে, ঝুটা না, এইখানাই আসল শঙ্খমুক্তা। সমুদ্রের গর্ভে ঝিনুকে জন্ম নিছে...ভারি শুদ্ধ, ভারি পবিত্র ...''[৬০] অনাগত আগামীর এই দুর্মর আশাবাদেই নাটক শেষ হয়েছে।

এই নাটকে সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহের পরিচয় আছে কিন্তু তাকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে কাহিনির মানবিক কাঠামো। আদর্শের জন্য লড়াই করে জেলে যাওয়া বীরেশ্বর যখন পঙ্গু অবস্থায় মুক্তি পায় তখন স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন রূপের সঙ্গে নিজের ভাবনা-চিন্তাকে মেলাতে পারেনি। জমিদার শ্রেণি ক্ষমতা দখলে রাখার নতুন উপায় হিসেবে অবলম্বন করেছে নির্বাচনকে। রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন একদা ত্যাজ্যপুত্র বীরেশ্বরকে কাছে টেনে নির্বাচনী-বৈতরণী পার হতে চান। কিন্তু বীরেশ্বর কিছুতেই নিজের আদর্শের সঙ্গে আপস করতে পারে না। অন্য সকলের কাছে তার এই জেদ হয়তো অর্থহীন কিন্তু তার নিজের কাছে এই আদর্শই অস্তিত্ব। আদর্শের প্রতি আকর্ষণে হয়তো নয়, কিন্তু বাবার প্রতি ভালোবাসাতেই একমাত্র নুকু সবসময় বীরেশ্বরকে সমর্থন করেছে। তবে তার মধ্যেও জেগেছে কিশোরীসুলভ আকাঙ্ক্ষা, তমালের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্নে, বিদেশ যাবার স্বপ্নে তার মনেও রঙ লেগেছে। আবার কাব্যতীর্থ সম্পর্কেও এক অদ্ভুত অনুভূতি তার মনে। এই নুকু তথা জানকীর জীবন কীভাবে ভুলের মারপ্যাঁচে মিথ্যে হয়ে গেল তা নিয়েই গড়ে উঠেছে এই নাটক। এক কিশোরীর রঙিন স্বপ্ন কীভাবে বৃদ্ধার বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসে বদলে গেল, তাই দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র। একই নারীর ছোটোবেলা ও বড়বেলা সৃষ্টি করে নিজের দৃষ্টিতে নিজের জীবনকে দেখার অভিনব আয়োজন করেছেন।

নাটকের শেষে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মুছে গিয়ে পাঠক-দর্শকের মনে জেগে থাকে জানকীর ব্যর্থ জীবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস, মিথ্যে দুঃখভোগের জন্য কারুণ্য।

মনোজ মিত্র নিজে কখনোই কোনো বিশেষ রাজনীতি বা আদর্শের পক্ষে বা বিপক্ষে নন। তাই কোনো পক্ষকে অন্ধভাবে সমর্থন বা অন্ধভাবে কারো বিরোধিতা তাঁর নাটকে নেই। তিনি আসলে খোঁজেন মানুষকে, মানুষের সমস্যা-সঙ্কটকে। বিশেষ পরিস্থিতিতে ফেলে মানুষকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সে পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ বলে মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন মাত্রা তাতে প্রকাশিত হয়। অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ নয় তাঁর মানুষ। তাঁর নাটকে আপাতদৃষ্টিতে যারা 'ভিলেন', তারাও নিজেদের প্রেক্ষণ-বিন্দু থেকে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পায়। আলোচ্য নাটকে যেমন রেন্টু বা বরদাপ্রসন্ন চরিত্র। বীরেশ্বরকে হুমকি দিতে এসেও নিজের অসহায়তা গোপন রাখতে পারে না রেন্টু। জমিদারি ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, ক্ষমতার নতুন উৎস রাজনীতি এবং নির্বাচন। সেই উৎসে অধিষ্ঠিত হতে না পারার আতঙ্ক রেন্টুকে বিহ্বল করে তুলেছে। বীরেশ্বরকে গরম দেখাতে গিয়েও তাই সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে ঃ

> ''অলরাইট ... যেও না ... গুডনাইট ... (চলে যেতে যেতে ঘুরে এসে বীরেশ্বরের পায়ে টলে পড়ে) প্লিজ চলো দাদা ... অবস্থা ক্যানট্যাংকারাস ... জমিদারি সিস্টেম লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ কমপেনসান মিলবে ঠিকই ... কিন্তু ক্ষমতা ... পাওয়ার ... কোথায় পাবো ?''[৬১]

জমিদারি রক্ষার জন্য বিপ্লবী সন্তান বীরেশ্বরকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন যে বরদাপ্রসন্ন তাকেও নাট্যকার সুযোগ দিয়েছেন পাঠক দর্শকের সহানুভূতিতে উত্তীর্ণ হতে ঃ

> ''সেদিন আর কী করতে পারতাম বলো। সাহেবদের খুশি না রাখলে সাতপুরুষের জমিদারিটা চলে যেত। যদি বলো জমিদারি রাখাটাই অপরাধ, আমি অপরাধী। কিন্তু অন্তর থেকে বলছি, বীরেশ্বর আমি তোমাকে নিয়ে গর্বও করি, হিংসাও করি ...''[৬২]

এই সরল স্বীকারোক্তির পর বরদাপ্রসন্নের প্রতি পূর্ণ বিরূপতা আর থাকে না। জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি বরদাপ্রসন্নদের ক্ষমতা লোলুপতা যেমন দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র, তেমনি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, শ্মশানঘাট নির্মাণে তাদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন। কোনো পক্ষাবলম্বনের দায় নেই বলেই তাঁর দৃষ্টিতে এই স্বচ্ছতা আছে। তবে তান্ত্রিকে পরিবর্তিত দারোগার মতো সুবিধাবাদী চরিত্রগুলির প্রতি তিনি বরাবরই নির্মম। এদের হেনস্থা করার সুযোগ তিনি ছাড়েন না। তান্ত্রিককে লাঠি দিয়ে বারংবার ঘেন্না এবং মজায় যে খোঁচা দিয়েছে বীরেশ্বর, সে খোঁচা আসলে নাট্যকারেরই। তীক্ষ্ণ খোঁচায় তিনি খুলে দিতে চান এই সব ভণ্ডদের মুখোশ।

কারো ভাবনাকে দোষারোপ করেন না তিনি, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে শুধু সেই ভাবনাকে উপস্থাপন করেন। এভাবেই বীরেশ্বরের ভাবনার বিপ্রতীপে উপস্থাপিত হয় আধুনিক কালের যুবক তমালের ভাবনা। নতুন সময়ে তমালের ভাবনাও নতুন। নীতি-আদর্শ আঁকড়ে থেকে জীবন নষ্ট করার চেয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কেরিয়ার গড়ে তোলা তার মতে উচিত কাজ। রায়বাহাদুরের স্কলারশিপের টাকায় তমাল ডাক্তারি পড়েছে, রায়বাহাদুর তাকে দেখিয়েছেন বিদেশ যাবার স্বপ্ন। সুতরাং রায়বাহাদুরের বিরুদ্ধাচরণ সে করতে পারবে না। নুকুকে নিতে হলে সে রায়বাহাদুরের হাত থেকেই নেবে। আধুনিক যে কোনো যুবকের মতোই সে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করায় অতীত প্রজন্মকে ঃ

> ''আপনারা নীতির কাজিয়া করছেন, মার খাচ্ছি আমরা, তরুণরা। চারপাশে হাজার সমস্যা, দিন দিন বেকার বাড়ছে। ... প্লিজ পুরনো আবর্জনা ঝেড়ে ফেলে দিন। ছেলেমেয়েদের জীবন নষ্ট করবেন না, দাঁড়াতে দিন আমাদের বাড়তে দিন ...''[৬৩]

মনোজ মিত্রের কথনভঙ্গির মুন্সিয়ানা এইখানে যে, এই আত্মকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও পাঠক-দর্শকের মন তমালের প্রতি বিরূপ হয় না, বরং তার ভাবনাকেও বোঝার চেষ্টা করে।

নতুন প্রজন্মের এই দাঁড়াতে চাওয়া, বাড়তে চাওয়ার মাঝে, ক্ষমতার জন্য উগ্র লোলুপতার মাঝে, বীরেশ্বরের মতো আদর্শবাদীর অসহায়তাও তাঁর লেখনীতে উজ্জ্বল। এই নতুন সময়ের 'ভোট করানো', মন্ত্রী হয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করা, পরের দাক্ষিণ্যে কেরিয়ার তৈরি করা – প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না বীরেশ্বর, ক্রমশ সে নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে থাকে। যে দেশের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছিল সেই দেশের এই অদ্ভুত পরিবর্তনে সে কষ্ট পায়। কাব্যতীর্থের মতো কেউ কেউ তাকে এবং তার আদর্শকে সম্মান জানালেও অধিকাংশেরই কাছে সে একজন বাতিল মানুষ। তবু সে আঁকড়ে থেকেছে নিজের আদর্শ। রায়বাহাদুরের নির্বাচনে নিজেকে এবং নিজের বিপ্লবী আদর্শকে ব্যবহৃত হতে দেয় নি। তবে চারপাশের অবস্থা দেখে তার নিজের মধ্যেও জেগেছে দ্বিধা সংশয় ঃ ''দেশকে বিদেশীর শাসনমুক্ত করতে অস্ত্র ধরলে, তাকে সন্ত্রাস বলে, না স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে ... সব আমার গোলমাল হয়ে গেছে! বুঝতে পারিনে, ঠিক করেছি না ভুল করেছি।''[৬৪] কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনোজ মিত্র প্রত্যক্ষত বীরেশ্বরের আদর্শের জয়ের কথা না বললেও পরোক্ষে তারই ব্যঞ্জনা দেন। বীরেশ্বরের মৃত্যুর পর চিত্রা যে রায়বাহাদুরের প্রাসাদে গিয়ে ওঠেনি, বরং সেই ভাড়াবাড়িতেই পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে এবং বরদাপ্রসন্নের অনুগ্রহের পরিবর্তে বীরেশ্বরের বিধবা হিসেবে পাওয়া বিপ্লবী ভাতাকেই জীবনধারণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে তা বীরেশ্বরের আদর্শের জয়কেই ব্যঞ্জিত করেছে। সেই স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে চিত্রার সঙ্গী কাব্যতীর্থ, যে কিনা বিশ্বাস করেছিল বীরেশ্বরের আদর্শে, জীবিকা এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েও দাঁড়িয়েছিল বীরেশ্বরের পাশে। শঙ্খমুক্তার মতো দুর্লভ এবং পবিত্র শুদ্ধ চৈতন্যের অধিকারী এই কাব্যতীর্থ। সেই শুদ্ধ চৈতন্যই জানকীকে আহ্বান জানিয়েছে নতুন জীবনের দিকে, নতুন ভাবে বাঁচার দিকে। এই শুদ্ধ চৈতন্যে স্থিত হওয়াই মনোজ মিত্রের যে কোনো নাটকের ভাববীজ।

২০০১ সালে রচিত 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' তুমুল হাসির নাটক। বাঙালি শিল্পপতি ধৃতিকান্ত ঘোষাল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছেন। অন্য সব প্রোডাক্ট বন্ধ হয়ে গিয়ে এখন চলছে কেবল কাপড় কাচা সাবান আর মশা মারা ধূপ। সে দুটো অবশ্য রমরম করেই চলছে। একদিকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি অন্যদিকে স্ত্রী সুনন্দা ধৃতিকান্তর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সুনন্দা প্রতি বছরই নির্বাচনে দাঁড়ায় আর তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। নির্বাচনের খরচ দিতে চান নি বলে আগের দু'বার সুনন্দার ইলেকশন ম্যানেজাররা ধৃতিকান্তকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করেছে। এবার তৃতীয় বারে পাঁচ রাজ্যের পাঁচ আসন থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পড়েছে সুনন্দা, তার ইলেকশন ম্যানেজারেরাও এসে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে অপহরণের আশঙ্কায় ধৃতিকান্তর প্রেশার-সুগার যথেষ্ট বেড়ে গেছে, খাসনবীশকে তিনি চব্বিশ ঘন্টার দেহরক্ষী হিসেবে নিয়েছেন।

নাটক শুরু হচ্ছে ধৃতিকান্তর কোম্পানির সেলস্‌ম্যান সৌরভের ফ্ল্যাটে। ত্রিপুরায় ট্যুরে যাবার সময় বউকে নিয়ে যেতে চায় সৌরভ। তাই বস্‌কে বাড়িতে ডেকে বউকে দিয়ে আপ্যায়ন করিয়ে অনুমতি আদায় করে নিতে চায়। বউ মুন্নির অদ্ভুত একটি গুণ – সে সব সময় হাসে। মোনালিসার হাসির মতোই সে হাসিরও মানে বোঝা দায়। নিজে সে কিছুই রাঁধতে পারে না, নিচের তেলেভাজাওয়ালিকে দিয়ে কুমড়োফুল, বকফুল, সর্ষেফুল প্রভৃতির বিচিত্র পদ তৈরি করিয়ে বঙ্গীয় রন্ধনশিল্পের মহিমায় ধৃতিকান্তকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে। পরে একদিন কদলীমঞ্জরী অর্থাৎ মোচা রেঁধে খাওয়াবে বলেছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এত কিছু তা সফল হয় নি। সৌরভ বউকে নিয়ে যাবার অনুমতি পায় নি। বরং সৌরভের অনুপস্থিতিতে ধৃতিকান্ত এসে মুন্নিকে দেখাশোনা করবেন বলে জানিয়েছেন। কাল্পনিক মস্তান শেতলার ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চাইলে চব্বিশ ঘন্টাই তাদের ফ্ল্যাটে থেকে মুন্নিকে পাহারা দেবেন বলে জানিয়েছেন। ফাঁকা ফ্ল্যাটে মুন্নি আর ধৃতিকান্ত – ভাবতেই সৌরভের চোখের ঘুম উবে গেছে। মুন্নির জন্য পাহারা চাই, ধৃতিকান্তকে আটকাবার লোক চাই। মুন্নিই পরামর্শ দিয়েছে ক্রনিক বেকার গোগোলকে ডাকার জন্য, যে কিনা মুন্নি-সৌরভের বিয়ের ঘটকালি করেছিল। আবার গোগোলকে আটকাবার জন্য ডাকা হ'ল পমমামা আর লতুমাসিকে। তার ওপর রইল ওপরের ফ্ল্যাটের বালাকন্ঠী হরিশ্চন্দ্র, ধৃতিকান্ত এলেই যে নিজের গুপিযন্ত্র নিয়ে গানে গানে ধৃতিকান্তকে ব্যস্ত রাখবে। সব মিলে তৈরি হ'ল এক অদ্ভুত গোলকধাঁধা – ধৃতিকান্ত অ্যারো (->) মুন্নি ... গোগোল অ্যারো (->) ধৃতিকান্ত, পমমামা অ্যারো (->) গোগোল, লতিকা অ্যারো (->) পমমামা, হরিশ্চন্দ্র অ্যারো (->) ধৃতিকান্ত। বউয়ের চারপাশে সাত চৌকিদার বসিয়ে সৌরভ গেল ত্রিপুরায়। তারপর ?

চারদিক থেকে তাড়া খাওয়া একটা মানুষ ধৃতিকান্ত মুন্নির ফ্ল্যাটেই আত্মগোপন করে থাকতে চান, অন্তত নির্বাচন পর্যন্ত। মুন্নির হাসিমুখ দেখে তিনি ভুলতে চান সব টেনশন। কিন্তু স্বস্তি তার কপালে নেই। গোগোলকে চাকরির টোপ দিয়ে হলদিয়া পাঠাতে না পাঠাতেই এসে উদয় হয় পমমামা আর লতুমাসি। কোনোমতে লতুমাসিকে রান্নাঘরে পাঠাতেই বালাকন্ঠী হরিশ্চন্দ্র হাজির তার গুপীযন্ত্র নিয়ে। সব মিলিয়ে ধুন্ধুমার নাটক জমে ওঠে সৌরভের ফ্ল্যাটে। খাসনবীশ বুঝে ফেলেছে কৌশল, ধৃতিকান্ত লতিকার দিকে ঝোঁকার ভাণ করলেই পমমামা বোনের 'ক্যারেকটার' বাঁচাতে মুন্নিকে ঠেলে দেবে ধৃতিকান্তর দিকে। সেই কৌশলেই ধৃতিকান্ত এগোতে থাকেন মুন্নির দিকে। মুন্নিকে পাশে নিয়ে তার বয়স যেন অনেকটাই কমে যায়। নিউ মার্কেটে বেড়াতে গিয়ে সুনন্দার গুন্ডারা যখন পিছু ধাওয়া করে তখন ধৃতিকান্ত একশ কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত স্পিডে গাড়ি চালিয়ে সেই গুন্ডাদের হাত থেকে নিজেকে আর সুনন্দাকে বাঁচান। এদিকে টেলিফোনে গোলমালের আঁচ পেয়ে সৌরভ ত্রিপুরা থেকে এসে শেতলার বেশ ধরে নিজের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। ধৃতিকান্ত তাকে দেখে ভিরমি খান। কিছু একটা ভালো-মন্দ ঘটে গেলে তার দায় বহন করতে হবে ভেবে মুন্নি সৌরভকে আবার ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দেয়।

অসুস্থ ধৃতিকান্ত নার্সিংহোমে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে খাসনবীশের শেখানো কৌশলে 'লতু-লতু' ডাক ছাড়েন। এদিকে নার্সিংহোম থেকে ধৃতিকান্তকে অপহরণের ছক কষে সুনন্দা এবং তার বাহিনী। কৌশলে মুন্নির কাছ থেকে নার্সিং হোমের ঠিকানা জেনে যায় সে। প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে যায়, ধৃতিকান্তকে অপহরণ করে সে দায় চাপাবে মুন্নিদের ওপর। পমমামা কিন্তু চিনতে পেরে যান

সুনন্দাকে। আর তখন তিনি পারমিশান দেন 'ডিফেন্স' ছেড়ে 'অ্যাটাকে' যেতে, অপোনেন্টের চালে অপোনেন্টকে মাত করতে। তারই পরামর্শে লতিকা আর মুন্নি সুনন্দাদের আগেই ধৃতিকান্তকে অপহরণ করে এনে তুলেছে নিজেদের ফ্ল্যাটে -- দায় চেপেছে সুনন্দার ঘাড়ে। কিডন্যাপের ব্যাপারে মুন্নিকে হারাবে কে! তার যে সেই ছোটোবেলায় মায়ের র‍্যাশন ব্যাগে বসে কিডন্যাপ হবার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সৌরভ তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয় নি, একটা খেলনা ভেবে তার চারপাশে পাহারা বসিয়েছে। কিন্তু ধৃতিকান্ত তাকে একটা সম্পূর্ণ মানুষ ভেবে আত্মসমর্পণ করেছেন, বাঁচাবার জন্য করুণ আর্তি জানিয়েছেন। তাই মুন্নি তাকে না বাঁচিয়ে পারে নি, এই বাঁচানোর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তার প্রকৃত ক্ষমতা। সৌরভ ফ্ল্যাটে ফিরে দেখে, সেখানে জয়ের আনন্দে পিকনিক শুরু হয়েছে। সৌরভের ফ্ল্যাটে বসেই ধৃতিকান্ত টি.ভি.-তে দেখেন পাঁচ রাজ্য থেকে প্রার্থীপদ তুলে নিয়েছে সুনন্দা। টি.ভি.-তে সুনন্দার কান্না দেখে ধৃতিকান্তসহ সকলে যখন উল্লসিত তখন ধীর পায়ে খাসনবীশের সঙ্গে প্রবেশ করে সুনন্দা। সুনন্দার কথায় যেন ঘোর ভাঙে ধৃতিকান্তর। নিজের অবনমন স্মরণ করে তিনি লজ্জিত হন। ক্ষুব্ধ হন সৌরভ-মুন্নির ওপর। কিন্তু আসলে তিনি নরম প্রকৃতির লোক বলে মুন্নির কান্না দেখে আবার বিচলিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত নাটকের মধুর সমাপ্তিই ঘটান মনোজ মিত্র। সুনন্দা ফিরে আসে মিস্টির বাক্স এবং মুন্নির জন্য কুমড়ো ফুলের বড়া নিয়ে, ধন্যবাদ জানায় তাদের দু'জনকেই বাঁচাবার জন্য। ধৃতিকান্তকে সে জানিয়ে দেয়, রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে এবার সোস্যাল ওয়েলফেয়ারে নামবে এবং সেখানে টাকা লাগবে আরো বেশি। কুমড়ো ফুলের বড়া ধৃতিকান্তর হাতে দিয়ে সে বলে মুন্নিকে খাইয়ে দিতে। হতভম্ব ধৃতি প্রথমে সে বড়া সুনন্দাকে খাওয়াতে যায়, তারপর হাতে নিয়ে মুন্নির দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসে। সে হাসির অন্য সকলের মধ্যে সংক্রমণের মধ্য দিয়েই নাটকের সমাপ্তি।

'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' উতরোল হাসির নাটক। কিন্তু এই নাটকেও মনোজ মিত্রের নাটকের পরিচিত উপাদানগুলি, যেমন -- মানুষের নিঃসঙ্গতা, সব কিছুর ওপরে শুভবোধের জয়, বিশিষ্ট জীবনদর্শন প্রভৃতির পরিচয় সহজলক্ষ্য। এইসব উপাদান দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে যে মূল বিষয়টি, তা হ'ল নারীর শক্তির বিকাশ। সাধারণভাবে নারীকে সমাজে অবলা বা দুর্বলা হিসেবেই দেখা হয়। তার চারপাশে সবসময় নিষেধ আর সতর্কতার আগল তুলে নিশ্চিন্ত হতে চায় পুরুষ। হয় তাকে নিজের র‍্যাশন ব্যাগে নিয়ে ঘুরতে চায় অথবা একের পর এক দারোয়ান লাগিয়ে তার 'নিরাপত্তা' সুনিশ্চিত করতে চায়। কিন্তু সেই নারীকেই যদি দেওয়া যায় বিকশিত হবার অনুকূল অবসর, যদি তার কাছে চাওয়া যায় নির্ভরতার আশ্রয়, তবে সেই হয়ে উঠতে পারে দশভুজা। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুন্নি সবদিক থেকেই ব্যতিক্রমী। তার মা ডিভোর্সী এবং গ্রামের স্কুলে সংস্কৃত পন্ডিত। সেই 'রেয়ার মাদার' মহিলা সংস্কৃত পন্ডিতের 'রেয়ার ডটার' মুন্নি, যাকে ছোটোবেলায় র‍্যাশন ব্যাগে পুরে মা ট্রামরাস্তা ধরে ছুটে পালিয়েছিলেন। তারপর থেকে নিজেকে বারবার সেই র‍্যাশন ব্যাগের মধ্যেই আবিষ্কার করে মুন্নি ঃ

> '' বাবা আমায় তার কাছে আটকে রেখেছিল। একদিন মা করল কি, বাবা যখন ঘুমোচ্ছে, একটা র‍্যাশনব্যাগ নিয়ে বাড়িতে ঢুকে, আমায় তার মধ্যে বসিয়ে নিয়ে দে ছুট ... পড়িমরি ট্রামরাস্তা ধরে ছুট ... ছুট ... ছুট ... (হাসতে শুরু করে) সেই থেকে মনে হয়, আমি যেন একটা হাতব্যাগের মধ্যেই বসে আছি ... কারো না কারো হাতে ঝুলছি ... কখনও মায়ের হাতে, কখনও সৌরভের হাতে ... কখনও ... হাতে হাতে ঝুলছি। সব মেয়েই বোধহয় তাই, না স্যার ?''[৬৫]

শেষের এই প্রশ্নেই মুন্নি সাধারণীকৃত হয়ে যায় যে কোনো নারীতে। অন্য রান্না তো দূর, মুন্নি ভাতের ফ্যানটাও ঝরাতে পারে না। এক গান সে দুবার এক সুরে গাইতে পারে না। একটা জিনিসই সে পারে — তা হ'ল এই সাত ঝঞ্ঝাটের পৃথিবীতে সবসময় হাসতে। সেই অদ্ভুত হাসির মানে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। বাবা-মায়ের ডিভোর্সের বথা বলতে গিয়েও সে হাসে, আবার গোগোলের কাছে ধৃতিকান্তর অপদস্থ হবার কথা শুনেও সে হাসে। এই হাসিই তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এই হাসিতেই ভুলেছেন ধৃতিকান্ত। ক্রমাগত আতঙ্ক যখন তাকে তাড়া করে ফিরছে,তখন মুন্নির হাসিতেই তিনি পেয়েছেন নির্ভরতার আশ্রয়। খাসনবীশ এই হাসিকে তুলনা করেছে মোনালিসার হাসির সঙ্গে। নিজের জাঁদরেল স্ত্রী সুনন্দা যার কাছে আতঙ্ক, ছেলেমেয়েরা যাকে ছেড়ে পশ্চিমী দুনিয়ার বাসিন্দা, সেই ধৃতিকান্ত ঘোষাল শান্তির আশ্রয় খুঁজেছেন মুন্নির কাছে। আপাতদৃষ্টিতে ধৃতিকান্তকে পরস্ত্রীর সান্নিধ্যলোভী শিথিল চরিত্রের মানুষ মনে হলেও মনোজ খুঁজেছেন তার ভেতরকার নিঃসঙ্গ আশ্রয়প্রার্থী মানুষটিকে। কর্মক্ষেত্রে সফল হয়েও পারিবারিক জীবনে শান্তির সন্ধান পান নি ধৃতিকান্ত। সেই অসহায় মানুষের আর্ত রোদন ধরা পড়েছে তার সংলাপে ঃ

> উৎখাত করছে ...ছেলেমেয়েরা সব বিদেশে, তারা আর এ বাংলায় ফিরবে না ... ব্যবসা-পত্তর কে রক্ষা করবে ... গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে আছি ... ওঃ মুন্নি, আমার সব সময় মনে হয় কিডন্যাপাররা তেড়ে আসছে ... আমায় ধরে নিয়ে যাবে ...গুম করে রাখবে ... ভয়! ভয়! ভয়!''[৬৬]

এই ভয়ের জন্যই ধৃতিকান্ত একটা 'তাড়া খাওয়া মানুষ'। হঠাৎ করেই সেই মানুষটির সামনে জেগেছিল একটু শান্তির, একটু স্বস্তির আশ্রয়ের ইঙ্গিত। কিন্তু তাকে লম্পট ভেবে স্ত্রীকে রক্ষা করতে তারই কর্মচারী সৌরভ একদল লোক এনগেজ করে রেখে গেছে নজরদারির জন্য। সেই লোকেরা —সেই গোগোল, পমমামা, লতুমাসি আর হরিশ্চন্দ্র তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এক সময় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। মুন্নিকে তার সুনন্দার চেয়েও বড় পলিটিশিয়ান মনে হয়েছে। এমনকি তিনি সৌরভ-মুন্নির বিরুদ্ধে থানাতেও যেতে চেয়েছেন। কিন্তু মনোজ মিত্র শেষ পর্যন্ত চরিত্রের ইতিবাচক দিকটিকেই ফুটিয়ে তোলেন। তাই ধৃতিকান্তর সেই পরিচয়টিই সত্য হয়ে ওঠে, যিনি 'সত্যিই কারো সর্বনাশ করতে পারেন না'। নিজের নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য মেনেই সুনন্দাকেও তিনি উত্তীর্ণ করে দেন পাঠক-দর্শকের সহানুভূতিতে। নিজের ভুল সে বুঝতে পারে। অপরাধ শুধরে নেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

আরো দুটি নিঃসঙ্গ মানুষ আছেন এই নাটকে — পমমামা এবং লতুমাসি। বোনের ক্যারেকটারের দিকে সারা জীবন কড়া নজর রেখেছেন পমবাবু, কিন্তু বোনের জন্য পাত্র জুটিয়ে উঠতে পারেন নি। নিজেও অবশ্য বিয়ে করেন নি। বোনের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে এনে দিয়েছিলেন একটি বেড়ালছানা। সেই আদি উৎস থেকে ক্রমে ঘর ভরে উঠেছে অসংখ্য মার্জারে — বাড়ির নামই হয়ে গেছে 'বেড়ালবাড়ি'। লতিকা থাকে সেই বেড়ালদের নিয়ে আর পমবাবু থাকেন বেড়াল খেদানো লাঠি আর দাবার বোর্ড নিয়ে। সৌরভের বউকে পাহারা দিতে এসেছে এই দুই ভাইবোন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে পেছন ফিরে তাকিয়ে অনেক না পাওয়ার জন্যই তাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে কিন্তু নিজেরাই নিজেদের সান্ত্বনা দেন ঃ ''দুজনের জীবন তো কেটেই গেল। (লতিকার মাথায় হাত বোলায়) ভাইবোনে খারাপ যে কাটল তাও তো না।'' [৬৭] তারা পরস্পরের আশ্রয়। যা কিছু কথা তারা পরস্পর ভাগ করে নেয়, একা কোনো কিছু খেতেই তাদের মন চায় না। বাইরে যতই তারা পরস্পরকে দোষারোপ করুক, একে অন্যের ত্রুটি

জোরগলায় প্রচার করুক, অন্তরের টান তাদের গভীর। তাই ধৃতিকান্ত লতিকার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে হাস্যকর করে তুলছেন দেখে পমবাবু পরম মমতায় বলেন ঃ ''বুঝিস না, ধৃতিকান্ত তোকে নিয়ে তামাশা করছে, হাসির খোরাক বানাচ্ছে।''[৬৮] লতিকা এটা বোঝে না, এতটা বোকা তাকে মনে হয় না। আসলে জীবনে যা হয়নি অথচ হতে পারত – তাকে নিয়ে এ যেন একধরণের সুখবিলাস। এই বিলাসের সাময়িকতা এবং অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও মানুষ এর মোহ এড়াতে পারে না। লতিকা তাই ধৃতিকান্তকে 'কান্তিদা' বলে ডেকে, তার জন্য ইলিশ মাছের ভাপা রেঁধে, অসুখে সেবা করে নিজের অতৃপ্ত বাসনাকে নিয়ে যেন কিছুক্ষণ খেলা করতে চেয়েছে। ধৃতিকান্ত বারবার তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, মুন্নির কাছে যাবার উপায় হিসেবে তাকে ব্যবহার করেছেন, কোনোরকম বাধা পেলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন – এসব দেখে এবং সম্ভবত বুঝেও ধৃতিকান্তর জন্য স্নেহের আশ্রয় সাজাতে চেয়েছে। এ যেন একজন নিঃসঙ্গ মানুষের জন্য আরেকজন নিঃসঙ্গ মানুষের সহমর্মিতা। সেই সহমর্মিতার বশেই শেষপর্যন্ত পমবাবুও মুন্নি আর লতিকাকে পারমিশান দেন ধৃতিকান্তকে দেখতে যেতে, পরামর্শ দেন ডিফেন্স ছেড়ে অ্যাটাকে যেতে, সুনন্দা ঘোষালের আগেই ধৃতিকান্তকে অপহরণ করতে। এই সহমর্মিতাই মনোজ মিত্রের যে কোনো নাটকের প্রধান জোর।

নাটকের এই ব্যাখ্যা থেকে 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকটিকে গুরুগম্ভীর নাটক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটক গেঁথে তোলার মূল বৈশিষ্ট্যই হ'ল – চরিত্রগত স্বাভাবিক কৌতুকপ্রবণতাকে তিনি কখনোই বিসর্জন দেন না। আলোচ্য নাটকেও বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে কৌতুককর পরিস্থিতি এবং তদুপযোগী সংলাপের যোগ্য সঙ্গতে। পাঠক-দর্শক উতরোল হাসিতে ফেটে পড়তেও পড়তেও একাত্ম হয়ে যায় মুন্নির মতো নারীর অমর্যাদা, ধৃতিকান্তর মতো আপাতসফল মানুষের রিক্ততা আর পমমামা-লতুমাসির নিঃসঙ্গতার সঙ্গে। কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বলেই বক্তব্য ভার হয়ে চেপে বসে না, স্বচ্ছন্দ নির্ভার এক আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

সামাজিক একাঙ্কগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেই প্রথম দিকে অর্থাৎ ছয় ও সাতের দশকে মনোজ মিত্র ক্রোধী। পরে ক্রমশ তিনি খুঁজে পেয়েছেন নিজের নাটক রচনার বিশিষ্ট ধরণাটি। ১৯৬৮ সালে লেখা 'কালবিহঙ্গ' একাঙ্কটিতে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ। মালিক শ্রেণি কীভাবে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন দমন করতে ধর্ম এবং কুসংস্কারকে কাজে লাগায় এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাসে মানুষ কীভাবে নিজের প্রিয়জনকে এমনকি নিজেকেও ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় – তাই নিয়েই তিনি এই নাটক গেঁথেছেন। ভক্তরাম টিয়েপাখিকে ত্রিকালজ্ঞ কালবিহঙ্গ রূপে প্রচার করে ব্যবসা ফেঁদেছে। ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য লেখা কতগুলি কার্ডে মৃদু মাদক গন্ধ মেশানো আছে। ভক্তরামের খুশিমতো যার বেলায় যে লেখা তুলতে হবে সেই কাগজের গন্ধ হাতের কৌশলে ঠিক আগের মুহূর্তে পাখিটাকে শুকিয়ে দেওয়া হয়। পাখি সেই কার্ড তোলে, কখনও কখনও মানুষের জীবনের ঘটনার সঙ্গে তা মিলেও যায় – আর ভক্তরামের পসার বেড়ে ওঠে। এই জালিয়াতির চরম বিরোধী নিজের ছেলে খোকার কাছে পরীক্ষা দিতে গিয়েও যন্ত্র চালিতের মতো হাত-সাফাই সে করে চলে। ভক্তরামের এই জালিয়াতিকে নিজেদের প্রয়োজনে কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙতে কাজে লাগায় মালিকপক্ষ। ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গের মুখে কাগজ উঠেছে, কারখানায় যোগ দিলে ভাগ্য ফিরবে। ভাঙন শুরু হয়েছে শ্রমিকদের দলে। মালিক শ্রেণির প্রতিনিধি ডাক্তার নিপুণ কৌশলে ধর্মঘট বানচাল করতে চেয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কৌশল

সফল হয় নি। ডাক্তারের পেটোয়া লোকেদের হাতে ভক্তরামের ছেলে খোকা প্রহৃত হয়েছে। নিজের চালাকির কাছে নিজেই বাঁধা পড়ে গেছে ভক্তরাম। স্ত্রী-পুত্র সবকিছু তার তলিয়ে গিয়েছে, নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ব্যবহৃত হয়ে গেছে। বিহঙ্গকে দৈবী পাখি বলে ভেবে অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকেও ধোঁকা দেয় ভক্তরাম, আর সেই সুযোগে স্বার্থান্বেষীরা তাকে ব্যবহার করে।

এই নাটকে শোষক-শোষিতের চিরন্তন লড়াই আছে, শোষকের পক্ষে ধর্মের সহায়তা আছে, শেষপর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ শোষিত মানুষের জয়ের ইঙ্গিতও আছে। জীবনে অনেক লড়াই-সংগ্রাম করে লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। এইসব দৈববাণীর ভড়ং সেই লড়াইকে পিছিয়ে দেয়। তাই শ্রমিক নেতা সূর্য তীব্র বিদ্রূপ হানে এই সহজ সিদ্ধির লোভে মত্ত মানুষের দিকে ঃ

> ''সর্বদা দেখি, একগাদা লোক পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এক এক সেকেন্ডে এক একটা লোকের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাচ্ছে। দিব্যি কারবার ... না মূলধন ... না পরিশ্রম ... কত সোজা ... যেন এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ... এই লড়াই ... সবটা বোকামি ! জীবনটা মাত্র একটা টিয়েপাখির মামলা ...''[৬৯]

নাটকের শেষেও সূর্যর স্পষ্ট বক্তব্য ঃ ''মানুষের ভাগ্য চিরকাল লড়াই করে ফেরাতে হয়েছে, চিরকাল তাই হবে। পাখির ঠোঁটে চাকা ঘোরে না।''[৭০] এই স্পষ্ট ও দৃঢ় বক্তব্য সত্ত্বেও একথা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে, এ ধরণের নাটক মনোজ মিত্রের হাতে যথার্থ প্রাণ পায় না। শেষ বাক্যে ঃ ''ভাঙ... ভাঙ খাঁচা ... পখিটাকে ছেড়ে দে খোকা ... উড়িয়ে দে ...''[৭১] সংলাপও নিতান্ত আরোপিত বলেই মনে হয়। আসলে এই সময় পর্যন্তও তাঁর পথসন্ধানের কাল। কোন্ পথে তাঁর প্রতিভার মুক্তি — তা তখনও পর্যন্ত স্পষ্ট করে চিনে উঠতে পারেন নি। পাশাপাশি, সমকালীন সমাজে মালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং সেই বিরোধে মধ্যস্থানীয়দের আখের গোছানোর চেষ্টা প্রত্যক্ষ বাস্তব। সেই বাস্তবতাকেই আশ্রয় করেছেন তিনি এই নাটকে।

মদন সিরিজের দুটি নাটক লেখেন মনোজ মিত্র ১৯৭৪ সালে — 'আমি মদন বলছি' এবং 'মদনের পঞ্চকান্ড'। দুটিই মদনের একক সংলাপ। 'খাটো ধুতি, সস্তা জামা, ছেঁড়া চটি আর ময়লা গামছায়' মদন আমাদের চিরপুরাতন গৃহভৃত্য। সেই গ্রামের মদনের দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন সমকালীন নাগরিক সভ্যতা এবং নাগরিক মানুষকে। গৃহভৃত্য হবার সুবাদে মনিবের জীবনের সব অলিগলিতেই মদনের অবাধ যাতায়াত। ফলে বাইরের ঝকঝকে পালিশের আড়ালে যে রংচটা রূপ তা সহজেই তার চোখে পড়ে। এই কারণেই কোথাও তার চাকরি বেশিদিন টেঁকে না। নিজের জীবনের গোপন কথা চাকরের কাছে ফাঁস হয়ে গেলে কোন্ মনিব আর সেই চাকরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন! তাই মদনকে বিদায় না করা পর্যন্ত তারা স্বস্তি পান না। আর মদনও ক্রমাগত বিতাড়িত হতে হতে কাজের সন্ধানে ফেরে। শহুরে কর্তাগিন্নি দু'জনেই পরনারী এবং পরপুরুষে আসক্ত। মদনকে দুজনের ওপরই স্পাইগিরি করতে হয় দুজনের নির্দেশে। কিন্তু মদন কারো কাছেই সত্য প্রকাশ করে না। একদিন নিজেদের অপকর্ম নিয়ে মুখোমুখি পড়ে যান কর্তা-গিন্নি। প্রথমে তীব্র চিৎকার, গালাগাল আর শাসানি আর তারপর চোখের জলে ক্ষমা প্রার্থনা। যখন আমে-দুধে মিশে গেল তখন উভয়েরই ক্রোধের কারণ মদন। কারণ ঃ ''এরপরে সাহেব কি মেমসাহেব আর মদনের দিকে

চোখ রেখে কথা বলবেন কী করে? মদন যে তেনাদের গোপন জীবনের সাক্ষী।''[৭২] বিতাড়িত মদন এরপর কাজ পায় কুঁদো মস্তানের কাছে। নিজের এলাকায় কুঁদো দোর্দন্ডপ্রতাপ। সামাজিক নানা বিরোধ নিষ্পত্তি থেকে শুরু করে ভাড়াটে উচ্ছেদ পর্যন্ত কুঁদোর কর্মকান্ডের অন্তর্গত। শিক্ষাক্ষেত্র কুঁদোর খাজনা আদায়ের সবচেয়ে বড়ো তালুক। ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষা পর্যন্ত সবই তার 'আন্ডারে' চলে, যদিও সে নিজে প্রথম শ্রেণিও উত্তীর্ণ হয় নি। রাজনৈতিক নেতারাও ভোট-বৈতরণী পেরোতে একান্তভাবে নির্ভর করেন এই কুঁদো মস্তানের ওপর। নির্বাচনে কুঁদো যাকে সাহায্য করেছিল, নানা চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তিনি হেরে গেলেন তখন ভয়েই মদন পালিয়ে গেল। কিন্তু পরে দেখা গেল, মদন মিছেই ভয় পেয়েছিল — জার্সি বদল করে কুঁদো ঢুকে গেছে জয়ী প্রার্থীর দলে।

মদনের তৃতীয় মনিব অচিনবাবু। সেই অচিনবাবুর স্ত্রী লায়লা। সংসারে শত অভাব সত্ত্বেও ফ্যাশনে তার কোনো কম নেই। বাড়িতে র‍্যাশন ওঠে না, বাজার হয় না — অথচ লায়লা বৌদির সাজগোজের বিরাম নেই। পাড়ায় 'প্রেস্টিজ' রাখতে কালার টিভি তার চাই, টেলিফোন না হলেও চলে না। লজ্জা নিবারণ করতে অচিনবাবু টেবিলক্লথ জড়িয়ে ঘরের কোণে শুয়ে থাকেন আর যেখানে যা কিছু সঞ্চয় ভেঙে বৌয়ের আব্দার মেটান। বিয়ের সময় নিজের উপার্জন বাড়িয়ে বলার খেসারত এভাবেই তিনি দিয়ে চলেন। নিজে যখন কঠিন অসুখে পড়লেন তখন তার স্ত্রীর একবার কাছে বসারও সময় নেই — সে তখন এক বিয়েবাড়িতে যাবার জন্য হাইহিল পরে হাঁটা অভ্যাস করছে। মদন এ সবই সহ্য করেছিল কিন্তু যেদিন অচিনবাবু তার কাছে ওষুধ কেনার টাকা চাইলেন সেইদিন অচিনবাবুরই দেওয়া চার মাসের মাইনে হাতে তুলে দিয়ে মদন বিদায় নিয়েছে। যে মনিব চাকরের কাছে হাত পাতেন তার কাছে মদন নিরাপত্তা বোধ করে কী করে! চতুর্থবারে মদন আশ্রয় পেয়েছে দাড়িবাবার কাছে। দাড়িবাবার দাড়িতে সুমিষ্ট দুধ ঝরে। সমস্যাগ্রস্ত মানুষ একবার সেই দাড়ি চুষে দুধ পান করলেই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পায়। তবে সেই দাড়ি চোষার সুযোগ মেলে উপযুক্ত দক্ষিণার বিনিময়ে। যে যত পাপই করুক, একবার দাড়ি চুষলেই সব পাপ থেকে মুক্তি। মদনও ভেবেছিল, বাবার পদসেবা করে দাড়ি চোষার সুযোগ নিয়ে সব পাপ-তাপ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু দাড়ি চুষতে গিয়ে শেকড় সুদ্ধ তিনহাত লম্বা দাড়ি উপড়ে তার হাতে উঠে এলো। স্পঞ্জের দাড়ির মধ্যে দুধের থলি রেখে বাবা ভক্তদের ধোঁকা দেন। স্পঞ্জের সেই গুরুকে ত্যাগ করে মদন আবার পথে নামে। পঞ্চকান্ডের শেষ কান্ডটি মদনের জীবনে ঘটেছে গদাই পালোয়ানের বাড়িতে। সারাদিনে প্রচুর খান গদাই পালোয়ান আর মদনকে শরীর-স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে বিবিধ উপদেশ দেন। নিজে অত্যন্ত দুর্বল বলে গদাই পালোয়ানের আশ্রয়ে থেকে মদন অত্যন্ত খুশি। কিন্তু রাত নামতেই বোঝা গেল, জগতশ্রী পালোয়ান রাতের বেলা ভূতের ভয়ে ভীত। গোঁ গোঁ করতে করতে সে পড়েছে মদনের বুকের ওপর। মদন কোনোক্রমে ভূতের ভয় দেখিয়ে নিজেকে মুক্ত করে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। যে গদাই দাবনার শোভা বাড়াতে একাই হাটবাজার গিলে ফেলছে, যার খাদ্যের সিকিভাগ পেলে মদনের গাঁয়ের মানুষ বর্তে যেত, যার 'ভেতরে ফোঁপরা, বাইরে পোদর্শন'— তার কাছে আর ফিরে যাবে না মদন। তাই সে আবার বেকার।

'আমি মদন বলছি'-তে মদনের গ্রাম এবং পরিবারের পরিচয় দিয়েছেন মনোজ মিত্র। হাসনাবাদ

লাইনের তেঁতুলে-বিষ্টুপুর গ্রামের ঈশ্বর ঘোঁতন মন্ডলের সেজো ছেলে মদন মন্ডল। গ্রাম বড়ো 'অসোন্দর'। সেখানে রাস্তাঘাট নেই, ব্রীজ নেই, আলো নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। তাই কোমলচিত্ত, সুন্দরের পিপাসু মদন সুন্দরের খোঁজে আসে শহর কোলকাতায়। কিন্তু ক্রমে তার কাছে উন্মোচিত হয় এই শহরের প্রকৃত রূপ। ঝকঝকে পালিশের আড়ালে কদর্য মুখটাকে আবিষ্কার করে সে বিস্মিত, হতভম্ব হয়ে পড়ে। 'মদনের পঞ্চকান্ড'তে মদন মনিবদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে আর 'আমি মদন বলছি'-তে সে নিজেরই একের পর এক মনিব 'ক্যান্সেল' করেছে। প্রথম সে ঠাঁই পেয়েছিল রেলের ঘুষখোর বড়বাবুর বাড়িতে। রেলের বসার আসন, আলো, পাখা – সবই এসে স্থান পায় বড়বাবুর বাড়িতে। মদন সেসব গোছায় আর মনের সুখে গান গায়। কিন্তু যেদিন সে মনিবের ডায়াবেটিসের কথা জেনেছে সেদিনই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে। কারণ যে সুন্দরের ছবি সে মনের মধ্যে এঁকে রেখেছে তার সঙ্গে ডায়াবেটিস খাপ খায় না। একাধিক মনিব 'ক্যান্সেল' করার পর মদন ফটিক দালালের হাত ধরে এসে ওঠে চিত্রাভিনেত্রী নন্দিনী দেবীর বাড়িতে। যে নন্দিনীর সৌন্দর্যে বহুদিন থেকেই মুগ্ধ মদন, তাকে একেবারে সামনাসামনি দেখা। এ যে একেবারে কল্পনারও অতীত। মদন সারাদিন কাজ করে আর দু'চোখ ভরে সেই সৌন্দর্য দেখে। মনে তার দারুণ সুখ। লুকিয়ে-চুকিয়েও সে দেখে নন্দিনীদেবীর সৌন্দর্য। এই দেখাই তার কাল হ'ল। ড্রেসিংরুমের দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ চালিয়ে মদন তো অবাক – যাকে নিয়ে সবাই এত উচ্ছ্বসিত তার মাথায় কিনা একটাও চুল নেই – বসে বসে সে কিনা টাকের ওপর ফলস চুল সাজাচ্ছে। সুন্দরের আবরণ খসে যেতেই মদন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এসে জুটেছে একেবারে হরনাথবাবুর বৈঠকখানায়। সেখানেও সে মাস তিনেকের বেশি টিঁকতে পারে নি। তারপর থেকে একের পর এক মনিব সে বাতিল করেছে, অনাহারে মৃতপ্রায় হয়েছে কিন্তু অসুন্দরের দাসত্ব করেনি। সেই সময়ই সে কোলকাতার রাস্তায় দেখেছে ছুরি-বন্দুক আর বোমবাজি, দেখেছে গাড়িতে আগুন ধরানো আর স্ট্যাচু ভেঙে ফেলা। মানুষকে ক্রমাগত অসুন্দর হতে দেখে মদন পীড়িত হয়েছে। শহরে থেকেই সে জেনেছে গ্রামের সংবাদ – সেখানে মড়ক লেগেছে, ফসল যা হয়েছে মিলিটারির খাবার জন্য ক্রোক করা হয়েছে, তার বাবা ধান নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছে। মদন কিন্তু কিছুতেই আর ফিরবে না তেঁতুলে-বিষ্টুপুরে। সে তখন কলেজের মাস্টার ডাকসাইটে পন্ডিত হরনাথবাবুর বাড়িতে কাজ করে। সেখানে বৈঠকখানায় কত বিচিত্র ব্যক্তির আড্ডা, কত বিষয়ে রাজা-উজির মারা। কিন্তু সেখানেও যে প্রদীপের নিচে অন্ধকার। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় বেরিয়ে আসে তাদের কদর্য চরিত্রের কথা। অশ্লীল ভাষায় দু'জনে আক্রমণ করে দু'জনকে। সুন্দরের সন্ধান না পেয়ে মদন সেখান থেকেও বেরিয়ে পড়ে। সেখান থেকে মদন যায় নেতা 'কালীনাথ বোম্মোচারী'র কাছে। মদনদের তেঁতুলে-বিষ্টুপুর থেকে ভোটে জিতে কালীনাথ এখন দেশসেবক। সেই দেশসেবকের খাস চাকর হয়ে মদনের উপার্জনও ভালোই। কারণ চাকরকে খুশি না রাখলে বাবুর কাছে পৌঁছনো যায় না। একদিন সে দেখে ফেলে স্বামীর ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে আসা এক অসহায় মহিলা কীভাবে 'গান্ধীবাবা' কালীনাথের লালসার শিকার হয়। কাঁপতে কাঁপতে মদন সিঁড়ির নিচে গিয়ে ঢুকেছে। সে বুঝেছে ঃ"এ সংসার পচে গেছে ... আমি গেঁড়ে মদন ; পচা কাঁঠালে সোন্দর কোষ খুঁজতিছি।"[৭৩] তাই আর সে বাড়ি পাল্টাবে না, মনের মতো বাবু না পেয়ে সে এবার বাবুদের মনের মতো হবে। কিন্তু মাঝরাতে মাতাল কালীনাথ সিঁড়ির নিচে থেকে টেনে বের করেছে মদনকে, পুলিশ ডেকে চুরির অপরাধ ধরিয়ে দিতে গেছে মদনকে, নিজের অপকর্মের

কোনো প্রমাণ সে রাখবে না। কোনোমতে পালিয়ে মদন নেমেছে রাস্তায়, ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে কয়েকজনকে দেখে সব খুলে বলে সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু তারাই যে কালীনাথের জাগ্রত যুবশক্তি। রেসে যা হেরেছে তার অন্তত পঁচিশ টাকা তারা বিকভার করতে চায় মদনকে 'ভেসেকটমি' করিয়ে। পথ খুঁজে পায় না তেঁতুলে-বিষ্টুপুরের গেঁড়ে মদন – তাকে কি খোজা হয়ে এই শহরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে – এই প্রশ্নের মধ্যেই নাটক শেষ হয়।

এই দুটি নাটকে মনোজ মিত্র বিশ শতকের সাতের দশকের অস্থির সময়ে নগর কোলকাতার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলিকে তুলে ধরেছেন গ্রাম্য যুবক মদনের দৃষ্টিতে। বাইরে থেকে আসা যে কোনো মানুষের মতোই মদনের চোখেও প্রথম পড়েছে শহরের ঝাঁ চকচকে বাইরের রূপটি, কিন্তু গৃহভৃত্য হবার সুবাদের সে যত কাছে থেকে দেখেছে মানুষগুলিকে ততই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নাগরিক সভ্যতার কদর্য দিকটি। বাইরের পালিশের আড়ালে মানুষের অন্তঃসারশূন্য রূপ তার বিশ্বাসবোধকে আহত করেছে। বিচিত্র মদনের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার সূত্রেই প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকারের সমাজ-সচেতনতা। সমকালীন নগর কোলকাতায় তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদের চারিত্রিক যে অধঃপতন দেখা গিয়েছিল, পরিবার-জীবনে যা রোপণ করছিল অশান্তির বীজ, তা দেখেছে মদন অভিজাত অঞ্চল নিউ আলিপুরে রায়সাহেবের বাড়িতে এবং কলেজ স্ট্রীটের বিখ্যাত কলেজের ডাকসাইটে অধ্যাপক হরনাথবাবুর বাড়িতে। ভোগবাদ সমাজে তখন সবে থাবা বসাতে শুরু করেছে। সেই ভোগবাদের সর্বনাশা ফল মদন প্রত্যক্ষ করেছে অচিনবাবুর স্ত্রী লায়লার মধ্যে। বাড়িতে প্রতিদিন চলছে ঝিঙেপোস্ত, অথচ যে ভাবেই হোক রঙিন টি.ভি চাই, টেলিফোন চাই। অন্তঃসারশূন্য সেই আড়ম্বরকে মদন ব্যাখ্যা করে তার মতো করেই – ''ঘরেতে শাক জোটে না, বৈঠকখানায় লাল বিছানা।'' এই বাবুয়ানিকে, এই ভোগসর্বস্বতাকে মনোজ মিত্র সমাজের ক্ষতিকারক দিক হিসেবেই দেখেছেন এবং মদনের মাধ্যমে তাকে কৌতুকে-ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন। ঘুষখোর রেলের বাবু, ভন্ড সাধু দাড়িবাবা, গান্ধীবাবা কালীনাথ ব্রহ্মচারী, মস্তান কুঁদো – সকলেরই মুখোশের আড়ালের মুখটাকে দেখেছে মদন আর শিউরে শিউরে উঠেছে – এত অসুন্দর নাগরিক সভ্যতা, এত কুৎসিত সেখানকার মানুষেরা!

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মদন-সিরিজের এই দুটি নাটকে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তকে ছুঁয়ে গেছেন মনোজ মিত্র। বাংলাদেশের যে গ্রামগুলি একসময় ছিল প্রাণশক্তির উৎস, সেই গ্রামের দুর্দশার চিত্র ফুটেছে মদনের বর্ণনায় ঃ ''খানাখন্দ ডোবা নালা ... বর্ষাকালে এই তক্ পাঁক ... পাটপচা দুর্গন্ধ ... ঘরে হাঁড়ি চড়ে না ... কোমরের কাপড় মাথায় তুলে পার হতে হয় কৈখালির বিল ...''[৭৪] চিকিৎসা বলতে সেখানে হাতুড়ে হেকিম। যুদ্ধের সময় গ্রামের ফসল ক্রোক করা হয়েছে মিলিটারির খাবার জন্য, লড়তে গেলে জুটেছে পুলিশের গুলি। বিদ্যুৎ সেখানে দূরকল্পনা, বিজলি বাতির খাম্বাও তখনো ঢোকে নি গ্রামে। সেই কংকালসার গ্রাম থেকে, অসুন্দর গ্রাম থেকে গেঁড়ে মদন এসেছে নগর কোলকাতায় -- এসেছে সুন্দরের আশায়। কিন্তু সাতের দশকের সেই উত্তাল সময়ে নগরজীবনে কোথায় সৌন্দর্য? সেখানে তখন চলছে মস্তানরাজ, চলছে রাজনীতিক-মস্তানের নিবিড় যোগসাজশ। নগরে মস্তান যেন গ্রামের জমিদারের মতো প্রতাপশালী। একেক মস্তানের এক এক অঞ্চল। কয়েকজন মস্তান এলাকা ভাগ করে তখন কোলকাতা শাসন করে। সমকালের কোলকাতায় এ ছিল নিতান্ত বাস্তব। সেই বাস্তবতাকেই

মনোজ মিত্র তুলে ধরেছেন মদনের জবানীতে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা তখন শিক্ষায়। ভর্তি থেকে পরীক্ষা — সবেতেই মস্তানের একচ্ছত্র প্রভাব। অশিক্ষিত সেই মস্তানদের শিক্ষাজগৎ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মদন বলে ঃ " ও বাবু যারা মড়া পোড়ায় তারা তো আজ্ঞে 'ক' অক্ষর চেনে না, তবে তারা বি. এ., এম. এ. পাশ করা লোক পোড়ায় কি করে ? আপুনিও তেমুনি বাবু ইস্কুল কলেজের মড়ি পোড়াচ্ছেন।"[৭৫] এই ধরণের সংলাপ মনোজ মিত্রের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গিটিকে চিনিয়ে দেয়। বুঝেই খোঁচা দেয়, না না-বুঝে, তা যেন ঠিক ধরে উঠতে পারা যায় না। এই মস্তানদের ঘাড়ে চেপেই তখন ভোটে জেতেন নেতারা — ফলে নেতাদের কাছে তারা পরম আদরের জন। মোটরবাইকে চেপে মস্তানদের ওয়াগন ভাঙতে যাওয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে মাস্তানি, ভোটের বাজারে জিপ হাঁকিয়ে মস্তানদের ঘুরে বেড়ানো, দেশনেতার 'জাগ্রত যুবশক্তি'র উল্লেখ, ভেসেকটমি-আতঙ্ক প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ সময়ের সামাজিক অবস্থাকেই স্মরণ করায় সত্য, কিন্তু সময় এবং রাজনীতির পরিবর্তনে সমাজের আদৌ কোনো মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে কি ? আজো কি ভণ্ড দাড়িবাবারা সমাজের বুকে জাঁকিয়ে বসে নেই, আজো কি রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে সমাজবিরোধীরা লালিত হচ্ছে না, বাইকবাহিনী কি রাজনীতির অনুষঙ্গে আজো ত্রাসের কারণ নয় ? আসলে রাজা বদলালেও দিন বদলায় না। এই নাটক তাই সমকালকে ধারণ করেও চিরকালের।

১৯৮২ সালে লেখা 'কাকচরিত্র' একাঙ্কটিতে মনোজ মিত্র এক ভূয়োদর্শী কাক চরিত্র সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন সমাজের গভীরে স্থিত ভিন্নতর সত্যকে। বাস্তববাদী নাটকার বলে নিজেকে দাবি করেন রাষ্ট্রপতি-পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার ব্যোমকেশ ভৌমিক। তিনি গর্ব করেন ঃ "আমি ব্যোমকেশ ভৌমিক বাস্তব জীবন থেকে তুলে এনে বসাই ! যাকে বলে বাস্তববাদী ... জীবনবাদী লেখা ..."[৭৬] কিন্তু কাকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি যখন জগৎকে চেনেন তখন উপলব্ধি করেন ঃ "গজদন্ত মিনারে বসে আমি এতোকাল বাস্তববাদী লেখক হবার গর্ব করছিলাম।"[৭৭] তিনি নিজের নাটকে নায়ক করেছিলেন বেঁটেখাটো দ্বিজুবাবুকে। কারণ দ্বিজুবাবু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে লোকের বাড়ির আরশোলা ছারপোকা টিকটিকি মেরে লোকের উপকার করেন। ছোটোখাটো মানুষের এইসব ছোটোখাটো মহত্ত্বকে নিয়েই নাটক লিখতে চান ব্যোমকেশ। কিন্তু দ্বিজুবাবুর ঘর থেকে কাক যে মানিব্যাগ, যে দামী পেন, যে হাতঘড়ি নিয়ে এসেছে সেগুলো তো ব্যোমকেশেরই। বুক-র‍্যাকের উই মারতে এসে দ্বিজুবাবু সেগুলো সরিয়েছেন। কাকই জানিয়েছে, দ্বিজুবাবু এই পরোপকারের নাম করে লোকের বাড়ি থেকে বিভিন্ন জিনিস হাতিয়ে নিয়ে আসে আর দ্বিজুর বৌ সব বেচে দেয়। নিজের নায়কের এই পরিচয় পেয়ে হতভম্ব ব্যোমকেশ সমস্ত লেখাটা নষ্ট করে ফেলেছেন। এরপরই তিনি সন্ধান পেয়েছেন আরেক নায়কের। তাঁরই পাড়ার ডাক্তার দাশ নিজের বাড়িতে দুর্ঘটনায় মৃত রাজমিস্ত্রি ছেদিলালের মর্মর মূর্তি স্থাপন করে ব্যোমকেশকে দিয়েই তা উদ্বোধন করাতে চান। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এই ভালোবাসাই ডাক্তার দাশকে মহৎ করে তোলে ব্যোমকেশের দৃষ্টিতে। তিনি ডাক্তার দাশকে নায়ক করেই নাটক লিখতে বসে যান। কিন্তু কাক তো ভূয়োদর্শী। ডাক্তারের পাশের বাড়ির অ্যান্টেনায় বসে সে দেখেছে প্রকৃত সত্য। কালো টাকা রাখবার গোপন কুঠুরি বানিয়ে দিয়েছিল ছেদিলাল, কিন্তু উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে লোক জানাজানির ভয় দেখালে মই ঠেলে ফেলে দিয়ে ছেদিলালকে খুন করেছে ডাক্তার। ব্যোমকেশ আবার বুঝেছেন — বাইরে থেকে মানুষকে কতটা কম বোঝা যায় ! যে ডাকাতেরা ব্যোমকেশের নিরুদ্দেশ মামা এবং বর্তমানে সাধু পরিচয়

দিয়ে ব্যোমকেশের কাছে 'শেলটার' চেয়েছিল তাদেরও প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করেছে কাক। কিন্তু দ্বিজুবাবু বা ডাক্তার দাশ বা ডাকাত তো বাইরের লোক, ব্যোমকেশ যে নিজের ঘরের লোকটিকে চিনতেও ভুল করেছেন। নিচের তলায় দরজা বন্ধ করে দুপুরবেলায় রেডিওতে তারই লেখা নাটকের অভিনয় শুনছে তার স্ত্রী – এরকমই মনে করতেন ব্যোমকেশ। কিন্তু কাক-ই তাকে জানিয়েছে, নাটক নয় – নিচে যা ঘটছে তা চরম বাস্তব। প্রত্যেক দুপুরে ব্যোমকেশ যখন ওপরে বসে লেখেন, তখন নিচে তার স্ত্রীর কাছে আসে অন্য পুরুষ। এত সত্য সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই, তাই বোধহয় মানুষ বানিয়ে তোলো সত্যকেই প্রকৃত সত্য বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। নিজের চেতনাসহ সেই সত্য যেদিন ভেঙে পড়ে সেদিন ব্যোমকেশের মতোই সকলে রক্তশূন্য মুখে ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

এই ছোটো নাটকটিতেও মনোজ মিত্র তাঁর সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক মানুষের মুখ আর মুখোশের খেলা উন্মোচন করেছেন ভূয়োদর্শী কাকের দৃষ্টিতে। আবার এই আস্তাকুঁড়-ঘাঁটা কাকই হয়ে উঠেছে নাটকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, যে মানুষ ভুখা, যার কাছে ব্যোমকেশের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এক টুকরো রুটি ঃ ''রাষ্ট্রপতি তোমায় পুরস্কার না দিয়ে আমায় যদি একখানা রুটি দিত গা।''[৭৮] একজন সাধারণ মানুষের জীবনদৃষ্টি কত সহজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এখানে। যে মানুষেরা বিপ্লবের কথা, সমাজতন্ত্রের কথা বলে তাদের প্রতি ব্যঙ্গের তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে ডাক্তার দাশের অন্তঃসারশূন্য বিপ্লবী বাণীতে ঃ ''বিপ্লব চাই ... খেটে খাওয়া মানুষকে মর্যাদা দিতে চাই আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব! এই ঘুণধরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঙ্কালের ওপর বসে তারই সাধনা করতে হবে ব্যোমকেশবাবু! কায়েমী স্বার্থ নিপাত যাক''[৭৯] যে কোনো ব্যাপারেই মেকি বিপ্লবিয়ানা দেখিয়ে এই মানুষেরা বিপ্লবকে খেলো করে তুলেছিলেন। সত্য-মিথ্যা নিয়ে এই নাটকে যেন ব্যোমকেশ আর কাকের মধ্যে এক অদ্ভুত খেলা চলেছে। যে সত্যজ্ঞান ব্যোমকেশের গর্বের কারণ ছিল তা কাকের দৃষ্টিতে একের পর এক মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে শেষতম মোহভঙ্গটি ব্যোমকেশের কাছে চরম আঘাত। এই সত্যের মুখোমুখি হতে তিনি সাহস পান নি। তাই কাকের আহ্বানে নিচে যান নি সত্য যাচাই করতে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে থাকলে তো সত্য কখনো মিথ্যে হয়ে যায় না। সত্য যতই রূঢ় হোক, তার মুখোমুখি হতে হয় – সেটাই জীবন। জীবনের সেই শিক্ষাই ব্যোমকেশকে দিয়েছে কাক ঃ

> ''নিজের ভেবে পরের ডিমে তা দিই ... ফোটাই ... আদর করি ... তারপর একদিন কুহু কুহু!
> দুখানা ডানা নাড়তে নাড়তে তারা চলে যায়, পিছু ফিরেও চায় না ... কোন্ আকাশে হারিয়ে যায় ...
> (থেমে, গলার বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে) তা বলে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? যা সত্যি তার মুখোমুখি
> দাঁড়াতে হবে..'',[৮০]

মনোজ মিত্র বলতে চান, সংসার আসলে কাকের মতোই পরের ডিমে তা দেওয়া – ডানায় বল হ'লে মায়া-মমতা ভুলে সকলেই উড়ে যাবে নিরুদ্দেশের পানে।

'প্রভাত ফিরে এসো' (১৯৮৮) একাঙ্কটিতে দেখানো হয়েছে, ক্রমাগত অপব্যবহার কীভাবে মানুষের সরলতার অপমৃত্যু ঘটায়। সৌম্য-ঝুমুরের বসার ঘরে শুরু হয়েছে এই নাটক, যে ঘরটিকে

ঝুমুর সাজিয়েছে অন্যের কাছ থেকে চেয়ে আনা আসবাবে এবং নিজেও সেজেছে ধার করা অলঙ্কারে। এই সাজসজ্জার পেছনে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে। নাট্যকার সৌম্যকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল ঝুমুর। কোলকাতার উত্তাল সময়ে নতুন থিয়েটার, রাগী থিয়েটার যখন সমাজদেহে নির্মম চাবুক চালাচ্ছে তখন দুর্দান্ত সৌম্য নাটক লেখে, নাটকের দল চালায়। সেই সৌম্য এবং ঝুমুরের মধ্যে প্রেম হয় এবং তারপর বিয়ে। কিন্তু বিয়ের পরই সৌম্যর হার্টের গোলমাল দেখা দিল। কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র বসানোর জন্য যে টাকা প্রয়োজন তা ঝুমুর আদায় করেছিল নিজের বিধবা মায়ের প্রেমিক নীলুমামার কাছ থেকে। এজন্য সে স্কটিশ কলেজে তার একদা সহপাঠী গ্রাম্য সরল প্রভাতের সঙ্গে নিজের এক মিথ্যে সম্পর্কের ফাঁদ পেতেছিল। কারণ কেলেঙ্কারির ভয় না দেখালে নীলুমামার থেকে টাকা আদায় করা যেত না। স্কটিশ কলেজে ঝুমুরকে দেখে, ঝুমুরের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ছিল প্রভাত। গ্রাম্য প্রভাতের সেই সরল মুগ্ধতাকে ব্যবহার করে ঝুমুর এবং তার শহুরে বান্ধবীরা তাকে বানিয়েছিল 'মোর্গা'। বারাসাতে বাবার চিংড়ি মাছের কোল্ড স্টোরেজের ক্যাশ ভেঙে প্রভাত আসত প্রেম জমাতে আর বসন্ত কেবিন-সাঙ্গুভেলিতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে, প্রচুর খেয়ে ঝুমুর সেই ক্যাশের 'সদ্‌গতি' করতো। প্রভাতের সরল ধারণায়, সেটাই ছিল প্রেম। নিজের মিথ্যে জন্মদিনের কথা বলে ঝুমুর প্রভাতের কাছ থেকে হাতঘড়িও আদায় করেছিল। আজ দীর্ঘদিন পর ঝুমুরের সেই মিথ্যে জন্মদিনকে মনে রেখে প্রভাত আবার আসবে বলে চিঠি দিয়েছে। কুয়েতে তেলের ব্যবসা করে সে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছে। ঝুমুর আবার ফাঁদ পেতে প্রস্তুত। এবারে তার প্রয়োজন পঁচিশ হাজার টাকা। প্রভাতের বুকের পেসমেকারটা গোলমাল করছে। টাকাটা না পেলে যে কোনো মুহূর্তে তা 'ডেড-স্টপ' হয়ে যেতে পারে। প্রভাতের নির্বোধ সরলতাই এখন একমাত্র ভরসা। ঝুমুর নিশ্চিত, আজো প্রভাত তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে অনায়াসে টাকাটা দিয়ে দেবে। প্রভাতের আসাকে কেন্দ্র করে ঝুমুরের উচ্ছ্বাস দেখে সৌম্য প্রথমে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, তারপর নিজের চিকিৎসার টাকা পাওয়া যাবে জেনে উল্লসিত ও উৎকন্ঠিত, শেষে প্রভাতকে ঠকাবার জন্য ঝুমুরের পরিকল্পনা শুনে ব্যথিত ও গ্লানিজর্জর। সৌম্যর এই আচরণ ঝুমুরের বিবেককে জাগিয়ে তোলে, প্রভাতকে নিয়ে নিষ্ঠুর অভিনয়ের পীড়ন তাকে বিদ্ধ করে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে যখন প্রভাত আসে তখন ঝুমুরের মানসিকতা বদলে গেছে। বিনা প্রয়োজনে বিনা স্বার্থে আজ প্রভাতের সঙ্গে সে সময় কাটাতে, গল্প করতে, খাওয়াতে চায়। কিন্তু অনেক বড় চমক অপেক্ষা করে ছিল ঝুমুরের জন্য। বাইরে সেই সরল নির্বোধ গ্রাম্য প্রভাতের রূপ থাকলেও প্রভাত নামে মানুষটা ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সবাই ঠকিয়ে ঠকিয়ে তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। প্রবঞ্চিত সরলতা তাই আজ ক্রূর হয়ে উঠেছে। নিজের সেই পুরনো রূপটাকে সামনে রেখে চেনা-আধচেনা মানুষদের বাড়িতে গিয়ে সে এখন ডাকাতি করে। কুয়েত, তেলের ব্যবসা ইত্যাদি সবই গল্পমাত্র। ঝুমুরকেও সে মুখ-হাত বেঁধে রেখে ঘরের সব জিনিস নিয়ে চলে যায়। হতভম্ব ঝুমুর বিস্মিত হয়ে দেখে সরলতার অপমৃত্যু — যে মৃত্যু ঘটানোর দায় আরো অনেকের সঙ্গে সমানভাবে তারও।

প্রভাত এই নাটকে সরলতার প্রতীক। মানুষের অপব্যবহারে সরলতা কীভাবে কদর্য হয়ে যায় — তাই দেখানো হয়েছে এই চরিত্রটির পরিণতির দ্বারা। সামাজিক ব্যবস্থায় প্রভাতের স্নিগ্ধতা রক্ষিত হতে পারে না, শেষ পর্যন্ত প্রভাতকে ফিরিয়ে আনার আর্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় মানুষেরই অপকর্মের

ফলে। সিরিয়স বিষয়কেও কৌতুকস্নিগ্ধ করে প্রকাশেই মনোজ মিত্র সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কৌতুকধারা যেখানে স্তব্ধ সেখানেই তাঁর দুর্বলতা প্রকট। আলোচ্য নাটকটিও সেরকম একটি দুর্বলতার নিদর্শন। দু'একজায়গায় সংলাপের দ্যুতি নাট্যকারের জাত চেনালেও সামগ্রিকভাবে কোথায় যেন অপূর্ণতার খেদ থেকে যায়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় গঠনকৌশলের দুর্বলতার দিকটি। অনেক জায়গাই অনাবশ্যক দীর্ঘ। ফ্ল্যাশব্যাকে ঝুমুরের মা এবং নীলুমামার দৃশ্যটি গঠনগত দিক থেকে নাটককে শিথিল করেছে। শেষ পর্যন্ত এই একাঙ্কটি তাঁর খুব সার্থক সৃষ্টি বলে গণ্য হবে না।

'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩) একাঙ্কটিতে মনোজ মিত্র ধরেছেন একটু উচ্চবিত্ত সমাজকে। সল্টলেকের একটি ফ্ল্যাটে একা থাকে অভিনেত্রী চন্দনা। অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পথে যাদের আনুকূল্য বিতরণ করতে হয়েছে তাদের অন্যতম প্রযোজক রাহুলবাবু। তিনি মাঝেমাঝেই চন্দনার ফ্ল্যাটে রাত কাটান, একপ্রস্থ জামাকাপড়ও তার এখানেই থাকে। এক ঝড়বাদলের সন্ধ্যায় চন্দনা নিজের ফ্ল্যাটে রাজা অয়দিপাউস নাটকে রাণী ইয়োকাস্তের ভূমিকার মহড়া দিচ্ছে। হঠাৎ পাশের ফ্ল্যাটের ঈশিতা ফোন করে জানায়, বর্ষার সন্ধ্যায় সে যখন বাচ্চার খাবার কিনতে বেরিয়েছিল তখন 'মাথা ভর্তি চুল গাল ভর্তি দাড়ি কালো ট্রাউজার নীল শার্ট' একজন লোক তার ছাতার তলায় ঢুকে গিয়ে প্রশ্ন করেছে - 'চিনতে পারো'? ফোনালাপ চলতে চলতেই সেই মানুষটি উপস্থিত হয়েছে চন্দনার ফ্ল্যাটের দরজায়, মুখে সেই একই প্রশ্ন - 'চিনতে পারো'? চন্দনা কিছুটা যেন মজা করতেই লোকটিকে ভেতরে ডেকে আনে, কৌতুক করেই তাকে চিনতে পেরেছে বলে জানায়। লোকটি চন্দনাকে নিজের স্ত্রী বলে ভুল করতে থাকে, যে স্ত্রী মানসিক অসুস্থতার জন্য তাকে ছেড়ে চলে গেছে। চন্দনাও লোকটির ভুলে সায় দিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু লোকটি যখন ঘর ছেড়ে আর যেতে চাইছে না তখন মজা কেটে গিয়ে আস্তে আস্তে জাগতে থাকে বিরক্তি। এদিকে শুটিং-এর জায়গায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে চন্দনার ফ্ল্যাটে এসেছেন রাহুল এবং বলা বাহুল্য, সেই পাগল লোকটিকে দেখে খুশি হন নি। রাহুল-চন্দনার জীবনের ঘটনার সঙ্গে পাগল মানুষ মিশিয়ে দেয় নিজের স্ত্রী নন্দিতার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কাহিনি। চন্দনা বুঝতে পারে, পৃথিবীর সব গল্পই অদ্ভুতভাবে ঘুরে ফিরে একরকম। তার মনে হয় – 'সব চন্দনারাই নন্দিতা ... সব নন্দিতারাই ...'। ক্ষুধার্ত পাগল মানুষকে চন্দনা যখন খেতে দেয় তখন জানালায় হঠাৎ ভেসে ওঠে পুলিশ সার্জেন্টের মুখ। সার্জেন্ট জানান, এই লোকটি বছর দুয়েক আগে নিজের বাবাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। কারণ তার প্রেমিকা নন্দিতাকে দখল করে নিয়েছিল তারই জন্মদাতা বাবা। রাজা অয়দিপাউস-এর নতুন ভাষ্য সেদিন শোনা যায় সল্টলেকের ফ্ল্যাটে। বাসব অর্থাৎ সেই প্রেমিকের বিচার শুরু হতেই পাগলামির লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। পাঠানো হয় মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে। সেখান থেকেই সে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু তার পাগলামি সত্যি না ভাণ তা বুঝে উঠতে পারেন নি ডাক্তাররাও। শেষ পর্যন্ত চন্দনার উন্মুক্ত পিঠে 'হ্যাঁ' লিখে বাসব জানিয়ে দেয় – সে সুস্থ। তার মাথাই সবচেয়ে সজাগ। আসলে ছেলেটির সেই কথাই চরম সত্য ঃ ''পৃথিবীর সব লোককেই প্রমাণ করতে পারো অসুস্থ, আবার সুস্থও বলতে পারো। মানে অসুস্থ বলেও চিনতে পারবে না, আবার সুস্থ বলেও না ...''[৮১] নাটকের শেষে চন্দনার কণ্ঠে অয়দিপাউস নাটকের সংলাপ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাঁচতে হলে, সুস্থভাবে বাঁচতে হলে জীবনের অনেক ভয়াবহ ঘটনাই আমাদের ভুলে যেতে হয়।

এই নাটকে মনোজ মিত্র দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন সামাজিক কলুষের দিকে। সমাজে

প্রতিনিয়ত যে ওপরে ওঠার লড়াই চলছে, সেই লড়াই জিততে গেলে ছাড়তে হয় অনেক কিছু, ভুলতে হয় অনেক কিছু। এই শহরে ঈশিতার মতো উচ্চবিত্ত গৃহবধূরা টি.ভি.-সিনেমায় মুখ দেখাবার জন্য নিজেদের বিকিয়ে দিতেও প্রস্তুত। অনির্বাণ ভোগাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্যই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সামাজিক ব্যভিচার। অনেক কর্দমাক্ত ভূমি মাড়িয়ে পৌঁছতে হয় যশ এবং প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল ক্ষেত্রে। প্রত্যেকের জীবনের গল্পটাই ঘুরে-ফিরে একইরকম। যারা এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, সব কিছু ভুলে থাকতে পারে – পৃথিবীতে তারাই সুস্থ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয়, আর যারা ভুলতে পারে না – তারাই অসুস্থ – তারাই পাগল। সুস্থ-অসুস্থের বোধ গুলিয়ে দিয়ে মনোজ দেখান, অয়দিপাউস নাটক আসলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিনীত হচ্ছে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই।

নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্র নিজের সময় এবং সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। সামাজিক বর্গের নাটকগুলিতে তাঁর সেই দায়বদ্ধতা প্রকাশিত। চারপাশের যেসব সামাজিক কলুষ তাঁকে পীড়িত করেছে, বেদনার্ত করেছে - কৌতুকের শরে তিনি সেগুলিকে বিদ্ধ করেছেন। বাইরে থেকে সমালোচনা নয়, এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই একজন হিসেবে তিনি আঙুল তুলেছেন এর অসঙ্গতির দিকগুলিতে। এই আঙুল তোলা সমাজশোধনের বাসনায়। সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি যেমন দেখেছেন রাজনীতির নীতিহীনতা এবং সুবিধাবাদী চরিত্র, তেমনি দেখেছেন ধর্মের কৌশলী ব্যবহার। এই দুটি অবক্ষয়ের ক্ষেত্রেই প্রধানভাবে আক্রান্ত হয়েছে তাঁর নাটকে। এছাড়াও তিনি সমাজে প্রত্যক্ষ করেছেন, মানুষের দ্বারা মানুষের ব্যবহৃত হবার চিরন্তন ইতিহাস। প্রভুত্ববাসনা মানুষের সহজাত। সেই বাসনা থেকেই মানুষ অন্য অনেক মানুষকে নিজের পদানত করতে চায়, আজ্ঞাবহ করতে চায়। অসহায়তার সুযোগ নিয়ে একজনকে মাড়িয়ে অন্যে ওপরে উঠতে চায়। এই কাজে মানুষের সহায়ক প্রধানত অর্থ এবং ক্ষমতা। এই দুয়ের জোরেই বশীভূত করা হয় অন্য মানুষকে। সেই ব্যবহারকারী এবং ব্যবহৃত মানুষেরাও প্রবলভাবে বর্তমান মনোজ মিত্রের নাটকে। নাটকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই তিনি স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সুবিধাবাদী রাজনীতিক, ভন্ড ধর্মধ্বজী আর উঁচুতলার শোষকের। অবক্ষয়ী সমাজের নিছক চিত্রাঙ্কনেই কিন্তু শেষ হয়ে যায় না তাঁর সামাজিক নাটক, বরং এই অবক্ষয় থেকে উত্তরণের দিশা দেখান তিনি। সে দিশা স্পষ্ট হয় কখনো শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সর্বাত্মক সংগ্রামে, কখনো বা তীব্র জীবনীশক্তির প্রাবল্যে, কখনো মানুষের ভেতরকার শুভবোধের জাগরণে, কখনো প্রান্তিক মানুষের জীবন ও চরিত্রোপযোগী প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, আর কখনো কিছু সহৃদয় মানুষের আন্তরিক সহযোগিতায়। 'শিবের অসাধ্যি' বা 'কিনু কাহারের থেটার'-এর মতো কোনো কোনো নাটকে দিশা খুব স্পষ্ট নয় বলে নাট্যপরিণতি কিছুটা আরোপিত মনে হ'লেও অধিকাংশ নাটকেই নাট্যকারের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও ঋজু। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের আধারে না হ'লেও এসব নাটকে তিনি মূলত দেখাতে চেয়েছেন শোষিত, প্রান্তিক, সাধারণ মানুষের জয়। সেই জয়ের উপযোগী পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই তাঁর অভিপ্রায়। এই সৃষ্টির কাজটি তিনি করেন সমস্তরকম নাটকীয় শর্ত মেনে। তাই বক্তব্য তাঁর নাটকে ভার হয়ে থাকে না, জীবনের সহজ চলনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - কুন্তল চট্টোপাধ্যায় - রত্নাবলী-৩৯ এ পটুয়াটোলা লেন -কোলকাতা-০৯ -চতুর্থ সংস্করণ - অক্টোবর, ২০০৪

২) The Types of Drama - Problem Play - The Anatomy of Drama - Kalyani Publishers - New Delhi - Ludhiana - 1999, পৃ.১৪৯-৫০

৩) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড) - আশুতোষ ভট্টাচার্য - এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড-২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ-বইমেলা, ২০০৪, পৃ.৪৩।

৪) ঐ, পৃ.৪৭৬।

৫) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন-কলকাতা - ০৯ প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ২০০১, পৃ.১৪

৬) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০৬, পৃ.১২২

৭) ঐ, পৃ.১২৩

৮) ঐ, পৃ.১২৪

৯) ঐ, পৃ.১২৫

১০) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-দ্বিতীয় খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ.১১

১১) ঐ, পৃ.২৩-২৪

১২) ঐ, পৃ.৪১

১৩) ঐ, পৃ.৪৭

১৪) ঐ, পৃ.৪৮

১৫) ঐ, পৃ.৪৯

১৬) ঐ, পৃ.৪৯

১৭) সাজানো বাগানে চোখ রেখে - দেবাশিস মজুমদার - দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান - ৬ আগস্ট ২০০৫

১৮) ঐ

১৯) মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার (বিপ্রতীপ দে) - দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান - ৬ আগস্ট ২০০৫

২০) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১

২১) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৩

২২) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৪

২৩) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র, পৃ.১৩৩

২৪) নাট্যকার মনোজ মিত্র অভিনেতা মনোজ মিত্র - শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় - অমৃত - ০৭.০৪.১৯৭৮

২৫) সাজানো বাগান - অশোক মুখোপাধ্যায় - বারোমাস, জুলাই, ১৯৭৮

২৬) দেশ - ২৮ জানুয়ারি, ১৯৭৮

২৭) সাজানো বাগানে চোখ রেখে - হাসান আজিজুল হক - দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান - ৬ আগস্ট ২০০৫

২৮) রাজদর্শন -- মনোজ মিত্র -- মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১৩৫

২৯) ঐ, পৃ.১৩৬

৩০) শিবের অসাধ্যি -- মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১৯

৩১) রাজদর্শন -- মনোজ মিত্র -- মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১২৮

৩২) ঐ, পৃ.১১২

৩৩) ঐ, পৃ.১১৯

৩৪) ঐ, পৃ.১২৩

৩৫) The tree haunted me - Manoj Mitra - PCP - 25-10-1986

৩৬) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র -- মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩, পৃ.২৮৬

৩৭) ঐ, পৃ.২৯১

৩৮) The tree haunted me - Manoj Mitra - PCP - 25-10-1986

৩৯) নৈশভোজ- মনোজ মিত্র — মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২৬০

৪০) ঐ, পৃ.২৫৮

৪১) ঐ, পৃ.২৮০-২৮১

৪২) কিনু কাহারের থেটার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২,পৃ.২৭৪

৪৩) কিনু কাহারের থিয়েটার - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য: হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৪১

৪৪) কিনু কাহারের থেটার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.২৭৩

৪৫) ঐ, পৃ.২৫৪

৪৬) ঐ, পৃ.২৫৬

৪৭) ঐ, পৃ.২৭১

৪৮) ঐ, পৃ.২৬৫

৪৯) কিনু কাহারের থিয়েটার - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য: হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৪৪

৫০) আত্মগোপন - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩২১

৫১) ঐ, পৃ.৩৩৩

৫২) ঐ, পৃ.২৯২

৫৩) ঐ, পৃ.৩৩০

৫৪) ঐ, পৃ.৩২৪

৫৫) ঐ, পৃ.৩২৫

৫৬) ঐ, পৃ.৩২৭

৫৭) ঐ, পৃ.২৮৭

৫৮) ঐ, পৃ.৩০৩

৫৯) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০, পৃ. ৫৩

৬০) ঐ, পৃ.৫৩

৬১) ঐ, পৃ.২২

৬২) ঐ, পৃ.৪৬

৬৩) ঐ, পৃ.২৫

৬৪) ঐ, পৃ.২২

৬৫) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৮৫

৬৬) ঐ, পৃ.১৮৫

৬৭) ঐ, পৃ.১৬৪

৬৮) ঐ, পৃ.৯০

৬৯) কালবিহঙ্গ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৯০

৭০) ঐ, পৃ.৪১০

৭১) ঐ, পৃ.৪১০

৭২) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৮২

৭৩) আমি মদন বলছি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৫৫

৭৪) ঐ, পৃ.৪৪৩

৭৫) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৮৫

৭৬) কাকচরিত্র - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৩৫৯

৭৭) ঐ, পৃ.৩৭১

৭৮) ঐ, পৃ.৩৫৯

৭৯) ঐ, পৃ.৩৬৩

৮০) ঐ, পৃ.৩৭২

৮১) বৃষ্টির ছায়াছবি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪০৬

পারিবারিক নাটক

পারিবারিক নাটকের পৃথক পরিচয়কে স্বীকৃতি না দিয়ে অধিকাংশ সমালোচকই একে সামাজিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কোন একটি সময়ের সামাজিক সমস্যা ও সংকট নিয়ে নাটকই সাধারণত সামাজিক নাটক। কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আরো পরে যৌথ পরিবারের বিলুপ্তি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে জীবনের জটিলতা যত বেড়েছে সমস্যার প্রকৃতিও তত বদলেছে। এইরকম সমস্যার নাট্যরূপায়ণ হলে সেই সামাজিক নাটককে Problem Play বলা হয়ে থাকে। সমালোচকদের মতে, পরিবার-আশ্রিত নাটকে যেসব সমস্যার কথা বলা হয় তা যেহেতু বৃহত্তর অর্থে সামাজিক সমস্যাই, সেহেতু এই শ্রেণির নাটককে সামাজিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন। একথা সত্য যে, পারিবারিক নাটক বৃহত্তর অর্থে সামাজিক নাটকের সমধর্মী। কিন্তু যে কোন সামাজিক নাটককেই পারিবারিক নাটক বলা চলে না। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বা 'সধবার একাদশী' আসলে সামাজিক নাটক। আবার মনোজ মিত্রেরই 'চাক ভাঙা মধু' বা 'সাজানো বাগান'ও সামাজিক নাটক। এদের কোন ভাবেই পারিবারিক নাটক বলা চলে না। যদিও প্রতিটি নাটকেই পরিবারের কথা আছে। এখান থেকেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সামাজিক বর্গ থেকে পারিবারিক নাটককে পৃথক করার। একটি বা দুটি পরিবারের মধ্যে যেখানে নাট্যকাহিনি সীমাবদ্ধ, নাটকের কেন্দ্রীয় সমস্যা যেখানে পারিবারিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে সম্পর্কিত, বাইরের জগতের বা পরিবারের ভিতরের কোন সমস্যায় বিপর্যস্ত পরিবার-জীবন যখন নাটকের উপজীব্য তখন তাকে পারিবারিক নাটক বলা হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে যে, একটি পরিবারের বিশেষ সমস্যার মধ্যে যখন বৃহত্তর সমাজের সমস্যা উপলব্ধ হয় তখনই তা সামাজিক নাটকের দিকে এগোয়। পরিবার বিশেষের সমস্যা যদি সমাজেরও সাধারণ সমস্যা হয় তাহলে তা সামাজিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে।

আমাদের দেশে, বা বলা চলে পৃথিবীর যে কোনো দেশেই গোষ্ঠীজীবন ভেঙে গিয়ে পরিবার তৈরি হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা থেকে। ব্যক্তিত্বচেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চাইল গোষ্ঠীর সম্পদের ওপর অধিকার। কিন্তু সে অধিকার নিরঙ্কুশ হ'ল না বলেই পরিবারের মতো এককে বিভক্ত হয়ে গেল গোষ্ঠী। কিন্তু আরো পরে দেখা গেল, পরিবারের সম্পত্তিও 'ব্যক্তিগত' হচ্ছে না। মানুষ আরো ক্ষুদ্রতর বৃত্তে ভোগের অধিকার চাইল। একই পরিবারের একাধিক মানুষের উপার্জন সমান নয়, কাজ করার ক্ষমতা সমান নয়— খুব বেশিদিন তা মেনে নিতে পারল না অধিক উপার্জনশীল বা অধিক কর্মক্ষম মানুষ। ফলে পরিবারের মধ্যেও ভাঙন ধরল। ক্ষুদ্রতম বৃত্তে ভোগের আয়োজনকে নিরঙ্কুশ করল মানুষ। সেই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে যার কাজ নেই, উপার্জন নেই, সে চিহ্নিত হ'ল বাতিল, অপ্রয়োজনীয় মানুষ হিসেবে। মনোজ মিত্র নিজের নাট্যরচনার সময় চারপাশে দেখেছেন পরিবার পুরনো অর্থে

আর নেই। প্রকৃত অর্থে পরিবার যখন ছিল তখন সমাজ ভোগবাদী ছিল না। আধুনিক ভোগবাদী সমাজের পরিবারে অর্থের কাছে সম্পর্ক মূল্যহীন। সবচেয়ে করুণ অবস্থা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। তাঁর যেন পরিবারের কাছে 'বোঝা'। উপার্জন নেই, কাজের ক্ষমতা নেই – ফলে তাকে বহন করা 'লাভজনক' নয়। বৃদ্ধাশ্রমের ধারণাও তখন তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ফলে নিতান্ত অনিচ্ছাতে হলেও সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে পরিবারেই স্থান দিতে হচ্ছে। কিন্তু সে দেওয়া সম্মানের নয়, করুণার।

মনোজ মিত্র দেখেছেন, আধুনিক পরিবার Physically আছে কিন্তু Psychologically নেই। নামে যিনি 'হেড অব দি ফ্যামিলি' তাকে বাইরে বের করে দেওয়া যাচ্ছে না কখনো চক্ষুলজ্জার কারণে, কখনো সম্পত্তির লোভে। এই লোভকে জিইয়ে রেখেই সংসার প্রাসঙ্গিক থাকতে চান মনোজ মিত্রের বৃদ্ধরা। এরা প্রবলভাবে জীবন-পিয়াসী, তাই সমাজ এবং সংসারে লগ্ন হয়ে থাকতে চান। নিজেকে অন্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দেখে তৃপ্তি পেতে চান। এ যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবার ভয় থেকে মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু মুশকিল হ'ল একসময় তাঁরই হাতে গড়া পরিবার তাঁকে আর সেই দৃষ্টিতে দেখে না। এঁরা সংসারকে ভালোবাসতে চাইলেও সংসার এদের ভালোবাসে না। স্ব-সৃষ্ট এই বৃদ্ধদের সম্পর্কে মনোজ মিত্র বলেছেন ঃ

> ''আমার বৃদ্ধেরা কেউ বৃত্তী পুরুষ নয়, নয় সমাজসংসারে প্রভাবপ্রতিপত্তিশীল গণ্যমান্য হোমরাচোমরা। সবাই বড় তুচ্ছ মানুষ, টুটাফাটা, সংসারে যাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। প্রায় সবাই উত্তরপুরুষের হাতে লাঞ্ছিত, অসম্মানিত। আমার বৃদ্ধেরা যেন ঝিলপুকুরে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরতে বসেছে। উত্তরপুরুষ সেই মায়ার বঁড়শি ছিঁড়ে বেরোতে চায়।''[১১]

এই বৃদ্ধদের অসম্মান এবং লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবার জন্যই পারিবারিক বর্গের নাটকে মনোজ মিত্রের লড়াই। তাঁর চরিত্ররাও লড়াই করে – বেঁচে থাকার লড়াই, প্রাসঙ্গিক থাকার লড়াই। মনোজ মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> ''এ লড়াই খুব একটা উচ্চস্তরের নয়, যথেষ্ট অভিজাত নয়। তবে জীবন ক্ষুদ্র তুচ্ছ বলে লড়াইটাও অকিঞ্চিৎকর, এমন সর্বনাশা সিদ্ধান্তে না আসাই তো উচিত। আমার বৃদ্ধেরা কেউ হারে না, বিনা যুদ্ধে এক ছটাক জমি ছাড়ে না ... শেষ হাসিটা তারাই হাসে।''[১২]

১৯৫৯ সালে মনোজ মিত্রের প্রথম নাট্যরচনা 'মৃত্যুর চোখে জল'। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে রচিত সেই এক বিনিদ্র রাতের ফসলে তিনি নিজের পরিবারের অতি চেনা কিছু ব্যক্তির জীবন তুলে ধরেছেন বলে নিজেই জানিয়েছেন। সেই প্রথম প্রয়াসের পর আরো বহুবার নিজের রচনায় তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারকে আশ্রয় করেছেন। সমাজ বা রাষ্ট্রর মতোই মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনেও তিনি লক্ষ করেছেন মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা, মানবিক বোধে স্বার্থের ঘৃণপোকার দংশন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস মানুষের ওপর। তিনি প্রত্যয়ী, মানুষের মধ্যেই আছে শুভ চেতনা এবং কল্যাণশক্তি। তাই তাঁর নাটকে মানবিকতার অবক্ষয়ের মধ্যেও স্নেহ-মায়া-মমতা-

ভালবাসার দীপশিখাটি অনির্বাণ থাকে। নেতিদর্শন ঘটিয়ে আমাদের শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক অবস্থানে পৌঁছে দেন তিনি, কোন বক্তব্য আরোপ করে নয়, বরং সহজ স্বাভাবিক অসংখ্য নাট্যমুহূর্তের মালা গেঁথে।

মনোজ মিত্রের পারিবারিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হল 'কেনারাম বেচারাম', 'পরবাস', 'দম্পতি', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'শোভাযাত্রা', 'স্মৃতিসুধা', 'আত্মগোপন' এবং 'পালিয়ে বেড়ায়'। এই বর্গের একাঙ্ক সৃষ্টিগুলি 'মৃত্যুর চোখে জল', 'পাখি', 'টাপুর টুপুর', 'সন্ধ্যাতারা', 'আঁখিপল্লব' এবং 'আকাশচুম্বন'। ১৯৫৯ সালে লেখা 'মৃত্যুর চোখে জল' থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সালে রচিত 'পালিয়ে বেড়ায়' পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বৎসরব্যাপী এই বর্গের বিস্তার। নাটকগুলির রচনাকাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১৯৫৯ এবং '৬০ সালে 'মৃত্যুর চোখে জল' এবং 'পাখি' রচনার পর এই ধারার নাটক আবার পাচ্ছি ১৯৬৭-তে ('টাপুর টুপুর')। এর মাঝে তিনি 'অশ্বত্থামা' রচনা করে ঘুরে এসেছেন পুরাণের জগৎ থেকে। পারিবারিক বর্গে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হল ১৯৭০ সালে 'কেনারাম বেচারাম' (পুনর্লিখন ১৯৭৭) এবং 'পরবাস' (পুনর্লিখন ১৯৭৫)। এরপর আট বছরের ব্যবধানে 'দম্পতি' (১৯৭৮) এবং আরো দশ বছর পর 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' (১৯৮৮) এবং 'শোভাযাত্রা' (১৯৯০)। ৭০-৭৮-এর মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি 'নরক গুলজার' (১৯৭৪) এবং 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭)। ৭৮-৮৮- র মধ্যে মধ্যে লিখেছেন 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯), 'রাজদর্শন' (১৯৮১) এবং 'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫)। 'স্মৃতিসুধা' (১৯৯৩) এবং 'আত্মগোপন' (১৯৯৪) রচনার আগেই 'গল্প হেকিমসাহেব' এর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে মনোজের অতীতচারণা। 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫) এবং 'ছায়ার প্রসাদ' (১৯৯৭-৯৮) নাটকে তারই অনুবর্তন। 'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯) নাটকের মধ্যে দিয়ে আবার পারিবারিক বৃত্তে ফিরে এলেন তিনি।

পারিবারিক বর্গের নাটকগুলিকে অন্তত তিনটি উপবর্গে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে একটি উপবর্গে প্রধান হয়ে উঠেছে আশ্রয়ের সমস্যা। আশ্রয় দু'রকমের হতে পারে — বাসস্থানের দিক থেকে এবং অস্তিত্বের দিক থেকে। মনোজ মিত্র এই দু'রকম আশ্রয়ের সমস্যাই দেখিয়েছেন। 'দম্পতি', 'পরবাস' ও 'সন্ধ্যাতারা' নাটকে বড় হয়ে উঠেছে বাসস্থানের সমস্যা। তার মধ্যে 'পরবাস'-এ বাসস্থানের পাশাপাশি অস্তিত্বের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। 'মৃত্যুর চোখে জল' এবং 'কেনারাম বেচারাম' নাটকে অস্তিত্বের প্রশ্নই মুখ্য। পারিবারিক বৃত্তে মানবিক আবেদন, মমতা, সহানুভূতি এবং অনিবার্য পতনের বিষণ্ণতা প্রকাশ পেয়েছে 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'শোভাযাত্রা' ও 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকে। পারিবারিক ক্ষেত্রে দাম্পত্যের বিচিত্র রূপ তুলে ধরেছেন মনোজ 'দম্পতি', 'পাখি', 'টাপুর টুপুর', 'আঁখিপল্লব', 'স্মৃতিসুধা' ও 'আকাশচুম্বন' নাটকে।

'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০) প্রথমে গ্রুপ থিয়েটারের জন্য লেখা হলেও পেশাদার

রঙ্গমঞ্চে (রঙমহল) দীর্ঘদীন অভিনীত হয় 'বাবাবদল' নামে। নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত একটি ঘোষণার মধ্যে দিয়ে নাটক শুরু হয় এবং সেই ঘোষণাতেই জানা যায়, সত্তর বছরের বৃদ্ধ বেচারাম চাটুজ্যে, যার চুল পাকা, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, পরিধানে লাল লুঙি ও গেরুয়া পাঞ্জাবি, নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সন্ধান দাতা উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন। পর্দা সরতেই দেখা যায় সন্ধান জানাবার ঠিকানা অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট বেচারাম চ্যাটার্জীর বাড়ির বসার ঘর। এই বাড়িতে আছে বেচারামবাবুর দুই পুত্র, এক পুত্রবধূ, এক নাতি এবং চাকর শ্রীধর । গৃহকর্তা নিরুদ্দেশের সংবাদ পেয়ে এলাহাবাদ থেকে এসেছে মেয়ে-জামাই বুড়ি এবং প্রদীপ, এসেছেন বড় পুত্রবধূ দীপ্তির বাবা চারুচন্দ্র চ্যাটার্জী, বার- অ্যাট-ল, বসিরহাট থেকে এসেছ দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ভৈরব। বেচারামবাবুর জন্য উদ্বেগে নয়, এরা প্রত্যেকেই এসেছেন উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিতে। পুত্রবধূ এবং কন্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব মায়ের গয়নার বাক্স নিয়ে, সিন্দুকের চাবি নিয়ে। বেচারামবাবু বলেছিলেন, তিনি বর্তমান থাকতে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কিছুই ভাগ হবে না। কিন্তু এখন যেহেতু তিনি 'অবর্তমান', সুতরাং সম্পত্তি ভাগ হতে কোনো বাধা নেই। সেই আশায় অফিসে 'উইদাউট পে' হয়েও বুড়িকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে জাঁকিয়ে বসে আছে প্রদীপ আর শ্বশুরকে খুঁজে বের করার জন্য একেক দিন একেকটা নতুন নতুন পরিকল্পনা করছে। দীপ্তি-শুভেন্দুও কিছুতেই সম্পত্তির ভাগ দেবে না। মায়ের গয়না আর বাবার সম্পত্তি নিয়ে ব্যবসা দাঁড় করানো এবং ছেলেকে দার্জিলিং-এ হস্টেলে রেখে পড়ানোর স্বপ্ন তাদের। তাদের পক্ষে আছেন দীপ্তির বাবা চারুচন্দ্র চ্যাটার্জী, বার-অ্যাট-ল। তিনি যে মক্কেলকে ধরেছেন তারই মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছেন। সম্পত্তি এবং গয়নার বাক্সের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব যখন তুঙ্গে তখন আবির্ভাব বর্ধমানের নগেন পাঁজার, যে কিনা ঘর-পালিয়েদের খুঁজে এনে যথাস্থানে 'ফিট করে' দেয়। সবসময় যে সে ঠিক মানুষটিকেই ধরে আনতে পারে এমন নয়, তবে বক্তৃতার তোড়ে আর সুযোগের সদ্ব্যবহারে তার আনা মানুষকেই প্রকৃত মানুষে পরিণত করে ফেলে। নগেন পাঁজা বেচারামবাবুর ফিরে আসার সংবাদ দিতেই সকলে মুষড়ে পড়ে। সম্পত্তির আশু বাঁটোয়ারা ভেস্তে যেতে সকলেই হতাশ হয়। নগেন বহু ঘাটের জল খেয়েছে। মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। সহজেই সে বুঝতে পেরেছে সকলের অখুশি হওয়ার কারণ এবং দিয়েছে মোক্ষম চাল ঃ ''তাই বেচারামবাবু পথে আসতে আসতে আমায় বলছিলেন, এবার বিষয়সম্পত্তি সব ছেড়ে দেবেন। যে তাঁকে খুশি করবে, তার হাতেই সব তুলে দেবেন।''[৩] নগেনের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় খুশি করার প্রতিযোগিতা। কচি ডাব, পাকা বেল, ক্ষীরকদম, পিতৃভোগ, পপকর্ণ, ছানার জিলিপি, পয়োধি, মায় মেটুলি চচ্চড়ি পর্যন্ত অর্ডার হয়ে যায় 'বেচারামবাবু'র জন্য। আপাদমস্তক প্লাস্টারে মোড়া 'বেচারাম'কে হাজির করলে শুরু হয় তাকে আপন করে নেবার প্রতিযোগিতা। সকলেই নিজের ভালোবাসা জাহির করতে ব্যস্ত। কিন্তু গোল বাঁধল মেটুলি চচ্চড়ি খাওয়াতে গিয়ে। প্লাস্টারে মুড়ে নগেন যাকে নিয়ে এসেছে সে আসলে কেনারাম। দীক্ষা নিয়েছে বলে যে কিনা পাঁঠা-মুরগী-রুই-কাতলা-বোয়াল-সিঙ্গি ছোঁয় না। জোর করে মেটুলি খাওয়াতে গেলে 'ধর্ম' রক্ষায় অগত্যা তাকে মুখের ব্যান্ডেজ খুলে 'না' করতেই হয়। আর তখন ধরা পড়ে যায় ফাঁকি। কিন্তু নগেন পাঁজা ভাঙলেও মচকায় না। মনোজ মিত্রের ধারালো সংলাপের জোরে সে কেনারামকেই বেচারামের শূন্যস্থানে 'ফিট করতে' তৎপর হয়ে ওঠে। কেনারামকে সে শিখিয়ে দেয় বেচারামের

অভিনয়। একের পর এক সন্দেহের নিরসন করে চলে তার নিজের সৃষ্ট যুক্তিতে। বেচারামবাবুর বাত ছিল কিন্তু কেনারামের নেই — এই বৈসাদৃশ্য ঢাকতে নগেনের যুক্তি ঃ

"নগেন ।। আচ্ছা, আপনারা কি চান বেচারামবাবুর পায়ে চিরকাল বাত থাকুক ?

বুড়ি ।। নিশ্চয় না!

নগেন ।। বাত সেরে গেলে আনন্দ করবেন কিনা!

বুড়ি ।। ষষ্ঠীতলায় হরির লুট দেবো!

নগেন ।। তবে দিন হরির লুট – বাত সেরে গেছে!"[৪]

বেচারামবাবুর দাঁত ছিল না শুনে কেনারামবাবুর দাঁত সাঁড়াশি দিয়ে তুলে দিতে উদ্যত নগেন। এটা তার কাছে কোনো সমস্যাই নয় ঃ "আমি বুঝতে পারছি না - মেজর মেজর পয়েন্টে যেখানে মিলে যাচ্ছে, সেখানে খুচরো দুটো দাঁতে কেন আটকাচ্ছে ? বেশ, তুলে দিচ্ছি"[৫] কৌতুকের এই আবহ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে যখন নগেন কেনারামকে বেচারামবাবুর চেয়ে সবদিক দিয়েই 'বেটার বাবা' বলে প্রতিপন্ন করে ঃ

"বেচারামবাবু দুবেলা ভাত খেতেন ... ইনি একবেলা খাবেন, দরকার হলে এটো কাঁটা খাবেন ... বেচারামবাবুকে কাপড় দিতে হত ... ইনি শ্রীধরের ছেঁড়া গামছা পরে লজ্জা নিবারণ করবেন! বেচারামবাবুকে বিছানা বালিশ দিতে হত, ইনি রোয়াকে থান ইট মাথায় দিয়ে শোবেন — মাঝে মাঝে ঠ্যাঙাতেও পারেন!"[৬]

নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ কেনারাম বেচারামবাবুর সংসারে 'ফিট হতে' গিয়ে পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ-নাতি-সহ সম্পূর্ণ সংসারের লোভে পড়ে গেছেন। এই ভরা সংসার ছেড়ে তিনি যেতে চান না, নগেনের শিক্ষা অনুসরণে পুত্র-কন্যাকে কাছে টেনে নিতে চান। অদ্ভুত অদ্ভুত মজার situation তৈরি করে নাটক এগোতে থাকে। পাড়ার ছেলেদের পরামর্শে জামাই প্রদীপ বোমের ব্যাগ নিয়ে এসেছ নগেনকে তাড়াতে, থানাতেও খবর দিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই বোমের কারণে নগেনই পুলিশের ভয় দেখায় প্রদীপকে। শুভেন্দুকেও একমাস যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট থাকা বাবার রেশন কার্ড সারেন্ডার না করার জন্য পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখায় । অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, প্রদীপ নগেনকেই জিজ্ঞেস করে তাদের তাড়াবার উপায়! তুখোড় নগেনের কৌশলের কাছে সকলেই মাৎ। ভোটপ্রার্থী ন্যাড়াজ্যাঠা নগেন-কেনারামকে তাড়াতেই এসেছিলেন, কিন্তু নগেন ফলস্ ভোটের লোভ দেখিয়ে তাকে কব্জা করে ফেলে ঃ

"নগেন ।। শ্রীধরের কাছে শুনলাম, ন্যাড়াবাবু আপনি নাকি ফলস্ ভোট খুঁজে বেড়াচ্ছেন...

ন্যাড়া ।। ডেফিনিটলি! ফলস্ ভোট ছাড়া আজকের দিনে কোন্ শালা ইলেকশানে ফাইট করতে পারে।

নগেন ।। রাইট... ভেরি রাইট! আর তাইতো আপনার জন্য ন্যাড়াবাবু, আমি বর্ধমান থেকে কেনারাম বাঁড়ুজ্যেকে ধরে নিয়ে এলাম। একাই পঞ্চাশটা ভোট দেবে...

ন্যাড়া ।। এইরকম কেনারাম তোমার কাছে আরও আছে ?

নগেন ।। আছে মানে কি, আমি তো সাপ্লায়ার। ইলেকশানের সময় আমি তো শত শত কেনারাম সাপ্লাই করি ...

ন্যাড়া ।। অনেক কেনারাম চাই আমার ! আমি কিনবো! এক একটা কেনারাম কিনতে কত পড়বে ?

শুভেন্দু ।। ন্যাড়া জ্যাঠা, কী ফুলতু বকছেন!

ন্যাড়া ।। না – ফালতু নয়। কেনারামকেই তুমি বাবা বেচারাম বলে চালিয়ে নাও শুভেন্দু।''[৭]

শেষ ভরসা পুলিশ। কিন্তু সেখানেও নগেন প্রখর। ইনস্‌পেক্টরকে সে 'ফিট করতে' চায় নেতাজীর শূন্যস্থানে ঃ

''নগেন ।। ...আমি আপনাকে ধরেছি! (গম্ভীর গলায়) কার মনে আছে ... কার মনে আছে, কোন বীর সন্তান, গায়ে এমনি খাকির পোশাক, বুকে এমনি চামড়ার বেল্ট, এমনি চওড়া কপাল ... বাংলা মায়ের বুক খালি করে দেশান্তরে হারিয়ে গেছে... বলুন, কে বলতে পারেন ...

ইনস্ ।। কার কথা বলছেন মশাই ... নেতাজী সুভাষ চন্দ্র!

নগেন ।। সে বুক আজো খালি... আজো খাঁ খাঁ করছে। স্যার, স্যার আপনাকে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।''[৮]

নগেন জানে, এদেশে একবার কোনো কিছু রটিয়ে দিতে পারলেই হল। তারপর আসল-নকলের মীমাংসা হতে হতে জীবন কাবার। নগেনের দর্শন স্পষ্ট ঃ ''একবার চালিয়ে দিলে বাকিটা জনগণই চালিয়ে নেবে''[৯] ইনস্‌পেক্টর এবার নগেনের হাত এড়িয়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু নগেন তাকে ছাড়বে না ঃ ''আমি আপনাকে ফিট করে দেবো স্যার। আজাদ হিন্দ ফৌজে ফিট করে দেবো... আবার ভারত সীমান্তে হানা দেবো... আবার সেই কদম কদম বাড়ায়ে যা – যা – যা – কদম কদম বাড়ায়ে যা''[১০] নগেনের অনুপস্থিতির সুযোগে শুভেন্দু আর প্রদীপ কেনারামকে রাস্তায় বের করে দিতে যায়, কিন্তু এবার একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী দীপ্তি এবং বুড়ি। কারণ নগেন ততদিনে তাদের মাথায় সম্পত্তি আর গয়নার লোভ ঢুকিয়ে দিয়ে দুজনকে দিয়েই কেনারামকে 'বাবা' ডাকিয়ে ছেড়েছে। এখন

তাদের লক্ষ্য বাবাকে ফিরে পাওয়া নয়, যে কোনো উপায়ে সম্পত্তি হস্তগত করা। তাই ফলস্ বাবাকে তারা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। কিন্তু সকলের সব আশায় ছাই দিয়ে বেচারামবাবুর ছোট ছেলে পিন্টুর জাঁহাবাজ প্রেমিকা কাকাতুয়া ইলেকট্রিক যন্ত্র দিয়ে সিন্দুক কেটে ফেলে আর পিন্টু গয়নার বাক্স নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। সেই মুহূর্তেই দরজায় দেখা দেন বেচারামবাবু — সেই লাল লুঙি, গেরুয়া পাঞ্জাবী, কালো ছাতা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর পাকাচুল সমেত। তার মুখেই জানা গেল, গয়নার বাক্সে কিছু টিনের চাকতি ছাড়া আর কিছুই নেই। ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শেখাতে, মেয়ের বিয়ে দিতে , বাড়ি করতে স্ত্রীর সব গয়না শেষ হয়ে গেছে। টিনের চাকতি সিন্দুকে ভরে প্রতিদিন রাতে না বাজালে এরা যে অনেক দিন আগেই তাকে বিদায় দিত, সে তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন। এতদিন তবু গয়নার বাক্সের মোহ ছিল, এখন যখন সে রহস্যও ফাঁস হয়ে গেছে তখন যে বাড়িতে আর তার স্থান নেই — একথা ভালোই বোঝেন বেচারামবাবু। তাই নাতি টোটন কেনারামকে তাড়িয়ে দিতে বললে তিনি বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসে বলেন ঃ ''আমি কে! আমি তো নেই! এতোকাল গয়নার বাক্সটা ছিল... এখন তাও ফাঁস হয়ে গেছে ! কেউ আমায় জায়গা দেবে না। ছেড়ে দে, আমি যাই...''[১১] কিন্তু মনোজ মিত্র তো মানুষের পরাভব দেখাবেন না, বিশেষত অসহায়, বিপন্ন মানুষের, তাই কিশোর টোটনকে দিয়ে তিনি ফিরিয়ে আনেন বেচারামকে। 'ফিট করে' দেন নিজের সংসারে ঃ ''না। তুমি যাবে না! এসো (দরজা থেকে বেচারামকে ফিরিয়ে আনছে) — বলো যাবে না, আর কখনো যাবে না!''[১২] টোটনের কথায় স্বার্থান্ধদের চোখ ফুটল, বেচারামবাবু সংসারে নিজের জায়গা ফিরে পেলেন আর নগেন কেনারামবাবুকে নিয়ে চললেন কলাবাগানে — হারিয়ে যাওয়া এক বছর মাসের শিশুর জায়গায় 'ফিট করতে'।

'কেনারাম বেচারাম' নিঃসন্দেহে হাসির নাটক, কিন্তু নাটকের মূল সমস্যা যথেষ্ট গভীর। মনোজ মিত্রের নাটকের সাধারণ লক্ষণ মান্য করেই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কেনারাম একজন বিপন্ন, অসহায় মানুষ, যে কিনা রেল লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিল। নিঃসঙ্গ এই মানুষটির হাহাকারে হৃদয় যেন ব্যথায় মুচড়ে ওঠে ঃ ''আমার যে কেউ নেই নগেন, এ সংসারে আমি একা''[১৩] বর্ধমানের 'বাড়ি-থেকে-পালিয়ে-ধরা' নগেন পাঁজা রেল লাইনের ধার থেকে কেনারাম বাঁড়ুয্যেকে তুলে এনেছেন নিরুদ্দিষ্ট বেচারাম চাটুজ্যের জায়গায় 'ফিট করতে'। বেচারামের ভরা সংসার দেখে লুব্ধ হয়ে পড়েছে নিঃসঙ্গ, পথের ভিক্ষুক কেনারাম। সংসারের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে তীব্র আকুলতা কেনারামের ঃ

> ''পারবে, পারবে নগেন, এই সব আমার করে দিতে পারবে ? নগেন, আমি নিঃস্ব, পথে পথে ভিক্ষে করে খাই, তুমি তো জানো, কেউ নেই আমার ! এর ওর দোকানে শুয়ে রাত কাটাই। ... পারবে, সব আমার করে দিতে ?''[১৪]

একজন অনিকেত মানুষের এই আশ্রয়লুব্ধতাকে মনোজ মিত্র দেখেন সহানুভূতির চোখে। কিন্তু তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা কখনোই ভালো-মন্দের স্পষ্ট বিভাজনে বিভাজিত নয়।

কেনারামও তাই নগেনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ক্রমশ ধুরন্ধর হয়ে ওঠে, প্যাঁচে ফেলে বুড়ি, দীপ্তি, এমনকি শুভেন্দুকে দিয়েও 'বাবা' ডাকিয়ে ছাড়ে। বুড়িকে দিয়ে বাবা ডাকানোর সময় ধুরন্ধর কেনারাম আর সংসারলুব্ধ, অসহায়, বিপন্ন কেনারামকে যেন পৃথক করা যায় না ঃ

"কেনারাম ।। একবার ডাক মা, বাবা বলে ডাক।

নগেন ।। নিন, চোখ কান বুঁজে ডেকে ফেলুন ...

বুড়ি ।। (দ্বিধান্বিত ভাবে) বাবা ...

কেনা ।। আবার বল্ ...

বুড়ি ।। বাবা ...

কেনা ।। আবার বল্ ...

নগেন ।। আরে দূর মশাই, আপনার মতো এরকম খোচোপার্টি আমি জীবনে পাইনি! বলছে তো !

কেনা ।। দু'বার বলেছে! নগেন, তিনবারে যে সত্যি হয় –

নগেন ।। বলুন তো মা আর একবারটি! ...

বুড়ি ।। বললাম তো ...

কেনা ।। বলেছিস ঠিক...কিন্তু আমার যে প্রাণটা ভরেনিকো,

নগেন ।। বলুন ... তিনবার বলুন তো মা ...

বুড়ি ।। বাবা ... বাবা ... বাবা ...."[১৫]

এই কেনারামকেই আবার ধূর্ত বলে মনে হয়, যখন পর মুহূর্তেই সে বলে ঃ "বুড়ু ও বুড়ু ... (ভেতরে যেতে গিয়ে ঘুরে) হচ্ছে নগেন ?"[১৬] কেনারামের সংসার নেই, আর বেচারাম সংসারে থেকেও নিরাশ্রয়। স্ত্রী বহুদিন গত হয়েছেন। ছেলেদের সংসারে তিনি এখন অবাঞ্ছিত। সংসারে উপার্জনহীন বৃদ্ধের করুণ অবস্থার দিকটি মনোজ মিত্র তুলে ধরেন বেচারামের সংলাপের মধ্যে দিয়ে ঃ

"বেচারাম ।। ... একটা জিনিস খেতে চাইলে পাবো না ... পরতে চাইলে পাবো না। মুখটি বুজে থাকো ! বাড়িতে ভদ্দরলোক এলে, ছেলে বলবে, গেট আউট ... পার্কে গিয়ে বসো ... তুমি সামনে গেলে, আমার মান যাবে। বাপু হে, সংসারে আমাদের মতো বুড়ো বাপের অবস্থাটা কী রকম জানো ...

নগেন ।। বলুন তো ...

বেচা ।। অ্যাপস্ট্রপির মতন !

নগেন ।। অ্যাপস্ট্রপি !

বেচা ।। হুঁ, ইংরেজি ভাষার অ্যাপস্ট্রপি ! মাথার পরে সাজানো থাকে ... কোনো উচ্চারণ নেই ! আমরা বুড়ো মা-বাপ ও তাই। হেড অব দি ফ্যামিলি ... নো প্রোনানশিয়েশান।''[১৭]

বেচারাম ঠেকে শিখেছেন : ''এ সংসারে কেউ নিজের না। টাকা ! নিজের কেবল টাকা ! ... বাপুহে টাকা থাকলে ছেলেমেয়ে কেনাও যায় ... বেচাও যায়।''[১৮] বাক্সে ভরা কিছু টিনের চাক্তির জোরে সংসারে টিকে থাকতে থাকতে ঘেন্না ধরে গেছে জীবনে, তাই নিরুদ্দেশ হয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছিলেন। গানের গলা শুনে যাত্রাপার্টিতে বিবেক সাজতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে, কিন্তু সেখানেও দেখলেন সংসারেরই হাল : ''এক নম্বর অ্যাক্টর মাছের মুড়ো খাবে ... দু নম্বর খাবে ধড় ... তিন নম্বর খাবে পোঁচা ... তার বিবেক টিবেক চুষবে কাঁটা ...'' [১৯] ফলে সেখানেও তিনি নিজেকে 'ফিট করতে' পারলেন না। নাট্যকার শেষ পর্যন্ত বেচারামকে নিজের সংসারে 'ফিট করে' দেন ঠিকই কিন্তু সত্য হয়ে থাকে বেচারামের, বেচারামের মতো সংসারে অবাঞ্ছিত বৃদ্ধদের আর্তি : ''হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা জায়গা আমার দরকার ... উটকো শ্যাওলার মতো আর ঘুরতে পারিনে ... একটা জায়গা ... নিজের জায়গা ...''[২০] বেচারামের মতোই অনিকেত নগেন পাঁজাও। হারিয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া লোক ধরে এনে সংসারে 'ফিট করে' দেয় যে নগেন, সেও নিজের সংসারে 'ফিট হতে' পারে নি। কৌতুকময় এই চরিত্রের গভীরে বেদনার যে প্রস্রবণ রয়েছে তার চকিত উদ্ভাস লক্ষ্য করা যায় নাটকে নগেনের একটি মাত্র সংলাপে। শুভেন্দুর ভাগ্নে ভৈরবকে নগেন 'ফিট করতে' চায় নিজের জায়গায়। দুর্বল নগেন পাঁজা নিজের ভাঙা ঘর জোড়া লাগাতে পারে না, তাই সে কাজে লাগাতে চায় শক্তসমর্থ ভৈরবকে :

> ''(কঠিন মুখে) পারবি হতে নগেন পাঁজা ? কিছু করতে হবে না ... শুধু একটা বৌয়ের দিকে নজর রাখবি। দেখবি সে কোথায় যায়, কি করে, কার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আমায় ছেড়ে সে কাকে চায় ? ... কেন, তার অভাব কিসের ? (লকলকে করাতের ফলার মতো নগেনের মুখ চোখ কণ্ঠস্বর) তুই বলবি আমিই নগেন পাঁজা! আমি সে আগের নগেনের মতো দুর্বল না। আমার ভাঙা ঘর জোড়া লাগাবো আমি! বল্ যাবি, বল্। ওই ফল্স লোকটাকে শক্ত হাতে ভাগিয়ে দিবি ? বল্, আমায় বাঁচাবি।'' [২১]

মানুষের এই অনিকেত সত্তার পাশাপাশি নাটকে ব্যঞ্জিত হয় আরেকটি গভীরতর সত্যও — সংসারে কোথাও ঠিক জায়গায় ঠিক মানুষটি নেই — সকলেই 'মিসফিট'। এর ইঙ্গিতও

আছে নগেনের সংলাপে ঃ ''একটা জায়গা দেখাতে পারেন, যেখানে আসল লোকটি বসে আছে ? মন্ত্রী থেকে শিক্ষক, রাজ্যপাল থেকে ঝাড়ুদার, পাহারাদার থেকে হরিদ্বার সর্বত্রই কি একটা ভুয়ো লোক জাঁকিয়ে বসে নেই ? বলুন, আমরাই কি তারে বসিয়ে রাখিনি।''[২২]

পারিবারিক বৃত্তে স্বার্থপরতা, সম্পর্কের চেয়ে সম্পত্তির প্রতি অধিক আকর্ষণ প্রভৃতির পাশাপাশি মনোজ মিত্র তাঁর অন্যান্য নাটকের মতো এই নাটকেও পরিচিত প্রতিবেশের ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, মন্ত্রিসভা গঠনের সময় এম. এল. এ.-দের দর বাড়ানো, রাজনীতির নীতিহীনতা, ভোটের আগে ও পরে নেতার দুই রূপ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। তবে সবটাই নাটকীয় পরিবেশকে রক্ষা করে এবং কৌতুকময়তার আবরণকে বিঘ্নিত না করে। নিরুদ্দেশ শ্বশুরমশাইকে খুঁজতে জামাই প্রদীপ একবার পুলিশ-কুকুর কাজে লাগাবার কথা বললে শুভেন্দুর সংলাপে নাট্যকার খোঁচা দেন সরকারি অফিসারদের ঃ ''আর ভুল সে করবেই। গভর্নমেন্টের টপমোস্ট অফিসাররাই যখন সর্বদা উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁদের হাতে গড়া কুকুর যে ...''[২৩] নগেন পাঁজা 'বাড়ি-থেকে-পালিয়ে-ধরা'। বিশেষ বিশেষ মরসুমে, যেমন — বিয়ে, ভোট বা পরীক্ষার মরসুমে তার কাজ অনেক বেড়ে যায়। সমসাময়িক কালে পরীক্ষা ব্যবস্থার গলদের দিকে এখানে মনোজ মিত্র ইঙ্গিত করেছেন সুযোগ পেতেই ঃ ''ইদানীং অবিশ্যি পরীক্ষার সিজিনে কিছু হচ্ছে না ... কারণ পরীক্ষাই উঠে গেছে। ... গণটোকাটুকির ব্যবস্থা! একদম ডাল যাচ্ছে সিজিনটা।''[২৪] বিভিন্ন শ্রেণির 'পালিয়ে'র জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেট আছে নগেন পাঁজার। তার মধ্যে এম.এল.এ.-রাও আছেন। অবস্থা বিশেষে এম.এল.এ.-দের ধরে আনার রেটের পার্থক্য আছে ঃ

> ''মন্ত্রিসভা গঠনের আগে যে সব এম.এল.এ.গা ঢাকা দিয়েছেন, যদি খোঁজ খবর এনে দিতে পারি, তাহলে জন প্রতি ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার! আবার রাষ্ট্রপতির শাসন কালে ঐ এম.এল.এ.-রাই এক টাকা চার আনা।''[২৫]

কোনো বিশেষ দল বা মতাদর্শকে আক্রমণ না করেও মনোজ মিত্র সাধারণভাবে ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত করেছেন ন্যাড়া জ্যাঠাকে, যিনি রাজনীতিতে নেমেছেন ঃ ''টু সার্ভ মাই মাদারল্যান্ড! অ্যান্ড টু এনলার্জ মাই পার্সোনাল ফান্ড!''[২৬] ভোটের বাজারে সব ধর্মের মানুষের মন জয় করার জন্য তার মাথায় মুসলমানী টুপি, গলায় খ্রীস্টানদের ক্রশ, কপালে মহাকালীর সিঁদুর। সঙ্গে গীতা, কোরাণ, বাইবেল। তার কর্মসূচী খুব পরিষ্কার ঃ

> ''যারা আমায় ভোট দেবে, তাদের বাড়ীর ময়লা গাড়ি করে তুলে নিয়ে গিয়ে, যে শালারা দেবে না, তাদের বাড়ির দরজায় ঢেলে দেব! যারা আমায় জেতাবে তাদের পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল গড়ে দেব ... যারা আমায় ল্যাং মারবে তাদের ঘরে ঘরে হাসপাতাল গড়ে দেব!''[২৭]

চারপাশের ভন্ডামির প্রতি নাট্যকারের যেন সহজাত ক্রোধ। তাই যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তিনি ভন্ডামিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীরে বিদ্ধ করেছেন।

অনিকেত মানুষের সমস্যা আরো প্রকট আকারে এসেছে 'পরবাস' নাটকে। ১৯৬৯ সালে একাঙ্ক আকারে লেখা হয়েছিল 'কোথায় যাবো' নামে। ১৯৭০ সালে সে একাঙ্ককে বাড়িয়ে রচনা করেন পূর্ণাঙ্গ 'পরবাস'। পুনর্লিখন ১৯৭৫-এ। দুটি অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকে কোন দৃশ্য বিভাগ নেই। দৃশ্যপট একটিই — পাঁচের বারো গলু ওস্তাগার লেনে করালী দত্তের বাড়ির তিনতলার একটি ঘর। এই ঘরের ছত্রিশ বছরের ভাড়াটে গজমাধব মুকুটমণি। তিরিশ বছর কোর্টে লড়াই করে 'সময় স্বাস্থ্য টাকাকড়ি মনের আনন্দ ফূর্তি — সব ঐ আলিপুরে নিবেদন করে' করালী দত্ত গজমাধবকে উচ্ছেদ করার রায় পেয়েছেন। করালী দত্তের বাবার আমলের নিয়ম, বাড়িতে ব্যাচেলর ভাড়া দেওয়া হবে না। গজমাধব ছত্রিশ বছর আগে করালী দত্তের বাবার কাছে মিথ্যে 'বিবাহিত' পরিচয় দিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। ক্রমে সত্য প্রকাশ হতেই আদালতে মামলা, সে মামলা গড়ায় ত্রিশ বৎসর। ইতিমধ্যে করালীর বাবা গত হয়েছেন, মালিক হয়েছে করালী। বহু প্রতীক্ষার জয় এসেছে, আজ তিনি অবিবাহিত ভাড়াটে গজমাধবকে উচ্ছেদ করছেন। আজ করালী দত্তের 'রেড লেটার ডে'। নাটকের শুরুতেই দেখা যায়, গজমাধবের বিদায়ের আয়োজন চলেছে। সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি জিনিস একত্র করা হয়েছে। একই বাড়ির অন্য ভাড়াটে দাদু, ভুতু ও পরাগ বাঁধাছাদায় সাহায্য করছে, দীর্ঘদিনের প্রতিবেশীর বিদায়ের দিনে তারাও কিছুটা যেন বিষন্ন। আদালতের পেয়াদা কোর্টের রায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে। গজমাধব যাত্রার জন্য প্রস্তুত। তার পরিচয় দিতে গিয়ে মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ

> ''পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, গলায় পাকানো চাদর, মাথায় সাজানো টেরি। গজমাধব একটা প্রাচীন মানুষ, চলনে কথনে। গজমাধব চলে দুলে দুলে - গোঁফের শাখায় সারাক্ষণ একটা মনোহর হাসি তুরতুর করে নাচে।''[২৮]

নাটক একটু এগোতেই বোঝা যায়, এই ঘরটির বাইরে গজমাধবের যাবার কোনো জায়গাই নেই। ছত্রিশ বছর আগে কাঁকড়াপোতা গ্রামে প্রেমিকাকে রেখে সেই যে এসে ঢুকেছিল গলু ওস্তাগারে তারপর আর গ্রামে ফিরে যাওয়া হয়নি তার। প্রেমিকাকে আর স্ত্রীর পরিচয় দেওয়া হয়ে ওঠে নি, ভিটেমাটির সঙ্গেও সম্পর্ক আর থাকে নি। পরবাসেই স্থায়ী হয়ে গেছে গজমাধব। এই ছত্রিশ বছর পর সেই ঘর থেকে উৎখাত হয়ে কোথায় সে যাবে তা জানে না অথচ যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। করালী দত্তের নতুন ভাড়াটেও এসে গেছে — মন্দিরা আর রতন, যারা বিবাহিত পরিচয় দিয়ে গজমাধবের এই ঘরটি ভাড়া নিয়েছে কিন্তু আসলে যাদের বিয়ে হয়নি। অনাথ আশ্রমে মানুষ হওয়া মন্দিরা একটা মনের মতো ঘর খুঁজে না পেয়ে বারবার বিয়ের তারিখ পিছিয়েছে। চালচুলোহীন গজমাধব যাবার ভঙ্গি করে কিন্তু যায় না, নানা উপায়ে 'টাইম কিল' করে। কখনও একটা মগ, কখনও বা হরলিক্সের বোতল (যাতে

নারকেল তেল রাখা হয়) খুঁজতে সময় নষ্ট করে। বিদায় উপলক্ষে অন্যদের প্রাথমিক বিষণ্ণতা ক্রমে বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায় কিন্তু গজমাধব নড়বার নামটিও করে না। পথের সব বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে সকলে যখন আসন্ন বিদায়ের জন্য প্রস্তুত তখনই গজমাধব নেই মোক্ষম প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে ঃ ''যে সব নির্দেশ দিলেন ... ওসব মেনেশুনে কোথায় যাবো আমি?''[২৯] সকলেই হতচকিত। তার ওপর গজমাধব যখন বলে ঃ ''কেন ভাবছেন আমার জন্যে! আর কোনো উপায় না হলে আপনাদের ঘর তো আছেই ...''[৩০] তখন সকলেই একে একে সরে পড়ে। আশ্রয়ের বড়ো অভাব। নিজেদেরই থাকার স্থান সঙ্কীর্ণ। তার ওপর আরেক জনকে কে আশ্রয় দিতে যাবে। যে ভয়ে গজমাধবের আত্মীয়েরা 'গা ঢাকা দিয়ে' আছে, সেই ভয়েই গা ঢাকা দেয় প্রতিবেশীরা। ইতিমধ্যে চলে আসে মন্দিরা আর রতন। সুন্দরী মহিলাকে সাহায্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে গজমাধবের প্রতিবেশীরা। গজমাধবকে তখন তাদের মনে হয় নিতান্ত অবাঞ্ছিত। বাড়িওয়ালা করালী দত্ত 'ব্যাড ইম্প্রেশনে'র ভয়ে মন্দিরা-রতনকে ভাড়াটে উচ্ছেদ সম্পর্কে কিছু জানায় নি, সেই সুযোগে গজমাধব সময় নিয়ে নিচ্ছে। মন্দিরাকে প্রয়োজনের পেরেক-হাতুড়ি দিয়ে, রান্না শিখিয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়ে গজমাধব তার শুভানুধ্যায়ী হয়ে উঠেছে। অনাথ-আশ্রমে মানুষ মন্দিরা আর নিঃসঙ্গ গজমাধব বেদনার সেতু বেয়ে পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। মন্দিরার সামনে নিজের আত্মীয়-পরিজন-সহ পরিপূর্ণ পরিবারের মিথ্যে ছবি এঁকে গজমাধব এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেয়েছে। কিন্তু মন্দিরা যখন জানতে পেরেছে গজমাধবের নিঃসঙ্গতা, তখন সে গজমাধবকে নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছে, এ যেন একজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতি আর একজন নিঃসঙ্গের বাড়িয়ে দেওয়া হাত ঃ ''(গজমাধবের হাত ধরে) কোথায় যাবেন! এ জগতে কেউ কারো না! কতো কষ্ট পাবেন ... আমার কাছে থাকুন!''[৩১] গজমাধবকে এভাবে কেউ কোনোদিন থাকতে বলে নি। কিন্তু গজমাধব মন্দিরার সুখের ঘরে কাঁটা হতে চায় নি। প্রেমিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন তার সফল হয়নি বলেই সে বোঝে ঘরের মর্ম। সেই ঘরের সুখ থেকে বঞ্চিত করতে চায় নি মন্দিরা-রতনকে। নিজের ছত্রিশ বছরের আস্তানা ওদের ঘর বাঁধার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিঃসঙ্গ গজমাধব রাস্তায় নেমেছে। হাসির নাটক শেষ হয়েছে গভীর বিষাদে।

নিরাশ্রয়, নিরালম্ব গজমাধবের বাসস্থানের সমস্যাকে ঘিরেই নাটক ঘনিয়ে তুলেছেন মনোজ। ''কোন একটা একস্ট্রীম (বাংলা করে নিন) অবস্থায় পৌঁছে নিরুপায় একজন মানুষ কীভাবে আচরণ করতে পারে, শেষ পর্যন্ত এসে কীভাবে সে অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে''[৩২] তার দৃষ্টান্ত এই নাটক। প্রস্তাবনা দৃশ্যে শহরে গজমাধব আর কাঁকড়াপোতায় প্রেমিকার মধ্যে যে পত্র বিনিময় দেখানো হয়েছে তা থেকে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কোলকাতায় জাপানী বোমাতঙ্ক, অফিসে ছুটি নেবার কোনো উপায় নেই — ছুটি নিলেই ইনক্রিমেন্ট বন্ধ। তাই বিয়ের শুভলগ্ন পেরিয়ে যায়, কাঁকড়াপোতায় প্রেমিকার কাছে ফেরা হয় না গজমাধবের। নগর কোলকাতায় জীবন-জীবিকার লড়াই তীব্র। গজমাধব প্রেমিকাকে

লেখে — ''স্বাধীনতা! ভুল! ভুল! মহাভুল! বাঁচিবার কোন পন্থা নাই!''[৩৩] মনোজ মিত্র বোধহয় বলতে চান, যে স্বাধীনতা মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না, সে স্বাধীনতা মূল্যহীন। কাঁকড়াপোতার সেই 'পেয়ারাতলা ... রাণীকুঠির ইক্ষুক্ষেত ... শুভ্র জ্যোৎস্না ... মেঘমল্লার ... শ্রাবণের বাদলধারা'র আহ্বান ভুলে গিয়ে গজমাধবকে কোলকাতায় ব্যস্ত থাকতে হয় জীবন সংগ্রামে — টিঁকে থাকার সংগ্রামে। জীবন থেকে হারিয়ে যায় অমূল্য ছত্রিশটি বছর। পাঁচের বারো গলু ওস্তাগর লেনের তিনতলার একটি ঘরেই কেটে যায় জীবনের সোনালি সময়। পড়ন্ত বেলায় আসে উচ্ছেদের নোটিশ! কোথায় যাবে এখন গজমাধব ? তার যে তিন কুলে কেউ নেই। এই মূল দ্বন্দ্বকে ঘিরে কৌতুককর নাট্য-পরিবেশ রচনা করেন মনোজ মিত্র, কিন্তু মাছে মাঝেই সে কৌতুককে ঘিরে ধরে বিষাদ। যতটা সম্ভব 'টাইম কিল' করতে চায় গজমাধব। সামান্য অবলম্বন পেলেও তাকেই আঁকড়ে ধরে টিঁকে যেতে চায় গুলু ওস্তাগারে। বাইরের পৃথিবী যে তার কাছে অচেনা। দইয়ের ফোঁটা কেটে, রসগোল্লা খাইয়ে, বেডিং বেঁধে দিয়ে গজমাধবকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছে প্রতিবেশী ভাড়াটেরা। কিন্তু গজমাধবের যাবার কোন জায়গা নেই শুনে তারা হতবাক। তবে গজমাধব নিজে যেন তেমন চিন্তিত নয় ঃ ''আপনাদের সহৃদয় আন্তরিক ব্যবহার দেখে ভাবছি, কেন এতো ভাবছি আমি! এমন করে যারা আমার বিছানা বেঁধে দিতে পারে, তারা কি আর একটু স্থান না দিতে পারে!''[৩৪] এই সময় কাটানোর প্রশ্নে গজমাধবের আচরণ কখনো অতিরেক মনে হলেও আসল এর মধ্যে রয়েছে এক বিপন্ন মানুষের অসহায়তা। যেমন, প্রতিবেশী ভাড়াটেরা যখন মন্দিরা-রতনের জন্য গজমাধবকে বিদায় করতে ব্যগ্র তখন গজমাধব একটা মগ হাতে করে ঢোকে ঃ ''(হঠাৎ মগটা তুলে) কী সর্বনাশ! ... এটা ফেলে যাচ্ছিলাম! ... দেখি কী, রান্নাঘরে তাকের ওপর ঘাপটি মেরে পড়ে আছে! আমার মগ...''[৩৫] একেবারে চূড়ান্ত বিদায়ের মুহূর্তে করালী দত্ত মুহূর্তের জন্য দুর্বল হয়ে পড়লে সেই সুযোগ নিয়ে থেকে যেতে যায় ঃ ''তবে থাক, গিয়ে কাজ নেই! ... সত্যি আপনি কাঁদবেন আমি চলে যাবো ... না না, সে হয় না ... (করালী হতবাক। করালীর চোখ মুছিয়ে) দ্যাখো পাগল কাঁদে ... যাচ্ছি না ...''[৩৬] এমনকি বেরিয়ে যাবার পরও করালী যখন বিচ্ছেদ ব্যথায় ভেঙে পড়ছে তখন গজমাধব আবার আরেক দরজা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে। হাওয়া অফিসের কর্মী ভুতু গজমাধবের বিদায়কে ত্বরান্বিত করতে সংবাদ দিয়েছে, সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া খারাপ হবে। প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়ের জন্য বিদেশগামী জাহাজের যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। সেই সুযোগটুকুকেই আঁকড়ে ধরেছে গজমাধব ঃ ''(ধমকে ওঠে) দূর মশাই, যাবো কীসে! শুনলেন না জাহাজ বন্ধ।''[৩৭] পাকা বদমাসের মতো মন্দিরাকে বাড়ির বিভিন্ন খুঁতের কথা বলে ভাংচি দিতে চায়, কিন্তু দেখা যায় করালী দত্ত নতুন ভাড়াটের জন্য সবকিছু সারিয়ে রেখেছে। অগত্যাই যখন যেতে হবে তখন গজমাধব রতনকে অনুরোধ করেছে খিদিরপুর ডকে সেজোমামার মেজোছেলেকে একটা ফোন করে দিতে। তাকে গজমাধব কোনদিন দেখেনি, তার নাম শিবতোষ, সন্তোষ, মহীতোষ না ভোলা তাও জানা নেই। বিভ্রান্ত রতন যখন ফোন করে এসে জানায় যে, সন্তোষ

বা প্রেমতোষ গজমাধবকে চেনে না, আর ভোলা নামে যে ছিল সে যুদ্ধের সময় মারা গেছে, তখন সেই মৃত ভোলাকে অবলম্বন করেই গলু ওস্তাগর টিঁকে যেতে চাইল গজমাধব। অদেখা সেই ভোলার শোকে প্রবল কান্না জুড়ে দিল। শোকগ্রস্ত মানুষের প্রতি সমবেদনা স্বাভাবিক। মন্দিরা তাকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। আপাতভাবে মঞ্চের ওপর এসব Situation প্রবল হাসির উদ্রেক ঘটায় কিন্তু তার মাঝেও গজমাধবের বেদনার দিকটিও চাপা থাকে না। অনিকেত একটা মানুষ সব বুঝেও না বোঝার ভাণ করছে, পথে নামার আগে শেষবারের মতো চেষ্টা করছে আশ্রয়টা টিঁকিয়ে রাখার — এতে তার চরিত্রের কারুণ্যের দিকটিই প্রকাশ পায়। কিন্তু নাটকের শেষে এই গজমাধব আর করুণার পাত্র থাকে না, মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হয়। মন্দিরার কাছে সে সাজানো সংসারের মিথ্যে গল্প করেছিল কিন্তু বিয়ে করা তার হয়ে ওঠে নি। ঘরে যে আসে নি, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া, সেই কল্পনাকেই মূর্ত করে তোলে মন্দিরার সামনে ঃ ''শুধু এই কপালটায় যখন সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে ... লালপেড়ে শাড়ি পরে ... প্রদীপ হাতে ... যখন সামনে এসে দাঁড়ায় ...''[৩৮] নিজের জীবনে সম্পূর্ণতা আসে নি, তাই সম্পূর্ণ জীবন দেখার লোভ গজমাধবের। তাই সাজানো ঘরের চেহারা দেখতে লোভীর মতো, চোরের মতো সে বারবার ফিরে এসেছে। পাখি, গাছ, ফুল দিয়ে গড়া মন্দিরার পূর্ণ সংসারের জন্য গজমাধব, সংসারের কাছ থেকে কিছু নিতে না পারা গজমাধব, পথে নেমেছে ঃ

> ''আমি চলে যাচ্ছি ... শুনছ ... আমি চলে যাচ্ছি ... (পকেট থেকে কৌটো বার করে) এই কৌটোয় একটু ছাতু আছে ... তোমরা বোধহয় আনতে ভুলে গেছো ... (পাখির খাঁচার সামনে গিয়ে) কিন্তু এরা খাবে কি! যখন ওদের খিদে পাবে ... জল মেখে খেতে দিয়ো। ... তোমার ঐ গাছটা ... জানালায় বসিয়ে রেখো ... রোদ পাবে, জল পাবে ... পাতা বেরুবে ... নতুন পাতা ...''[৩৯]

এই নতুন জীবনকে, নতুন সম্ভাবনাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে যায় 'নিঃস্ব', 'বাতিল' লোক গজমাধব। নিজের জীবনে তার সুর জাগে নি কিন্তু সে জানে, মন্দিরার 'তানপুরাটা যে কোনো মুহূর্তে বেজে উঠবে!' সেই সুখ কি করে ভাঙে সুখের স্বপ্ন দেখা গজমাধব! তারই স্বপ্ন যে আজ সাকার হতে চলেছে তারই ঘরে — স্বপ্নকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাই নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় গজমাধব।তাঁর এই নিষ্ক্রমণ মমতার কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ ঃ

> ''বলবান শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করতে সে বিনত শিরে এমন কূটচাল চেলেছে যে তা বাড়ির মালিককে উন্মাদপ্রায় করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যখনই নতুন ভাড়াটের গৃহিণীর (?) মমতা অর্জনে সে সমর্থ হল, তখনই সে তার সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করল, অনাত্মীয়ের স্নেহ তাকে পরমাত্মীয়ের স্নেহের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনল, সে খালি হাতে আসন্ন সন্ধ্যায় বাসা ছেড়ে ঠিকানাহীন পৃথিবীর যে কোন অংশে হারিয়ে গেল।''[৪০]

'পরবাস' হাসির নাটক। মনোজ মিত্র হাসির Situation তৈরিতে এবং উপযুক্ত সংলাপ রচনায় সিদ্ধহস্ত। এ নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। বেডিং বাঁধতে গিয়ে ভুতুর পা বেঁধে ফেলা, বিরাট বাটিতে একফোঁটা দই নিয়ে নিমাইয়ের গজমাধবের কপালে ফোঁটা কাটা, করালীর

উল্লাস, গজমাধবের বাইরের ও ভেতরের দরজায় লুকোচুরি খেলা, সাড়া দেবার বিচিত্র ভঙ্গি, মন্দিরা সম্পর্কে দাদু, ভুতু ও পরাগের কৌতূহলমিশ্রিত আকর্ষণ, রতন-মন্দিরার বিয়ে না হওয়ার কথা করালী দত্তের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ার পর 'ম্যানেজ' করার চেষ্টায় অদ্ভুত সব কথা, বিছানায় শুয়ে থাকা গজমাধবের ওপর করালী দত্তের বসে পড়া, মন্দিরার কাপড়ে ছারপোকা দেখতে দাদুর ব্যগ্রতা প্রভৃতি Situation হাসির নাটকের পক্ষে উপযুক্ত। তবে কোথাও কোথাও অতিরঞ্জনও লক্ষিত হয়। বিশেষত গজমাধবের সেজোমামার মেজোশালার পরিচয় নিয়ে রতন-গজমাধবের কথোপকথন একটা পর্যায়ের পর অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়। কিন্তু নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব এই যে — পাঠক দর্শককে হাসাতে হাসাতেই তিনি নিয়ে গেছেন বিষাদের প্রান্তে। আর অন্তিমের সেই বিষাদ গজমাধবের পূর্বাপর আচরণের ওপর কারুণ্যের একটি আস্তর রচনা করে যার ফলে 'পরবাস' হয়ে ওঠে 'বিষণ্ণ হাসির নাটক'।

আধুনিক মানুষের আশ্রয়ের সমস্যা দুই প্রজন্মের দুই জোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন 'দম্পতি' (১৯৭৮) নাটকে। দুই অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকের প্রথম অঙ্কে চারটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য। এর মধ্যে প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য বাদে অন্য সবগুলি দৃশ্য একটি বাড়ির ওপর বা নিচের তলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিচের তলায় থাকেন বাড়িওয়ালা কর্তা ও গিন্নি এবং তাদের চাকর কানাই আর ওপরতলায় থাকে ভাড়াটে দম্পতি বকুল-শ্যামল। বকুল চাকরি করে, শ্যামল মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। একদিন ভোরবেলায় নিচের তলায় গিন্নির কণ্ঠে শুকসারীর গান দিয়ে নাটক শুরু হয়। শুকসারীর গানে শুক এবং সারী রাধা ও কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের গুণপনা বর্ণনা করে। এই গানে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে আপাত দ্বন্দ্ব থাকলেও দুইয়ে মিলে সম্পূর্ণতার কথাই ব্যঞ্জিত হয় :

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন

সারী বলে আমার রাধা পাশে যতক্ষণ

মদন তাইতো মোহন।" [৪১]

দিন শুরু হতে না হতেই শুরু হয় কর্তা-গিন্নির বাকযুদ্ধ, চলে গভীর রাত পর্যন্ত। কর্তা রোগে ভুগে ভুগে খিটখিটে। তার ওপর সন্দেহবাতিক। অকৃতদার বন্ধু জিতেনের প্রতি স্ত্রীর দুর্বলতা আছে বলে তিনি সন্দেহ করেন। গিন্নিও জিতেনবাবুর প্রশংসা করে, নানারকম ইঙ্গিত করে, এমনকি তার সঙ্গে মোটরে করে বেড়াতে বেরিয়ে কর্তাকে ক্ষেপিয়ে মজা পায়। কিন্তু আসলে জিতেন এই পরিবারের একজন ভাল বন্ধু মাত্র। কর্তা-গিন্নির দুই ছেলের একজন দিল্লি, একজন আসাম। কর্তার পক্ষপাতিত্ব বড়খোকার প্রতি আর গিন্নির ছোটখোকার প্রতি। ওপর তলায় শ্যামল আর বকুলের দাম্পত্য। শ্যামল সন্তান চায় না, প্রতিদিন মিলনের আগে বা পরে বকুলকে ট্যাবলেট দেয়। বকুল তা না খেয়ে জমায় পেটমোটা একটি পুতুলের মধ্যে — কারণ সে সন্তান চায়, নারীত্বের পূর্ণতা চায়। নিজেদের প্রেমে পড়ার দিনটাকে সেলিব্রেট করতে বকুল শ্যামলের সঙ্গে মোটরবাইকে চড়ে বকখালি যেতে চায়। অফিসের কাজের জন্য

প্রথমে রাজি না হলেও পরে নিমরাজি হয় শ্যামল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ফোন আসে। বকুলের কছে নিজের পরিচয় না দিলেও শ্যামল ফোন ধরে বুঝতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রেমিকা দোলন বা দোলা, যার সঙ্গে পরে বিয়ে হয়েছে শ্যামলেরই বন্ধু সন্দীপের। দোলন বিশেষ প্রয়োজনে আজ দেখা করতে চায় শ্যামলের সঙ্গে। বলে, সুদীপের সঙ্গে তার ডিভোর্স হয়ে গেছে। শ্যামলের উভয় সঙ্কট। দোলা শ্যামলের অহংকারে আঘাত দেয় বৌ নিয়ে আউটিংয়ের মধ্যবিত্ত মানসিকতার কথা বলে। শ্যামল হুট করে রাজি হয়ে যায় দোলার সঙ্গে বকখালি যেতে। বকুলকে বলে, অফিসের কাজে এখনি বর্ধমান যেতে হবে। বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত বকুলকে রেখে বেরিয়ে যায় শ্যামল। রাগে, দুঃখে, অপমানে ক্ষুব্ধ বকুল নিজের অফিসের জুনিয়র ছেলে অরূপকে নিয়ে বকখালি যায় শ্যামলকে শিক্ষা দিতে। বাড়িতে যখন জিতেনকে মাঝখানে রেখে কর্তা-গিন্নির টানাপোড়েন চলছে তখন বকখালি ট্যুরিস্ট লজে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে গিয়ে উঠেছে শ্যামল ও দোলন আর একই লজে ঘর নিতে এসেছে বকুল-অরূপ। দোলন কোনো কারণ না জানিয়ে শ্যামলের কাছে কুড়ি হাজার টাকা চায়, না দিতে চাইলে চিৎকার করে লোক জড়ো করে শ্যামলের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়। শ্যামল ঝোঁকের বশে চলে এসেছে ঠিকই কিন্তু তারপর বকুলকে কাঁদিয়ে রেখে আসার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। দোলনের সঙ্গে কোন অসদাচরণ সে করে নি। অন্যদিকে বকুলও জেদের বসে বকখালিতে চলে এসে শ্যামলের জন্য মনে কষ্ট পেয়েছে। দুজনের মনের এই অবস্থায় তারা মুখোমুখি হল এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন বকুল ভাবছে শ্যামল দোলনের সঙ্গে আর শ্যামল ভাবছে বকুল অরূপের সঙ্গে বকখালিতে ফূর্তি করতে এসেছে, দুজনের ওপরেই তখন চেপে বসেছে নিদারুণ মিথ্যার পাহাড়। এদিকে বাড়িতে নিচের তলায় কর্তা চিঠি লিখে বড়খোকাকে আনিয়েছেন। বড়খোকা বাড়ি বিক্রি করে দিতে চায়। সেই টাকায় মেয়ের বিয়ে দেবে। বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পর এসে উপস্থিত হয় ছোটখোকা। দাদার সঙ্গে যোগসাজশ করে বাড়ি বিক্রির টাকা আধাআধি ভাগ করে নেয়। সেই সঙ্গে মা-বাবাও ভাগাভাগি হয়ে যায়। বড়খোকার ওখানে কাজের লোক পাওয়া যায় না, তাই সে মাকে নিয়ে যেতে চায়, যদিও এতদিন বাবার দিকেই তার টান ছিল বেশি। 'উদার' ছোটখোকা মাকে দান করে দেয় দাদাকে, নিজে নেয় বাবাকে। ওপরতলায় শ্যামল-বকুলের চরম অশান্তি। বকুলের গর্ভের সন্তানের জন্য শ্যামল দায়ী করে অরূপকে, যদিও পরে তার ভুল ভাঙে আর বকুল শ্যামলের বকখালির ব্যভিচার স্মরণ করে তাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। গর্ভের সন্তানসহ সে এখন একা। বাড়ি বিক্রির ফলে শুধু কর্তা-গিন্নিকেই আশ্রয়চ্যুত হতে হয় না, সেই সঙ্গে বকুলও অগাধ জলে পড়ে। গর্ভের সন্তানকে নিয়ে সে এখন কোথায় যাবে। আর বিপাকে পড়ে কানাই। সেই ছোটবেলা থেকে সে কর্তা-গিন্নির কাছে আছে। এখন দুই ছেলে তাদের দুই ভাগ করে ফেলল কিন্তু কানাই যে কোনো ভাগেই নেই। শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে দোলন এসে বকুলের ভুল ভাঙিয়ে দেয়। দোলনকেও নাট্যকার পাঠক-দর্শকের সহানুভূতিতে উত্তীর্ণ করে দেন এই সংবাদ দিয়ে যে, দোলন শ্যামলকে ব্ল্যাকমেল করেছিল নিজের স্বামীকে পুলিশের হাত

থেকে বাঁচাতে। একেবারে শেষ দৃশ্যে নাটকীয় চমক দেন মনোজ মিত্র । আসাম এবং দিল্লির মালপত্র দুই ভাগে বাঁধা। মনে পড়ছে কত পুরনো কথা। মনে আসছে কত আশঙ্কা। হয়তো শেষ সময়ে দুজনের দেখা হবে না, হঠাৎ টেলিগ্রামে সংবাদ আসবে — একজন চলে গেছে। আজ আর ঝগড়া নেই। চূড়ান্ত বিদায় আসন্ন। ট্যাক্সি এসে গেছে। কুলিরা মালপত্র তুলছে। গিন্নি কেঁদে উঠেছে। এইসময় জিতেন এসে দাঁড়ায়, কুলিদের মাল নামাতে নির্দেশ দেয়। জানা যায়, শুকলাল শেঠকে দিয়ে আসলে বাড়ি কিনেছে জিতেন। বিচ্ছেদ সে রুখে দিয়েছে। মুহূর্তের জন্য জিতেন রূঢ় হয় ঃ

> ''কেউ যাবে না। সবাই থাকো। শ্যামল বকুল, তোমরাও যাবে না কেউ। সবাই থাকো। যাবে শুধু ওরা – (জিতেন বড়খোকা ও ছোটখোকার দিকে ফেরে।) দেড়লাখ টাকা পেয়েছ ... হাফ্ হাফ্ হয়েছে... সাড়ে ছয়টায় আসাম মেল ... সাড়ে সাতটায় কালকা... ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে... যাও খোকারা বেড়িয়ে পড়ো। এরপর কিন্তু মিনিটে মিনিটে ঘর ভাড়া চার্জ করবো ...''[৪২]

কিন্তু সহানুভূতিশীল মনোজ মিত্র শেষ পর্যন্ত কারো কষ্ট দেখতে পারেন না। তাই দুই ছেলে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যেতে গেলেই তাদের পথ আগলায় জিতেন ঃ ''যাচ্ছো কোথায় ? দাঁড়াও ! ট্যাক্সি আমি ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি। আরে আমি যেতে বললেই যাবি কেন ? জিতু কাকার উপর তোদের জোর নেই ?''[৪৩] সমাপ্তিকে আরো মধুর করতে নাট্যকার ছোট্ট তাতাইকে দিয়ে বলান ঃ ''বাড়িটা যখন আমাদেরই থাকলো, তখন বাড়ি কেনার টাকাটা তুমি ফিরিয়ে নাও জিতুদাদু''[৪৪]। দুই ছেলে ভাগ করা টাকা আবার এক করে ফেরৎ দিতে ভেতরে যায়। সকলের হাসিমুখ আর শুকসারীর গানে নাটক শেষ হয়।

মনোজ মিত্রের অন্যতম প্রিয় বিষয় পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবস্থা। প্রত্যেক পরিবারেই যখন শিকড় ছেঁড়ার প্রবণতা প্রবল তখন এই প্রাচীন মানুষেরা সংসারে যেন অবাঞ্ছিত। তাদের সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা-মন্দলাগার যেন কোনো মূল্যই নেই সংসারে। অন্যের ইচ্ছাই তাদের নিয়ন্ত্রক। এই অন্যেরা অর্থাৎ সন্তানেরা শিকড়ের প্রতি কোনো টান অনুভব করে না। স্বার্থই তাদের সর্বস্ব। মনোজ মিত্রের সহানুভূতি সংসারের এই অনাদৃত মানুষগুলির প্রতি। এদের হেরে যেতে দেন না তিনি, জিতেনের মতো কোনো একজন মানুষের হাত ধরে ডুবে যেতে যেতেও এরা আবার ভেসে ওঠে। এটাই তাঁর বিশ্বাসের জগৎ। সংসারে শুধু স্বার্থপর বড়খোকা-ছোটখোকাই নেই, স্বার্থশূন্য বন্ধু জিতেনও আছে — এই বিশ্বাসে পাঠক-দর্শককে উত্তীর্ণ করতে চান তিনি। বাড়ি মানে তো শুধু থাকার জায়গা নয়, বাড়ি মানে একটা শিকড়, একটা অস্তিত্বের অনুভব, একটা মায়া, একটা টান, গাছ-গাছড়া, প্রতিবেশী সকলকে নিয়ে জড়িয়ে থাকা। আধুনিক কালে বাড়ি সংক্রান্ত এই অনুভব 'ঠুনকো সেন্টিমেন্ট' বলেই পরিচিত। কিন্তু মনোজ মিত্র আধুনিক হয়েও সদর্থে প্রাচীন। তাই তাঁর নাটকের চরিত্ররা তথাকথিত সেন্টিমেন্টের

অনুভূতিতে আলোড়িত হয়। কর্তা এবং গিন্নি সারাজীবন যে বাড়িতে কাটালেন, জীবনের পড়ন্ত বেলায় আজ সে জায়গা ছেড়ে দুজনকে যেতে হবে দুপ্রান্তে — একজন আসাম, আর একজন দিল্লি, কারণ তাদের সন্তানেরা সেইরকম বিধান দিয়েছে। কর্তা-গিন্নির ঝগড়াঝাঁটির সুযোগে বড় ছেলে বাবাকে দিয়ে বাড়ি বিক্রি করিয়ে নিয়েছে, কর্তার এখন আক্ষেপ একমাত্র সম্বল ঃ ''হ্যাঁ, বাড়িটা বিক্রি করে সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে এখন আমি কোথায় থাকবো সেটা তোমাদের মর্জির ওপর।''[৪৫] এই সন্তানদের ওপর মনোজ মিত্রের তীব্র রাগ। সেই রাগই যেন ব্যঙ্গের আকারে ব্যক্ত হয়েছে জিতেনের সংলাপে ঃ ''লাউ, কাঁঠাল, কুমড়ো ভাগ হয় ... জমিজমা ভাগ হয় ... দেশ ভাগ হয় ... দেশে দেশে গঙ্গার জল ভাগ হয় ... মা বাপ ভাগ হবে, এতে আর কি আছে রে ?''[৪৬] শেষ সম্বল বাড়িই ছিল 'পায়ের তলায় মাটি'। তা চলে যেতে আর নিজেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে কিছু নেই। শুধু ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়াই নয়, পরস্পরের কাছে যে আশ্রয়, তা থেকেও বিচ্যুত হতে হচ্ছে আজ ঃ ''কতো বললাম, ওরে আশ্রমে পাঠিয়ে দে — বনে জঙ্গলে পাঠিয়ে দে — শুধু একসঙ্গে রাখ। কেউ শুনলো না... কেউ শুনলো না ...!''[৪৭] জিতেন ডাক্তার অকৃতদার — ভাইপোদের সংসারে থাকেন। এই পরিবারটি তার কাছেও ভালোবাসার এক পরম আশ্রয়। সে আশ্রয় রক্ষা করতেই তিনি শুকলালের বেনামিতে বাড়ি কেনেন, কর্তা-গিন্নির বিচ্ছেদ রুখে দেন। স্বার্থপরতার ওপরে মানবিকতার জয় দেখান মনোজ মিত্র। বাড়ি সম্পর্কে, শিকড় সম্পর্কে তাঁর যে রোমান্টিসিজম্ আছে তা যেন ব্যক্ত হয়েছে কর্তার নাতি ছোট্ট তাতাইয়ের মুখে ঃ ''আমাদের একটা বাড়ি ছিলো! ছুটিতে আমরা আসতাম, আনন্দ করতাম! সবাইকে বলতাম, আমাদের একটা দেশ আছে, দেশে বাড়ি আছে! সব বেচে দিলে বাবা!''[৪৮] এই শিকড় ছেঁড়ার বিরুদ্ধেই নাট্যকারের প্রতিবাদ। আশ্রয়ের সমস্যাই একটু ব্যঞ্জনার আকারে এসেছে ওপরতলার শ্যামল-বকুলের দাম্পত্যের মধ্য দিয়ে। দাম্পত্যের মূল ভরকেন্দ্র বিশ্বাসবোধ। সেই বিশ্বাসবোধের আশ্রয়েই বেঁচে থাকে মানুষ। বিশ্বাসবোধ নষ্ট হলে জীবন কীভাবে নিরাশ্রয় হয়ে পড়তে পারে তা দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র এই দম্পতির ছবি এঁকে। আধুনিক জীবনে মানুষ ছোটে শুধু অর্থ, প্রমোশন, কাজের পেছনে। সন্তানও সে প্রতিযোগিতার জীবনে অবাঞ্ছিত। কিন্তু জীবনের সমগ্রতার প্রতি মনোজ মিত্রের লোভ। তাই বকুলের সন্তান সম্ভাবনাকে তিনি নষ্ট হতে দেন না, সযত্নে লালন করেন। সন্তানের আবির্ভাবের সম্ভাবনাসহ বকুল এবং শ্যামলকে ফিরিয়ে দেন দাম্পত্যের নিশ্চিত আশ্রয়ে। পরিণতির এই ইতিবাচক দিকটিই তাঁর নাটক রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, যদিও এই নাটক সম্পর্কে সমালোচক আক্ষেপ করেছেন ঃ

> ''পুরানো কাল এবং আধুনিক কাল, ব্যক্তি স্বাধীনতা, রক্ষণশীলতা ও নারী পুরুষ সম্পর্কের নানা পর্যায়ের অসংখ্য সূক্ষ্ম জটিলতায় এ নাটক যে গভীরতায় যাবার সম্ভাবনা ছিলো, বলতেই হবে, সেখানে একে যেতে দেওয়া হলো না, জোর করে, প্রায় গলা টিপে ফেলে দেওয়া হলো সুখী সমাপনের চেনা ছকের মধ্যে।''[৪৯]

'দম্পতি' কমেডি নাটক। ১৯৮৬-৮৮ 'রঙ্গনা'য় এই নাটক নিয়মিত অভিনয় হয়। কর্তার চরিত্রে এবং পরিচালনায় ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। 'ভালোবাসা' নামে এর চলচ্চিত্রায়ণও হয়েছে, যেখানে নাট্যকার নিজে কর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকের অনেক সংলাপ পাঠকালে মঞ্চের ওপর অভিনয়রত নাট্যকারকেই যেন প্রত্যক্ষ করা যায়। কর্তা-গিন্নির ঝগড়া, নিজের স্ত্রীকে কর্তার সন্দেহ, জিতেন ডাক্তার এবং গিন্নি মিলে কর্তাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া, নাপিত বা দুধওয়ালাকে সাক্ষী রেখে কর্তা-গিন্নির পরস্পরকে দোষারোপ, চাকর কানাইয়ের আচরণ প্রভৃতি হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক। ছেলেদের স্বার্থপরতায় নাটক যখন অনিবার্য বিচ্ছেদের ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তখন নাট্যকার জিতেনের মাধ্যমে মিলনান্তক সমাপ্তি ঘটালেন। এই সমাপ্তি আধুনিক নাটকের বিচারে আরোপিত মনে হতে পারে, ইচ্ছাপূরণ মনে হতে পারে, কিন্তু তা মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগৎ থেকে উদ্ভূত। তিনি মানুষের, বিশেষত অসহায়, বিপন্ন মানুষের হেরে যাওয়া দেখতে চান না, দেখাতে চান না।

'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯) আর একজন অনিকেত মানুষের গল্প। সেই মানুষটি হ'ল রূপচাঁদ, যাত্রাদল কৈলাস অপেরার বাঁশিওয়ালা। সেই ছোটোবেলায় বিধবা মায়ের অবৈধ প্রণয় চোখে পড়ে যাওয়াতে মায়ের প্রেমিক বোঁচা-মামার হাতে মার খেয়ে মুখচোখ ফুলিয়ে সারারাত ধানবনে পড়ে কেঁদেছিল নন্তু — নন্তু হালদার। ভেবেছিল মা হয়তো ডেকে বাড়িতে নেবে। কিন্তু বাড়ি থেকে ডাক আসেনি। সকালে বাড়ি ঢুকে নন্তু দেখে ঘর ফাঁকা — বাচ্চা বোনটাকে নিয়ে নন্তুর মা বোঁচামামার সঙ্গে চলে গেছে। সেই যে সুতো আলগা হ'ল, আর কোনোদিন সংসারের সঙ্গে সেভাবে জড়াতে পারেনি নিজেকে। তখন থেকেই সে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তার পালানোর মধ্যে একটু অদ্ভুততু আছে ঃ

> 'আমি যাদের ছেড়ে পালাচ্ছি ... তারা আমাকে কতো ডাকাডাকি করছে ... খোঁজাখুজি করছে ... মানে আমার জন্যে কতোটা ব্যাকুল হচ্ছে ... দূরে বসে সেইটে জানতে আমার খুব ভালো লাগে ...'[৫০]

এই পলাতক অবস্থায় নন্তু তথা রূপচাঁদ সবসময় 'ফ্রী' থাকতে চায়, যাতে ডাকলেই ধরা দেওয়া সম্ভব হয়। ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করে সেই ডাকটির জন্য। কিন্তু সবসময় ডাক আসে না। চোদ্দ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে নন্তু, কেউ ডাকেনি, ফেরাও হয় নি। বিয়ে করতে বসে ছাদনাতলা থেকে পালিয়েছে — বেশিদূর যায়নি — কনের বাড়ির পেছনে লিচুগাছটার কাছেই ছিল — কিন্তু কেন যেন সেভাবে কেউ খুঁজল না — ফেরাও হল না। কনের বাড়িতে তখন সেই লগ্নেই নতুন পাত্র জোটানোর দায়। কিন্তু তাই বলে, নন্তুর আক্ষেপ ঃ 'কেউ একবারও বলবে না, আগের পাত্তরটাই ভালো ছিল। মেয়েটা বলবে না, তাকে ছাড়া বিয়ে করব না। মূর্ছাটুর্ছা যাবে না? কাঁদতে কাঁদতে একবার লিচুগাছের দিকে ছুটে আসবে না '[৫১]। ফিরে ডাক শোনার বড় লোভ রূপচাঁদের। সে ডাক আর কোথাও থেকে না আসুক, কৈলাস অপেরা থেকে আসে। কৈলাসের মালিক ছোড়দা জানেন চিৎপুরে এরকম বাজিয়ে আর

একটাও নেই। তাই তিনি ডাকেন, চল্লিশ বছরে চোদ্দবার পালাবার পরও রূপচাঁদকে আকুল হয়ে ডাকেন। পনেরো বারের বার লাস্ট ট্রেনের কামরায় রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় গন্ধকালীর, যার 'জোড়া পায়ের নাথি' তে দু'দুটো মরদ ছিট্‌কে পড়ে। গন্ধকালী চলেছে কেষ্টনগরে। গাঙডাকাত হুলো গাঙ ছেড়ে ডাঙায় উঠেছে। সেই হুলো গন্ধকালীকে মেয়ে বলে 'কেলেম' করে। পুলিশ প্রতিদিন গন্ধকালীকে হুলো ডাকতের জন্য নাজেহাল করে। সেই হুলোকে নাকি কেষ্টনগরের বাসস্ট্যান্ডে দেখা গেছে। গন্ধকালী তাই চলেছে হুলোকে ধুলো করতে। কেষ্টনগরে একটা আস্তানা তার প্রয়োজন। একই গাড়িতে আছে নাঙ্গাবাবা এবং তার সাকরেদ নেপাল, আছে ভারতে চোখ অপারেশন করতে আসা বাংলাদেশের নাগরিক আতাউল্লা খান আতা, আছে প্রমোটার ভানু খেমকা। নাঙ্গাবাবার আশ্রম এই রেলগাড়ি, চেলাচামুন্ডা রেলের কামরায় ছড়ানো। বাবা 'কত্তাল বাজা' বলে চিৎকার করে উঠলেই চেলারা যাত্রীর সর্বস্ব লুঠ করে। এভাবেই আতাউল্লার সর্বস্ব এবং রূপচাঁদের বাঁশির ব্যাগ হৃত হয়েছে। রূপচাঁদ গন্ধকালীকে কেষ্টনগর থেকে এক ঘন্টার হাঁটা পথ ফুলবাড়ি গ্রামে নন্তু হালদারদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। সেই পোড়ো বাড়িই আবার নাঙ্গাবাবা তথা হুলো ডাকাতের 'হেড কোয়ার্টার'। ভানু খেমকা সেই বাড়িতেই গড়ে তুলতে চায় ফাইভ স্টার হোটেল। আতাউল্লা ভারতে এসেছিল নিজের পৈতৃক ভিটের সন্ধানে। ভানুর মুখে 'ফুলবাড়ি' নামটা শুনে তার মনে পড়ে যায়, ফুলবাড়ি গ্রামেই ছিল তার জন্মভিটে। শুধু এরাই নয়, পজেশান নেবার জন্য ভানু খেমকা যাদের নন্তুর বোন-বোনের জামাই সাজিয়ে এনেছে, তারাও সে রাতে উপস্থিত ফুলবাড়ি গ্রামে। এই গ্রামেই আবার বিয়ে হয়েছে নন্তুর সেই পালিয়ে ফেলে আসা কনে শিখার, মহিলা সংরক্ষণের জন্য যে এখন অঞ্চলপ্রধান। এদের সকলকে নিয়ে চল্লিশ বছর আগের সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে জমে ওঠে নাটক। সাজানো বোন-বোনের জামাই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাইলেও গন্ধকালীর সঙ্গে পেরে ওঠে নি। গন্ধকালী রূপচাঁদকে নিয়ে রীতিমত সংসারই পেতে বসেছে পোড়োবাড়িতে। সাজানো বোন রূপচাঁদের পরিচয় পেয়ে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসা দেখায়। কিন্তু এসবে অনভ্যস্ত রূপচাঁদ অস্বস্তি বোধ করে। যে বাড়িতে কেউ তার কথা ভাবেনি, একবার খোঁজেনি, সেই বাড়ির প্রতি, বাড়ি বিক্রির টাকার প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই রূপচাঁদের, সে এককথায় সব ছেড়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু গন্ধকালী অন্য ধাতুতে গড়া। সে 'দোখ্‌নে নাইনের ঘুঘু'। তাই রূপচাঁদ সট্‌কে পড়লেও সে রূপচাঁদের বৌ সেজে সম্পত্তি আগলায়। অঞ্চল প্রধানের কাছে গিয়ে দরবার করে। নাঙ্গাবাবা এবং নেপাল আতাউল্লার মেয়ের বিয়ের যেসব জিনিস হাতিয়ে এনে হেড কোয়ার্টারে রেখেছিল সেগুলি পড়েছে গন্ধকালীর হাতে। গন্ধকালী সেই ঢাকাই জামদানি আর পায়ের মল পরে গেছে অঞ্চলপ্রধানের বাড়ি, আতাউল্লাও সেখানে উপস্থিত নিজের জিনিস চুরির অভিযোগ জানাতে। সেখানেই সে চিনেছে জামদানি আর পায়ের মল। অঞ্চল প্রধান শিখারাণী আতাউল্লাকে নিয়ে হালদার বাড়ি যেতে প্রস্তুত হয় বাড়ির পজেশান ভানু খেমকাকে দিতে এবং চোর-বাটপাড় শায়েস্তা করতে। কিন্তু প্রধান তৈরি হতে ঘরে যেতেই নেপাল এসে পিস্তল

দেখিয়ে আতাউল্লাকে নিয়ে যায়। প্রধান যখন বাইরে আসে তখন তার সামনে রূপচাঁদ। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সব রহস্যের ওপর থেকে যবনিকা ওঠে। নাঙ্গা সাধু এবং নেপাল এসেছে সাধুর মেয়ে গন্ধকালীকে 'উড়িয়ে দিতে'। গন্ধকালী হুলোকে কোনদিন বাপ বলে স্বীকার করে নি, যতবার ডাকাতির মাল এনে জমা করেছে ততবার পুলিশের হাতে জমা দিয়েছে, আর আজ বাপের চেয়ে অন্তত দশ বছর বেশি বয়সের একজনকে বিয়ে করতে চলেছে। সুতরাং তার প্রতি কোনো 'ছেন্তিমেন' নেই হুলোর। হুলোকে চিনতে পেরে এগিয়ে আসে ভানু। গন্ধকালীকে সে নিয়ে যেতে চায়, বিনিময়ে নতুন তৈরি হোটেলে সাধুকে কোয়ার্টার দেবে সে, হনুমানজীর মন্দিরের ইনচার্জ করে দেবে। জামদানি আর মল পরে ঘরে শুয়ে আছে গন্ধকালী। নেপাল বাইরে গেলে সাধু আর ভানু মিলে কম্বলে জড়িয়ে পাঁজাকোলা করে গন্ধকালীকে তুলে এনে উঠানে ফেলে কিন্তু তখনই দেখা যায় ভাঙা দেওয়ালের আড়াল থেকে কাটারি হতে বেরিয়ে আসে গন্ধকালী। তাহলে জামদানি আর মল পরা — সে কে ? সে আতাউল্লা খান আতা। সাধুর চেলা নেপাল আসলে পুলিশ অফিসার, আতাউল্লা সাধুকে ধরতে নেপালকে সাহায্য করেছে। ভানু আর সাধু জেলে যায়, আতাউল্লা জন্মস্থান পেলেও জন্মভিটে খুঁজে পায় না। কিছু না দিয়ে জন্মস্থানের মুখ দেখা যায় না। তাই সে জামদানি, রূপার মল দিয়ে যায় গন্ধকালীকে। অঞ্চলপ্রধান বাড়ির পজেশান তুলে দেয় রূপচাঁদ আর গন্ধকালীর হাতে। কিন্তু তাদের তো বিয়ে হয়নি। এদিকে কৈলাসের মালিক এসে উপস্থিত রূপচাঁদকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। রূপচাঁদ বাড়িটা গন্ধকালীকে দিয়ে ফিরে যায় কৈলাসে। বলে যায় ঃ

> ''আমি যদি আবার কোনদিন কৈলেস থেকে পালাতে পারি ... যদি কেন, পারবই ... এক ফাঁকে এসে বিয়ে করে যাব। তবে যদি খুব দেরি হচ্ছে দেখিস ... অঞ্চল প্রধানের পারমিশন নিয়ে আর কাউকে বিয়ে করে নিস।''[৫২]

গন্ধকালী পায় আশ্রয়, রূপচাঁদ ফিরে যায় কৈলাসের আশ্রয়ে।

আশ্রয়ের সমস্যাই একটু ভিন্নভাবে এসেছে 'মৃত্যুর চোখে জল' একাঙ্কটিতে। এটি মনোজ মিত্রের প্রথম নাট্যরচনা। থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যখন পছন্দসই নাটক পাওয়া যাচ্ছে না তখন তরুণ মনোজ এক রাত্রি জেগে এই নাটকটি রচনা করেন এবং প্রতিযোগিতায় এই নাটকের অভিনয় প্রথম স্থান লাভ করে। যে কোনো লেখকের প্রথম রচনাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই ছাপ ফেলে তার পরিচিত পরিবেশ এবং চেনা-জানা মানুষেরা। মনোজের এই নাটকেও যে তাই ঘটেছে সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন ঃ

> ''ছাত্রাবস্থায় এক রাত্রি জেগে একটা ছোট নাটক লিখে ফেলেছিলুম — 'মৃত্যুর চোখে জল' - - খানিকটা আমাদের সদ্যগঠিত (তৎকালে) দল সুন্দরম্ — এর প্রয়োজনে, খানিকটা আমার পরিবারের অতি চেনা কিছু ব্যক্তির জীবন মঞ্চের ওপর তুলে দেখাব বলে।''[৫৩]

সেই প্রথম নাট্য-প্রয়াসে পারিবারিক জীবনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবস্থান এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের উপস্থাপনার তাৎপর্য এইখানে যে, পরবর্তীকালে তাঁর একাধিক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে দেখা গিয়েছে সংসারে বাতিল অথচ সংসারলগ্ন থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষাযুক্ত এরকম বৃদ্ধেরা। মনোজ মিত্র দরদী মন নিয়ে অনুভব করেছেন এইসব মানুষের জীবন-পিপাসা এবং মনের সেই দরদই চরিত্রগুলিকে হারতে দেয়নি শেষ পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই প্রথম রচিত নাটকে মনোজ অভিনয় করেছিলেন বৃদ্ধ বঙ্কিমের চরিত্রে। তারপর থেকে গজমাধব (পরবাস), বাঞ্ছারাম (সাজানো বাগান), কর্তা (দম্পতি) কঙ্ক (মেষ ও রাক্ষস), ধনগোপাল (শোভাযাত্রা), ওয়ালী খাঁ (গল্প হেকিম সাহেব), দ্বৈপায়ন (ছায়ার প্রাসাদ) প্রভৃতি অসংখ্য বৃদ্ধের চরিত্রে তিনি মঞ্চের ওপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকের একটিই দৃশ্যপট — সিঁড়ির মুখের ঝুপসি অন্ধকার ঘর, যেখানে পড়ে থাকে সত্তর বছরের রুগ্ন বৃদ্ধ বঙ্কিম। এই ঘরের ওপর দিয়েই বাড়িতে ঢুকতে বা বেরোতে হয়। বঙ্কিম জীবনপিয়াসী। শিশুর মতোই তার আচরণ, তবে শিশু কথা বলতে পারে না, আর তিনি প্রবল ভাবে পারেন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে রোগে ভুগে ভুগে এখন ওষুধই তার একমাত্র অবলম্বন। সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া যেন তার একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। ওষুধ না খেলেই তিনি মরে যাবেন, এই তার ধারণা। স্ত্রী নীহার বলেন ঃ ''সময়ে অসময়ে অত ভক্তি করে মানুষ যে দেবদেবীর প্রসাদও খায় না।''[৫৪] বঙ্কিম বাতিকগ্রস্ত, কে কি ভাবছে তাতে তার হুঁশ নেই। কিন্তু তার স্ত্রী নীহার স্বামীর এই তীব্র বাঁচার ইচ্ছে নিয়ে যেন কুণ্ঠিত। বিশেষত যেদিন বাড়িতে বড় ছেলের সন্তানের জীবন-মরণ সমস্যা, সেদিন বঙ্কিমের বাঁচার তাগিদ যেন বড় নির্লজ্জ! পাঁচদিন ধরে রবির ছেলের জ্বর ছাড়ছে না, আজ একেবারে বাড়াবাড়ি রকমের। বাড়িতে ডাক্তার এসেছে। সকলের ছোটাছুটি। ডাক্তার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শিশুকে ওষুধ দিচ্ছেন। কিন্তু এই উদ্বেগ থেকে, ব্যস্ততা থেকে বঙ্কিম যেন বহুদূরের মানুষ। নিজের রোগ আর ওষুধের বাইরে তার কোনো জগৎ নেই। বাড়ির সকলে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, তার অসুস্থতা যথেষ্ট গুরুত্ব পাক, ডাক্তার তাকে নিয়মিত পরীক্ষা করুক — এই কেবল তার আত্যন্তিক ইচ্ছে। তার ওষুধ খাবার ব্যবস্থাপত্র পড়ে দেবার একটা লোক নেই, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দেবার কেউ নেই, তার ক্ষুধাবোধ সকলের কাছে অবহেলিত। কিন্তু অভিমানে চুপ করে সে থাকে না। সকলকে জোর করে নিজের দিকে মনোযোগী করতে চায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িতে যখন একটি শিশুর জীবন-মরণ-সমস্যা তখন বৃদ্ধের এই আচরণ বিরক্তিকর বলেই মনে হয়। কিন্তু বৃদ্ধকে কে তা বোঝাবে। তিনি নিজের জগতে মগ্ন। শিশুর হরলিক্স, আঙুর তাকে লুব্ধ করে, তার জন্যেই এসব আনা হয়েছে — এমনও ভাবেন তিনি! চাকর পদোকেও তিনি ডেকে পান না। বাড়িতে এখন অকর্মণ্য বৃদ্ধের চেয়ে কর্মঠ চাকর অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। একেবারে চরম অসহ্য মনে হয় বঙ্কিমকে বৌমা কণিকার সঙ্গে কথোপকথনে। ডাক্তারবাবুর হাত ধোবার জল নিয়ে ওপরে যাচ্ছে কণিকা, তাকে ধরে পড়েছেন বঙ্কিম ওষুধের ব্যবস্থাপত্র আর ওষুধ খাবার সময় নিয়ে। তার ওষুধ খাবার গ্লাস

খোকার ঘর থেকে ভেঙে গেছে শুনে আঁতকে উঠেছেন ঃ

> ''কী ? (কাঁপতে কাঁপতে এসে তক্তাপোষে বসে) ভেঙে গেছে ? না। তোমরা আমার একটা জিনিস একটু নজর দিয়ে রাখতে পারো না! ওষুধের মাপে দাগ কাটা ছিল ঐ গেলাসের গায়ে। আমি এখন কি করি বলো দেখি ...!''[৫৫]

খোকার প্রয়োজনে একে একে বঙ্কিমের ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হয় আলো, খলনুড়ি, পাখা, কুঁজো। বঙ্কিমের মনে হয়, বাঁচার সব উপকরণগুলো তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তীক্ষ্ম, তীব্র চিৎকারে তিনি বাধা দিতে চান কিন্তু ব্যর্থ হন। সব চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুটি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যায় আর কোন চেষ্টা না করা হলেও তীব্রভাবে বেঁচে থাকে বঙ্কিম। মৃত্যুর বিপরীতে জীবন পিপাসার অদ্ভুত রসায়ন সৃষ্টি করেন মনোজ মিত্র নাটকের শেষে। শিশুটির চরম মুহূর্ত, এদিকে সাতটা বেজে গেছে অথচ ওষুধ খাওয়া হচ্ছে না বলে অন্ধকার ঘরে বঙ্কিম ব্যাকুল। লণ্ঠন নিয়ে প্রবেশ করে 'পাথরের মতো শান্ত, কঠিন' নীহার ঃ

> ''নীহার ।। কই তোমার ওষুধ ? (নীহার মিটসেফের দিকে এগিয়ে যায়)
>
> বঙ্কিম ।। ওই মিটসেফের ওপর। দ্যাখো ... সব ছড়ানো কিন্তু।
>
> নীহার ।। থাকুক। (নীহার অন্যমনস্ক হাতে একটা শিশি তুলে নেয়)
>
> বঙ্কিম ।। ওকী, ওটা কী ওষুধ!
>
> নীহার ।। বুকের ওষুধ!
>
> বঙ্কিম ।। না ...
>
> নীহার ।। হ্যাঁ ... খাও ...
>
> বঙ্কিম ।। (সভয়ে) না ... না ... ভাল করে দ্যাখো ... (নীহার বঙ্কিমের দিকে এগোয়)
>
> নীহার ।। দেখতে হবে না। খাও ...
>
> বঙ্কিম ।। না, খাব না ...
>
> নীহার ।। (শান্ত কঠিন গলায়) তোমায় খেতে হবে।
>
> বঙ্কিম ।। (ভয়ে) রবির মা, রবির মা ...
>
> নীহার ।। নাও ধরো ... হ্যাঁ করো ...
>
> বঙ্কিম ।। না ... না ...
>
> (নীহার জোর করে বঙ্কিমের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়। বঙ্কিম অস্ফুট আর্তনাদ করে তক্তাপোষে ঢলে পড়ে। নীহার পাথরের মত স্থির। মঞ্চ নীরব। বাড়ির মধ্যে তীক্ষ্ম কান্নার রোল উঠল।)''[৫৬]

নীহার এই প্রতিদিনের বেঁচে থাকার গ্লানি থেকে বোধহয় বঙ্কিমকে একেবারে মুক্তি দিতে চেয়েছিল, মুক্ত হতে চেয়েছিল নিজেও। কিন্তু বঙ্কিম তবু বেঁচে থাকে, মারা যায় 'রবির ছেলেটা'। বাড়ির তীক্ষ্ম কান্নার রোলের মধ্যে মিশে গিয়ে নীহার নিজেকে এবং বঙ্কিমকে করে তুলতে চায় সকলের একজন। নিজেদের বেঁচে থাকা জানান দেওয়ার একমাত্র উপায় এখন তীব্র, তীক্ষ্ম কান্না ঃ

''বঙ্কিম ।। রবির মা, ওষুধ খেয়েও আমার বুকের চাপ কমেনি। আমার কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে!

নীহার ।। (বঙ্কিমকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে) তবু কাঁদো ...

বঙ্কিম ।। আমি পারব না ...

নীহার ।। পারবে। কেঁদে তুমি জানিয়ে দাও ওদের, আমরা দু'জনে এ ঘরে এখনও বেঁচে আছি!''[৫৭]

জীবনের এই প্রথম নাটকে মনোজ মিত্র দেখালেন, বিপন্ন মানুষ স্নেহ-মায়া-মমতার আশ্রয় চায়, মানসিক শুশ্রূষা চায়, সংসারে কিছুটা গুরুত্ব চায়। এইসব চাওয়ার কোনোটিই পূর্ণ হয় না। এই অপূর্ণতার জন্য নাট্যকার কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান না। কোনো তথাকথিত খল চরিত্র এখানে নেই। নাট্যকার শুধু পরিচিত এবং স্বাভাবিক পরিবেশে ফেলে চরিত্রের মুখে স্বাভাবিক সংলাপ তুলে দেন। এই নাটকে বঙ্কিমের দুই ছেলে, পুত্রবধূ, ডাঃ সেন, পদো — প্রত্যেকের আচরণ পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিকতার মধ্যে বঙ্কিমের প্রবল জীবনতৃষ্ণা যেন বিসদৃশ ঠেকে, অথচ অদ্ভুত এক সহানুভূতি তৈরি হয় তার প্রতি। অত্যন্ত সহজ সংলাপের সাহায্যে মনোজ মিত্র তুলে ধরেন বঙ্কিমের জীবনতৃষ্ণাকে ঃ

''নীহার ।। এখনো বাঁচার ইচ্ছে আছে তোমার ?

বঙ্কিম ।। (মুখ বিকৃতি করে) হ্যাঁ, বাঁচার ইচ্ছে! সে ইচ্ছে থাকলে কবে এতদিন দু'ফোঁটা মালিশের ওষুধ জিবে ঠেকিয়ে আমি তোমাদের হাত থেকে বাঁচতাম! দিনরাত ঐ বাঁচা নিয়ে আমায় খোঁটা দেওয়া! ... নাও, দেখ, কী ওষুধ এটা ...'' [৫৮]

বঙ্কিমের মতো মানুষেরা সংসারে গুরুত্বহীন কিন্তু নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভেবে তারা তৃপ্তি পেতে চান। এই আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপ দেন মনোজ মিত্র বঙ্কিমের সংলাপে ঃ

''(আপন মনে) এখন কিছু খেয়াল করবি না! না করিস, করিস নে। এবার আবার হার্টের অ্যাটাক হলে ... এই শরীরে ... (অপেক্ষাকৃত জোরে) একেবারে মরণাপন্ন না হলে তো তোদের টনক নড়বে না! শেষে ছোট পদো ... ছোট শম্ভু ... আন ওষুধ ... আন হরলিক্স ...''[৫৯]

শিশুর ঘর বা শিশুটিকে না দেখিয়েও নাট্যকার ফুটিয়ে তোলেন মুমূর্ষু শিশুটিকে নিয়ে উদ্বেগ

ও ব্যস্ততা। এই উদ্বেগের কাছে আজ গুরুত্বহীন বৃদ্ধ বঙ্কিমের পনেরো বছরের অসুস্থতা। মনোজ মিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক নাট্যপরিস্থিতি সৃষ্টি করেন এই বিষয়গুলি নিয়ে। আলোর জন্য বঙ্কিমের আর্তনাদ, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে বুকে জলের হাত দেবার মুহূর্তে পদোর কুঁজো নিয়ে চলে যাওয়া প্রভৃতি ছোট ছোট ঘটনা পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাভাবিক কিন্তু হৃদয়স্পর্শী। তবে বঙ্কিমের লুব্ধতা প্রকাশে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ঃ

"বঙ্কিম ।। ওরে পদো, আমি কী খাব রে ? হরলিক্সটাও ভাঙা হবে না রে!

পদো ।। আপনি দেখছি ছেলেপিলেরও অধম হলেন! খোকার তো অত খাই-খাই নেই। দু-ঠোঁটের ফাঁকে যা দিচ্ছে ... তাই গড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে। ডাবের জল ... বার্লির জল ... লেবুর রস ... মুসুম্বির রস ...

বঙ্কিম ।। ওরে তোকে কি আমি ফর্দ শোনাতে বলেছি।"[৬০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় লক্ষ্যভেদের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত এই সংলাপ। এই পরিবারে সবচেয়ে বিব্রত অবস্থা বঙ্কিমের স্ত্রী নীহারের। অবুঝ স্বামীকে নিয়ে সে মরমে মরে আছে। তার অসহায়তা ক্ষোভ হয়ে ঝরে পড়েছে। সন্তানের সামনে তীব্র রাগ এবং বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি যেন স্বামীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান ঃ "পারিসনে, ধরে বেঁধে এক শিশি একদিন গলার মধ্যে উপুড় করে দিতে পারিস নে ?"[৬১] কিন্তু নির্জনে আবার এই লোকটির কাণ্ডালপনাই তাকে ব্যথিত করে। খোকার জন্য আনা আঙুর থেকেই সামান্য একটু তুলে দিতে যান বঙ্কিমের ব্যগ্র হাতে। কিন্তু দেওয়া আর হয়ে ওঠে না, পদো এসে জানায় —আঙুর ফেরত দিয়ে মুসুম্বি আনতে হবে — সুতরাং একটা ফল কম পড়লে চলবে না। একেবারে শেষে নীহারের অসহায়তা চরমে উঠেছে। বাড়িতে একটা শিশু মারা গেছে — সেই শোকে সামিল করতে হবে, করতেই হবে, অবুঝ স্বামীকে —এ যেন বেঁচে থাকার দায় — টিঁকে থাকার শর্ত।

'মৃত্যুর চোখে জল'-এর বঙ্কিমই তো 'কেনারাম বেচারাম'-এর বেচারাম। বঙ্কিমের ঠাঁই হয়েছে সিঁড়ির নিচে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে, আর সেরকম অনাদর অসহ্য হতেই তো বেচারাম বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। নীহার যে সদ্যমৃত নাতির শোকে বঙ্কিমকে কাঁদতে বলেছে, সেটাই তো 'হেড অব দি ফ্যামিলি'র প্রোনান্‌শিয়েশন। Psychologically অস্তিত্ব রক্ষার প্রবল প্রয়াস। এই কান্নার অর্থ হ'ল, আমি পরিবারের জন্য Feel করছি, আমি এই পরিবারের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার, আমি এই পরিবারলগ্ন। কিন্তু এই প্রোনান্‌শিয়েশন যখন গুরুত্ব পায় না, Psychologically attachment যখন শিথিল হয়ে পড়ে তখন Physical উপস্থিতি অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই বঙ্কিমের উত্তরপুরুষ বেচারামকে ঘর ছেড়ে পথে নামতে হয়।

আশ্রয়ের সমস্যা অনেক Serious ধারায় এসেছে 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকে।

এই নাটক থেকে মনোজ মিত্রের নাট্যরচনা-ধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন সমালোচক। কুমার রায়ের মতে ঃ ''আগের সব নাটক থেকে এ আলাদা।''[৬২] সৌমিত্র বসুও মনে করেছেন ঃ '''অলকা নন্দার পুত্রকন্যা'য় তিনি মোড় ফিরছেন।''[৬৩] মনোজ মিত্রের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হাসি-মজা-কৌতুক এখানে অনেকটাই কমে গেছে। এক অসুস্থ সময়ের কথা বললেন মনোজ মিত্র এই নাটকে। এই নাটক রচনার বাহ্য প্রেরণা সম্ভবত দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত নাট্যোৎসবে সেখানকার নাট্যানুরাগী মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতাতেই উপ্ত হয়েছিল। ১৯৮২ সালের জুলাই-আগস্ট সংখ্যার 'নাট্যচিন্তা'য় মনোজ লিখেছেন যে, দিল্লির নাট্যানুরাগী মানুষের পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকারদের সম্পর্কে অভিযোগ, তাঁরা পাঁচ রকম মানুষ নিয়ে নাটক লিখতে পারেন না। সেখানেই একজন বলেছিলেন ঃ ''জানেন আমার জীবনের কি সমস্যা ? আমার ছেলে র‍্যাগিং-এর পাল্লায় পড়েছে। আপনাদের নাটকে এ জিনিস কি ধরা হয়েছে ?''[৬৪] এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই তাঁকে ভাবিয়েছিল। বেশ কয়েকবছর পর 'অলকানন্দার পুত্র কন্যা'য় অন্যতম কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে তিনি র‍্যাগিংকে গ্রহণ করলেন। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' শহর জীবনের নাটক, আধুনিক সময়ের নাটক কিন্তু সবার ওপরে এ এক সর্বংসহা মায়ের নাটক। স্বামী রজনীনাথ এবং পুত্র শুভ ও কন্যা মানসীকে নিয়ে অলকানন্দার সংসার। এক সময় কলেজ স্ট্রীটে বিরাট বইয়ের দোকান এবং প্রকাশনার ব্যবসা ছিল রজনীনাথের। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে রজনীনাথ-অলকানন্দা ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু মাতৃত্ব শুধু গর্ভধারণে হয় না, প্রকৃত মাতৃত্ব সন্তানের লালনে। অলকানন্দা সেই মা। অনাথ আশ্রম থেকে মানসীকে আর উঠতি দরিদ্র লেখক যদুপতি সিকদারের স্ত্রী মারা যাবার পর তাঁর সাতদিনের শিশুপুত্র শুভকে নিয়ে এসেছে অলকানন্দা-রজনীনাথ। অলকানন্দার ভাই বাদল এই 'পুষ্যি' নেওয়াকে বড়লোকের বিলাসী খেয়াল বলে মনে করলেও অলকানন্দা কিন্তু ভিন্ন পথে ভাবে ঃ ''কেন বারবার পুষ্যি-পুষ্যি করো! ভাবতে পারো না ওরা আমার ... আমার পেটের সন্তান ... এটুকু মেনে নিতে এত জটিলতা কেন হয় তোমাদের!''[৬৫] ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এলেও এবং তাদের পরিচয় গোপন না করলেও শুভ আর মানসী নিজের ভাইবোনেরই মতো হয়ে গেছে। এক বিজয়া দশমীর দিন নৌকা করে নদীতে বেড়ানোর সময় মানসী জলে পড়ে গেলে রজনীনাথও পিছু পিছু জলে ঝাঁপ দেন। সাঁতার-জানা মানসী সহজেই ওপরে উঠে আসে কিন্তু রজনীনাথকে পাওয়া যায় আধঘন্টা পরে। নৌকার গলুইয়ে মাথায় যে আঘাত লাগে তাতেই সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়েন। তিনবার বিদেশে পাঠিয়ে ব্রেন অপারেশন এবং চিকিৎসার আনুষঙ্গিক খরচ জোগাতে ব্যবসা বিক্রি করে দিতে হয়। পুরুষ পঙ্গু হয়ে স্থান নেয় ঘরের কোণে আর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নেয় নারী — নেয় অলকানন্দা। তার সঙ্গীতশিক্ষিকার চাকরিই এখন সংসারের একমাত্র অবলম্বন। মানসীর বিয়ে দিতে সঞ্চিত শেষ অর্থও সে প্রায় সম্পূর্ণই ব্যয় করেছে। হস্টেলে থেকে শুভর ইঞ্জিনিয়ারিং

পড়ার খরচও তাকে জোগাতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য অলকানন্দার — তার ছেলে-মেয়ে কারো জীবনই সুখের হয় নি। মানসীকে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত হতে হয়েছে আর শুভ তার কলেজে র‍্যাগিং-এর কবলে পড়েছে। এই বিপর্যস্ত সময়েও অলকানন্দা বাড়িতে আশ্রয় দেয় ফুটপাথের ছেলে লালাকে, মমতায় কাছে টেনে নেয় পাশের ফ্ল্যাটের উচ্ছৃঙ্খল দেবাহুতির অনাদৃত সন্তানকে। অলকানন্দা আগলাতে চেয়েছে মানসীকে, আগলাতে চেয়েছে শুভকে কিন্তু ডানার বাইরে তার শক্তি যে সীমিত। ভাই বাদল এবং তার অধ্যাপক পুত্র পার্থ যথাসাধ্য সাহায্য করেছে অলকানন্দাকে। মানসী শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়িয়েছে নিজের অধিকার আদায়ে। লড়াই করে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করবে বলে সে ফিরে আসেনি অলকানন্দার কাছে। কিন্তু শুভ র‍্যাগিং-এর মানসিক পীড়ন সহ্য করতে পারে নি। বন্ধুবেশী শত্রু জয়দীপের টাকার দাবি মেটাতে সে প্রথমে অলকানন্দার কাছে এবং সেখানে ব্যর্থ হয়ে তার আগের বাবা যদুপতি সিকদার (যিনি এখন যুগান্তর শর্মা নামে বিখ্যাত লেখক)-এর কাছে গেছে। কিন্তু যদুপতিও তাকে কোনো টাকা দেন নি। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে শুভ পাগল হয়ে গেছে এবং শেষপর্যন্ত তাকে পাগলাগারদে পাঠাতে হয়েছে। কেয়াপাতার যে দুটো নৌকা গড়েছিল অলকানন্দা, নোঙর ছিঁড়ে সে দুটো ছুটে গেছে ভরা গাঙের মাঝখানে, ডুববে কি ভাসবে সে জানে না। তাই সে আরেকটা নৌকা গড়তে চেয়েছে। দেবাহুতির ফেলে যাওয়া শিশুপুত্রকে সে কোলে তুলে নিয়েছে। রজনীনাথ বারবার বাধা দিতেন অলকানন্দাকে ঐ শিশুটির কাছে যেতে, কারণ তিনি জানতেন, অলকা শেষে পর্যন্ত এই শিশুটিকেও নিজের ডানার নিচে আশ্রয় দেবে। যখন সত্যি সত্যি তাই ঘটেছে তখন রজনীনাথ আর নিষেধ করতে পারেন নি। উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি নিয়ে তিনি দোলনার দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। বাদল বিরক্ত হয়ে বাইরে চলে যেতে চাইলেও পুত্র পার্থ তাকে হাত ধরে আটকেছে, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অলকানন্দার কাজের মহত্ত্বের প্রতি ঃ ''বাবা ... তুমি তো বলো বাবা, মানুষের বড় কাজ করার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। আজ আমার পিসি কোথায় দাঁড়িয়ে কী কাজটা করছে, একবার দেখবে না!''[৬৬] অলকানন্দা 'জোরে, আরও জোরে' দোলনাটা দোলাতে থাকে। নতুন শিশুর সঙ্গে অলকানন্দার মাতৃসত্তার নতুনতর বিকাশের সম্ভাবনায় নাটক শেষ হয়। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকের বিষয়বস্তুকে চমৎকার চিহ্নিত করেছেন সৌমিত্র বসু ঃ

> ''সে নাটকে আছে এই ছন্নছাড়া সময়ের কথা, আছে এক নষ্ট মা, যে তার বাচ্চাকে ফেলে পালিয়ে যায়, আছে এক নষ্ট দাম্পত্য যেখানে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, আছে এক নষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে সরলতাকে কুঁকড়ে যেতে হয় ক্রমশ।''[৬৭]

এই নষ্ট সময়ের ক্ষতে শুশ্রূষার প্রলেপ দিতে পারে কেবল মায়ের কোমল হাতের স্পর্শ। অলকানন্দা সেই মা। এই মাতৃত্বের সঙ্গে গর্ভধারণের কোনো সম্পর্ক নেই। এ এক ধারণা। সেই ধারণা লালনের, সেই ধারণা সেবার। আধুনিকা দেবাহুতি গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে কিন্তু 'মা' হতে পারে নি। ভেতর থেকে সে নিজের সন্তানের জন্য কোনো টান অনুভব করে না। অথচ অলকানন্দা বলে ঃ ''নিজের পরের ওসব কোনো কথা নারে দেবাহুতি। একবার

চোখ বন্ধ করে ভাব ... দেখবি আপন-পর সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।''[৬৮] শুভ-মানসীকে আপন ভাবে বলেই অলকানন্দা যেমন মমতায় শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত মানসীকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে ধানবাদ যাবার জন্য ব্যগ্র হয়, সেরকম ক্ষোভে দুঃখে দুর্বিনীত শুভর গালে চড় বসাতেও দ্বিধা করে না। ব্যক্তিগত জীবনে অলকানন্দার তীব্র সংগ্রাম। স্বামী পঙ্গু হয়ে যাবার পর সংসারের সম্পূর্ণ দায় তার ওপর, সখ-আহ্লাদ বলতে তার কিছুই নেই। একবার চকিতে সেই আক্ষেপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ঃ ''নিজের আর কি ... ঝুপ করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভুবন সংসারের বাইরে চলে গেছ! যতই সিঁদুর পরি, চুল বাঁধি - চোখেও পড়বে না ...''[৬৯] নিজের জীবনের সব অপূর্ণতা, সব দুঃখ-বেদনাকে সে ভুলে থেকেছে সন্তানের প্রতি গভীর মমতায়। সেই মমতা বিস্তৃত হয়েছে ফুটপাথের ছেলে লালার প্রতি, দেবাহুতির অনাদৃত সন্তানের প্রতি। মনোজ মিত্র দেখাতে চান, যে করে সে এমনি করে।পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অলকানন্দার ক্রিকেট-পাগল ভাই বাদল দেবাহুতির সন্তানকে নিজের করে নেবার মধ্যে অলকানন্দার খামখেয়ালিপনাকেই দেখে কিন্তু অলকানন্দা প্রত্যয়ে দৃঢ় ঃ

> ''হ্যাঁ বয়েসটা আমার পশ্চিমে হেলেছে। হাতে পায়ে আর সে জোর নেই। শুভকে যেমন করে দুহাতে তুলে চাঁদ দেখাতাম, আর তা পারব না। যেমন করে লাঠি হাতে মানসীর পেছনে তেড়ে গিয়ে শাসন করেছি, তাও পারব না! (দোলনার শিশুকে) হয়ত অকূলে ভাসিয়ে যাব রে তোকে! ... সে ভয় তো আছেই! (বাদল ও পার্থকে) তবে তোমরা সবাই যদি একটু সাহায্য করো ...''[৭০]

বাধা-বিপত্তি, প্রতিকূলতার ভয়ে মানুষ বড় কোন কাজে হাত দেবে না, একথা বিশ্বাস করেন না মনোজ মিত্র। তাই জীবনের পড়ন্ত বেলাতেও নতুন দায়িত্ব নিয়েছে অলকানন্দা, দু'বাহু বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরেছে সেই অসহায় শিশুটিকে, মাতৃত্বের মমতা যার পরম প্রয়োজন। মনোজ মিত্রের নাটকে অসহায়ের জন্য, বিপন্নের জন্য এভাবেই অপেক্ষা করে থাকে এক স্নিগ্ধ আশ্বাসের জগৎ। অলকানন্দা সেই মা যে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে হিসেবি আর সাবধানী হয় না, আর্তের ক্রন্দন শুনলেই তার ওপর মেলে দেয় নিজের ডানা। তাকে তাই মাদার কারেজ-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন সমালোচক ঃ "Alkananda is also a peacetime Mother courage who refuses to learn from experience."[৭১] অলকানন্দার পঙ্গু স্বামী রজনীনাথকে বর্তমান 'প্রজন্মের আসল সঙ্কট'-এর 'পুঞ্জীভূত প্রতীক' বলে মনে করেছেন অধ্যাপক বিষ্ণু বসু। পঙ্গুতা, স্থবিরতা এই প্রজন্মের প্রধান অসুখ। Abnormality যেন এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। দেবাহুতি, শুভ, জয়দীপ সকলেই abnormal. সময়ের এই পঙ্গুতাকে, স্থবিরতাকে যেন সচল করে অলকানন্দা। যখন ঃ

> ''খসে পড়েছে যাবতীয় মূল্যবোধ, নিজের শিশুকে অক্লেশে ছেড়ে চলে যেতে পারে এখনকার অনেক দেবাহুতি, ... স্বার্থপরতায় ও লুব্ধতায় আক্রান্ত যুব শক্তি, ... সেখানে 'মাদার ইমেজ' নিয়ে ক্রমে অভিব্যক্ত হতে থাকে অলকানন্দা। ... শুধু শিকড় নামিয়ে চলে নিরবচ্ছিন্ন মাতৃত্বের।''[৭২]

অস্থির এই সময়ে তরুণ প্রজন্ম যেন ঝড়ের পাখি। তাদের অবস্থা যথার্থ চিত্রিত হয়েছে যদুপতির সংলাপে ঃ

> ''কালবৈশাখীর ঝড়ে আকাশের পাখিদের অবস্থাটা কখনও দেখেছেন বৌদি ? ঝড়ের দোলায় দাপাদাপি করে সমস্ত গাছ ... কোন ডালে পাখিরা বসতে পারে না। ... ডাল থেকে ডালে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে পাখিরা। ... আজকের নবীন তরুণ আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে একজন অর্থবান পিতার সন্ধান করে! কেনাবেচা বেচাকেনা ... এছাড়া আজকের ছেলেরা কিছু বোঝে না বৌদি! হয়তো বিশ্বাসও করে না।''[৭৩]

'একটা প্রচন্ড ঝড়ো দুনিয়ার এক ঝলক হাওয়া' ঢুকে পড়েছে অলকানন্দার ঘরে। সেই ঝড়ো হাওয়া থেকে শুভকে সে বাঁচাতে পারে নি। শুভর স্থান হয়েছে মেন্টাল অ্যাসাইলামে। মানসী নিজের লড়াই নিজেই লড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। জীবনের এই শূন্য সময়ে অলকানন্দা কোলে তুলে নেয় দেবাহুতির পরিত্যক্ত শিশুকে। এই নতুন দায়িত্ব গ্রহণকে জীবনের অস্তিত্বের দিকে যাত্রা বলে মনে করেছেন সমালোচক ঃ

> ''ফুরিয়ে যাওয়াকে পার হয়ে জীবনের 'হ্যাঁ'-এর দিকে, অস্তিত্বের প্রবল উপলব্ধির দিকে অলকানন্দার জয়যাত্রা। সেখানে অলকানন্দা শুধু একজন ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী নন, মানসিকতার সৌন্দর্যে আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একজন মানুষ।''[৭৪]

দীর্ঘদিন পর, বলা চলে সেই 'নেকড়ে' (১৯৬৮) 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯)-র প্রায় কুড়ি বছর পর মনোজ মিত্র Serious কথা Serious ভঙ্গিতে বললেন 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য়। এই ভঙ্গি বদলের দিকটিকে লক্ষ্য করেই সমালোচকেরা মনোজের মোড় ফেরার কথা বলেছেন, 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'কে অন্য ধরণের নাটক বলেছেন। তা নাহলে বিষয়ের দিক থেকে মনোজ মিত্র কিন্তু এখানেও আছেন নিজের সেই পুরনো বিশ্বাসের জগতে। যুগযন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যের মধ্যে নয়, পাঠককে পৌঁছে দেন এক আস্তিক্যবোধের জগতে। অলকানন্দার মধ্যে সেই আস্তিক্যবোধ, সেই শুভ ও মঙ্গলচেতনারই জয় ঘোষিত হয়েছে।

আধুনিক সমাজের যেসব সমস্যা পারিবারিক সংকট সৃষ্টি করে পরিবারকে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করে তাকেই মানবিক সম্পর্কে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে পরিবারকে রক্ষা করার চেষ্টা 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটক। ধ্বংসাত্মক (Destructive) এই সমাজে নারী অলকানন্দা গঠনাত্মক (Creative). সে অন্যের অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করেছে। অনাথ আশ্রমের মানসী, মাতৃহীন শুভ, পথের কিশোর লালা, দেবাহুতির অনাদৃত সন্তান – প্রত্যেকেই তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছে। এই আশ্রয় না পেলে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারতো। যাদের অস্তিত্ব রক্ষা করছে অলকানন্দা, এই সমাজ আবার তাদের ভাঙছে। মানসী শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহীতা, শুভ হস্টেলে র‍্যাগিং-এর শিকার। অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ব আবার বিপন্ন হচ্ছে। তার মধ্যেও কেউ

কেউ মানসীর মতো নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াইয়ে তৈরি হয়ে যায়। এখানেই অলকানন্দার সার্থকতা, অলকানন্দাদের সার্থকতা। মনোজ মিত্র নাটকের শেষে বলতে চেয়েছেন, সমাজ এবং পরিবারের কাঠামো রক্ষা করতে, তাকে সুস্থ, সুন্দর করতে অলকানন্দাদের প্রয়োজন আরো কিছু সাহায্যের হাত।

'শোভাযাত্রা' (১৯৯০) - কেও আমরা পারিবারিক নাটক-ই বলতে চাই। যদিও নাটকে চিত্রিত ধনগোপালের পরিবার বাংলাদেশের ক্ষয়প্রাপ্ত জমিদারি ব্যবস্থার উত্তরপুরুষ শ্রেণিটিরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এ নাটক নিঃসন্দেহে সময়ের ট্রাজেডি কিন্তু তার মধ্যে মনোজ ভরে দিয়েছেন মানুষে মানুষে সম্পর্কের নিরুচ্চার প্রকাশকে। প্রাচীন জীর্ণ জমিদার বাড়ির কর্তা ধনগোপাল থাকেন তার দুই মেয়ে অতসী ও সরসী এবং অতসীর একুশ বছরের জড়বুদ্ধি ছেলে শঙ্খকে নিয়ে। এই জড়বুদ্ধি ছেলের জন্যই অতসীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন খোরপোষের মামলা চলছে। ছোটো মেয়ে সরসীর বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। পূর্বপুরুষের জমিদারির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই ধনগোপালের। আছে শুধু নিষ্ফল স্বাতন্ত্র্যবোধ আর পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের জন্য গ্রামবাসীদের ক্রোধ এবং প্রতিহিংসা। নিজেকে ক্রমশ সবকিছু থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন ধনগোপাল। তিনি ভোট দেন না, তাই তার সঙ্গে কোন 'দল' নেই, বর্গাদার ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে বলে তিনি বর্গাদারের কাছে যান না, উকিলের জেরা শুনতে হবে বলে তিনি অতসীর কেসের ব্যাপারে কোর্টে যাবেন না — নিজের চারদিকে অদৃশ্য এক গন্ডি কেটে দিয়েছেন তিনি নিজেই। ধনগোপালের উঠোনে আছে ঢাউস এক রথ — জগন্নাথের। জমিদারির শেষ চিহ্ন। দোল, দুর্গোৎসব সব বন্ধ হয়ে গিয়ে আছে কেবল এই রথযাত্রার উৎসব। প্রতি বছর এই রথযাত্রা উপলক্ষে মাধবকাটি গ্রামে বিশাল উৎসব হয়, মেলা বসে যায়। করব না করব না করেও ধনগোপাল প্রতি বছরই এই উৎসবটা করে থাকেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই রথ এবং শঙ্খর ওপর কার অধিকার থাকবে — তা নিয়ে নাট্যদ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত হয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত যামিনীর কথায় প্রথম শঙ্কা জেগেছে — তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে, এবার থেকে জগন্নাথের বিগ্রহ, মন্দির এবং রথযাত্রা 'ইজারা' নিচ্ছে মাছের ব্যবসা করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা মন্মথ পাল। ধনগোপালের কয়েক বিঘে সম্পত্তি মন্মথের কাছে বন্ধক আছে পাঁচ বছর ধরে। মন্মথ সেই বন্ধকের দলিল ধনগোপালকে ফেরৎ দেবে, বিনিময়ে জগন্নাথের পুরো 'এস্টাবলিশমেন্ট' যাবে তার হাতে। মাছের ব্যবসাদার মন্মথ মাছের ভেড়ির মতোই জগন্নাথের 'ইজারা' নিয়েছে। জগন্নাথ এবং রথযাত্রাকে ঘিরে তার বিরাট ব্যবসার পরিকল্পনা। জগন্নাথ এখন তার 'মূলধন'। রথের চাকা মাটিতে দেবে গেছে, মন্মথ এবং তার সঙ্গীরা রথকে সচল করেছে। কিন্তু নিয়ে যাবার মুখে বাধা আসে অতসী, সরসী এবং মুকুলের কাছ থেকে। মুকুল ধনগোপালের জ্ঞাতি ভাই রমেশের ছেলে। বিগ্রহ দিয়ে রথযাত্রা উৎসবটা রায়বাড়িরই রাখার প্রস্তাব দেয় মুকুল। কিন্তু উৎসব ছেড়ে বিগ্রহ নিতে চায় না মন্মথ। সকলের বাধায় আপাতত স্থগিত থাকে রথ হস্তান্তর। এদিকে শঙ্খকে নিয়ে মামলাও ঘুরে গেছে। অতসী পাঁচশো টাকা করে খোরপোষ পাচ্ছে, দু'হাজার টাকা

দাবী করে মামলা করেছে। কিন্তু ওপক্ষ এবার ছেলে ফেরৎ চেয়েছে। তারা নাকি শঙ্খর চিকিৎসা করাবে বিদেশে নিয়ে গিয়ে, তাকে স্বাভাবিক মানুষ কবে তুলবে। অর্থাৎ একদিকে জগন্নাথের রথ আর একদিকে শঙ্খকে হারাবার আশঙ্কা একসঙ্গে দেখা দেয় রায় পরিবারে। কাহিনি ক্রমে অন্য মাত্রায় বিস্তারিত হয় নদুর উপস্থিতিকে ঘিরে। নদুর মা জোছনা একসময় মুকুলদের মোহনকাননের বাড়িতে রান্না করত। কিন্তু এর গভীরে ছিল অন্য কাহিনি — ছিল জমিদারবাড়ির ব্যভিচার। মুকুলের বাবা রমেশ রায়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল জোছনার। সেই ক্রোধ রক্তে বহন করে নদু। জমিদার-পরিবারকে নানাভাবে অপদস্থ করে সে প্রতিশোধ নিতে চায়, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায়। ধনগোপাল রায়ের ঝাড়ের বাঁশ কেটে নেয় সে বিনা অনুমতিতেই। কৈফিয়ৎ চাইলে কুণ্ঠিত হয় না, বরং ফুঁসে ওঠে ঃ ''বেশি তড়পাবেন না। জমিদারবংশের তড়পানি আমার একদম সহ্য হয় না। একসময় সারা দেশে অত্যাচার করেছে, আবার নীতি শোনাচ্ছে!''[৭৫] কথা-কাটাকাটি একসময় চরমে ওঠে। মুকুল একটা কাঠের টুকরো দিয়ে নদুর কুড়ুল-ধরা হাতে আঘাত করে। আহত হাত চেপে নদু বেরিয়ে যায়, কিন্তু ঘটনাটা এখানেই শেষ হয় না। এক রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কর্মী (আচরণ এবং সংলাপে বামপন্থী বলেই মনে হয়) উদয় নদুকে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। নরমে-গরমে ধনগোপালকে বুঝিয়ে দেয়, নদুর সঙ্গে বিষয়টা মিটিয়ে নিতে হবে। উদয়ের সঙ্গে কথোপকথনে প্রকাশ হয়ে পড়ে ধনগোপালের অভিমান, পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলার ক্লান্তি ঃ

> ''আমি জানি একটা বাঁশ, ভাঙা দরজা কি চারটে ফলপাকুড় এসব বৃহৎ কিছু না। যা আমরা হারিয়েছি তার কাছে অতি তুচ্ছ ... নগণ্য। কিন্তু কি জানো উদয়, আমি বুঝতে পারছি —যারা এগুলো নিচ্ছে, তাদের অভাব দরকারের চেয়ে বেশি আছে রাগ, ঘেন্না! যেন লোকটাকে বাগে পেয়েছি, এবার খোঁচাও। যতো পারো খুঁচিয়ে যাও। ... তুমি আমায় বোঝাতে পারো উদয়, বাপ-ঠাকুর্দার দোষ অপরাধ পাপ একটা মানুষ কতদিন টানবে ? কতকাল টানতে পারে সে ?''[৭৬]

বাধ্য হয়ে নদুর সঙ্গে আপস করতে হয় ধনগোপালকে। ক্ষতিপূরণ কতটা চাওয়া যেতে পারে তা ঠিক করতে না পেরে নদু একটা কাজ চায়। তার প্রস্তাব, রায়বাড়ি থেকেই রথের উৎসব হোক আর তাকে করা হোক ম্যানেজার। ধনগোপাল সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান এই শর্তে যে, নদু পুরনো কোনো কথা, রমেশ রায় ও তার মায়ের ব্যাপারে কোনো কথাও মনে রাখবে না। কিন্তু নাটকের পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, নদু কিছুই ভোলে নি — শুধু উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। নদুর ম্যানেজারিতে রথযাত্রার আয়োজন বেশ ভালোই জমে ওঠে। ধনগোপালও সব বিষয়ে নদুর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সেই পুরনো দিনের মতোই চারধার আবার হাঁক-ডাকে জমজমাট হয়ে ওঠে। ধনগোপাল ভাঙা হারমোনিয়াম সারিয়ে নিয়ে এসে আবার সুর তুলতে চেষ্টা করেন। ম্যানেজার নদু বর্গাদারদের ধাতানি দিয়ে এসেছে, তারা রথের আগে কিছু ধানচাল দেবে বলে কথাও দিয়েছে। তবে ম্যানেজারের পদ নদুকে উদ্ধত এবং লোভীও করে তুলেছে। কেটারিং-এর লোক দিয়ে সে জগন্নাথের ভোগ রাঁধাবে

বলে ঠিক করেছে, শঙ্খর খোরপোষের টাকা থেকে যে বারোশ টাকা অতসী নদুকে দিয়েছিল চানযাত্রার মাল কিনতে তা নিজে মেরে দিয়ে কাটা পকেট দেখিয়ে সে পকেটমারির 'গল্প' শুনিয়েছে। ধনগোপাল গল্প বিশ্বাস না করলে সে কৌশলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে রায় পরিবারের পুরনো কেচ্ছা ঃ ''আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি জ্যাঠামশাই, সেদিনের পর থেকে আমি পুরো বিশ্বাসী হয়ে কাজ করছি। আমি সব ভুলে গেছি। ঐ রমেশবাবু ... জোছনা মা ... সব কথা।''[৭৭] নদুর সঙ্গে মন কষাকষি হতেই ফের হাজির মন্মথ। সে তো বুঝতে পেরেছে জগন্নাথ এবং রথযাত্রার 'সম্ভাবনা', তাই সে ওঁৎ পেতেই ছিল। ধনগোপালও এই উৎসবের ভার আর বইতে পারছেন না, তাই চুপচাপেই তিনি রথ তুলে দেন মন্মথর হাতে। কিন্তু সরসী চিৎকার করে শঙ্খকে ডাকে আর মায়ের সঙ্গে কোর্টে যাবার জন্য প্রস্তুত শঙ্খ রথের সামনে শুয়ে পড়ে 'মৃগী রোগীর মত গলা ফাটিয়ে ছটফট করতে থাকে'। অতসী শঙ্খকে টেনে নিয়ে কোর্টে চলে যায়। মন্মথ সঙ্গীদের সাহায্যে রথ নিয়ে যাবার তোড়জোড় করে। ব্যবসার জোর বাড়াতে সে সেখানে দাঁড়িয়েই জগন্নাথ সম্পর্কে এক অলৌকিক গল্প তৈরী করে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অতসীর এক মাত্র অবলম্বন শঙ্খকে নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। জজও শঙ্খকে তার বাবার হাতে ছেড়ে দেবারই পরামর্শ দেন অতসীকে। নিজের ভবিষ্যৎ অতসী নষ্ট করেছে ঐ ছেলের জন্য। আর একটা বিয়ে করেনি, চাকরি করে নি, সব ঐ লোকটাকে 'নিষ্কৃতি' দেবে না বলে। যে ছেলের জন্য তারা অতসীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই ছেলেকে আজ ফিরিয়ে নিলে মাঝখান থেকে অতসী যে নিরালম্ব হয়ে পড়ে। এদিকে ম্যানেজার নদু ধনগোপালের বর্গাদার এন্তাজ মিঞার বাড়িতে গিয়ে এন্তাজের বিবিকে লাথি মেরে দাওয়া থেকে উঠোনে ছিটকে ফেলে দিয়েছে এবং জগন্নাথের পুজোয় লাগবে বলে দশ বস্তা সাদা সর্ষে টেনে নিয়ে এসেছে, যদিও সে সর্ষে জগন্নাথের পুজোর আয়োজনে জমা পড়ে নি। এ নিয়ে সাম্প্রাদায়িক সংঘর্ষ ঘনিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মন্মথ দাঙ্গা বাঁধাবার জন্য ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে গেছে। সুযোগ বুঝে উদয় আবার চেপে ধরেছে ধনগোপালকে ঃ

> ''আসলে ব্যাপারটা কী জানেন দাদা, ... আপনাদের পরিবার চিরকাল লেঠেল পাইকের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কাজ হাসিল করে এসেছে। আজ নদুকে পেয়ে সেই ফিউডাল কায়দায় তাকে ব্যবহারের লোভটা এড়াতে পারেন নি।''[৭৮]

উদয়ও মন্মথকেই রথ দিয়ে দিতে বলে। ইতিমধ্যে এন্তাজ এসে ঢোকে। সে বিশ্বাস করে, ধনগোপাল কখনও তাদের বাড়িতে লুঠতরাজ করতে লোক পাঠাতে পারেন না। কিন্তু বৃদ্ধ এন্তাজের কথা গ্রামের কেউ আর শুনছে না, তারা সবাই ফুঁসছে। এই অবস্থায়, এন্তাজ ধনগোপালকে পরামর্শ দেয়, প্রফুল্লবাবুকে গিয়ে ধরতে। প্রফুল্লবাবু উদয়ের দলেরই উঁচুস্তরের নেতা এবং তিনি যে উদয়ের তুলনায় আলাদা তা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন জনের উক্তিতেই বোঝা

যায়। উদয়রা অনেক কাজই করে থাকে তাঁর অগোচরে। ধনগোপাল কারো কাছে কোনোদিন মাথা নিচু করে দাঁড়ান নি, আজও তার কুণ্ঠা যায় না। মানুষের মুখোমুখি তিনি আর হতে চান না। তাই মুকুলই যায় প্রফুল্লবাবুর কাছে। প্রফুল্লবাবুর পরামর্শে নদুকে ম্যানেজারের পদ থেকে বরখাস্ত করে মুকুল, ক্ষিপ্ত নদু রায়বাড়িতে এসে সামনে পায় সরসীকে। শাসায়, ভয় দেখায়, পায়ে ধরে অনুরোধ করে চাকরিটা ফিরিয়ে দেবার জন্য। ইতিমধ্যে প্রবেশ করে শঙ্খ আর অতসী। সরসীকে সে পাঠায় ধনগোপাল আর মুকুলকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য, শঙ্খর পরনে আজ নতুন জামা, গলায় ফুলের মালা। যে হাত ভাঙা বলে নদু ক্ষতিপূরণ হিসাবে ম্যানেজারির চাকরি পেয়েছিল তা যে আসল ভাঙেই নি সেকথা অতসীর কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে ধূর্ত নদু। ক্ষিপ্ত অতসী নদুকে তাড়া করে — নদু পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে পড়ে, অতসীও তার পিছু পিছু বাগানে যায়। হঠাৎ অতসীর হাঁকডাক বন্ধ হয়ে যায়, একটা চাপা গোঙানি শোনা যায়। শঙ্খ তখন রথের সর্বোচ্চ চাতালে। বাগানের অন্ধকারের দিকে সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। তার শরীর কাঁপছে থরথর করে। পুরোহিত যামিনী তখন চানযাত্রার প্রসাদ নিয়ে এসে শঙ্খকে শোনাচ্ছে পুরাণের কাহিনি — জগন্নাথ কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করলে লক্ষ্মী তাকে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেছেন, খেতেও দেবেন না, উঠতেও দেবেন না। কিন্তু জগন্নাথ 'অপানিপাদ তবু দ্রুতগতি', তিনি নিজেই তখন 'ফুলমালা ধারণ করলেন', কপালে চন্দন মেখে রথে চড়ে বসলেন। যামিনীর এই বর্ণনার সময় রঙিন পতাকা আর জ্বলন্ত প্রদীপে সজ্জিত রথের ওপর নতুন জামা পরা, ফুলের মালা গলায় শঙ্খই যেন জগন্নাথ। সে পাণি এবং পাদযুক্ত, তবু ঠুঁটো। জমিদারতন্ত্রের অবসিত শক্তির মতোই সে অক্ষম। তাই বিস্ফারিত চোখে সে দেখে নিজের মাকে ধর্ষিতা হতে। জমিদারি ব্যবস্থার ওপর ঈর্ষাবশত চরম প্রতিশোধ নেয় নদু। রথযাত্রার উৎসবের আয়োজনে লাগে বিষাদের ছোঁয়া। ধনগোপাল মন্মথর হাতেই রথ তুলে দেবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এদিকে অতসীও শঙ্খকে ছেড়ে দেবে বলেই ভাবে। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় রায়বাড়ির উঠোন-জোড়া রথটা আর নেই। প্রফুল্ল মন্ডলের পরামর্শ শুনে রথ তুলে দেওয়া হয়েছে জনসাধারণের হাতে। পরিবারের গন্ডি থেকে মুক্ত হয়ে জগন্নাথের রথ সর্বজনের হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সম্ভাবনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পটভূমিতে পরিবর্তিত হয়েছে। শঙ্খকেও কোর্টের রায়ের জোরে নিয়ে গেছে তার বাবা। রায়বাড়ি আজ রথশূন্য, জগন্নাথশূন্য। সরসীর আজ খুব মনে পড়ছে প্রায় বন্ধুর মতো হয়ে ওঠা শঙ্খকে। ধনগোপাল রায় আজ নিঃস্ব। বংশের আভিজাত্যের শেষ প্রতীক রথ হারিয়ে, হাবা গোঙা নাতিকে হারিয়ে, ধর্ষিতা মেয়ের কলঙ্ক নিয়ে ধনগোপাল আজ সামন্ততন্ত্রের ভগ্নস্তূপ। এই শেষ দৃশ্যেই সরসীর প্রতি মুকুলের ভালোবাসা ব্যক্ত হয়, অতসী এই সম্পর্কের পূর্ণতা দিতে সাহায্য করবে বলে জানায়। জগন্নাথের রথের শোভাযাত্রা চলেছে গ্রামের পথ দিয়ে। রথ আর রায়বাড়ির নয়, রায়বাড়িও আর সাধারণের তুলনায় স্বতন্ত্র নয়। শোভাযাত্রায় যেতে চান ধনগোপাল, যেতে চায় মুকুল। কারণ, মালিকানা গেলেও অধিকার তো যায় নি। জগন্নাথের রথ আজ সকলের। সেই সকলের মধ্যে তারাও তো

আছেন। ধনগোপাল শোভাযাত্রায় যাবার জন্য ছটফট করছেন। কিন্তু অতসী যাবে না শোভাযাত্রায়ঃ ''আজ আমার রথও নেই, জগন্নাথও নেই! হয়তো এই বাড়িতে তাদের মানাচ্ছিল না! দুঃখ বুঝিনে, ব্যথাও বুঝিনে! সবাই যাও তোমরা, কিছু মানিনে! যাও ...'',[৭৯] অতসী শঙ্খ বাজায়। পরপর দুবার। ধনগোপাল, মুকুল, সরসী শোভাযাত্রায় পা মেলাতে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তৃতীয়বার কিছুতেই শাঁখ বাজাতে পারছে না অতসী। প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছে, 'শোভাযাত্রার আলো ডাক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে' বলে মনোজ মিত্র নাটক শেষ করেছেন।

'শোভাযাত্রা' নাটকের প্রতীতি মনোজ মিত্র পেয়েছিলেন মহিষাদলের রাজার দেওয়ানবাড়িতে। সিনেমার শুটিং-এ গিয়ে সেই বাড়িতে উঠেছিলেন। ভাঙাচোরা বিশাল বাড়িটায় বাস করেন সস্ত্রীক দেওয়ানের এক বংশধর। একদিন তাঁর ঘরে খেতে বললেন মনোজ মিত্র এবং দীপঙ্কর দে'কে। সেই বাড়ির উঠোনে তাঁরা দেখেছিলেন ঃ ''ঢাউস একখানা জগন্নাথের রথ। বহুকেলে। রথের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে। কাঠে পচন ধরেছে। কলতলার পেছনে ঘন সবুজ বাঁশ ঝাড়। বাঁশের মাথা রথের মাথায় ঢলে পড়েছে।''[৮০] বাড়ির গিন্নির সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল, আগে খুব সমারোহের সঙ্গে রথযাত্রার উৎসব হতো। অনেক দিন সেসব চুকে গেছে। জগন্নাথের রথ — ফেলতেও পারেন না, বিক্রি করতেও পারেন না — বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আমবাগানে তাদের অনেক আমগাছ কিন্তু একটা ফলও ঘরে ওঠে না। আশেপাশের গাঁয়ের লোকজন সব জোর করে পেড়ে নিয়ে যায়, বাধা দিতে গেলেই বলে, রাজবাড়ির লোকজন এককালে তাদের শোষণ করে এতো সম্পত্তি করেছে, এখন সুদে-আসলে পাওনাগন্ডা বুঝে নেব। সেই হতদরিদ্র পরিবারটি পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। মনোজ মিত্র বলেন ঃ ''শোভাযাত্রায় ঐ বাড়িটা আছে, ভাঙা রথ আছে, বাঁশঝাড়টাও আছে, আর আছে বোধহয় গৃহকর্ত্রীর লজ্জাবনত মুখের দু'একটা কথা।''[৮১] বাংলা নাটকে জমিদার এবং কৃষক বহুবার এসেছে। তবে তা একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে। জমিদার সেখানে শোষক এবং কৃষক শোষিত — আর শেষ দৃশ্যে মঞ্চে লাল আলোর বৃত্তে কৃষকের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। মনোজ এই সম্পর্কটাকেই একটু ঘুরিয়ে দেখতে চাইলেন। 'মগজের ডার্করুমে' ছিল মহিষাদলের সেই বাড়ির স্মৃতি আর নিজের বুদ্ধিবৃত্তির তাগিদ ছিল প্রচলিত সত্যের উল্টো পিঠটাকে ধরা। এখানে থেকেই সৃষ্টি 'শোভাযাত্রা'র। জমিদার এ নাটকে নেই, আছে জমিদারের উত্তরপুরুষ, যাঁকে পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, ঐতিহ্যের 'বোঝা' টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। সেই হতভাগ্য উত্তরপুরুষ ধনগোপাল। বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে তিনি এখন গ্রামের লোকের কাছে সেই সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ, যা এককালে গ্রামের মানুষের ওপর বহু অত্যাচার চালিয়েছে। বংশের সকলেই সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে বাইরে চলে গেছে। যদি কিছু বা থেকেও থাকে তাও বিক্রির চেষ্টা চলছে, রমেশ রায়ের ছেলে মুকুল এসেছে গ্রামে তাদের শেষ সম্পত্তি মোহনকাননের বাড়ি বিক্রি করতে। গ্রামে একমাত্র পড়ে আছেন ধনগোপাল। তাই পূর্বপুরুষের সব কৃতকর্মের দায় তাকেই বহন করতে হচ্ছে।

আগে প্রজারা জমিদারবাড়িতে এসে ধান চাল দিয়ে যেত, আর এখন ধনগোপালকে বর্গাদারের দরজায় গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু কিছুই প্রায় মেলে না। বর্গাদারের ঘৃণা ঝরে পড়ে 'জমিদারের বাচ্চা' সম্বোধনে। পরিবারের 'ঐতিহ্য' বলতে একমাত্র রথযাত্রার উৎসব ধরে রেখেছেন ধনগোপাল। এও যেন এক প্রায়শ্চিত্ত ঃ

> ''আমার কাছে ঐ কাঠের খাঁচাটা পাপেরও না পুণ্যেরও না। কেন ওটা বছর বছর রাস্তায় বের করে টেনে বেড়াই জানো ? অন্তত কিছুদিন লোকে বলে, না হে, রায়েরা একেবারে মন্দ নয়। দু'চারটে ভালো কাজও তারা করেছে। কিছুদিনের জন্যেই আমায় নিন্দেমন্দ গঞ্জনা শুনতে না হয়। আমার বাড়ি বাগান খেত খামারে ধ্বংসলীলা বন্ধ থাকে। যেন কেউ আমায় শাসায় না ... অত্যাচারী শাসক শোষক বলে না।'' [৮২]

সকলেই যেন জমে থাকা ক্রোধ উগরে দেয় বিপাকে পড়া ধনগোপালের প্রতি। নদু সেই মানসিকতার প্রতিনিধি। ধনগোপালের জ্ঞাতি রমেশ রায়ের সঙ্গে নিজের মায়ের অবৈধ সম্পর্কের সূত্রে সে যতটা সম্ভব সুবিধে আদায় করে নিতে চায় ধনগোপালের কাছ থেকে। নদু কখনো প্রতিহিংসাপরায়ণ, কখনো ধূর্ত। তার ক্ষোভ এবং ঈর্ষাকে যথাযথ শব্দে প্রকাশ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ ''এই বাড়িটা দেখলে আমার সব কেড়ে নিতে ইচ্ছে করে! ... জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে ইচ্ছে করে! এদের এতো ছিল কেন ? কেন ছিল এতো ?''[৮৩] চারিদিকের প্রতিকূলতায় নিজেকে ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছেন ধনগোপাল। মানুষের কাছে তার 'সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ' পরিচয়টাই বড় হয়ে থেকেছে — এখানেই তার অভিমান। এই অভিমানের বশেই তিনি জগতের দিকে পেছন ফিরে বসেছেন। আভিজাত্যের অহংকার তাঁর আছে কিন্তু তার চেয়ে বেশি আছে অভিমান ঃ

> ''আমার বাপ চোদ্দপুরুষ কী অন্যায় করে গেছে, তার জন্যে আমি নাকে খৎ দিয়ে লোকের দোরে যাবো কেন ? কই, তোমরাও তো আমায় তোমাদের একজন ভাবো না ! তোমরাও তো ধরে বসে আছো, আমি সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ ! তাহলে বলো, এই সমাজে আমার কোন জায়গা নেই ! আমি একটা জঞ্জাল! একটা চন্ডাল!''[৮৪]

ধনগোপালের পূর্বপুরুষেরা একদিন যেমন ছিলেন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আজ গ্রামে তেমনি পার্টিকর্মীদেরই একাধিপত্য। ধনগোপালের পূর্বপুরুষদেরই কথা তারা বলে অন্য ভাষায়। ধনগোপাল তাদের থেকে দূরেই থাকেন কিন্তু তারা একে আভিজাত্যের অহংকার বলে মনে করে। এই অহংকার ভেঙে ধনগোপালদের 'ওয়ান অব দ্য ইকুয়ালস্'-এ পরিণত করতে চায়।

দুই মেয়ে আর এক হাবা-গোঙা নাতিকে নিয়ে নিজের মতোই ছিলেন ধনগোপাল। কিন্তু সুখে থাকা তাঁর হল না। রথযাত্রার উৎসব তাঁর বাড়িতে বিপদ ডেকে আনল। জড়বুদ্ধি শঙ্খর মতোই অবসিত জমিদারতন্ত্রও আজ অক্ষম। তাই শঙ্খর মতোই বিস্ফারিত চোখে

তাকে দেখতে হয় বাড়ির মেয়ের চরম সর্বনাশ। প্রতিকারের আশা না রেখে সে লজ্জা চাপা দিতেই ব্যস্ত হতে হয়। নাটকের শেষে ধনগোপাল এক বিধ্বস্ত মানুষ। রথযাত্রার উৎসব গেছে সাধারণের হাতে, শঙ্খকে নিয়ে গেছে তার বাবা, ধর্ষিতা মেয়ে অতসী আর ছোটো মেয়ে সরসীকে নিয়ে তিনি আজ 'ওয়ান অব দ্য ইকুয়ালস্'। নাটকে ধনগোপালের বাড়ির রথযাত্রার উৎসব এবং জগন্নাথের মন্দির মন্মথ পালের 'ইজারা' নেওয়ার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ওপর ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত আছে। দীর্ঘদিন তক্কে তক্কে থেকেও রথ হস্তগত করতে পারেনি মন্মথ, এ তার বিরাট আক্ষেপ। কিন্তু বিষাদ সরে গিয়ে তার চোখে লোভ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, যখন তার সহযোগী একটি চরিত্র রায়েদের বাড়ি বিক্রি করে চলে যাবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে ঃ

> ''সে আমলের কড়ি বরগা, এখন সোনার চেয়ে দামী। শুধু এই মাল বেচার টাকায় গোটা কত মাল্টিস্টোরিড হয়ে যায়। আনমনা করে দেয় কাকা ... এই প্রাসাদপুরী ... এই মেঘলা রঙা পায়রার ডাক! কিনে নিতে ইচ্ছে করে ... সব!''[৮৫]

রথযাত্রা উৎসব রায়বাড়ির গন্ডি ছাড়িয়ে সাধারণের মাঝে নেমে এসেছে। জগন্নাথের ছাতা নিয়ে ধনগোপালও সেই শোভাযাত্রায় পা মেলাতে চান কিন্তু অতসীর তৃতীয়বারের শঙ্খ আর বাজে না। মনোজ মিত্র দেখান, অনিবার্য বিষন্ন পরিণতি সামন্ততন্ত্রের। কিন্তু ব্যবধান তবু সহজে ঘোচে না। কালের অমোঘ নির্দেশে ধনগোপালদের স্বাতন্ত্র্য ভেঙে পড়তে বাধ্য কিন্তু তার জন্য অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্তর পার হতে হয়। সেই ব্যবধান ঘুচে যাবার পূর্বমুহূর্তেই তিনি নাটক শেষ করেছেন। এতেই যেন অভিশাপ মুক্তি ঘটেছে এই পরিবারের।

এই নাটকে মনোজ মিত্র বাংলাদেশের গ্রামের একটি বিশেষ কালখন্ডকে বিধৃত করেছেন নিজের সত্যদৃষ্টির আলোকে। অবসিত জমিদারতন্ত্রের বিষাদময় পরিণতি তিনি দেখিয়েছেন কিন্তু তার মমতা পুরনোরই প্রতি। এদিক থেকে তিনি তারাশঙ্করের সমধর্মী। এককালের জমিদার বংশের প্রতি মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বর্গাদারদের আধিপত্য, গ্রামে প্রবল দলতান্ত্রিকতা, সামন্ততন্ত্রের মৃতদেহের ওপর ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সবই দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র। আর সেই সঙ্গে রচনা করেছেন অদ্ভুত সুন্দর কিছু মানবিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলি তৈরি হয়েছে শঙ্খ-সরসীর মধ্যে, অতসী-যামিনীর মধ্যে। কোথাও স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই, নির্দিষ্ট কোনো সংলাপ উদ্ধার করে হয়তো দেখানোও যাবে না, কিন্তু তবু কীভাবে যেন আমরা বুঝে যাই শঙ্খ আর সরসীর সম্পর্ক নিছক মাসি-ভাগ্নে বা বন্ধুত্বের নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। আর শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান পূজারী যামিনী সম্পর্কেও একটা 'অন্যরকম' ভাব জেগেছিল অতসীর মনে। এই সম্পর্কগুলির আভাস ধরা পড়েছে সমালোচকের চোখে ঃ

> ''অতসী কেন যামিনী ঠাকুরের চলে যাওয়াতে এমন ব্যাকুল হয় ? ... বয়স এবং সম্পর্ক ছাড়িয়ে একটি বোবা ছেলের বন্ধু হওয়া ছাড়া সরসীর মনে অন্য কিছু যে জন্ম নিচ্ছিল তা

> প্রমাণিত হল শঙ্খর চলে যাওয়ার পর ভেঙে পড়াতে। ... নদুর হাতে ধর্ষিতা অতসীর সামনে যখন আর কিছু নেই, যখন ছেলেকে ছেড়ে দিয়েও সে পাথর তখন সে বোনের দিকে অমন কাতর চোখে তাকায় কি করে ? মানুষের এই সম্পর্কগুলোয় অনুচ্চারে সাহসী হয়ে আলো ফেলেছেন মনোজ মিত্র।''[৮৬]

চরিত্র রচনায় মনোজ মিত্র যে এই নাটকে বারবার প্রত্যাশিত ছক ভেঙে দিয়েছেন, সেকথা উল্লেখ করেছেন শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ও ঃ

> ''ঝিয়ের ছেলে নদুর মনে যে জমিদার-বাড়ি সম্পর্কে ঘৃণা, পয়সা রোজগারের ধান্দায় সেই বাড়িরই কাজ করতে রাজী হয় সে। ... মানব সম্পর্কের জটিল বিন্যাস ধরা পড়ে বাবার সঙ্গে দুই মেয়ের দু'রকমের বোঝাপড়ায়, বা জড় কিশোর শঙ্খর সঙ্গে তার মাসি সরসীর অন্যরকম বন্ধুত্বে বা পুরোহিত যামিনীর সঙ্গে বড় মেয়ে সরসীর নিরুচ্চার বিনিময়ে।''[৮৭]

মুকুলের মনে সরসী সম্পর্কে যে ভালো লাগার বোধ তৈরি হয়েছে এবং যা পরে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে তা ব্যক্ত করেছে মুকুল একেবারে শেষে এবং এই সম্পর্ক যে ইতিবাচক পরিণতি পাবে তার ইঙ্গিত আছে নাটকে। অর্থাৎ গ্রাম বাংলার পটভূমিকায় অস্তায়মান জমিদারতন্ত্রের ছবি আঁকতে গিয়ে একটি বিশেষ পরিবারের মধ্যে সৃষ্ট কতগুলি মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনকেও ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র।

'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'র মতো 'শোভাযাত্রা'তেও কৌতুক সৃষ্টির অবকাশ কম। যেটুকু কৌতুক আছে তাকেও সমালোচকেরা বাহুল্য বলে, দর্শককে 'তুষ্ট' করার আয়োজন বলে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য ঃ ''এসব নাটকে যে প্রধান জোর তার ওপর যেন মনোজ ভরসা করতে পারছেন না।''[৮৮] কিন্তু 'শোভাযাত্রা' নাটকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে কৌতুকরসের আয়োজন প্রধানত মন্মথ চরিত্রটিকে ঘিরে। নাটকের খলচরিত্র বা Villain-এর প্রথাগত পরিচয়ের সঙ্গে মেলে না মনোজ মিত্রের নাটকের খল চরিত্র। কৌতুকের আবরণে এই চরিত্রগুলিকে তিনি যেন সহনীয় করে তোলেন। এই চরিত্রের মধ্যেও কোথায় যেন একটা অসহায়তা আছে ঃ ''মনে হয় ধনী মন্মথ টাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েও ভগ্নপ্রায় নিঃস্ব ধনগোপালের কাছে কোথায় যেন হেরে যাচ্ছে।''[৮৯] কৌতুক এই চরিত্রটিকে করুণার পাত্র করেছে, খল চরিত্রের type-এ পরিণত করে নি।

পরিবার-জীবনে দাম্পত্যের বিচিত্র রূপকে মনোজ মিত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন একাধিক নাটকে। এই নাটক গুলি মুখ্যত একাঙ্ক। 'পাখি' (১৯৬০), 'টাপুর টুপুর' (১৯৬৭), 'সন্ধ্যাতারা' (১৯৭৯-৮০), 'আঁখিপল্লব' (১৯৯০), 'স্মৃতিসুধা' (১৯৯৩) এবং 'আকাশচুম্বন' (১৯৯৫) নাটকগুলিকে এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ 'দম্পতি' এই গুচ্ছেও আসতে পারে, যার সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬০ সালে রচিত এবং ১৯৭৬ সালে পুনর্লিখিত 'পাখি' নাটকে নায়ক নীতিশ পেশায় হ্যারিকেনের সেলস্‌ম্যান। তার স্ত্রী

শ্যামা 'একটু রোগা, একটু কালো, কঠিন চিবুক, চোখের কোণে কালি'। বৈশিষ্টহীন এই চেহারার মধ্যেও মনোজ মিত্র রেখে দিয়েছেন একটু রোমান্টিকতা — 'বড় বড় চোখ। সঘন মেঘের মতো রাশিকৃত ঘনকৃষ্ণ কোঁকড়া চুল'। নাটকের শুরুতেই দেখা যায়, কাগজের শিকল, ফুল এবং বিচিত্র সব কারুকার্যে নীতিশ নিজের ঘর সাজিয়েছে। গ্রামোফোনে পুরনোদিনের রেকর্ড বাজছে আর পালঙ্কের ওপর আধশোয়া হয়ে বিড়ি টানতে টানতে নিজের শিল্পকীর্তি উপভোগ করছে নীতিশ। শ্যামা গিয়েছিল তার ছোড়দির বাড়ি, সেই সুযোগে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকেই টাকা তুলে নীতিশ গ্রামোফোন ভাড়া করে, ফুল কিনে এনে, আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করে, ঘরের জিনিসপত্র সব, এমনকি ঠাকুরও ছাদে তুলে দিয়ে ঘর সাজিয়েছে। 'সর্বজনীন পরোপকারী' গোপালকে বাজারে পাঠিয়েছে কাঁচা-বাজার করতে। বন্ধুবান্ধব, পরিচিত মোট তেরোজনকে নিমন্ত্রণও করা হয়ে গেছে। কারণ আজ ৭ই ফাল্গুন — নীতিশ-শ্যামার পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী। শ্যামা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এই আয়োজন দেখে। মাসে চারশো টাকা মাইনে আর হ্যারিকেন প্রতি বিশ পয়সা কমিশন যার, তাকে সাজে না এই আয়োজন। নামেই হ্যারিকেন কোম্পানির 'রেগুলার সেলস্ রিপ্রেজেন্‌টেটিভ' কিন্তু আসলে ফেরিওয়ালা। শ্যামা বলে ঃ ''হুঁ হুঁ সেলস্ রিপ্রেজেন ... তেলাপোকা আবার পাখি! হাতে হ্যারিকেন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়''[১০] কিন্তু মনোজ মিত্র দেখাতে চান, তেলাপোকাও পাখি হতে চায়, একদিন ক্ষণিকের জন্য হয়তো পাখি হয়েও যায়। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন রেশন উঠছে না, বাড়িওয়ালা, মুদির কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, দেশের বাড়িতে বুড়ি মা পোস্ট অফিসের দিকে চেয়ে বসে আছে ছেলের টাকার আশায়, উকিল বাড়িতে এসে অপমান করে যাচ্ছে ফী-এর টাকার জন্য — কিন্তু তবু একটা দিন, অন্তত একটা দিনের জন্য মধ্যবিত্ত মানুষ সব সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে চায়। তাই হ্যারিকেন বিক্রির কমিশন মার যাবে জেনেও নীতিশ ছুটি নিয়েছে। গোপালকে সঙ্গে নিয়ে সব আয়োজন সে করে ফেলেছে, এমনকি ডেকরেটারের কাছ থেকে তেরোটা ফোল্ডিং চেয়ার ভাড়া আনার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। কারণ একদিন সে দেখিয়ে দিতে চায় ননীকে, ভুবনকে আর সব বড়লোক বন্ধুদের। বন্ধুরা বড়লোক বলে কোনো দুঃখ নেই নীতিশের কিন্তু মাঝে মাঝে খোঁচা লাগে বুকে ঃ

''নীতিশ ।। শুধু মাঝে মাঝে কিরকম খোঁচা লাগে ... একদম এইখানে। ননীর ছোট মেয়ের মুখেভাতে ... ওঃ, সে কী এলাহি ব্যাপার ... হ্যাঁ খাওয়ার টেবিলে খোঁচাটা কড়াং করে লেগেছিল।

শ্যামা ।। খোঁচা! কী খোঁচা গো!

নীতিশ ।। ভুবন আমার পাশে বসেছিল। বলল, নিতুর বাড়ি কবে যাচ্ছি আমরা ? শুনেই ননী হা হা করে উঠল — যেদিন বৃষ্টি হবে, আর যেদিন বৃষ্টি হবে না ... দুটো দিন বাদ দিয়ে নিতু আমাদের খাওয়াবে। কড়াং করে যেন চাবুক

পড়লো শ্যামা, এইখানে। সেদিন থেকে তাক করে আছি, একদিন ব্যাটাদের আমি তাক লাগিয়ে দেব! ঠিক! শুধু তোরাই আমায় ডেকে খাওয়াবি, আমি তোদের ডাকতে পারি না! তখন ভাবলাম যা থাকে কপালে ... প্রভিডেন্ট ফান্ড তো প্রভিডেন্ট ফান্ডই সই! লড়িয়ে দিলাম!''[৯১]

শ্যামা প্রথমে নীতিশের এই আয়োজনে ক্ষিপ্তই হয়ে উঠেছিল। সাধ-আহ্লাদ তার নেই এমন নয়, তবে একদিনের উৎসব করে সারা বছর তার জের টানতে সে রাজি নয়। কৌশলে সে নীতিশের পকেট থেকে টাকা হাতিয়ে নিতে চায়। নীতিশের আয়োজন তার কাছে মনে হয় 'ক্যারিকেচার'। এ যেন নিজেদেরই অপমান করা। উকিল চৈতালীকেও সেই প্ররোচিত করে নীতিশের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিতে। কিন্তু গোপাল যখন সত্যি সত্যি চ্যাঙারি ভর্তি বাজার নিয়ে আসে এবং উকিল চৈতালী বাকি ফী-এর দায়ে সেই চ্যাঙারি ধরেই টানতে থাকে তখন শ্যামা চ্যাঙারি টানে ঘরের দিকে। উকিলকে একশো টাকা দিয়ে আপাতত মিটিয়ে লেগে যায় রান্নার কাজে। কিন্তু মধ্যবিত্তের সাধ পুরণে বাধা শুধু একটা নয়। দরজার বাইরে থেকে গোপাল কুড়িয়ে নিয়ে আসে একটি চিঠি কিন্তু নীতিশ তখন সেই চিঠি পড়তে চায় না। কারণ সে জানে, এই চিঠি যদি মায়ের হয় তবে তাতে শুধু খারাপ খবরই আছে। গ্রামের বাড়িতে সাত পুরুষের ভিটে আগলে বসে আছে যে মা তার প্রত্যেক চিঠিতেই জানা যায় 'অবস্থা খারাপ ... আরো খারাপ ... আরো।' আজকের কয়েকটা ঘন্টার ওপর দুঃখের ছায়া পড়তে দিতে চায় না নীতিশ। আজ যে তার 'পাখি' হয়ে ওঠার দিন। একটু চেষ্টা করে ঘন্টা কয়েকের জন্যে সে সব ঢেকে রাখতে চায়, যেভাবে শ্যামার সুতোর কাজ করা চাদর দিয়ে তারা ঢাকছে ছেঁড়া, তুলো বের হওয়া গদি। সেই চাদরে শ্যামা ছেঁড়া কাপড়ের সুতো দিয়ে তুলেছিল 'এক ডালে দুই পাখি'। কিন্তু অভাবের সংসারে 'সুখপাখি' টেঁকে না, ন্যাপথলের অভাবে একটা পাখি কীটদষ্ট হয়ে যায়। তবু নীতিশ গ্রামোফোনে গান বাজিয়ে, নানারকম গল্প করে শ্যামার মন ঘোরাতে চেষ্টা করে, একটা দিন অন্যভাবে কাটাতে চায়। বন্ধুরা কী উপহার দিতে পারে তা নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু পাড়ার সব দোকানের দেনা রেখে বিবাহবার্ষিকীর মোট বাড়িতে ঢোকাতে দেখে সব পাওনাদারেরা দরজায় এসে উপস্থিত। শ্যামা এই অপমান সহ্য করতে পারে না। নীতিশের প্রভিডেন্ট ফান্ড ভাঙা টাকা নিয়ে দেনা মেটাতে যায়। রাগে ক্ষোভে অসহায় নীতিশের চোখ ফেটে জল আসে। দুঃখের ছায়াপাত যখন আটকানো গেলই না, তখন নীতিশ পকেটের সেই চিঠি খুলে দেখে। আর দেখা মাত্রই অস্ফুট আর্তনাদ করে সব ছিঁড়ে ফেলে, ফুলদানি, আছড়ে ভাঙে, চাদর টেনে ছুঁড়ে ফেলে। অন্ধকারে এক ধ্বংসস্তূপের মাঝে সে বসে থাকে — একা, ভাঙাচোরা। পাঠক-দর্শক যখন নীতিশের মায়ের কোনো দুঃসংবাদ আশঙ্কা করছে তখন নীতিশ শ্যামার কাছে ভেঙে পড়েছে প্রকৃত সংবাদে। বন্ধুরা আজ কেউ তার বাড়িতে খেতে আসছে না। 'কুত্তাবাবু' ননী চিঠিতে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে, চাকরি খালির সংবাদ দিয়ে দরখাস্ত করতে বলেছে, আর ঃ

''আর লিখেছে যে খাওয়াতে চেয়েছি, এই ঢের! আমার যা অবস্থা সত্যি সত্যি না খাওয়ালেও চলবে! শ্যামা, ওরা নাকি সত্যি সত্যি আমাদের কাছে খেতে চায় নি! ... আর শেষ লাইন ... তুই খুশি তো নিতু, এতো বড় একটা খরচের হাত থেকে তোকে রেহাই দিলাম''[৯২]

এতক্ষণে দুচোখে জল টলমল করে ওঠে নীতিশের চোখে। নিজেকে ভীষণ ভীষণ অপমানিত বোধ হয় তার। 'গরিব' বলে নিজেকে যেন সত্যি সত্যি সে চিনতে পারে এবার। কিন্তু মনোজ মিত্র ধনী বন্ধুদের এই করুণায় ব্যর্থ হয়ে যেতে দেন নি নীতিশ-শ্যামার বিবাহবার্ষিকীকে। শ্যামা এগিয়ে এসেছে সহমর্মিতার স্পর্শ নিয়ে ঃ

''(বাতিদানে পাঁচটি মোমবাতি জ্বালাচ্ছে) নাই বা এলো ওরা ... নাই বা জ্বলল আলো ... বাজল বাজনা! কিন্তু আমাদের দিনটা মিছে কেন হবে ... সাতুই ফাল্গুন ... আমাদের একটা দিন! বলো ... ওরা কে আমাদের অ্যাঁ, যে এলো না বলে সব নষ্ট করে দিতে হবে ? ওরা আমাদের কেউ না গো ... কেউ না''[৯৩]

পারস্পরিক এই বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার জগতেই মনোজ মিত্র পৌঁছে দেন তাঁর চরিত্রদের।

'টাপুর টুপুর' নাটক শুরু হয়েছে এক বৃষ্টির দুপুরে শহরের এক রেস্তোরাঁয়, যেখানে বেণী বসে ঝিমুচ্ছে আর গণেশ চেয়ার জোড়া দিয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন। দুপুরে রেস্তোরাঁ বন্ধ। এমন সময় বাতাসের দাপটে খুলে যাওয়া দরজায় হাতে চটি নিয়ে যে মেয়েটিকে দেখা যায় তার নাম মরালী। মরালীর মতোই সে যেন জলে সাঁতার কেটে উঠে এল। মনোজ তাকে পরিচিত করিয়েছেন এইভাবে ঃ ''দেখতে শুনতে খুব ভালো না, একটু কালো, একটু কৃশ আর আষাঢ়ের ধারার মতো মাথায় দীর্ঘ সতেজ একরাশ চুল।''[৯৪] (বর্ণনায় শ্যামার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়)। স্বামীর সঙ্গে শহর দেখতে বেরিয়ে এই বর্ষায় বড় 'আতান্তরে' পড়ে গেছে মরালী। লোকের কাছে শুনেছে 'এখানে লোকে বসে খায়-দায়, গপ্পোসপ্পো করে'। তাই সে এসে উঠেছে এখানে, পেছনে তার স্বামী। দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় বিরক্ত বেণী আর গণেশ তাদের তাড়াবার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবার পর নতুন কৌশল ধরল। গ্রামের দরিদ্র মানুষকে নিয়ে এক নিষ্ঠুর খেলা শুরু করল। হঠাৎ যেন ভালো লোক হয়ে গেল বেণী আর গণেশ। কাটলেট, মোগলাই, মাংসের দো-পেঁয়াজি ইত্যাদি নানারকম জিনিসের ফর্দ শুনিয়ে লুব্ধ করে আর পাশাপাশি দাম বলে যায়। কেষ্টদুলালের পকেটে তখন মাত্র এক টাকা। সে বুঝে গেছে, আজ তার হেনস্থার একশেষ করে ছাড়বে বেণী-গণেশ, এমনকি পুলিশে পর্যন্ত দিতে পারে। মরালীকে নিয়ে নানা অজুহাতে সে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মরালী নতুন নতুন খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ না নিয়ে যাবে না। আর বেণীও তাদের বেরোতে দেবে না। 'গাঁও কা মাল' নিয়ে নিষ্ঠুর উল্লাসে মেতেছে বেণী-গণেশ। ছাতা বগলে নিয়ে কেষ্টদুলাল যখন মরালীর হাত ধরে আপ্রাণ টানছে বাইরের দিকে তখন নির্মম হাসিতে ফেটে পড়েছে বেণী ঃ ''আহা চললে কোথায়! ও লাটের বাবা! এখন ল্যাজ গুটিয়ে ভাগো যে! ধর্ ধর্ ধর্ ...''[৯৫] এবার জ্বলে ওঠে মরালী। আঁচল খুলে চারটে ভিজে দশ টাকার নোট বের করে ঃ ''ফুলশয্যের ছাতা দেখেছো,

ছেঁড়া জুতো দেখেছো, এবার টাকা দ্যাখো! টাকা! হাত দিয়ে দ্যাখো গরম!''[৯৬] হতভম্ব বেণীর মুখের ওপর টাকা ছুঁড়ে দিয়ে মরালী 'ফাস্টকেলাস' খাবার আনতে বলে দাপটে। গরিবকে নিয়ে ঠাট্টার জবাব এভাবেই দেয় মনোজ মিত্রের চরিত্ররা। পাশাপাশি থাকার অঙ্গিকার করে তাদেরই মতো ক'রে ঃ ''বে'র রাতে বলেছিলে না, সংসারে তুমি আমার মান বজায় রাখবে, আমি তোমার মান বজায় রাখবো। মাত্তর সোমে-সোমে একুশ দিনে সব ভুলে যাবো! না গো, না ... না''[৯৭] পারস্পরিক এই সহমর্মিতাকেই বড় করে দেখাতে চান মনোজ মিত্র, পরিবার-জীবনকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান শক্ত ভিতের ওপর।

'আঁখিপল্লব' নাটকে সেই ভিতকেই দৃঢ় করেন তিনি। ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ গবেষক পল্লব, কিন্তু তার পেছনে রয়েছে এক নারী — সে আঁখি। বাড়ির অমতে সে পল্লবকে বিয়ে করেছে। বাড়ি থেকে পল্লবের পড়ার খরচ বন্ধ করে দিলে আঁখি নিজের পড়া ছেড়ে চাকরি করে পল্লবকে এম.এ. পড়িয়েছে। এখনও আঁখি চাকরি করে আর পল্লব গবেষণা। বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়েছে তারা, ভালো জায়গায় ঘর নেবার মতো সেলামি দেবার সাধ্য নেই বলে। খুরশিদের সাহায্যে এই ঘর পাওয়া গেছে। খুরশিদ ভালুক খেলা দেখায়, সেই ভালুক বেঁধে রাখে আঁখি-পল্লবের ঘরের বারান্দায়। আঁখি গোয়েন্দা গল্প-লেখিকা শকুন্তলা দেবীর অনুলেখিকার কাজ করে। পল্লব সারাদিন নিজের পড়াশুনা নিয়ে থাকে। সম্প্রতি সে এক পুঁথি নিয়ে মগ্ন। তাঁর অনুমান, এই পুঁথি চৈতন্যদেবের লেখা ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথির প্রাথমিক খসড়া। যদি একথা সে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-দর্শনের ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে। আপাতত সেই স্বপ্নে সে রোমাঞ্চিত। খুরশিদের দুই বোন মাঝে মাঝে এসে উঁকি দিয়ে যায় পল্লবের ঘরে। আঁখি কখনও কখনও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পল্লবের 'আনমাইন্ডফুল প্রফেসরি ঢং' দেখে। রাগে সে ফুঁসে ওঠে ঃ

> ''আছে ভালো। কাজকর্ম চাকরিবাকরির চিন্তা নেই, বছরের পর বছর চলছে ইতিহাস গবেষণা! আরো সুবিধে, সারাদিন আমি থাকছি বাইরে, দিনভর একা একখানা ঘরে! শুয়ে বসে চিৎ হয়ে বই মুখে! বই ... বই ... বেড়ালছানার মতো সারা ঘরে বই ঘুরছে দ্যাখো! বাদুলে পোকার মতো থিকথিক করছে বই আর বই! করে এ জঞ্জালের হাত থেকে মুক্তি পাবো! পারছি না ... আর যে পারছি না আমি!''[৯৮]

যে কোনো পুরুষের মতোই পল্লবের ধারণা, জগতে তার কাজটাই কেবল গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদের কাজ তুচ্ছ। তাই আঁখির ডিকটেশন নেবার কাজকে তার 'একঘেয়ে' 'ক্লান্তিকর' বলে মনে হয়, সেই কাজ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে বলে সে মনেই করে না। অথচ নিজের কাজ সম্পর্কে আঁখির কাছে সে মুখর। এই স্বার্থপরতাকে, আত্মকেন্দ্রিকতাকে পরীক্ষার মুখেই ফেলেন মনোজ মিত্র, আঁখির বাইরে একটা চাকরির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কিন্তু পল্লব সে চিঠি আঁখির হাতে না দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। শিলচরে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের আশ্রমে সুপারভাইজারের সেই পদে যোগ দেবার শর্ত — আঁখিকে একা যেতে হবে। পল্লবের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে ঃ ''কে দেখবে আমায় ? খেতে দেবে কে ? ঘরটা গোছাবে কে ? বইপত্রগুলো সামলাবে কে ? ও না

থাকলে আমার কিছু হবে না। কিছু না। টাকা দেবে কে আমায় ? কোথায় যাবে রিসার্চ!''[৯৯] পল্লব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সবকিছুর ওপর। অপমান করে তাড়িয়ে দেয় হর্ষ আর ছদ্মবেশী শকুন্তলাদেবীকে, যারা আঁখির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে এসেছিল। পল্লব নিজের জগতে মগ্ন কিন্তু আঁখি ? সে তো সংসার চায়, পল্লবকে একান্ত নিজের করে পেতে চায়। পড়াশুনো করে, গবেষণা করে পল্লব বিরাট হয়ে তার নাগালের বাইরে চলে যাক্ তা চায় না আঁখি ঃ

> ''যখন তুমি এই আশ্চর্য পুঁথিটার রহস্য ভেদ করবে, যখন তুমি এই বিপুল সম্পদ আবিষ্কার করবে, তখন যে একেবারেই কোনো দাম থাকবে না আমার পল্লব। সারা দেশ তোমায় মাথায় নিয়ে হৈচৈ বাঁধাবে, আমি হারিয়ে যাবো।''[১০০]

এই ভয়েই মাস্টারমশাই-এর কাছে পুঁথির গুরুত্ব শুনেও আঁখি পল্লবকে কিছু বলে নি। কিন্তু আজ সেই পুঁথিই বোধহয় পল্লবকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়! পল্লব যখন দুরন্ত অভিমানে আঁখির চাকরির সংবাদ প্রকাশ করে দেয় তখনই আবার আসে হর্ষ। এবার চাকরির প্রস্তাব পল্লবের জন্য, তবে শর্ত সেই একই — একা যেতে হবে। বনলতা সেন (শকুন্তলাদেবী) আগেই পল্লবকে লোভ দেখিয়েছেন শিলচরের বিশাল গ্রন্থাগারের, সেখানে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত এক অজ্ঞাত লেখকের ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথির সংবাদও দিয়েছেন। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে পল্লবের অনুশোচনা জাগে। আঁখির প্রতি অপরাধবোধে, আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য নিজেকে সে ধিক্কার দেয়। গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে ঘুমের বড়ি খায় আত্মহত্যা করতে। পরদিন সকালে সব রহস্যের সমাধান হয়। আসলে পল্লবের কাছে নিজের গুরুত্ব বুঝতেই শকুন্তলাদেবীকে দিয়ে এই কৌশল করিয়েছে আঁখি। আর ঘুমের বড়ি বলে পল্লব যা খেয়েছিল তা আসলে চিনির দলা। পল্লবের 'সুইসাইড বাতিক' আছে বলে আঁখি ঘুমের বড়ি সরিয়ে চিনির দলা রেখে দিয়েছিল। আকর্ষণীয় সম্ভাবনার মুখে ফেলেও নাট্যকার পরিবারের শক্ত বনিয়াদকেই জিতিয়ে দেন। আঁখি থেকে পল্লবকে পৃথক করে নয়, আঁখি-পল্লবের সহাবস্থানেই জীবনের সম্পূর্ণতা দেখান। এর পাশাপাশি তিনি বস্তিবাসীদের সহৃদয়তা তুলে ধরেন খুরশিদ এবং তার পরিবারের মধ্য দিয়ে। ভালুক 'কালাসাহেব'কে সে পল্লবের দরজায় বেঁধে রাখে, পল্লব একটা জ্যান্ত প্রাণীর সাহচর্যে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাবে ভেবে। বস্তিতে একমাত্র এই ঘরেই পড়াশুনোর দীপশিখা জ্বলে। সে শিখাকে রক্ষা করতে আন্তরিক খুরশিদ ঃ ''এ পাড়ায় তো বইকিতাবের পাট নাই! তো পাড়ার লোক তাই চায়, এমন কিছু না হয় যাতে আপনারা আর কোথাও চলে যান। বস্তির এই একখানা ঘরে লিখাপড়ার আলো জ্বলছে।''[১০১] কোনোভাবেই যেন তাদের কোনো অসুবিধে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি খুরশিদের। আঁখি বিরক্ত হলে কালাসাহেবকে নিজেদের ঘরে রাখে খুরশিদ। কালাসাহেবের শেষ সময় আগত। পশু হাসপাতালেও স্থান নেই। মনোজের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় না কালাসাহেবও। তাই পরদিন সকালে পাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে দল বেঁধে কালাসাহেবকে হাসপাতালে নিয়ে যায় খুরশিদ ঃ ''সীট নাই বললে আজ ফিরব না। হাসপাতালে কালাসাহেবের ব্রেকডানস্ লাগিয়ে দেব''[১০২] আর তখনই জানিয়ে যায়, বোনেরা যে পল্লবের ঘরে উঁকি দেয় তা আসলে

'কিতাব' শুনতে। কতো 'কিতাব' একজন লোকে পড়তে পারে তাই নিয়ে ওরা বাজি ধরেছে। খুরশিদের মা তার বোনেদের সাজা দিয়েছে পল্লবের ঘরে উঁকি দেবার জন্য, কিন্তু খুরশিদের অনুরোধ, 'ভাবী'রা যেন কোনোভাবেই বস্তি ছেড়ে না যায়। আঁখি খুরশিদকে অভয় দেয় ঃ ''আমরা যাচ্ছি না — যাবো না — আমরা বেশ দিব্যি আছি — তোমাদের কাছে ভালো আছি''[১০৩] এই অস্তি ঘোষণাতেই, ইতিবাচক বিন্দুতে উত্তরণেই মনোজ মিত্র নাটক শেষ করেন।

'সন্ধ্যাতারা' নাটকের দম্পতি কুমুদশঙ্কর-আশালতা। পূর্ণাঙ্গ 'দম্পতি' নাটকের একাঙ্করূপ 'সন্ধ্যাতারা'। মেয়ের বিয়ে হয়েছে শিলং আর ছেলে চাকরি নিয়ে ভিলাই। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাড়ি আগলে বসে আছেন। জীবনের বোঁটা থেকে একে একে খসে পড়ছে বন্ধুরা, আর আশঙ্কা জাগছে নিজের শেষের সে দিনের। নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে মনে হয় বাড়ি বিক্রি করে সন্তানের কাছে সন্তানকে ছুঁয়ে থাকাই বোধহয় ভালো। সংবাদ পেতেই দুদিক থেকে ছেলে-বৌ এবং মেয়ে-জামাই এসে হাজির। বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। দুপক্ষই টাকার জন্য মরিয়া, যদিও অভাব কারো সংসারে নেই। এই নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব, কথা কাটাকাটি — ভদ্রতার আবরণ আর টেঁকে না। এমনকি যে ছোটো ছেলে বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর, সেও বাড়ি বিক্রির টাকার ভাগ চায়। বাড়ি বিক্রির টাকা সমান তিন ভাগ হলো, 'বাড়িতে এবার সত্য সত্যই চাঁদের হাট বসিল'। যারা এতোদিন তীব্র আক্রোশে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়েছে এখন তাদের মধ্যেই কত মিল, কত ঠাট্টা-রসিকতা। কিন্তু এবার সমস্যা বাবা-মাকে রাখা নিয়ে। তারা তো এখন 'রেসপনসিবিলিটি', কেউই এই 'বোঝা' নিতে রাজি নয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত — বাবা-মা ভাগাভাগি হবে — একজন ভিলাই, অন্যজন শিলং কর্তা-গিন্নির ভেতরের টান এবার বোঝা যায় — কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে রাজি নন। শেষে নাটকের মনোজীয় সমাপ্তি ঃ ''এখনো বিশ হাজার টাকা আছে আমার। নাগো, সব টাকা ওদের দিইনি। আর এই বারান্দাটাও ছাড়তে হবে না। দলিলে আছে, যতদিন আমরা দুজন বাঁচবো উপরতলাটা আমাদের থাকবে।''[১০৪] শিকড় ছিন্ন হতে দেন না মনোজ মিত্র। উৎকেন্দ্রিক আধুনিকতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকে তাঁর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

একাঙ্ক নাটক হলেও আকারে প্রায় পূর্ণাঙ্গের মতো 'স্মৃতিসুধা' শুরু হচ্ছে সুধাময়ীর স্মরণসভার প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে। সুধাময়ী নিজেও এই নাটকের একটি চরিত্র। ফুল-মালায় সজ্জিত ছবি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মাঝে মাঝেই কথা বলে যান, অবশ্যই ঘরে কেউ না থাকলে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে ঘর করেছেন নলিনাক্ষ-সুধাময়ী। তাদের বিবাহিত জীবনে কোনো খেদ বা অপূর্ণতা ছিল না, সুখে-দুঃখে তারা ছিলেন পরস্পরের সঙ্গী। পরস্পরকে তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন। আজকের স্মরণসভার আয়োজক সুধাময়ীর স্বামী নলিনাক্ষ। ছেলেরা আমেরিকায় থাকে, আসতে পারেনি কিন্তু 'ডলার' পাঠিয়েছে। অনুষ্ঠানে ঘোষণার দায়িত্বে আছেন 'টিভি-বেতারখ্যাত' টুম্পা হালদার। ঘোষণাকে জমাটি করতে, মাঝে মাঝে

'ফিলার' দিতে টুম্পা নলিনাক্ষর কাছে জানতে চায় তাদের দাম্পত্য জীবনের নানা গল্প, এমন কোনো ঘটনা, যা অস্বাভাবিক বা রহস্যময়। অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে বিয়ে হয়েছিল নলিনাক্ষ-সুধাময়ীর। ফুটবল খেলে ফেরার পথে নলিনাক্ষ যখন হেদুয়ার পুকুরে হাত-পা ধুতে গেছেন তখন সুধাময়ী সেই পুকুরে ডুবে যাচ্ছেন। তাকে উদ্ধার করেন নলিনাক্ষ এবং তার পর বিয়ে। পঞ্চাশ বছরের দাম্পত্যে সুধাময়ীর একটা আচরণই কেবল রহস্যময় মনে হতো নলিনাক্ষর। সই-এর বর মোহনবাঁশির প্রতি সুধার ব্যবহারে যেন স্বাভাবিকতা ছিল না। কোনো না কোনোভাবে মোহনবাঁশিকে হেনস্থা করে যেন সুধার আনন্দ। স্মরণসভায় উদ্‌ঘাটিত হয় সত্য — পাড়ার রূপবতী শ্যালিকা সুধাময়ীর বিয়ের প্রতিটি সম্বন্ধেই ভাংচি দিতেন মোহনবাঁশি, সুধাময়ীকে অন্যের সঙ্গে দেখতে তার ভালো লাগবে না বলে। নীরব ভালোবাসা এই ভাংচি দিয়েই তৃপ্ত হতো। তার প্রতিশোধ নিতে সুধাময়ী মোহনবাঁশির কাছায় কোলাব্যাঙ বেঁধে দিতেন বা পিছল বাথরুমে আছাড় খাওয়াতেন। কুলগুরু সুধাময়ীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করবেন বলে ঘোষিকা টুম্পা গেরুয়া শাড়ি, টিপ আর রুদ্রাক্ষের মালায় সেজেছে। কিন্তু ততক্ষণে যে হাজির আর এক রহস্য। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই বেহালা থেকে এসে উপস্থিত 'বিল্ডিং কনট্রাক্টর' কিরীটি ঘোষাল। বহুকাল আগে যে সুধাময়ীর সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, স্মৃতিবাসরের সুধাময়ী সে-ই কিনা তা মিলিয়ে দেখতে এসেছেন। সুধার মনে ধরেছিল কিরীটিকে, কিন্তু কে যেন ভাংচি দিল, পাত্র 'দুশ্চরিত্র লম্পট মাতাল'। বিয়ে ভেঙে গেল। বলা বাহুল্য, এই ভাংচি মোহনবাঁশিই দিয়েছিল। সাধারণভাবে বেশ কয়েকবার বিয়ে ভেঙে যাবার কথা বললেও এত বড়ো ঘটনাটা সুধাময়ী নলিনাক্ষর কাছে চেপেই রেখেছিল। নলিনাক্ষ এবার ঘোষণা করেন, কুলগুরু নয়, প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করবেন কিরীটি ঘোষাল। টুম্পাও এই প্রস্তাব সমর্থন করে, যদিও তাকে আবার পোশাক পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু কিরীটির প্রস্তাব, 'যে মানুষটা কোন আশা না রেখে সারাজীবন মিছেই ভালোবাসলো', সেই মোহনবাঁশিই মাল্যদান করবে সুধাময়ীর প্রতিকৃতিতে। আরো চমক, আরো রহস্য ছিল সুধার জীবনে। এমনি এক চমকের কথা বলেছে সুধার সই লবঙ্গ। নলিনাক্ষ এবং আর সকলেও জানতেন, সুধাময়ী পা পিছলে হেদুয়ার পুকুরে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু লবঙ্গই জানে আসল সত্য — সুধা গিয়েছিল আত্মহত্যা করতে। একের পর এক বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে সুধার মা এক দোজবরের সঙ্গে সুধার বিয়ে ঠিক করেছিল। সুধা এক বেলফুলওয়ালার সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালাবে ঠিক করে। জানাজানি হয়ে যেতে সুধাকে তার মা মারধোর করেন এবং রাগে দুঃখে ঘেন্নায় সুধা আত্মহত্যা করতে যায় হেদুয়ার পুকুরে। কিন্তু গোপন কি শুধু সুধাই করেছেন, নলিনাক্ষ করেন নি ? তাহলে কী বলছে স্মরণসভায় উপস্থিত সাঁতারু ভেলটু ভট্ট ? এখন অটোচালক ভেলটু ক্যাটারারের মালপত্র নিয়ে এসেছে আর এসেই শুনেছে হেদুয়ার পুকুর থেকে মেয়ে উদ্ধারের গল্প। তার স্মৃতি পিছিয়ে গেছে পঞ্চাশ বছর। ভেলটু তখন অলিম্পিকে যাবার জন্য দিনরাত অনুশীলন করছে হেদুয়ার পুকুরে। এক বর্ষার সন্ধ্যায় একটি মেয়েকে সে পুকুরে ঝাঁপ দিতে দেখলো, তারপর তাকে বাঁচাতে একটি ছেলেও। কিন্তু তারা

দুজনেই যখন ডুবে যাচ্ছে তখন দুজনকেই বাঁচায় ভেলটু। সুধাময়ীকে বাঁচানোর কৃতিত্ব নিয়ে তাকে বিয়ে করেন নলিনাক্ষ কিন্তু তিনি সাঁতারই জানেন না। সত্য প্রকাশ হয়ে গেলে ভেলটু ভট্টকেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মনোনীত করেন নলিনাক্ষ। কে আজ সুধাময়ীর প্রতিকৃতিতে প্রথম মাল্যদানের অধিকারী — নলিনাক্ষ, মোহনবাঁশি, কিরীটি না ভেলটু ? আসলে সারাজীবন দুটি মানুষ একসঙ্গে কাটিয়ে দেবার পরও তাদের মধ্যে থেকে যায় কতো অজানা বিষয়। এক একটা ভুলের ওপরেই গাঁথা হয়ে যায় জীবনের ভিত। যা হওয়া উচিত ঘটে যায় তার বিপরীত ঃ

> ''আমি যাকে চাইলাম তাকে পেলাম না ... আমাকে যে চাইল সে পাবে না জেনেই চাইল ... যে আমাকে বাঁচাল সে আমাকে পেল না ... যার পাবার কথা না, সে আমাকে সব দিল ... ঘর সংসার সুখ শান্তি ছেলেমেয়ে নাতিপুতি বিত্ত বৈভব... কী আশ্চর্য জগৎ!''[১০৫]

মনোজ মিত্র দেখান, তবু মানুষ গড়ে স্নেহ-ভালোবাসা-মমতার ইমারত। ভুল যেমন সত্য, তেমনি সত্য ভালোবাসাও। পরস্পরের অনেক কিছু না জেনেও প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-আহ্লাদের কোনো হেরফের ঘটে না ঃ

> ''নলিনাক্ষ ।। পঞ্চাশ বছর কী অদ্ভুতভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করেছে। একটা দিনের জন্যেও আমাকে তার বিশ্বাসযোগ্য কি নির্ভরযোগ্য মনে হয় নি। কিরীটিবাবু, আমরা কার স্মরণসভা করছি ? যাকে আমরা কেউ ভালো করে জানি না, চিনিও নি —
>
> কিরীটি ।। অত তো জানার দরকার নেই ভাই নলিনাক্ষ। না জানার জন্যে কি তোমার পঞ্চাশ বছরের সুখ-আহ্লাদের কোনো হেরফের ঘটেছে। তবে আজ ও নিয়ে ভাবা কেন ?
>
> টুম্পা ।। অজানা বলেই তো আরো সুন্দর। এই ভুলভ্রান্তি আছে বলেই না ভুবন জুড়ে মোহিনীমায়া!''[১০৬]

জীবনের এই সৌন্দর্যই মনোজ মিত্রের অন্বিষ্ট, জীবনকে নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে এই সৌন্দর্যকেই তিনি খোঁজেন। এই নাটকের পরিবেশের সঙ্গে তিনি চমৎকার খাপ খাইয়ে দিয়েছেন ঘোষিকা টুম্পা এবং নলিনাক্ষর বাংলাদেশি ভাগ্নে ছানার অম্লমধুর রোমান্সকে।

'আকাশচুম্বন' নাটকেও আছে এক দম্পতি সুপ্রিয়-রূপার কথা, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা, পা পিছলে যাবার কথা। কোচিং সেন্টারের শিক্ষক সুপ্রিয় এতদিন ছিল ওলাইচন্ডীতলায় পলেস্তারা খসা স্যাঁতসেঁতে একতলার কুঠুরিতে। বহু চেষ্টায় আজ তারা উঠে এসেছে কোলকাতার অভিজাত অঞ্চলে গগনচুম্বী অট্টালিকার এক ফ্ল্যাটে। এতদিন তারা গুটিয়ে ছিল, আজ স্বচ্ছন্দে ডানা মেলেছে। রূপা টিপটপ রাখতে চায় তার ফ্ল্যাটকে। মুছে ফেলতে চায় ওলাইচন্ডীতলার ধূসর বিবর্ণ অতীতকে। সুপ্রিয়র মধ্যবিত্ত মানসিকতা এত উচ্চতার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বারবার হোঁচট খায় কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করে মানিয়ে নেবার, 'সুখী' হবার। সারাদিন গৃহপ্রবেশের

ঝামেলার শেষে সারাটা রাত তারা জেগে উপভোগ করতে চায় নিজেদের এই 'সাফল্য'কে। দশ লাখের ফ্ল্যাট তারা জোগাড় করতে পেরেছে মাত্র এক লাখ পঁচাত্তরে। রূপা অবশ্য মান নষ্ট হবার ভয়ে সকলকে দশ লাখই বলেছে। কোচিং সেন্টারের শিক্ষক এত টাকা কোথায় পায় সে প্রশ্নের উত্তর দেবার ভারও সেই নিয়েছে। একমাত্র বাথরুমের সামান্য ফাটলটা ছাড়া আর কোনো খুঁত নেই এই ফ্ল্যাটে, যেখান থেকে গলা বাড়িয়ে আকাশকে চুমু খাওয়া যায়। খুশির রাত কাটছিল ভালোই — কিন্তু রাত বারোটায় হঠাৎ গোল বাঁধালো অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির পাঠানো বিশাল রক্তগোলাপের ঝাড়। পাশের ফ্ল্যাটের মাতাল প্রতিবেশীর হাত দিয়ে পাঠানো সেই ফুলের তোড়ায় শুভেচ্ছা কার্ডে লেখা আছে ঃ ''রূপা ... রুপু ... সোনারুপো তোমার গৃহপ্রবেশে অভিনন্দন। আমাকে ভুলে যেয়ো না। ইতি তোমারই ডট ডট ডট ...''[১০৭] কে হতে পারে এই লোকটি ? শুরু হয় অনুমান। আর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে ওপরে ওঠার পঙ্কিল সিঁড়িগুলি। সে কি নির্মাল্য ব্যানার্জী, যে বহুতলের কো-অপারেটিভে রূপাকে কৌশলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল মৃত কেশব সাহার জায়গায় এবং আশি সালের দামে পঁচানব্বইয়ে ফ্ল্যাট পেতে সাহায্য করেছিল এবং বিনিময়ে নিজের গাড়িতে বসিয়ে রূপার পায়ের পাতায় চাপ দিয়েছিল ? অথবা সে হিরন্ময় সেন, যে রূপার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী হবার সুবাদে অনেক গলদ থাকা সত্ত্বেও এই অট্টালিকার প্ল্যান পাশ করে দিয়েছিল এবং বিনিময়ে তার বুকে মাথা রেখে প্রতিদান দিতে যাওয়ায় রূপাকে অপমান করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল ? অথবা সে এই বহুতলের প্রমোটার চঞ্চল রায়, যে আশি সালের দামে পঁচানব্বইয়ে ফ্ল্যাট দিয়েছে বলে গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব ফলাতে আসে এবং যে বিল্ডিং মেটেরিয়ালে কতটা ভেজাল দিয়েছে তা রূপা জানে ? অথবা সে পাড়ার নেতা দেবজিত ঘোষ, যে সবার কাছ থেকে ইলেকশানের চাঁদা বাবদ দশ হাজার টাকা করে নিলেও রূপাকে ছাড় দিয়েছে এবং সেই সুবাদে যখন-তখন রূপার নতুন ফ্ল্যাটে হানা দেবে বলেও জানিয়ে রেখেছে ? মনোজ মিত্র একে একে দেখিয়েছেন, ওপরে উঠতে হলে মানুষকে কত কদর্য পথ অতিক্রম করতে হয়। দেবজিত পর্যন্ত এসে ভেঙে পড়ে সুপ্রিয়। তার মনে হতে থাকে, দেবজিৎ 'সব' জানে বলেই বোধহয় এভাবে তাকে না ভোলার হুমকি দিয়েছে। কী জানতে পারে দেবজিত? জানতে পারে সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত সংবাদ — মিষ্টার ধানুকা সুপ্রিয়কে দু'লাখ টাকা ধার হিসেবে দেন নি — সুপ্রিয় দু'লাখ টাকায় বিক্রি করেছে মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র, সে জড়িয়ে পড়েছে প্রশ্ন ফাঁস চক্রের সঙ্গে, মনোজ মিত্র এখানে মিলিয়ে দিয়েছেন বহুতলের সঙ্গে মানুষকে। উভয় ক্ষেত্রেই ভিত রচনায় রয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত ফাঁকি। ওপরে উঠতে গেলে, আকাশে চুম্বন এঁকে দিতে গেলে যে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়ানো দরকার তা ভুলে যাচ্ছে মানুষ। ফাঁকি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইছে। শিক্ষক পিতার শিক্ষক সন্তান জড়িয়ে পড়েছে প্রশ্ন ফাঁস চক্রে, শুধু ওপরে ওঠার লোভে। এই লোভ থেকে নিষ্কৃতি কোথায়, এই অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কোথায় ? দুর্বল ভিতের এই ইমারত টিঁকতে পারে না — মানুষের ক্ষেত্রেও না, বহুতলের ক্ষেত্রেও না। কিন্তু স্বভাবত সহানুভূতিপ্রবণ মনোজ মিত্র মানুষকে আর একটা সুযোগ সবসময়

দিতে চান। তাই ভেতরে যখন চূড়ান্ত ভাঙচুর শুরু হয়েছে রূপা-সুপ্রিয়র, যখন দুলে উঠছে তাদের অট্টালিকা, তখন তিনি দেখান, তাদের বিল্ডিং নয়, ভেঙে পড়ছে তার কাছেই আর একটা বিল্ডিং, এটাও যে ভাঙবে তারই ইঙ্গিত দিয়ে। মানুষের ভেতরকার ভাঙন তুলে ধরে বেদনার্ত মনোজ মিত্র তার প্রতিকার চান বলেই বাঁচিয়ে রাখেন রূপা-সুপ্রিয়কে — তবে তাদের বাঁচতে হবে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ককে সঙ্গী করে।

নাট্যকার মনোজ মিত্র অনেকসময় রাজনৈতিক ভন্ডামি, রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতির প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ শর সযত্নে সরিয়ে রেখে বিচরণ করেছেন স্নিগ্ধ মধুর পারিবারিক জীবনবৃত্তে। দৈনন্দিন জীবনের গড় মানুষের আপাত তুচ্ছ হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে মণি-মুক্তার মতো ব্যবহার করে অপূর্ব মালা রচনা করেছেন। পরিবার জীবনের দিকে তাকিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের মতো এখানেও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। আধুনিকতা মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে কিন্তু তার ভেতরকার 'আমি' টিকে ধ্বস্ত, বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। স্বার্থপরতা আর আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তে আটকে গেছে মানুষের বৃহত্তর সম্ভাবনা। বেদনার্ত চিত্তে মানুষের এই অধঃপতনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পরিবারের সীমায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা হারান নি। মানুষের মধ্যেকার শুভবোধে তিনি বিশ্বাসী। তাই মানুষকে আর একটা সুযোগ তিনি দেন সংশোধনের। তাঁর নাটকে এই শুভবোধ কখনো প্রকাশিত হয় টোটনের (কেনারাম বেচারাম) মাধ্যমে, কখনো তাচ্ছইয়ের মাধ্যমে (দম্পতি)। এই গুচ্ছের নাটকগুলিতে তিনি এমন সব মানুষের কথা বলেছেন যারা সংসারের কাছে বাতিল, অপ্রয়োজনীয়। এদের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি। তিনি নিজেই এদের সম্পর্কে বলেছেন :

> "আমার বেশিরভাগ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রেরা কৃতী নয়, সমাজের গণ্যমান্য কেউকেটা নয়। অতিতুচ্ছ মানুষ, অসহায়, নির্বান্ধব, নির্জন, পরিবার বা সমাজ কেউ তাদের তোয়াক্কা করে না। মানুষ তাদের চায় না, তবু তারা মানুষের গললগ্ন হয়ে থাকতে চায়। যেমন পরবাসের গজমাধব, কেনারাম বেচারামের কেনারাম, রাজদর্শনের লম্বোদর ভট্ট বা পালিয়ে বেড়ায়-এর রূপচাঁদ।"[১০৮]

এই তালিকায় অনায়াসে যুক্ত করে নেওয়া যায় 'দম্পতি' বা 'মৃত্যুর চোখে জল'-এর দুই বৃদ্ধকে। বাংলা নাটকে যখন রক্তমাংসের মানুষের অভাব, তখন মনোজ মিত্র তাঁর এই গুচ্ছের নাটকে ফিরিয়ে আনলেন 'আলোছায়ার ঘেরা গভীর গোপন মানুষ'কে। এই মানুষেরা বিরাট কেউ নয়, কিন্তু তারা আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে উঠে আসা। এই গুচ্ছের নাটকে বারবার বৃদ্ধদের কথা বলে, পুরনোর সঙ্গে নতুনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্বে পুরনোর পক্ষাবলম্বন করে মনোজ মিত্র ঐতিহ্যের সংরক্ষণ চান, পারিবারিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান। কিন্তু ঐতিহ্যের বিলুপ্তি বা রূপান্তর যে অনিবার্য তা দেখাতেও ভোলেন না 'শোভাযাত্রা'র মতো নাটকে। তারাশঙ্করের মতোই বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস আছে তার পুরনোর জন্য কিন্তু তার অনিবার্য বিবর্তনকে তিনি স্পষ্টই তুলে ধরেন। 'শোভাযাত্রা' নাটকে যে পরিবার তা বাংলাদেশের একটি লুপ্তপ্রায় শ্রেণীর প্রতিনিধি। পারিবারিক নাটক থেকে তাই এই নাটক সামাজিক অভিধার

দিকে এগিয়েছে। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য় তিনি আধুনিক নাগরিক এক পরিবারের কথা বলেছেন যেখানে 'ঝড়ো দুনিয়ার একঝলক হাওয়া' ঢুকে পড়েছে। এই গুচ্ছের নাটকে মনোজ মিত্র ক্রোধী নন, বরং সহানুভূতিশীল। সেই সহানুভূতির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় না, এমনকি দেবাহুতির মতো নারী বা 'দম্পতি' নাটকের স্বার্থপর বড়খোকা-ছোটখোকাও। তবে ক্রোধ একেবারেই নেই এমন নয়, মরালী-কেষ্টদুলালকে নিয়ে বেণীর ঠাট্টার জবাবে মনোজের প্রচন্ড রাগ প্রকাশ পেয়েছে মরালীর মাধ্যমে।

মনোজ মিত্রের পারিবারিক নাটকগুলির আলোচনায় সামগ্রিকভাবে দেখা গেল, নাট্যকার পুরনো দিনের 'পরিবার'-ধারণার ভাঙনে বেদনাহত । তিনি দেখেছেন, একান্নবর্তী পরিবারগুলি ক্রমশ ভেঙে চলেছে । কোথাও কোথাও আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানের সঙ্গে বাবা কিংবা মা , অথবা উভয়েই - আছেন হয়তো, কিন্তু সে থাকা নিতান্ত অনাদরের এবং অবহেলার । পারিবারিক বৃত্তে একাধিক মানুষের উপস্থিতি যে মানসিক স্বস্তি দিত একসময়, তা রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে । পরিবারে কোনো মানুষের উপস্থিতির মূল্য এখন নির্ণীত হয় তার প্রয়োজনসাধনের ক্ষমতার দ্বারা । এই মূল্যমান নির্ণীত হবার ফলে সবচেয়ে বিড়ম্বনা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের । কারণ তাদের উপার্জন নেই এবং কাজ করার ক্ষমতা নেই । আধুনিক মানুষ ক্রমশ ওপরে উঠতে চায় । সেই ওপরে ওঠার পথে যেমন অনেক পাঁক মাড়াতে হয়, তেমনি অনেক কিছু বর্জনও করতে হয় । বর্জনের তালিকায় প্রথম বস্তুটিই হ'ল আবেগ । তাই ওলাইচন্ডীতলার এঁদো গলির বাড়ি ছেড়ে অভিজাত এলাকায় সাত তলার ফ্ল্যাটে উঠে আসে রূপা-সুপ্রিয়, উঠে আসে জীবনকে নির্জনে উপভোগ করতে ('আকাশচুম্বন') ; পাঞ্চালী অর্পণকে ডিপ্রেসন থেকে বাঁচাতে বেহালার আদিবাড়িতে যেতে দেয় না ('আত্মগোপন') ; ছেলেরা বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টাকা ভাগ করে নিতে তৎপর হয়ে ওঠে ('দম্পতি') । এইসব কারণে পরিবারগুলির মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরন্তর অতৃপ্তিবোধ, মানুষ ক্রমশ হয়েছে সংকীর্ণ । 'আমরা'র পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে 'আমি' । নিজে সুখে থাকব, নিজে ভোগ করব - এই ধারণা থেকেই মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, নি:সঙ্গ হয়েছে । এই ভোগবাদের পাশাপাশি আবার সামাজিক কিছু সমস্যাও পরিবার-জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে । যেমন, র‍্যাগিং বা শহরে আশ্রয়ের সমস্যা । মনোজ মিত্র তাঁর পারিবারিক বর্গের নাটকগুলিতে মূলত এই সমস্যাগুলিকেই তুলে ধরেছেন । তিনি দেখেছেন, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পারিবারিক মানুষ ক্রমশ অধ:পতিত হচ্ছে । আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তটি ক্রমশ ছোটো হতে হতে তার অস্তিত্বকেই গ্রাস করছে । এই অবনমন থেকে পরিবার এবং পারিবারিক মানুষকে রক্ষা করতে চান মনোজ মিত্র । তাই তাঁর নাটকে উপস্থিত হয় টোটন ('কেনারাম বেচারাম'), জিতেনবাবু ('দম্পতি'), অলকানন্দা ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা'),

শ্যামা ('পাখি'), মরালী ('টাপুর টুপুর'), আঁখি ('আঁখিপল্লব')-র মতো চরিত্র। এই চরিত্রদের মাধ্যমেই নাট্যকার বুঝিয়ে দিতে চান, পরিবারে স্নেহ-মায়া-মমতা-শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটেনি। সহমর্মিতা বা সহানুভূতির বোধ এখনো লুপ্ত হয়ে যায় নি। মানুষকে এই বিশ্বাসবোধে স্থিত করার দিকেই মনোজ মিত্রের পারিবারিক নাটকগুলির অভিযাত্রা। এই অভিযাত্রায় জিতেনবাবুর মতো বন্ধু কতটা বাস্তব, সে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু নাটকের শর্ত রক্ষা করে তিনি এই চরিত্রগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যে, তাঁদের বাস্তব বলেই প্রতীতি জন্মে। আসল কথা, মনুষ্যত্ব এবং মানবতার পরাভব দেখাতে চান না তিনি। তাই পারিবারিক ক্ষেত্রে মানবিকতা ও মূল্যবোধের পুন:প্রতিষ্ঠাতেই তাঁর আন্তরিক প্রয়াস।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৬, পৃ.২০

২) ঐ, পৃ.২০

৩) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩, পৃ.১১১

৪) ঐ, পৃ. ১২২

৫) ঐ, পৃ. ১২২

৬) ঐ, পৃ. ১৩৪

৭) ঐ, পৃ. ১৩৯

৮) ঐ, পৃ. ১৪৫

৯) ঐ, পৃ. ১৪৬

১০) ঐ, পৃ. ১৪৭

১১) ঐ, পৃ. ১৫২

১২) ঐ, পৃ. ১৫২

১৩) ঐ, পৃ. ১১৮

১৪) ঐ, পৃ. ১১৮

১৫) ঐ, পৃ. ১২৪

১৬) ঐ, পৃ. ১২৪

১৭) ঐ, পৃ. ১৫০-৫১

১৮) ঐ, পৃ. ১৫০

১৯) ঐ, পৃ. ১৫১

২০) ঐ, পৃ. ১৫১

২১) ঐ, পৃ. ১৪৫

২২) ঐ, পৃ. ১৪০

২৩) ঐ, পৃ. ১০৪

২৪) ঐ, পৃ. ১১৪

২৫) ঐ, পৃ. ১১৪

২৬) ঐ, পৃ. ১৩৭

২৭) ঐ, পৃ. ১৩৮

২৮) পরবাস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - পৃ. ২০৪

২৯) ঐ, পৃ. ২১১

৩০) ঐ, পৃ. ২১২

৩১) ঐ, পৃ. ২৪৩

৩২) প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

৩৩) পরবাস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - পৃ. ২০৩

৩৪) ঐ, পৃ. ২১২

৩৫) ঐ, পৃ. ২১৫

৩৬) ঐ, পৃ. ২২০

৩৭) ঐ, পৃ. ২২২

৩৮) ঐ, পৃ. ২৩৫

৩৯) ঐ, পৃ. ২৪২

৪০) প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

৪১) দম্পতি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২, পৃ.

৪২) ঐ, পৃ. ২২২

৪৩) ঐ, পৃ. ২২৩

৪৪) ঐ, পৃ. ২২৩

৪৫) ঐ, পৃ. ২১৫

৪৬) ঐ, পৃ. ২১৬

৪৭) ঐ, পৃ. ২২১

৪৮) ঐ, পৃ. ২১৩

৪৯) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস্ ১৯৯৩, পৃ. ৮৯

৫০) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০,প্রথম প্রকাশ-'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০, পৃ.৬৩

৫১) ঐ, পৃ. ৯৭

৫২) ঐ, পৃ. ১০৪

৫৩) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন, কোলকাতা-০৯, পৃ. ১৩

৫৪) মৃত্যুর চোখে জল - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৪২

৫৫) ঐ, পৃ. ৩৫০

৫৬) ঐ, পৃ. ৩৫৩-৫৪

৫৭) ঐ, পৃ. ৩৫৪

৫৮) ঐ, পৃ. ৩৪২

৫৯) ঐ, পৃ. ৩৪৮

৬০) ঐ, পৃ. ৩৫২

৬১) ঐ, পৃ. ৩৪৪

৬২) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস্ - ১৯৯০, পৃ. ৩৫৫

৬৩) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস্ ১৯৯৩, পৃ. ৯১

৬৪) নাট্যচিন্তা, প্রথম বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা, জুলাই - আগস্ট ১৯৮২

৬৫) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৭৬

৬৬) ঐ, পৃ. ১৯৯

৬৭) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস্ ১৯৯৩, পৃ. ৯১

৬৮) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৬৪

৬৯ ঐ, পৃ. ১৭৯

৭০) ঐ, পৃ. ১৯৮

৭১) Man of the Match - Dharani Ghosh - The Statesman - ১৩.১.১৯৯০

৭২) অলকানন্দার পুত্রকন্যায় চিত্রা সেন অত্যন্ত সাবলীল - বিষ্ণু বসু - গণশক্তি - ১৬ জানুয়ারি, ১৯৯০

৭৩) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৮৯

৭৪) দুই বাংলার দুই নাটকে নারী মহিমা - শিখা বসু - যুগান্তর

৭৫) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২২

৭৬) ঐ, পৃ. ২৪

৭৭) ঐ, পৃ. ৩৩

৭৮) ঐ, পৃ. ৩৯

৭৯) ঐ, পৃ. ৫২

৮০) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৬

৮১) ঐ, পৃ. ১৬

৮২) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ - কোলকাতা, পৃ. ৩৪

৮৩) ঐ, পৃ. ৪৪

৮৪) ঐ, পৃ. ৪১

৮৫) ঐ, পৃ. ৪৯

৮৬) শূন্য রথে বসে আছি ঃ শোভাযাত্রা - সমরেশ মজুমদার - দেশ - ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

৮৭) একটি চমৎকার নাট্য-অভিজ্ঞতা - অশোক মুখোপাধ্যায় - আনন্দবাজার পত্রিকা - ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১

৮৮) ঐ

৮৯) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস্ - ১৯৯০, পৃ.৩৫৫

৯০) পাখি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৪২৩

৯১) ঐ, পৃ. ৪৩৬

৯২) ঐ, পৃ. ৪৪০

৯৩) ঐ, পৃ. ৪৪০

৯৪) টাপুর টুপুর - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৫১

৯৫) ঐ, পৃ. ৩৬৬

৯৬) ঐ, পৃ. ৩৬৬

৯৭) ঐ, পৃ. ৩৬৬

৯৮) আঁখিপল্লব - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৭৮

৯৯) ঐ, পৃ. ৩৮৫

১০০) ঐ, পৃ. ৩৯২

১০১) ঐ, পৃ. ৩৮৯

১০২) ঐ, পৃ. ৩৯৬

১০৩) ঐ, পৃ. ৩৯৬

১০৪) সন্ধ্যাতারা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৪৭

১০৫) স্মৃতিসুধা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২৬৭

১০৬) ঐ, পৃ. ২৬৪

১০৭) আকাশচুম্বন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২৮১

১০৮) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ. ১৬

রাজনৈতিক প্রসঙ্গযুক্ত নাটক

বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচার, কোনো সমস্যাকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে বিশেষ মতাদর্শ -অনুসারী সমাধানের ইঙ্গিত, কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বকে আক্রমণ করে বিকল্প তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তুলে ধরা এবং আক্রমণ করা হয় যে নাটকে তাকে বলা হয় 'রাজনৈতিক নাটক'। বাংলা নাটকে রাজনীতি-চেতানর স্পষ্ট প্রকাশ যদিও বিশ শতকের তিরিশের দশকের শেষ দিক থেকে, কিন্তু এর পূর্ব সূত্র নিহিত আছে আরো অনেক আগে লেখা কিছু কিছু নাটকে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম পরিচয় সামাজিক ট্রাজেডি হিসেবে হ'লেও রাজনৈতিক নাটক হয়ে ওঠার প্রবণতা এবং সম্ভাবনা এই নাটকে ছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় যে প্রবল বিক্ষোভ এবং লড়াই সংগঠিত হয়েছিল, তার প্রভাব পড়েছে এই নাটকে। এই নাটক বাঙালি জাতিকে প্রথম জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। নীলকরদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ কীরকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ হিসেবে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ

> ''হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল না। 'নীলদর্পণ' আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালোবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই, অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খন্ড খন্ড করিতে পারি।''[১]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নাটককে বাংলার 'Uncle Tom's Cabin' বলেছিলেন। কারণ ঃ ''টমকাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রীদের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে। 'নীলদর্পণ' নীলদাসদিগের দাসত্বমোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।''[২] সমকালীন সমাজে নীলকরদের বিরুদ্ধে যে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ দেখা গিয়েছিল, দীনবন্ধু তাঁর নাটকে সরাসরি সেই প্রতিরোধের চিত্র আঁকেন নি, কিন্তু ব্যক্তির সমস্যার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে কৃষকসমাজের সমস্যাকেই উপস্থাপিত করেছেন প্রতিনিধিস্থানীয় পরিবারগুলির মধ্য দিয়ে। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণির স্পষ্ট বিভাজনও এই নাটকে লক্ষণীয়। শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রথম বাংলা নাটকও তাই বলা চলে 'নীলদর্পণ'কে। এই নাটকের রাজনৈতিক সম্ভাবনার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়েছে সমালোচকের উক্তিতে ঃ

> ''এই নীলদর্পণ নাটক রচনারই মধ্য দিয়ে তিনি হয়তো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই এই অমোঘ ঐতিহাসিক সত্যটাকেও প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী চেতনার শরীক হতে না পারলে মধ্যবিত্তের সংগ্রামী চেতনাও কখনও সার্থক ও সাবয়ব রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না।''[৩]

অর্থাৎ রাজনৈতিক নাটক রচনা দীনবন্ধু মিত্রের সচেতন প্রয়াস না হ'লেও এই নাটক যেভাবে সমাজ-জাগরণের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করেছে, তাতে এর রাজনৈতিক সম্ভাবনাই স্পষ্ট হয়েছে। এই নাটকে শোষণ-বিরোধী আধুনিক মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন গবেষক ঃ

> ''সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনকে দাঁড় করিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকে একটা কালের একটা ব্যাপক সমাজের জীবনতরঙ্গকে নাটকে মূর্ত করে তুললেন। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন ও

> শোষণের ভয়ঙ্কর দানবমূর্তি, নীলচাষের ফলে কৃষিকেন্দ্রিক বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সাধারণ মানুষের দুর্দশা, নিষ্করুণ অসহায়তা, দুর্বিষহ অত্যাচারের ক্ষুব্ধতা 'নীলদর্পণ' নাটকে গণবিক্ষোভের অনুভূতি সঞ্চার করেছিল।''[৪]

যদিও তখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ আবিষ্কার হয়নি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন স্পষ্ট কোন দিশা পায় নি তবু এই নাটক ঃ ''বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে এবং স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।''[৫]

পরাধীন ভারতবর্ষে ইতিহাসের আশ্রয়ে সমকালীন রাজনৈতিক চেতনাকে প্রকাশ করেছেন একাধিক নাট্যকার। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস, প্রমথনাথ মিত্র, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ। এঁদের নাটকে রাজনীতি এসেছে স্বাদেশিকতার সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজনীতি এসেছে অন্যভাবে। 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'র মতো নাটকে তিনি রূপক এবং সংকেতের সাহায্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছেন। যন্ত্রসভ্যতা এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

প্রকৃত অর্থে বাংলা রাজনৈতিক নাটকের সূচনা হ'ল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৩) থেকে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শে প্রভাবিত এই সংঘের নাটকে রাজনীতি-চেতনা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেতে থাকল। এই সময় থেকে বাংলা নাটকের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন বিশিষ্ট গবেষক ঃ

> '' 'গণ' শব্দটি প্রকাশ করল সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এবং তাদের বাঁচার দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী রূপকে। বাংলা নাটকে গণচেতনা এরূপ বিকাশ লাভ করেছে চল্লিশ দশকে। বাংলা নাটক সরে এল অপজাত, অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়, নিম্নগত ও মধ্যবিত্তের সংসারে। গণচেতনার পথেই এসেছে বাংলা নাটকের মুক্তি। ... ধনবন্টনের বৈষম্য, সর্বব্যাপী শোষণ ও বঞ্চনা, সাম্যবাদের চৌম্বক আকর্ষণে নাটকের পাত্র-পাত্রী বদল হ'ল। শ্রমিক, মজুর, কৃষক ব্রাত্যদের আগমনে নবরূপে রূপ পেল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ। ... মন্বন্তর, মহামারী আর বন্যায় ভেসে গেছে বাংলা নাটকের পূর্ব পটভূমি, ঘটনা, বিষয়বস্তু, চরিত্র, আঙ্গিক, সংলাপ — সব রূপান্তরিত হয়ে গেছে এক নিমেষে। বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'-এ তার পটভূমি।''[৬]

সাধারণ মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, বঞ্চনার পরিচয়, তার কারণ নির্ণয় এবং বামপন্থী মতাদর্শ অনুসারে, অর্থাৎ সংঘশক্তির জাগরণের মধ্য দিয়ে সংকট থেকে উত্তরণের কথা বলা হতে থাকল গণনাট্যের নাটকে। নাটকের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে আনন্দ দান করা এবং দুঃখের মধ্যেও আশাবাদ ধ্বনিত করে তোলা ছিল গণনাট্যের উদ্দেশ্য।

গণনাট্য সংঘের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল 'শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির ঐক্য', কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, কিছুদিনের মধ্যেই রাজনীতির অতি-প্রাধান্যের কারণে শিল্পরূপ উপেক্ষিত হতে থাকল। সংঘনাটকে একঘেয়েমি সৃষ্টি হ'ল। সংঘে ভাঙন সৃষ্টি হ'ল রাজনীতি এবং শিল্পবোধের প্রাধান্যের প্রশ্নে দ্বন্দ্বের কারণে। ১৯৫০ সালে 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠা তারই ফল। এখান থেকেই নবনাট্য ধারার সূচনা ধরা হয়ে

থাকে। চল্লিশের দশকের তুলনায় ষাটের দশকের বাংলা নাটকের পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই পরিবর্তনটিকে চিহ্নিত করেছেন সমালোচক ঃ

> ''চল্লিশের দশকের নাটকে সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার এবং মানুষকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল ঘোষিত নীতি। কিন্তু ষাট দশকের নাট্যকারেরা সমাজবাস্তবের স্থূলতা পরিহার করে সূক্ষ্মতার দিকে ঝুঁকলেন। বক্তব্যকে করতে চাইলেন অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য এবং নাটকের অবয়বে আনতে চাইলেন অধিকতর শিল্পসুষমা। গতানুগতিকতাকে বর্জন করে নতুন কথা নতুনভাবে বলার জন্য এক নব পর্যায়ের নাট্য আন্দোলন শুরু করলেন।''[৭]

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সময় 'শ্রেণী সংগ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট কাল' হওয়া সত্ত্বেও কেন রাজনৈতিক নাটক সেভাবে লেখা হ'ল না, তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

> ''সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে ট্রেড-ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের আস্থা সৃষ্টি করতে পারে নি। শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতা, দারিদ্র্য, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, জীবন ও জীবিকার সমস্যা, সুবিধাবাদী মনোভাব, মার্কসবাদ এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞান প্রভৃতির জন্য শ্রেণীসংগ্রাম সর্বসাধারণের বিশ্বাস হারিয়ে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। বিশ্বাসহীনতার মাটিতে অঙ্কুরিত হয়নি শ্রেণীসংগ্রামের বীজ। শ্রেণীসংঘাতের চেয়ে মননের সংকট অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।''[৮]

এই যুগের নাট্যকারেরা গণনাট্যের আদর্শবাদকে স্বীকার করে নিয়েও নাটককে একটি সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে গড়ে তোলার দিকে জোর দিলেন। মানুষের শ্রেণিপরিচয়কে অস্বীকার না করেও ব্যক্তিমানুষের স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হলেন। বাংলা নাটকের ভূগোল এই সময় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ঃ

> ''সর্বস্তরের এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ এসেছে নাটকে। জীবিকা ও বৃত্তি তাদের বিবিধ। বিবিধ ধর্ম ও সম্প্রদায় এবং অঞ্চলের মানুষ তারা। এর ফলে, বাংলা নাটকে মহাকাব্যীয় জীবনের বিস্তার ঘটেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন জনপদ, মানুষ ও জীবন।''[৯]

মনে রাখতে হবে, এই নবনাট্যের নাটকেও রাজনৈতিক চেতনা উপস্থিত ছিল। সেই চেতনার দিক থেকে নবনাট্য ধারা গণনাট্যেরই উত্তরসূরী, অর্থাৎ বামপন্থার দিকেই তার প্রধান ঝোঁক।

বাংলা নাটক ও থিয়েটারে যখন গণনাট্যের রাজনৈতিক আদর্শের দিকটিকে উচ্চগ্রামে প্রকাশ করছেন উৎপল দত্ত এবং তার শৈল্পিক সূক্ষ্মতার দিকটি প্রকাশ পাচ্ছে শম্ভু মিত্রের মধ্যে, তখন, বিষ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে, নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের আবির্ভাব। সেই সময়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ ''সময়টাই ছিল ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতায় সংকল্পবদ্ধ। জন্ম নিচ্ছিল নতুন থিয়েটার, নব নাট্য।''[১০] ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত সেই সময়ে মনোজ মিত্রের নাট্য রচনার শুরু কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির উত্তাপ তাঁর নাটকে সেভাবে নেই। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের রাজনৈতিক বোধ ও আদর্শ সম্বন্ধে মনোজ বলেছেন ঃ

> ''আমি যখন নাটক করতে আসি তখন আমার সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগাযোগ ছিলনা। ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম না। ... তবে হ্যাঁ, একথা তো ঠিক আজকে আমার একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস আছে। আমার নাটকেও তা প্রতিফলিত হয়। ... আমি নিজে রাজনীতির সঙ্গে যতটা যুক্ত, আমার নাটকও রাজনীতির সঙ্গে ঠিক ততটাই যুক্ত। আমি রাজনীতি থেকে

> যতখানি দূরে, আমার নাটকও ঠিক ততখানিই দূরে। তবে এটাতো ঠিকই, একজন মানুষ যখন নাটক লিখবেন বা করবেন, তখন তার সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নাটকে প্রতিফলিত হবেই। সেটা সোচ্চারেই হোক কিংবা গোপনেই হোক।"[১১]

তবে মতবাদে আস্থা থাকলেও দলীয় রাজনীতিতে তাঁর আস্থা নেই। বরং সাধারণভাবে রাজনৈতিক ভন্ডামি এবং কাপট্যের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন। নির্দিষ্ট কোনো দলীয় রাজনীতির কাছে আনুগত্য বাঁধা দেন নি বলে তাঁর দৃষ্টি অনেক বেশি স্বচ্ছ। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ঃ " নাটকে আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পাঠক বা দর্শকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চাই। কোনো বক্তব্য চাপাতে চাই না। "[১২] এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট শিল্পিত রূপে সমগ্র নাট্যকর্ম হিসেবে উপস্থিত করাই মনোজের লক্ষ্য। তা করতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনীতির বহুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা তাঁর চোখে পড়েছে, তাকেই ব্যঙ্গের শরে বিদ্ধ করেছেন। রাজনীতির প্রতি এবং রাজনীতির সম্পর্কে মনোজের বক্তব্য এতটাই সাধারণীকৃত যে কালের ব্যবধানে তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনীতির মানুষেরা। একদিন যাদের কাছে বাহবা জোটে, পরদিন দেখতে হয় তাদেরই চোখ-রাঙানি। এরকম অভিজ্ঞতার কথা মনোজ নিজেই জানিয়েছেন। ১৯৭৬ সালে প্রযোজিত 'চোখে-আঙুল দাদা' নাটক প্রযোজনার পর একদল মানুষ নাট্যকারকে বাহবা দিয়েছিলেন এই বলে যে, জরুরি অবস্থার বিরোধী মানুষকে নাটকে খুব জব্দ করা হয়েছে। আর একদলের কাছ থেকে জরুরি অবস্থার পক্ষে কলম ধরার জন্য ছিছিক্কার শুনতে হয়েছিল। দশ বছর পর ১৯৮৬ সালে একই নাটকের মঞ্চায়নের পর দুই দলের কাছে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সেদিন যিনি বাহবা দিয়েছিলেন আজ তিনি গম্ভীর, আর ছিছিক্কার দিয়েছিলেন যিনি, তিনি আজ পিঠ চাপড়াচ্ছেন। মনোজ বলেছেন ঃ "প্রথমজনের গাম্ভীর্যের কারণ তিনি আজ বিরোধীপক্ষে, নিজেই ছিদ্রান্বেষী, দ্বিতীয়জনের উল্লাসের কারণ তিনি সরকারপক্ষে। ছিদ্রান্বেষীকে তিনি আজ সহ্যই করিতে পারেন না।"[১৩] কাশী এবং কোসলরাজের গল্প শুনিয়ে মনোজ বলেছেন ঃ " কাশীকোসলে কবে রেষারেষি কবে গাত্র শোঁকাশুঁকি তাল রাখিতে পারি না।"[১৪] তাই একদিন যে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপস্থাপনা শিল্পীকে পুরস্কারে ভূষিত করে, দিনবদলের পর সেই অভিজ্ঞতাই তার ওপর খড়্গাঘাত নামিয়ে আনে। শিল্পীর এই উভয়সংকটই হতাশ মনোজকে দিয়ে বলিয়ে দেয় ঃ " ঘরানা বদল তাই বুঝি বুদ্ধিমানের কর্ম।"[১৫] মনোজ নিজে অবশ্য কোনোদিন কোনো ঘরানার আনুগত্য স্বীকার করেন নি, ফলে ঘরানা বদলের বিষয়টিও তাঁর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তিনি কেবল নিজের দেখাটাকে ভাগ করে নিয়েছেন পাঠক-দর্শকদের। তাঁর বিশ্বাস ঃ " আমি যে চোখে যা দেখেছি তাই দেখুন ওঁরা - তাহলেই আমি যা বুঝেছি - তাই বুঝবেন তাঁরা।"[১৬] এই দেখার দৃষ্টি মুক্ত বলেই সে দৃষ্টিতে রাজনীতি নির্বিশেষে যে কোনো শাসক তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটি এবং অসঙ্গতি অনায়াসে ধরা পড়ে। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উত্তাপ না ছড়িয়েও তাঁর নাটক উত্তীর্ণ হয়ে যায় রাজনৈতিক বোধে। প্রকৃত অর্থে মনোজের কোনো নাটককেই সেভাবে 'রাজনৈতিক' বলা যায় না, তবে সরাসরি রাজনীতির অনুষঙ্গ আছে এরকম কিছু নাটক তিনি লিখেছেন। এর মধ্যে দু'একটি serious ভঙ্গিতে রচিত, আর বাকি সবগুলিতেই রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদের প্রয়াস। এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে 'নেকড়ে' (১৯৬৮), 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯), 'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪), 'নরক গুলজার' (১৯৭৪), 'চোখে আঙুল দাদা' (১৯৭৬), 'সত্যি ভূতের গপ্পো' (১৯৮১, 'মহাবিদ্যা' (১৯৮৬), 'টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯১) নাটকগুলিকে।

১৯৬৮ সালে রচিত 'নেকড়ে' মনোজের অন্যান্য অনেক নাটকের তুলনায় দুর্বল সৃষ্টি, কিন্তু বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গিটি এখানে serious. পরের বছর লেখা 'চাক ভাঙা মধু'র মতো এই নাটকের পটভূমিও সুন্দরবন অঞ্চলের একটি দ্বীপ। অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের শোষণ করে কীভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠে বহিরাগত শোষকশ্রেণি এবং শেষপর্যন্ত নিপীড়িত মানুষের জাগরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কীভাবে শোষকের পরাজয় ঘটে তাই এই নাটকের উপজীব্য। প্রত্যক্ষত কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের উল্লেখ না থাকলেও শোষণের বিরুদ্ধে সমবেত জনশক্তির প্রতিরোধের ইঙ্গিতে এবং নীহারি কর্তৃক জনতাকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসের মধ্যে বিশেষ মতাদর্শের প্রভাবই লক্ষিত হয়।

প্রথম যৌবনে কংসারি ঠাকুর এসেছিল এই বাদা অঞ্চলে, এই দ্বীপে। দ্বীপের অধিবাসীরা তখন আদিম বন্য জীবন যাপন করে। মাছ ধরে, পশু-পাখি মেরে খায় আর এক ধরণের বুনো জ্বরে বেঘোরে প্রাণ দেয়। বিরাট ঐশ্বর্য গড়ার স্বপ্ন নিয়ে কংসারি ধীরে ধীরে ক্ষেতের পর ক্ষেত দখল করে নেয় বিনা মূল্যে বা অতি সামান্য মূল্যে। বনজঙ্গল সাফ করে চাষ আবাদ শুরু করে। ধান-কাঠ-মধু চালানের বিশাল ব্যবসা আজ তার। আজ সে দ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি। আক্রাম এবং গোঁসাই অর্থাৎ শক্তি ও ধর্ম তার আগ্রাসনের সহায়ক। দ্বীপের অন্য সবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে কংসারি দখল করেছে নারীকেও, যে নারী ছিল অন্যের স্ত্রী। সেই নারী নীহারি যখন গর্ভবতী হয়ে পড়ে তখন সে কংসারির কাছে নিজের অনাগত সন্তানের অধিকার দাবী করে। কিন্তু যাদের মানুষ বলেই স্বীকার করে না কংসারি, তাদেরই একজনের গর্ভজাতকে কীভাবে দেবে উত্তরাধিকারীর সম্মান ? তাই নীহারিকে বিষাক্ত বুনো পাতার রস খাওয়ায় সে। গর্ভস্থ সন্তান মরে যায় না, কিন্তু জন্মায় এক অদ্ভুত আকৃতি নিয়ে। সারা দেহে লম্বা লম্বা চুল, হাতের তালু আর জিভ টকটকে লাল। সেই বীভৎস মাংসপিন্ডকে মেরে ফেলতে দিয়েছিল গোঁসাইকে। কিন্তু গোঁসাই তাকে মারতে পারেনি, ফেলে রেখে এসেছিল দক্ষিণের নোনা বিলে। এসব প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ অদ্ভুত এক আতঙ্ক অনুভব করছে কংসারি। সবসময়ই মনে হচ্ছে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে। নিরুপদ্রব নির্ঝঞ্ঝাট যে জায়গায় মানুষকে চড় মারলে মাথা নীচু করে সহ্য করে সেখানে হঠাৎ একদিন রাতে কংসারির শোবার ঘরে প্রবেশ করে এক লোমশ জন্তু — মনে হয় নেকড়ে। অকুতোভয় কংসারি ক্রমে ভয় পেতে শুরু করে। তিল তিল করে যে ধন সঞ্চয় করেছে তার উত্তরাধিকার সঁপে দেবার জন্য ডাকিয়ে এনেছে ভাইপো শশাঙ্ককে। আর আশ্চর্যজনকভাবে তার পরই বেড়ে উঠেছে নেকড়ের অত্যাচার। একে একে কংসারির দুটি বুলডগ এবং তারপর আক্রাম নিহত হয় রহস্যময় নেকড়ের আক্রমণে। রক্তের দাগ যায় দক্ষিণের বিলমুখো। নানারকম চেষ্টাতেও ধরা যায় না নেকড়েকে। দ্বীপ তোলপাড় করে ফেলে কংসারি। কিন্তু রহস্যভেদ হয় না কিছুতেই। নীহারি যেদিন বাজায় তারের বাজনা সেদিন রাতেই আঘাত হানে নেকড়ে। এক অদ্ভুত আতঙ্কের পরিবেশ। সন্ধ্যার পর আর কেউ বাড়ির বাইরে বের হয় না। গোঁসাইয়ের নৈশ অভিসারেও বাধা পড়েছে। ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে কংসারি, বিশেষত আক্রামের মৃত্যু তাকে নাড়িয়ে দেয়। নিজের শেষ শক্তি জড়ো করে সে 'নেকড়ে' শিকার করতে চায়। নীহারি ইতিমধ্যে তাকে জানিয়েছে, দক্ষিণের বিলে ফেলে দেওয়া সেই ছেলে নেকড়ের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে লাভ করেছে নেকড়ের স্বভাব কিন্তু তার রয়ে গেছে মানুষের মস্তিষ্ক। পশুর শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের বুদ্ধি। কংসারি এবং শশাঙ্ককে হত্যা করে সে ছিনিয়ে নেবে নিজের

অধিকার। শশাঙ্ক প্রথমে এই দ্বীপে থাকতে চায়নি, কিন্তু ক্রমে সে এখানকার মোহে পড়েছে, এখানকার নারী সুখী নিজের পূর্বপ্রেমিক হুক্কাকে ভুলে 'দাদাবাবু' শশাঙ্ককে ভালোবাসে। কিন্তু শশাঙ্ক সুখীকে দেখে ভোগের নারী হিসেবেই। তাই অনায়াসেই ব্যবসায়ী ঘনশ্যামবাবুকে খুশি করতে সুখীকে ভেট দেয় সে। সুখী তখন ফুঁসে ওঠে। কাটারি হাতে রুখে দাঁড়ায়। গ্রামের নিরীহ মানুষগুলিও কেমন যেন বদলে যেতে থাকে। সকালবেলা একটা ক্ষুর দিয়ে মাথা চেঁচে দিলে, দুপুরবেলা তেল মাখতে গিয়ে যারা টের পেত, তারাই গোলায় ধান ঢোকার দিন গাড়ি আটকে দেয় খোরাকির দাবিতে। সচেতন হয়ে ওঠে তাদের প্রতি অনুষ্ঠিত দীর্ঘকালের বঞ্চনা সম্পর্কে। ধীরে ধীরে মুখ খুলতে শুরু করে। নিজেরই ঔরসজাত 'নেকড়ে' শিকার করতে যায় কংসারি দক্ষিণের বিলে, কিন্তু সেখানে মানুষের পায়ের ছাপ দেখে মনে সন্দেহ জাগে। এদিকে ততক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে নেকড়ে-রহস্য। নীহারির সেই ছেলে জন্মের কিছুদিন পরই মারা গিয়েছিল। কিন্তু বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা নারী নীহারি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সেই ছেলের নেকড়ে হয়ে ওঠার গল্পকে ব্যবহার করেছে। সে সংগঠিত করেছে বঞ্চিত মানুষদের। তারই নির্দেশে নেকড়ে সেজেছে মানুষ। একে একে কংসারিকে দুর্বল করে তুলেছে। একসময়ের প্রবল প্রতাপশালী কংসারি ভয়ে ক্রমশ কুঁজো হতে শুরু করেছে, অকাল-বার্ধক্য তাকে গ্রাস করেছে। সঞ্চিত ধন এবং অর্জিত সাম্রাজ্য হাতে তুলে দেবার জন্য সে দ্বীপে ডেকে এনেছে ভাইপো শশাঙ্ককে, সোনা বিক্রি করে দেবার জন্য ডেকেছে ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম পালকে। গোঁসাই সোনার ভাগ চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সে যোগ দিতে চেয়েছে নীহারির দলে। কিন্তু অত্যাচারীর প্রতি নীহারি নিষ্ঠুর ঃ

" মানুষগুলোরে চিৎ করে ফেলে লাথি ঝাড়ো, দেনার দায়ে বেঁধে ... মুখের ভাত ফেলে দে ... পেতলখানা পর্যন্ত কেড়ে আনো! ভুলে গেছি ? প্রেমচন্দর ! দ্বীপ ভাগ করতে আসো ! দ্বীপ তোমার বাপের —"[১৭] গোঁসাইয়েরও পরিণতি হয় আক্রামের মতোই। কংসারির সবগুলি ডানা ছাঁটা হয়ে যাবার পর ঘনিয়ে ওঠে শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি। কংসারিও প্রস্তুত। সে জানে, যখনই দ্বীপের সম্পদ বাইরে পাচারের সম্ভবনা দেখা দেয়, যখনই অধিকারে ভাগ পড়তে যায় তখনই অবির্ভাব ঘটে নেকড়ের। পরদিন সকালেই ঘনশ্যামের হাতে তুলে দেওয়া হবে সোনা, সুতরাং আজ আসবেই নেকড়ে। সারা বাড়ি জাল দিয়ে ঘিরে এক বিরাট ঘন্টা টাঙানো হয়েছে। নেকড়ে ঢুকতে গেলেই জালে টান পড়বে, বেজে উঠবে ঘন্টা, তখন তাকে হত্যা করবে কংসারি। পথে বাঘের ভয়ের কথা বলে চাষীরা সন্ধের আগেই কংসারির বাড়ি ফাঁকা করে চলে গেছে। শশাঙ্ক বুঝতে পেরেছে, নীহারিই সবকিছুর মূলে। সে নীহারিকে গুলি করে মারতে চায়। কিন্তু কংসারির মধ্যে কোথায় যেন রয়ে গেছে নীহারির প্রতি দুর্বলতা। তাছাড়া বাদাবনের এক মেয়েকে শত্রুর মর্যাদা দিতেও তার বাধে। কংসারি যখন নেকড়ের জন্য একান্ত প্রতীক্ষায় — তখন উপস্থিত হয় নীহারি। তার 'সাজসজ্জায় আগুন জলছে। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ'। পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে কংসারির। নীহারিকে সে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে, চুলে হাত বোলায়, কণ্ঠ শিথিল হয়ে পড়ে। একসময়ের উদ্দাম ভোগের স্মৃতি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। তখন কংসারি জানায়, সেই নেকড়ে সন্তান আর বেঁচে নেই। সদ্য তাকে মাটিতে পুঁতে রেখে এসেছে। প্রমাণ হিসেবে তার মাথার একমুঠো কালো দুর্গন্ধযুক্ত চুলও দেখায়। শত্রুনিপাতের আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে কংসারি। তার ঐশ্বর্যের, তার সাম্রাজ্যের আর কোনো ভাগীদার নেই। কংসারির আনন্দের মাঝেই নীহারি বুকের থেকে বাঘের থাবা বের করে হাতে পরে নিয়েছে, ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত

করেছে কংসারির চোখে। অন্ধ কংসারি জেনেছে, নেকড়ে নয় দ্বীপের আধমরা মানুষেরাই তাকে ধ্বংস করেছে। দ্বীপের মানুষ দ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের অধিকার। নেকড়ে শিকারের জন্য যে জাল লাগিয়েছিল কংসারি, সেই জালেই আটকে মরবে 'ওপারের জানোয়ার' কংসারি-শশাঙ্ক-ঘনশ্যাম। প্রবল আক্রোশে নেকড়ের মতোই পরস্পরের গলা যখন চেপে ধরেছে কংসারি আর নীহারি, তখন শশাঙ্ক গুলি করেছে নীহারিকে। পড়ে যেতে যেতে ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে নীহারি, ছুটে এসেছে শোষিত চাষীরা। তাদের কারো হাতে বাঘের থাবা, কারো পিঠে তীর-ধনুক, কারো গায়ে ডালপালা বাঁধা। সবার গলায় জয়োল্লাস।

ক্রমাগত শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের জেগে ওঠার, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নাটক 'নেকড়ে'। নীহারি নেতৃত্ব দিয়েছে শোষকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, উজ্জীবিত ও সংঘবদ্ধ করেছে জনতাকে। নিখুঁত পরিকল্পনা করে একে একে সরিয়ে দিয়েছে কংসারির দুই বুলডগ, আক্রাম এবং সবশেষে গোঁসাইকে। নানা দিক থেকে শত্রুকে দুর্বল করে তোলার পর প্রস্তুত হয়েছে চরম আঘাত হানার জন্য। এই প্রস্তুতির পথে বাধা কম নয়। অনেকেই দ্বিধা ঝেড়ে এগিয়ে আসতে ভয় পায়, সাফল্য সম্পর্কে জাগে সংশয়। ধানের গাড়ি আটকাতে গিয়ে একবার ব্যর্থ হয়েছে চাষীরা, চাবুক চালিয়ে চাষীদের বুকের ওপর দিয়ে কংসারি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে। সেখানে ছিল পরিকল্পনার অভাব, তাই সফল হয় নি প্রতিরোধ। এবার নীহারির পরিকল্পনা নিখুঁত। পাইকার ডেকে এনেছে কংসারি, সঞ্চিত সব সোনা সে বিক্রি করে দেবে। নীহারি কিছুতেই দ্বীপের সোনা বাইরে যেতে দেবে না। সরাসরি লড়াইয়ের শক্তি নেই, তাই রচনা করতে হয় কৌশল ঃ " রাবণরাজা অসুর। সামনা-সামনি নিকেশ করা যাবে না। আঁধারে কাজ হাসিল করতে হবে হামিদ ভাই।"[১৬] ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া গেছে কংসারির মনে। দিন দিন সে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় দিতে হবে মরণকামড়। এই সংগ্রাম অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এখানে দয়া-মায়া-মমতার কোনো স্থান নেই। পালানের মতো দুর্বল প্রকৃতির যে মানুষেরা শেষ মুহূর্তে এসে ভয় পায়, তাদের প্রতিও হতে হয় নির্দয় ঃ " যা করতে এয়েছ করো, নয় মরো ... তুমি যে হাতে রক্ত লাগাবে না ... শুদ্ধু হয়ে ঘরে ফিরে সব কথা ফাঁস করে দেবা না, তার ঠিক কি ...।"[১৭] সেই পালানকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে নীহারি। প্রস্তুত হয়ে তারা অপেক্ষা করে নীহারির সংকেতের জন্য। শেষ লড়াইয়ে পতন ঘটে শোষকের, নীহারিকেও মৃত্যুবরণ করতে হয় শশাঙ্কের ছোঁড়া গুলিতে। কিন্তু নিজের প্রাণের বিনিময়েও অত্যাচারীর পতন সম্ভব করে তোলে নীহারি। প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকে এভাবেই শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে নিজের শ্রেণিগত অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন মনোজ মিত্র। বক্তব্য এখানে স্পষ্ট এবং বলার ভঙ্গিটিও serious. শোষক-শোষিতের সংগ্রাম এখানে অন্যতর মাত্রা পেয়েছে নারী নীহারির উপস্থিতিতে। কংসারিকে একাধিকবার 'রারণ-রাজা' বলে উল্লেখ করে মনোজ মিত্র স্মরণ করাতে চেয়েছেন রামায়ণের অনুষঙ্গ। নারী সীতার ওপর অত্যাচার করে ধ্বংস হয়েছিল রাবণ আর বাদাবনের এক আপাত-নিরীহ নারীর জেদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে কংসারি ঠাকুর।

'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯) নাটকেও আছে শোষক-শোষিতের লড়াই এবং পরিণামে শোষকের পরাজয়। তবে 'নেকড়ে' থেকে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে রচিত এই নাটকে মনোজ মিত্র কথন-ভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন এনেছেন, শিল্পরূপ নির্মাণের দিক থেকেও অনেক পরিণত হয়েছেন।

এখানেও তিনি ক্রোধী, তবে সে ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে নানা মজাদার পরিস্থিতি ও সংলাপের সাহায্যে। যে বাদাবনের গল্প বলেছিলেন 'নেকড়ে' নাটকে, সেই একই অঞ্চলকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন 'চাক ভাঙা মধু' নাটকেও। এই পটভূমি এবং চরিত্র যে মনোজ মিত্র চোখে দেখা বাস্তব, সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন ঃ

> "জলজঙ্গলের দেশে জন্ম আমার। চাক ভাঙা মধুর জটা মাতলা বাদামীকে দেখেছি আমি খুব কাছ থেকে, দেখেছি তাদের লজ্জা নিবারণের ছেঁড়া তেনি, রুক্ষ উড়োখুড়ো খসখসে চামড়ার মানুষগুলো ভাঙা সানকিতে শাকপাতা খাচ্ছে। দারিদ্র্য তাদের সহোদর।" [২০]

স্মৃতিতে সঞ্চিত এই বাস্তব অভিজ্ঞতা জেগে ওঠে সংবাদপত্রের একটি সংবাদের অভিঘাতে ঃ "ওঝার বাড়িতে বিষ ঝাড়াতে এসে সর্প দংশনে মৃত্যু।"[২১] লেখা হয় 'চাক ভাঙা মধু'। তবে এই নাটকে সাপ থাকলেও অঘোর ঘোষের মৃত্যু সাপের কামাড়ে ঘটেনি, ঘটেছে বাদামির সড়কির আঘাতে।

অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাজনে অঘোর ঘোষ শোষক এবং জটা-মাতলা শোষিত। মহাজন অঘোর ঘোষ দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে মাতলার ওপর, মাতলাদের মতো মানুষের ওপর। সুদের বদলে জমি লিখে নিয়েছে, বিষয়-আশয় যা কিছু, সব গ্রাস করেছে, নারীকেও অধিকার করেছে। সেই শোষকের বাঁচা-মরা আজ শোষিত মাতলার ওপর নির্ভর করছে। সুযোগ এসেছে প্রতিশোধ নেবার। সাপে-কাটা অঘোর ঘোষের ডুলি আসছে সাপের ওঝা জটা-মাতলার উঠোনে। একদিকে সংস্কার — উঠোনে সাপে-কাটা শরীর এলে ঝাড়তেই হবে, অন্যদিকে প্রতিশোধ নেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ। পরপর কয়েকদিন অভুক্ত মাতলা, তার কাকা জটা এবং স্বামী পরিত্যক্তা গর্ভবতী কন্যা বাদামী। মুখ বাঁধা এক কলসী এনেছে মাতলা। বাদামীকে দেখিয়েছে চাক ভেঙে আনা ঘন লাল টকটকে মধুর লোভ। কিন্তু কলসির ঢাকা খুলতেই তেড়ে আসে প্রচন্ড গোখরো সাপ। মধুর বদলে বিষ। সামাজিক নানা প্রতিকূলতা এবং শোষণে মাতলার জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। গোখরোর বিষের সাহায্যে নিজের জীবনের বিষ ক্ষয় করে সে নিজের জীবনকে মধুময় করতে চায়। এই বিষ যেন বুকের ভেতর গজরাতে থাকা তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা। ফণা তোলা গোখরোকে দিয়েই মাতলা চরিতার্থ করবে নিজের প্রতিশোধবাসনা ঃ "মরার কালে উয়ারে আমি ছুঁড়ে মেরে যাবো পৃথিবীর বুকি। যতো বজ্জাত মিলে আমার যে সব্বোনাশ করেছে - "[২২] সাপের বিষ দেহে নিয়ে অঘোর ঘোষের ডুলি নেমেছে মাতলার উঠানে। সঙ্গে আছে অঘোরের ছেলে শঙ্কর আর দাক্ষায়ণী। যত অত্যাচার এতদিন করেছে অঘোর, সেসব স্মরণ করে আজ অঘোরকে বাঁচাতে চায় না জটা-মাতলা। যেটুকু দ্বিধা ছিল মাতলার, তাও কেটে গেছে জটার মন্ত্রণায়। নানাভাবে সময় নষ্ট করে অঘোরের মৃত্যু নিশ্চিত করতে চেয়েছে তারা। গ্রামের অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীও এই সুযোগে অঘোর ঘোষের প্রাণ নাশ করারই পক্ষপাতী। ফুকনা এসে বারবার সেই কথাই বলে যায়। কিন্তু তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাদামী। তার দেহে বর্ধিত হচ্ছে এক প্রাণকণিকা। সে বোঝে প্রাণের মর্ম। নিজের সন্তানের জন্য সে রচনা করতে চায় নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ। তার ওপর শঙ্কর তাকে লোভ দেখিয়েছে আশ্রয়ের, লোভ দেখিয়েছে ভালোভাবে বাঁচার ঃ

"হরিশ লোকটা অভাবে পড়ে তোকে ছেড়েছে। ওই অঘোর ঘোষকে দিয়ে আমি তোদের সব অভাব মিটিয়ে দেব। আমি আড়তদার মানুষ ... স্পষ্টা-স্পষ্টি কথা। অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে দে, আমি দেখব ... হরিশ, তুই আর তোদের বাচ্চাটা যেন বাঁচে ! ভালোভাবে বাঁচে!" [২৩]

বাদামীর জন্যই মাতলা বাধ্য হয় অঘোর ঘোষকে ঝাড়াতে। বাদামী তখন অঘোর ঘোষের প্রাণস্বরূপা, চাক ভাঙা মধুর মতো তীব্র জীবনরসে পূর্ণ। গ্রামের সকলের বিরোধিতা উপেক্ষা করে মাতলা অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু প্রাণ ফিরে পাবার পরই অঘোর দেখা দেয় শোষকের চিরন্তন মূর্তিতে। শঙ্করের রূপও মুহূর্তে বদলে যায়। অঘোর এবার হাত বাড়ায় বাদামীর দিকে। তীব্র লালসায় তার জান্তব লালা ঝরে। বাদামী অঘোরের তৃষ্ণা মেটাতে এগিয়ে দেয় সেই গোখরোর কলসী। কিন্তু আবার কখনো বাদামীর দিক ছোবল তুলতে পারে এই আশঙ্কায় গোখরোকে আগেই মেরে রেখেছে মাতলা। বাদামীর স্বপ্নের 'গোক্ষুর' তখন মৃত, তার মাথাটা একটা প্রকান্ড ভন্ডামির মতো ফুলে ফেঁপে হাঁ করা। হাসিতে কান্নায় জ্বলতে জ্বলতে বাদামী সেই মৃত সাপ টেনে বের করে আছড়ায় উঠোনে আর পরমুহূর্তেই কচ্ছপ ধরা সড়কি তুলে নিয়ে ছোটে অঘোরের দিকে। অঘোর লাফিয়ে পড়ে আলের ওপাশে। বাদামীও আলের ওপরে উঠে সড়কি চালায়। মাতলার মুখে শোনা যায় বর্ণনা ঃ " আঁই শালা, মেয়ে আমার লিজের হাতে বক্ষ ফাটায়ে দিলো রে !"[২৪] বাদামী 'মা' রূপে মধুর আধার, সেই 'মা' প্রাণ দিয়েছিল অঘোরকে। আবার সেই 'মা' যখন সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত তখন তীব্র বিষ। সেই বিষেই অঘোরের নিপাত। বিষ উগরে দিয়েই আবার মাধুর্যে স্থিত হয়েছে বাদামী। বাবার বুকে জড়িয়ে থেকে উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে গেছে দাওয়ার দোলনার দিকে — মৃত্যু পেরিয়ে জীবনের দিকে। শোষক-শোষিতের লড়াই এবং পরিণামে শোষকের পরাজয়ের পরিচিত থিমকেই মনোজ মিত্র ব্যবহার করেছেন এই নাটকে, কিন্তু জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। তাই বক্তব্য ভার হয়ে চেপে বসেনি তাঁর নাটকে। ক্রোধ এবং প্রতিবাদ প্রকাশের সরল প্রচলিত পথ তিনি বেছে নেন নি। বরং জটা-মাতলার প্রতিবাদকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের শ্রেণির উপযুক্ত করেই। মহাজন এদের নানাভাবে পীড়ন করে, ঘৃণা-অপমান-অত্যাচারে নিঃস্ব করে। সেই মহাজনের জীবন-মরণ যখন তাদের হাতে তখনও তাদের মধ্যে অবাস্তব বীরত্ব আমদানির সরল প্রলোভন জয় করে মনোজ মিত্র ফুটিয়েছেন এই শ্রেণির মানুষের চরিত্রের স্বাভাবিকতা। মাতলা বহুদিন মনে মনে ভেবেছে, 'কত্তা'কে একবার বাগে পেলে সব অপমানের শোধ তুলবে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যেদিন বাগে পেল সেদিন দেখা গেল, ক্রমাগত শোষণ এবং পীড়নের ফলে তাদের ভেতরকার আগুনেও আর তেমন তেজ নেই। কলসির মৃত গোখরোর মতো তাদের ভেতরকার গর্জনও নিস্তেজ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। তাই ডুলি তাদের বাড়ির দিকে ছুটে আসতে দেখে মাঠ ভেঙে খিঁচে দৌড় লাগাতে চায় মাতলা। ক্রোধের পরিবর্তে তাদের চরিত্রে মিশে যায় অসহায়তা এবং আত্মবিদ্রূপ। মাতলার ভয়, শেষ পর্যন্ত কর্তাকে না ঝাড়াতেই হয়। কিন্তু জটা অনেক জটিল, অনেক প্যাঁচালো। সে মাতলাকে শেখায়, বঁড়শিতে মাছ খেলানোর মতো করে অঘোর ঘোষের প্রাণটাকে খেলাতে হবে কিন্তু কিছুতেই তাকে বাঁচানো চলবে না। ছুতোয়-নাতায় সময় নষ্ট করতে হবে। মনোজ মিত্রের কোনো চরিত্রেই সাদা-কালোর স্পষ্ট ভেদ নেই। চরিত্রের বিভিন্ন দিকে আলো ফেলেন তিনি। তাই জটার পরামর্শে মাতলার মনে দ্বিধা জাগে ঃ " ট্যাকা যদি গোড়াতেই খেয়ে বসি তালে তো রুগী বাঁচাতিই হবে !"[২৫] কিন্তু এর কাটানও আছে জটার কাছে ঃ "ধর দেবতার থানে কতো তো হত্যে হয়, মানত হয়, প্যাঁটা কাটা হয়, তা বলে সব বারে কি আর রুগী বাঁচে!" [২৬] সুতরাং

যতটা পারা যায়, পয়সা খিঁচে নিতে হবে, কিন্তু কিছুতেই প্রাণ বাঁচানো চলবে না। ফুকনা, ষষ্ঠী প্রমুখ গ্রামবাসীরাও এই সুযোগ অঘোরের গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে চায়। মাতলাকে তারা নিষেধ করেছে অঘোর ঘোষকে ঝাড়াতে। কিন্তু এর মাঝে নাট্যকার উপস্থিত করেছেন মাকে — উপস্থিত করেছেন বাদামীকে। প্রাণকে লালন করা যার ধর্ম সে কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারে না প্রাণকে। তারই পীড়াপীড়িতে মাতলা অঘোরকে ঝাড়তে যায়। সেই সঙ্গে মনোজ মিত্র আবার যুক্ত করে দেন মাতলার রক্তে বয়ে চলা সংস্কারকে। ওঝার সামনে বিষ রোগীর শরীর উথাল-পাথাল করবে, এ যে সহ্য হয় না ঃ "বাপ আমারে লিজহাতে ধরে ধরে গাছগাছাড়ি ওষুধবিষুধ চেনায়ে গেছে! আজ থেকে থেকে শুধু তার কথা মনে পড়ে আর দু'খান হাত আমার লিসিরপিসির করে! "[২৭]

শেষ পর্যন্ত সব কিছুর উর্ধ্বে জয়ী হয় প্রাণের দাবী। মাতলা বিষ নামায় অঘোরের। 'কত্তা'কে ঝাড়াতে গিয়ে নিজের ভেতরকার বিষটাও ঝেড়ে ফেলেছে মাতলা, উপলব্ধি করেছে প্রাণের মাধুর্য। কিন্তু অঘোরের শরীরের বিষ নামলেও মনের বিষ তো নামে নি। তাই জান্তব লোভে সে হাত বাড়িয়েছে বাদামীর দিকে। যে নারীকে নাট্যকার এনেছিলেন প্রাণস্বরূপিণী হিসেবে, সেই নারীকেই এবার দেখালেন অসুরবিনাশিনী রূপে। নিজের এবং গর্ভস্থ সন্তানের বিপদের আশঙ্কায় বাদামী হাতে তুলে নিল সড়কি — সেই সড়কির আঘাতেই মৃত্যু ঘটল অঘোর ঘোষের। বাদামীর এই একক প্রত্যাঘাত সংঘ নাটকের প্রচলিত ছকের সমাপ্তির সঙ্গে মেলে না। কারণ সেখানে সমবেত জনশক্তিই শোষকের পতন ঘটায়। মনোজ মিত্র কখনো প্রচলিত ছকবন্দি নাটক লেখেন না। তাই তাঁর নাটকে গ্রামবাসীরা অঘোর ঘোষকে ঘিরে ধরলেও চরম আঘাতটি হানে বাদামী। এই পরিণতিকে সমর্থন জানিয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যকার উৎপল দত্ত এবং বিশিষ্ট সমালোচক ড. পবিত্র সরকার। ড. সরকারের মতে ঃ

> "বাদামীর চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া কোনো এক মুহূর্তের উদ্‌গম নয় – পুরো নাটকের ঘটনাক্রম তার পিছনে না থাকলে ওই ক্লাইম্যাক্স তৈরি হতেই পারত না ; ... বাদামীর এই কাজ শ্রেণী সংগ্রামকে সাহায্যই করে, তা শ্রেণী সংগ্রামের মূল লক্ষ্যকেই সমর্থন জোগায়।"[২৮]

বাদামী অঘোরকে মারলেও তার পেছনে সমূহ শোষিত মানুষের সমর্থন আছে। নিজে সে একক চরিত্র হিসেবে শোষিত নয়, তার মধ্যে সমস্ত শোষিত মানুষের চিত্র ধরা পড়েছে। তাত্ত্বিক বক্তব্যে নাটক শেষ করার পরিবর্তে 'বাদামীর হঠাৎ জেগে ওঠা নিরুপায় আক্রোশ' নাট্যকারের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শত্রুনিপাত তখন আর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যের রূপায়ণ হয়ে থেকে যায় না, জীবন থেকে উঠে আসা মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রতিফলন হয়ে ওঠেঞ্চ

'নেকড়ে' এবং 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে গল্পের ছক মোটামুটি এক। একজন অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত অনেক মানুষ। উভয় ক্ষেত্রেই শোষকের মৃত্যু ঘটেছে একজন নারীর হাতে। নীহারি গণশক্তিকে সংগঠিত করে প্রতিশোধে নেতৃত্ব দিয়েছে, বাদামী মানুষকে সংগঠিত না করলেও শ্রেণি হিসেবে সাধারণ মানুষ তার সঙ্গে আছে। গ্রামের সকলে অঘোরকে ঘিরে ধরার পরই সে সড়কি চালিয়েছে। এই দুটি নাটকের গড়নে সংঘ নাটকের প্রভাব আছে। গণনাট্যের আদর্শ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ঃ

> ''গণনাট্যের আদর্শ হল শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংকট, শোষক ও শোষিতের মধ্যে স্পষ্ট শ্রেণিবিভাজন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণিবিভাজনের অবসান না হচ্ছে ততদিন শ্রেণিদ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতার চিত্র আঁকা গণনাট্যের সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।''[২৯]

এই দুটি নাটকে শোষক-শোষিতের শ্রেণিপরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কিত। অঘোর এখানে অত্যাচারী এবং তার অত্যাচার প্রকাশ পেয়েছে মাতলা, দাক্ষা ও বাদামীকে কেন্দ্র করে। তবে শ্রেণিগত মানুষের ব্যক্তিপরিচয়টিও তুলে ধরেছেন নাট্যকার। শ্রেণি হিসেবে মাতলা মহাজনের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে সে বিশ্বাস করে, ওঝার বাড়িতে রুগি এলে তাকে ঝাড়াতেই হয়। ব্যক্তিগত এই বিশ্বাসবোধের সঙ্গে তার শ্রেণিপরিচয়ের দ্বন্দ্বও আছে নাটকে। বাদামী শোষিত নারী, কিন্তু স্বামী-সন্তানসহ সংসারের লোভ, প্রাণের জন্য তার মমতা প্রভৃতি তাকে ব্যক্তিপরিচয়ে চিহ্নিত করেছে।

'চাক ভাঙা মধু' থেকে 'শিবের অসাধ্যি'র ব্যবধান পাঁচ বছরের। প্রত্যক্ষ বাস্তবকে এড়িয়ে এই নাটক মনোজ শোষক-শোষিতের লড়াইকে উপস্থাপিত করেছেন অনেকটা ফ্যান্টাসির আকারে। দেবতারাই এই নাটকে প্রধান চরিত্র হয়ে এসেছেন। কৈলাস থেকে মা দুর্গা তাঁর সন্তানদের দিয়ে মর্ত্যে এসেছেন। আর শিব তাঁর অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গীকে নিয়ে পৃথকভাবে উপস্থিত হয়েছেন সেই ঘোড়াডাঙায়, যেখানে জোতদার হাঁদু সিংগির বাহিনী মায়ের পুজোর চাঁদার নামে অত্যাচার চালায় গ্রামবাসীদের ওপর। শিব এই অত্যাচারিত মানুষদের পরামর্শ দেন জোতদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলে গ্রামবাসীরা। কিন্তু জোতদার শিবেরও অসাধ্যি। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের নামে শিবকে যুক্তিজালে ফাঁসিয়ে কার্যসিদ্ধি করে হাঁদু সিংগি। দুর্গা তাঁর বরপুত্র হাঁদুকে বাঁচাতে কার্তিক-গণেশকে পুলিশের বেশে পাঠান। কারণ কমতে কমতে জোতদার এখন সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। তাদের রক্ষা করা মায়ের কর্তব্য। পুলিশের শক্তিতে উজ্জীবিত হাঁদু, নেতা শিবসহ সকলকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। শিব শুরু করেন প্রলয়নৃত্য। কিন্তু দুর্গার চেষ্টায় রক্ষা পায় হাঁদু। নাটকের শেষে সর্বহারা মানুষের চেতনার জাগরণ এবং সেই চেতনার দ্বারা নতুন পথ খুঁজে নেবার ইঙ্গিত আছে।

'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'তে শেষে শোষিত মানুষের জয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু 'শিবের অসাধ্যি' শেষ হয়েছে আশা দিয়ে, সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে। জোতদারকে মানুষ পরাস্ত করতে পারেনি, কিন্তু মানুষের শুদ্ধ চৈতন্য যে ভবের অসুর বিনাশ করবে তেমন সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দু'টি নাটকের তুলনায় এই নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার ছায়াপাত বেশি করে ঘটেছে। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৪। অর্থাৎ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে তখন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অস্থির। জোতদারদের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ ক্রমে সংগঠিত হচ্ছে, বিশেষ রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট জোতদারদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে, কেন্দ্রীয় শক্তি প্রাদেশিক শক্তির উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রতিফলিত হয়েছে নাটকে। শিব এখানে সর্বহারা শ্রেণির প্রতিনিধি। ছিদাম-বংশী-গোবর্ধনের সঙ্গে তিনি একই 'কেলাসে'র। কিন্তু এই সর্বহারার নেতা পরাজিত হয়েছেন বুর্জোয়ার কৌশল এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তার কাছে। সাধারণের চেতনা বাড়ার আশাতেই তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা চরিত্রে ছায়া পড়েছে সমকালের

রাষ্ট্রনায়িকার। সাধারণের দুঃখ দূর করা যার কাজ তিনি আজ জোতদারের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত। সে সময় 'গরিবি হটাও' স্লোগান নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তার ইঙ্গিত আছে দুর্গার সংলাপে। গরিবের সর্বনাশ করে গরিবি দূর করার স্লোগান তোলার দিকে কটাক্ষ করা হয়েছে ঃ " আমি জোতদার, মজুতদার, ভেজালদার মানিকদের ছেড়ে দিয়েছি। ওরা মারুক, ঘর জ্বালাক, গরিব লোক মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিক ... গরিব না মারলে, গরিবি দূর হবে কি করে ছোটখোকা?"[৩০] সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে নকশাল দমনের নামে রাষ্ট্র শক্তির যে নিপীড়ন নেমে এসেছিল, পুলিশ-মিলিটারির সাহায্যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী যে নিষ্পেশণ চালাচ্ছিলেন তাকে তুলে ধরেছেন মনোজ মুখ্যমন্ত্রীর ডাকনামটির ধ্বনিসাদৃশ্যে ঃ

> "পুলিশ আছে, সি.আর.পি. আছে, মিলিটারি আছে, কোর্ট আছে, কনস্টিটিউশন আছে, দশ হাত ভরে মানিকের কোনো অভাব রাখি নি। কেউ ওর কিছু করতে পারবে না। মানিক আমার ঠিক হড়কে বেরিয়ে আসবে।"[৩১]

মানুষের দুর্দশায় ক্রুদ্ধ নাট্যকার দেবীকে 'পিশাচজননী' বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন অনুষঙ্গে এই নাটকে এসেছে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির বহু প্রসঙ্গ। বিদ্যুৎহীন খাম্বা, ভেসেকটমি, আন্দোলন করতে গিয়ে জোতদারের সঙ্গে নেতার মিলে যাওয়া, ভোট জালিয়াতি, রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠীবাজি, শাসক-পুলিশ যোগসাজশ, নকশাল আন্দোলনে শিক্ষার অবনমন, মিসা আইনের ব্যবহার, মন্ত্রী হয়ে স্বার্থরক্ষা এবং সাধারণের সর্বনাশসাধন ইত্যাদি সবকিছুই নাট্যদেহে যুক্ত হয়ে গেছে এবং কোনোটিই আরোপিত মনে হয় নি। নাটকের মূল বক্তব্যটি হ'ল, দেশের কৃষক - শ্রমিকের সমস্যা সমাধানের পথ বাইরে থেকে কেউ এসে বাতলে দিতে পারবে না, তাদের নিজেদেরই পথ করে নিতে হবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঃ " ওরে পরের কাছা ধার করে কে জিতেছে কবে ... চাষার ভাগ্যি চাষা ছাড়া কে ফিরালো ভবে ..."[৩২] চাষী ছিদাম উপলব্ধি করেছে এই সত্য। ত্রিপাক্ষিকের রস তার মিটে গেছে। কোনো তৃতীয় পক্ষ নয়, চাষাকে নিজের বুঝ নিজেই বুঝে নিতে হবে ঃ "পরের কাছা ধার করে পার পাওয়া যাবে না। কত্তা, গরিবেরে বাঁচাতে হলে ... তার নিজেরে দাঁড়াতে হবে, লড়তে হবে !"[৩৩] নাটকের শেষে ধ্বনিত হয়েছে আশাবাদ ঃ

> "ও ছিদেম, লেগে পড়। পারবি পারবি... পারলে তোরাই পারবি। ... উল্টেপাল্টে দে। আসছে বছর আমরা এসে যেন দেখতে পাই, ও ছিদেম, ভবের অসুর নাশ হয়েছে, তোরা জয়ী হয়েছিস ... পৃথিবী সুন্দর হয়েছে ... মধুর হয়েছে ... আসছে বছর আমরা তোদের ঘরে উঠব ..."[৩৪]

এই আশাবাদ এবং নাটক জুড়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বাস্তবতার উল্লেখ সত্ত্বেও 'শিবের অসাধ্যি', 'চাক ভাঙা মধু', এমনকি 'নেকড়ে'র তুলনায়ও দুর্বল সৃষ্টি। 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে Seriousness কম, রসিকতা বেশি। থিম এক, প্লটও প্রায় চেনা। চরিত্রগুলির ভূমিকা সমকালের বাস্তবতার সঙ্গে মেলানো। জোতদার-চাষীর দ্বন্দ্ব এবং শেষপর্যন্ত শোষিত কৃষককে নিজের শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে হবে – এই তাত্ত্বিক উপস্থাপনা খুব Seriously করা হয় নি। বিষয়বস্তুর নিরিখে সমসাময়িক কালে এর কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও চিরকালীন নাট্যিক আবেদন এতে নেই। প্রতিরোধের নাটক হিসেবে যেমন দৃঢ় নয়, তেমনি কৌতুকনাটক হিসেবেও খুব একটা সফল নয়। কৌতুক অনেক ক্ষেত্রে ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত এবং কোথাও কোথাও অনাবশ্যক দৈর্ঘ্যে ভারাক্রান্ত। মনোজ মিত্রের অনেক বক্তব্যপ্রধান নাটকও যেমন নাট্যিক শর্ত পূরণ করেছে, এই নাটক কিন্তু তা পারে নি।

'নরক গুলজার' নাটকেও সমকালীন সমাজ-রাজনীতির প্রতি রঙ্গ-ব্যঙ্গের শেল নিক্ষেপের জন্য মনোজ বেছে নিয়েছেন Epic form। 'শিবের অসাধ্যি'তে দেবতা নেমে এসেছিলেন মর্ত্যে আর 'নরক গুলজার'-এর কাহিনি স্বর্গ-মর্ত্য-নরকে প্রসারিত। বিশ শতকের সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপটি ধরা পড়েছে এই নাটকে। পিতামহ ব্রহ্মা স্বর্গের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন, নরকের পাপীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে — তাদের পুনর্জন্ম চাই। মর্ত্যের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গিয়ে তারা আবার নিজ নিজ কুকর্মে লিপ্ত হতে চায়। যমের ছোটো বৌকে তারা হাইজ্যাক করেছে দাবী পূরণের লক্ষ্যে। ব্রহ্মা কোনো কড়া পদক্ষেপ নিতে পারছেন না, কারণ এরা সব তারই সৃষ্টি এবং নিজের গদি টেঁকাতে তিনি অনেক সময়ই এই মস্তান, পুলিশ এবং গুরুঠাকুরদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। কৌশলে কার্য-সিদ্ধির জন্য তিনি নারদকে নরকে পাঠালেন নেতা বাঁটুল বিশ্বাসের ছদ্মবেশে। কিন্তু ফল হ'ল উল্টো। নারদ বাঁটুল বিশ্বাসের ছদ্মবেশ ধারণ করে আসল বাঁটুল বিশ্বাসের মতো আচরণ করতে শুরু করল। কারণ নেতার পোশাক পরলেই নেংটি ইঁদুরও বাঘ হয়ে যায়। এদিকে যম আসল বাঁটুলকে মারতে ব্যর্থ হয়ে মেরে নিয়ে এসেছে ঠেলাচালক 'মরা গরিব' মানিকচাঁদকে। মর্ত্যে মানিকচাঁদের কষ্টের সংসার ফুল্লরা আর শিশু সন্তানকে নিয়ে। নানা দিকের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে, স্ত্রী-পুত্রের কষ্ট দেখতে না পেরে মানিক আত্মহত্যা করেছে। পুনর্জন্ম সে চায় না, মর্ত্যের জীবনে আর ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু শোষকশ্রেণির যে মর্ত্যে মানিককে অবশ্যই চাই। নইলে কে ঘোড়ুই-এর লাঙল ঠেলবে, কে পান্নার গুদাম সাফা করবে, কে বাঁটুলের বেগার খাটবে, কার নারীকে ভোগ করবে গুঁইবাবা? ব্রহ্মা মানিককেই ঠেলে দেন নরকের পাপীদের কাছে। কারণ রক্তপায়ীর মুখে অবিরাম খাদ্যের যোগান না দিয়ে গেলে তার গদি টেঁকে না। লড়াইতে কিন্তু জিতে যায় মানিক। শিকল ছাড়া হারাবার যার আর কিছুই নেই, সেই মানিক সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জিতে যায় নেংটি-ঘোড়ুই-বাঁটুল-গুঁইবাবার বিরুদ্ধে। নারদ ব্রহ্মার চাল বানচাল করে দিয়ে মানিকচাঁদ-ফুল্লরাকে পুনর্জন্ম দিয়ে দেন। কারণ মর্ত্যে লড়তে হবে শেষ লড়াই — সে লড়াই বাঁটুল-ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে। মানিকও এবার রাজি হয় ফিরে যেতে। কারণ ঃ "জ্যান্ত শয়তানের থাবা থেকে ছেলেডারে বাঁচাতে হবে ... পিথিবীরে বাঁচাতে হবে।"[৩৫] সব শয়তান এবং সেইসঙ্গে ভগবানকেও নারদ ঢুকিয়ে দিলেন পুনর্জন্মের তালিকায়। তাদের জন্ম মানুষের নয়, গাভীর। গভীর ক্রোধে মনোজ মিত্র সমস্ত শয়তান এবং সেইসঙ্গে তাদের নিয়ন্তাকেও গো-জন্ম দিয়ে যেন মনের রাগ মেটান। এই গোরুদের লালন-পালনের ভার এখন থেকে সাধারণ মানুষ মানিকের।

আনন্দবাজার পত্রিকা এই নাটক সম্পর্কে লিখেছিল ঃ " পলিটিক্যাল ড্রামা বলতে যা বোঝায়, এই প্রথম তা মঞ্চস্থ হ'ল।"[৩৬] সমকালীন ভারতবর্ষ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের অবক্ষয়ী রাজনীতির দিকে আঙুল তুলেছেন মনোজ মিত্র এই নাটকে। স্বর্গ-নরক ইত্যাদির দ্বারা কৌতুকের একটা আবরণ সৃষ্টি করলেও ভেতরের খোঁচাটা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব এইখানে যে, দু'একটি মাত্র শব্দের কুশলী ব্যবহারে তিনি লক্ষ্যভেদ করে ফেলেন। ব্রহ্মা জানেন নেংটি ঘোড়ুইদের কুকীর্তি, কিন্তু তিনি নিজেও ষড়যন্ত্রের বাইরে নন, তাই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। মাঝেমধ্যে একটু-আধটু শাস্তি দিতে হয় লোকদেখানো, কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে রয়েছে গভীর আঁতাত। নাট্যকারের তীব্র ক্রোধ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের শাসককুলের সঙ্গে কেন্দ্রের শাসকের আঁতাতটিকে

স্পষ্ট করে দেয় সামান্য আয়োজনে ঃ " এই হাত ... এই হাত রক্তমাখা! এ কার হাত! কার ? ভগবানের হাত ... সব ভগবানের হাত ! "[৩৭] নিয়ন্তা যদি নিজেই দুর্নীতিপরায়ণ হন তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার সাধ্য তার থাকে না। গুঁইবাবার কুকীর্তি জানা সত্ত্বেও জনমতের চাপে তাকে স্বর্গে রাখতে বাধ্য হন ব্রহ্মা। এভাবেই নানাদিকে 'তাপ্পি' দিয়ে তাকে স্বর্গ চালাতে হয়। ঘোড়ুই এর উৎকোচও তাই গ্রহণ করতে হয় ব্রহ্মাকে এবং উৎকোচ গ্রহণের যে সাফাই তিনি দেন তাতে ব্রহ্মাকে সমকালের এবং চিরকালের একজন তথাকথিত দেশনেতা হিসেবে চিনে নিতে কষ্ট হয় না ঃ " উৎকোচ ছাড়া আমাদের ইনকামটা কী, অ্যাঁ? আমরা কি খাটি, না এগ্রিকালচার করি না মেসিন বানাই ?"[৩৮] এই পরগাছাই শোষকের মুখে শোষিত যোগান দেবার কাজটি করে থাকে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের গদি সুরক্ষিত রাখে। পান্না-ঘোড়ুই-বাঁটুল-গুইবাবা সেই শোষক শ্রেণি আর মানিকচাঁদ শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি। শোষক শ্রেণি একটি চেন। লিডার, জোতদার, মজুতদার, মস্তান, পুলিশ, ধর্মগুরু সকলে মিলে এক লম্বা শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে সাধারণ মানুষ। সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গ এই অশুভ শৃঙ্খলের দ্বারা যেন সত্যিকারের ভূতের রাজত্বে পরিণত হয়েছিল। এই নরক গুলজার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে প্রয়োজন সর্বহারার সংগ্রাম। কোমরের শিকল খুলে রেখে মানিক সেই চরম সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছে শোষক শ্রেণিকে এবং সেই সংগ্রামে জয় হয়েছে সর্বহারার। এই জয়ই দেখাতে চান মনোজ মিত্র। তীব্র ক্রোধে ভস্ম করতে চান অত্যাচারী, অমানবিক শক্তিকে। এই শক্তির স্বরূপ উন্মোচনেও তিনি নির্মম। শাসন কায়েম রাখতে যাদের তোল্লা দেওয়া হয়, একদিন তারাই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ওঠে, চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সত্তরের দশকে এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গ, তাদের সামলাতে তখন জারি করতে হয় জরুরি অবস্থা। 'শিবের অসাধ্যি' যে নাটকত্বের অভাবে সার্থক হতে পারে নি, সেই নাটকত্বের সার্থক উপস্থাপনাতেই 'নরক গুলজার' বক্তব্যপ্রধান হয়েও সফল নাটক হয়ে উঠেছে।

'নেকড়ে' এবং 'চাক ভাঙা মধু'র serious ধরণ থেকে সরে এসে মনোজ 'শিবের অসাধ্যি' এবং 'নরক গুলজার'-এ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বাস্তবতা আমদানি করলেন, কিন্তু দেবতা ও ভূতের আধিপত্যে এগুলি ফ্যান্টাসির দিকে এগোল। এই দেবতা বা ভূতেরা যে আসলে মানুষেরই ক্যারিকেচার তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে তখন এক অস্থির অবস্থা। নকশাল আন্দোলন দমনের নামে চলছে রাষ্ট্রীয় পীড়ন, মানুষের অধিকার হচ্ছে পদদলিত এবং কিছুদিনের মধ্যেই জারি হয়ে যাচ্ছে জরুরি অবস্থা। বিশিষ্ট সমালোচক এই সময়কে চিহ্নিত করেছেন এভাবে ঃ

> "ভিতু বাঙালি গান্ধী পরিবারের মাতা ও কনিষ্ঠ পুত্রের ভয়াবহ সব কার্যকলাপ নিয়ে কানা-কানি করি – চাকরি নেই, নিরাপত্তা নেই, মুখ ফুটে অভিযোগ করবার অধিকার নেই, ধ্বসে যাচ্ছে সুস্থ জীবনের মূল্যবোধ।"[৩৯]

এই ধ্বসে যাওয়া মূল্যবোধের কথাই ব্যক্ত হয়েছে 'শিবের অসাধ্যি' বা 'নরক গুলজার'-এ। তবে তা ব্যক্ত হয়েছে মজা-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে। 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'র সঙ্গে আরেকটি বড়ো পার্থক্য আছে এই দুটি নাটকের। প্রথম দুটিতে বাস্তবকে মান্যতা দিয়ে নাটক শেষ হয়েছে আশাবাদে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো নেতা বা তত্ত্ব নয়, ছিদাম-মানিকদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে তাদের নিজেদেরই, এরকম ইঙ্গিত আছে নাটকের শেষে। নাটকের এই কথনভঙ্গি কেউ

কেউ হয়তো পছন্দ করেন নি, কিন্তু এটাই মনোজ মিত্রের বক্তব্য প্রকাশের ধরণ এবং সে ধরণটি গড়ে উঠছে এখান থেকেই। 'শিবের অসাধ্যি'তে নাটকের গড়ন কিছুটা শিথিল, কিন্তু 'নরক গুলজার'-এ অনেকটাই সামলে নিয়েছেন মনোজ। হাসি-মজা-হুল্লোড় সত্ত্বেও গভীর নাটক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এখানে। স্মর্তব্য যে, এই পথেই এরপর লেখা হবে মনোজের শ্রেষ্ঠ নাটক 'সাজানো বাগান', ফ্যান্টাসির জগৎও যেখানে জীবনবোধে উজ্জ্বল।

মনোজ মিত্রের প্রত্যক্ষ রাজনীতির উত্তাপযুক্ত নাটক বলতে মোটামুটি এগুলিই। চিৎকৃত ঢঙে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচার নাট্যকার তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর পথ ভিন্ন। নাট্যকার হিসেবে নিজের সহানুভূতি কোন্‌দিকে সেকথা স্পষ্টই জানিয়েছেন তিনি ঃ"Of course, my sympathy lies with the poor and victims of exploitation"[৪০]

কিন্তু দরিদ্র মানুষের এই exploitation যে রাজনীতি নির্বিশেষে যে কোনো দলের দ্বারাই ঘটে থাকে তাও জানেন তিনি। তাই রাজনীতির প্রতি তাঁর কটাক্ষ সাধারণীকৃত হয়ে পড়ে। কোনো বিশেষ মতাদর্শ প্রচারে দায়বদ্ধ নন তিনি, দায়বদ্ধ মানুষের দুঃখ-বেদনা প্রকাশে। সেই দুঃখ-বেদনার কারণ হিসেবে যেই তাঁর চোখের সামনে পড়েছে তাকেই আঘাত করেছেন তিনি। যেমন 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে জোতদারকে একহাত নেবার পাশাপাশি তিনি সেই নেতাদেরও রেহাই দেন নি, যারা সর্বহারা মানুষের হয়ে লড়তে গিয়ে জোতদারের সঙ্গে রফা করে। মনোজ মিত্র আসলে দেখাতে চান 'আলোছায়ায় ঘেরা মানুষ' এবং মানুষের বিচিত্র সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের পথ। তা দেখাতে গিয়েই তাঁর নাটকে প্রসঙ্গক্রমে আসে রাজনীতি। সে রাজনীতি কখনো এক দলকে আঘাত করে, আবার সময়ের বিবর্তনে তাই হয়তো হয়ে দাঁড়ায় বিপরীত মতাদর্শে বিশ্বাসী কোনো রাজনৈতিক দলের বিরাগের কারণ। ঠিক যেমনটি ঘটেছে পূর্বে উল্লিখিত 'চোখে আঙুল দাদা' একাঙ্কটির ক্ষেত্রে। মনোজ ১৯৭৬ সালে রচিত এই নাটকে সৃষ্টি করলেন এমন একজন মানুষকে যে কিনা সকলের, এমনকি বিধাতার কাজেরও খুঁত ধরে। অথচ তাকে যখন একটি মানুষ তৈরি করতে দেওয়া হ'ল, সে তৈরি করল এক কিম্ভূতদর্শন জন্তু, যার হাতের জায়গায় পা, চোখের ওপর নাইকুন্ডলি, কান দুটো কুলোর মতো। এই অদ্ভুত সৃষ্টির হাতেই চোখে-আঙুলের বিনাশ। নাটকের এই বিষয়বস্তু সমকালে জরুরি অবস্থার সমর্থকদের উল্লসিত করেছিল, আর বিরোধীদের ক্রোধান্বিত। দশ বছরের ব্যবধানে ক্ষমতা বিপরীতগামী হতেই নাটকটি নিয়ে দু'দলের প্রতিক্রিয়াও হয়ে গেল সম্পূর্ণ বিপরীত।

'মহাবিদ্যা' (১৯৮৬) এবং টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯১) এরকমই সাধারণীকৃত রাজনৈতিক একাঙ্ক। প্রথমটিতে দেখানো হয়েছে 'অনুন্নত কিংবা উন্নতিশীল কিংবা নিতান্তই উন্নতিকামী' এক রাষ্ট্রে চরম অর্থনৈতিক সংকটের কালে রাজা-দেওয়ান-কোতোয়াল-সান্ত্রী প্রমুখ রক্ষকেরা কীভাবে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সান্ত্রী চায় গৃহস্থের জুতো, কোতোয়াল চায় নিদ্রিতা নারীর অলঙ্কার, দেওয়ান চান সম্পূর্ণ নারীটাকেই। শেষে দেখা যায়, রাজা আগেই গৃহস্থের ঘরে ঢুকে একলা গৃহবধূকে মুখে কাপড় গুঁজে শৌচাগারে বেঁধে রেখে সব জিনিস সংগ্রহ করে নিয়েছেন, ঠিক বেরিয়ে আসার সময়টিতেই একে একে হাজির হয়ে পড়েছে সান্ত্রী, কোতোয়াল, দেওয়ান। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজপুরুষেরা ব্যবহার করেছে ধাঙড় তুলসীদাসকে, মদ খাইয়ে যাকে সহজেই সবকিছু ভুলিয়ে দেওয়া যায়। রাজা-মন্ত্রি-সান্ত্রীর রূপক ব্যবহার করলেও সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি এ নাটকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। নেশা ছুটে যাওয়া তুলসীর উক্তিতে মাঝে মাঝেই ধরা পড়েছে

সমকালে অথবা সর্বকালে দেশের অবস্থা। সান্ত্রী-কোতোয়াল-দেওয়ানের টুকরো উক্তিতেও যে দেশের ছবি ফোটে তা যে আসলে আমাদেরই জননী জন্মভূমি সেকথা বুঝতেও অসুবিধে হয় না। যেমন, চরম অর্থনৈতিক সংকটে দেশ যখন জেরবার, যখন কর্মচারীদের মাইনে দেওয়া যাচ্ছে না তখনও দেশকে 'অনুন্নত' বলা যাবে না ঃ

> "না, অনুন্নত বলবে না কোতোয়াল... বলবে উন্নতিশীল কিংবা উন্নতিকামী দেশ। আমাদের প্রিয় মহারাজ দেশের প্রভূত উন্নতি কামনা করে বিদেশ থেকে প্রতিদিন প্রভূত ঋণ আনয়ন করছেন। এক দেশ থেকে ঋণ এনে আরেক দেশের সুদ মেটাচ্ছেন। দেশের উন্নতিতে তুমি বিশ্বাস হারিয়ো না কোতোয়াল!"[৪১]

যিনি রাতে চুরি করছেন তিনিই দিনে তদন্ত সমিতি বসাচ্ছেন এবং তদন্ত সমিতির পক্ষে জোরদার মামলা করার সুবিধে হবে ভেবে তিনি অপরাধীকে অপরাধ করার সুযোগ দিচ্ছেন, এমন সংবাদ দেশ-কাল-নির্বিশেষে যে কোনো শাসককেই বিদ্ধ করে। রাজা ক্রমাগত ঋণ নিয়ে দেশকে প্রায় বিকিয়ে দিয়েছেন। যারা একসময় আগ বাড়িয়ে ঋণ দিয়েছিল, তারাই এখন পাওনা আদায়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। অগত্যা প্রজার সর্বনাশ করা ছাড়া রাজার আর কোনো পথ নেই। প্রকাশ্য কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ সম্ভব নয়, কারণ তাহলে প্রজারা ক্ষেপে যাবে। দেশের অস্থির অবস্থায় বিদেশী ঋণ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং প্রজার ধন অপহরণই একমাত্র পথ। রাতে অপহরণ করে দিনে তদন্ত সমিতি বসিয়ে বিদেশের দৃষ্টিতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত দেখানো হচ্ছে। মনোজ মিত্র নাটকের শেষে দেখান, প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যায়, চুরির দায়ে ধরা পড়ে তুলসীদাসের মতো সাধারণ মানুষেরা। রাজা-সান্ত্রী-কোতোয়াল-দেওয়ান সকলে বেরিয়ে যাবার পর গৃহস্থ গৌরহরি যখন তুলসীদাসকে জাপটে ধরে 'চো-ওর ! চো-ওর !' বলে চিৎকার করছে তখন তুলসী দাসের গলা ফাটিয়ে হাসি যেন ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলে নাট্যকারেরই অট্টহাসি।

'টু-ইন-ওয়ান' নাটকে নিঃসন্তান সুলতান যখন নিজের সন্তানলাভ সম্পর্কে আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, তখন তিনি পিতা হলেন একসঙ্গে জোড়া সন্তানের। পরস্পর পিঠের দিকে জোড়া দুই ছেলের নাম রাখা হ'ল ঝুল মহম্মদ গুল মহম্মদ। সার্জেন অস্ত্রোপচার করে দু'জনকে পৃথক করতে চাইলেও তা কার্যকর করা হয় না ফৈজীর এই যুক্তিতে যে, একসঙ্গে থাকলে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে গোল বাঁধবে না, কেউ কারো বিরুদ্ধে চক্রান্তে করতে পারবে না, পরামর্শের প্রয়োজন হ'লে দু'ইঞ্চি ঘাড় হেলিয়েই তা সম্ভব হবে, আবার এক মুখের হাসি অন্য মুখের কান্না দেখিয়ে জনগণকে বোকা বানানোও সম্ভব হবে। অতএব যুক্ত অবস্থাতেই শাহজাদারা দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমেই বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য প্রকট হয়ে পড়ে। কোনো কিছুতেই তারা সহমত হতে পারে না, অথচ নিয়তি তাদের এক মাংসপিণ্ডে জুড়ে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে এই নাটক রচনার কিছুদিন আগেই ভারতের কেন্দ্রে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে জোট রাজনীতির অনুশীলন। আদর্শগত দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থিত দুটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতার জন্য কীভাবে সহাবস্থান করে তা বিস্মিত করেছে ভারতবাসীকে। এই নাটকে সম্ভবত সেদিকেও সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত আছে। ফৈজীর পরামর্শে সুলতান সিংহাসন ছেড়ে দেন শাহজাদাদের। কিন্তু সেখানেও তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করে পারস্পরিক বিরোধ। এদিকে এই সুযোগে এগিয়ে আসে বিদ্রোহীরা, বিদ্রোহ দমন

করতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে যায় শাহজাদারা, বুঝতে পারে, তাদের নসিব একসঙ্গে গাঁথা। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফেরা শাহজাদাদের জীবন্ত স্ট্যাচু বানিয়ে দেয় রাজ্যের মানুষ। মনোজ মিত্রের অন্য অনেক নাটকের মতোই এই নাটকে রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা আছে, মসনদ নিয়ে লড়াইয়ের প্রতি কটাক্ষ আছে, বৃদ্ধ বয়সেও গদির লোভের প্রতি ব্যঙ্গ আছে, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনকে বিদ্ধ করা আছে এবং ডাক্তারের অত্যধিক কাঁচিপ্রিয়তার কথাও আছে। কিন্তু তাঁরই অন্যান্য নাটকের মতো এখানে যা নেই তা হ'ল শেষপর্যন্ত কোনো সুস্থ, শুভবোধে উত্তরণ।

এরকম সাধারণীকৃত রাজনৈতিক প্রসঙ্গ মনোজ মিত্রের আরো অনেক নাটকেই আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯), 'রাজদর্শন' (১৯৮১), 'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫), 'কিনু কাহারের থেটার' (১৯৮৮), 'পুঁটি রামায়ণ' (১৯৮৯-৯০) প্রভৃতি নাটকগুলির কথা। সাধারণভাবে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ, রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি এসব নাটকে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার বিষয় হলেও 'রাজনৈতিক নাটক' এগুলিকে বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো নাটকই সেই অর্থে 'রাজনৈতিক' নয়। কারণ নিজের বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস থাকলেও দলীয় রাজনীতিতে আস্থাহীন মনোজ কোনো বিশেষ মতাদর্শের বিরোধিতা বা কোনো বিশেষ মতাদর্শ প্রচারের দায় গ্রহণ করেন নি। সাধারণভাবে রাজনীতির স্খলন-পতন দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবনকে যেভাবে বিষিয়ে তোলে তা তাকে ব্যথিত করেছে এবং সেই ব্যথাই তাকে প্রণোদিত করেছে রাজনীতির দিকে ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপে। সেই তীর কখন কোন্ তত্ত্ব বা দলকে আঘাত করছে তা তিনি খেয়াল করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তা সত্ত্বেও 'নেকড়ে', 'চাক ভাঙা মধু', 'শিবের অসাধ্যি' এবং 'নরক গুলজার' নাটকগুলিতে যেভাবে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের জাগরণ অথবা জয়কে তুলে ধরেছেন তা সমকালের বাংলা নাটকে একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের সার্বিক প্রভাবসঞ্জাত বলেই মনে হয়।

উৎপল দত্তের মতো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নাটকের রচয়িতা নন মনোজ মিত্র। উৎপল দত্ত শ্রেণিশত্রুর প্রতি সামান্য ক্ষমাকেও শ্রেণি-সমঝোতা বলেই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু মনোজ মিত্র সেই ধারার শিল্পী, যিনি ঃ ''শ্রেণীসমূহের প্রতি সচেতন থেকেও তার সংগ্রামের সীমাকে কোনো নির্দিষ্ট গন্ডীতে বেঁধে রাখতে চান না।''[৪২] তিনি মানুষ ও সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসঙ্গতিকে দেখতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত উপলব্ধির আলোকে। শ্রেণিপরিচয় মনে রেখেও ব্যক্তি মানুষের বিশিষ্টতাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে রাজনীতি উপরিতলে নয়, গভীরে রহমান। তাঁর প্রথম দিককার নাটকগুলিতে গণনাট্যের রাজনৈতিক ভাবাদর্শই নিঃসন্দেহে জয়যুক্ত হয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন ঃ

> ''গণনাট্যের বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব এবং তার অনুসরণে রচিত গণনাট্যগুলির সঙ্গে মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু', 'শিবের অসাধ্যি', 'সাজানো বাগান' অথবা 'নৈশভোজে' খুব একটা পার্থক্য নেই। গণনাট্য শিল্পী তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' কিংবা গণনাট্যের উত্তরাধিকারী বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবী গর্জনে'র সঙ্গে মনোজ মিত্রের 'নৈশভোজে'র দৃষ্টিভঙ্গিগত কোন বিরোধ চোখে পড়ে না।''[৪৩]

নাট্যকার উৎপল দত্তও 'চাক ভাঙা মধু'কে ব্রেখ্‌টের প্রতিবাদী থিয়েটারের উত্তরাধিকারী বলে

অভিনন্দিত করেছেন ঃ ''কার্ড-বাহী অনেক নাটকের চেয়ে এ নাটক আসল ব্রেখ্‌টের অনেক কাছাকাছি। ব্রেখ্‌টের যেটা মর্মবাণী তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর বিদ্রোহের ডাক, চাক ভাঙা মধু সেটিকে আত্মস্থ করে নিয়েছে।''[৪৪]

বাংলা নাটক এবং থিয়েটারের যে সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে তাতে কোনো একজন সচেতন নাট্যকারের পক্ষে রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি নিজের নাটককে রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে করবেন, অথবা নিজের রাজনীতিবোধকে ব্যবহার করে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণ করবেন — তা একান্তভাবে তাঁরই স্বাধীনতা। মনোজ মিত্র দ্বিতীয় ধারাটিকে গ্রহণ করে নিজের ভূমিকা পালন করেছেন। সামাজিক দিক থেকে দুটি ধারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশিষ্ট সমালোচক ঃ

> ''(মনোজ) মিত্রকে অরাজনৈতিক চেতনার নাট্যকার কখনই বলা যায় না, যদিও তিনি উৎপল দত্তের ন্যায় একজন মার্কসবাদী চেতনার নাট্যকার বা প্রয়োজক নন। মার্কসবাদী চেতনায় সমাজ বিশ্লেষণের নাট্যকাররা সাধারণত সোচ্চার রাজনীতির নাটক লেখেন, তাঁরা এক অর্থে রাজনৈতিক প্রচারের ভ্যানগার্ড, অ্যাজিটেটর। রাজনৈতিক থিয়েটারে অ্যাজিটেটরের যেমন গুরুত্ব আছে, তেমনই যেসব জীবনস্রষ্টা নাট্যকার বা শিল্পী রাজনীতিটাকে উপরিতলে না ধরে অন্তস্তলে ধরেন এবং মানবিক ও সামাজিক জীবনের দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই রাজনৈতিক মতাদর্শকে গভীর ব্যঞ্জনাবহ করে তোলেন, তাঁদের গুরুত্বটা কম তো নয়ই, বরং বেশি।''[৪৫]

মনোজ মিত্রের রাজনীতিচেতনার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ, যে মানুষ বহুমাত্রিক। সেই মানুষের জয় দেখানোই মনোজ মিত্রের লক্ষ্য। প্রত্যক্ষ দলকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রচারের চেয়ে মানবিক ও সামাজিক জীবনের গভীরে স্থিত এই রাজীনিতিচেতনার মূল্য কিছু কম নয় বলেই মনোজ মিত্রকে অন্যতম সেরা রাজনৈতিক নাট্যকার বলতে চেয়েছেন চন্দন সেন ঃ

> ''সবরকম ভন্ডামি, নষ্টামি, আধিপত্যবাদ আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ, তার সাধারণ জীবন আর অনিঃশেষ ভালোবাসার জয় যে নাটককার শুনিয়ে যাচ্ছেন গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে, শাস্ত্রজ্ঞ রাজনীতির পন্ডিত আর তাদের কূপমন্ডুক শিষ্যদের মঞ্চায়িত শ্লোগান আর পোস্টার ছাপিয়ে তিনিই বোধহয় আমাদের সেরা রাজনৈতিক নাটককারদের অন্যতম; জীবনের মতো রাজনীতির চেতনাও যাঁর কাছে কোন গন্ডিবাঁধা চারণ-ভূমিতে আটকে থাকে না।''[৪৬]

রাজনীতির চেয়ে তাঁর নাটকে তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বোধ, সেই বোধ সাধারণ মানুষকে জয়ী দেখতে চায়, প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ - শিবনাথ শাস্ত্রী - বিশ্ববাণী প্রকাশনী - কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ.২২৪

২) রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - বঙ্কিম রচনাবলী - দ্বিতীয় খন্ড - কামিনী প্রকাশালয় - ১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন - কলকাতা-০৯, পৃ.৮৩৪-৩৫

৩) নীলদর্পণ - সম্পাদনা ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু ও যতীন্দ্র সেনগুপ্ত - বিশ্বাস বুক স্টল - কোলকাতা-০৯ - ২০০১, পৃ.২১

৪) আধুনিকতার স্বরূপ ও লক্ষণ, বাংলা নাটকে আধুনিকতার কাল নির্ণয় - ড. দীপক চন্দ্র - বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩ - দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০১, পৃ.১৬

৫) ঐ, পৃ.১৭

৬) দৃষ্টিকোণ - ঐ, পৃ.৯-১০

৭) উপসংহার - ঐ, পৃ.২৭৯-৮০

৮) ঐ, পৃ.২৭৯

৯) ঐ, পৃ.২৭৭

১০) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন-কলকাতা - ০৯ প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ২০০১, পৃ.১৪

১১) 'চেষ্টা করে নাটককে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখব কীভাবে?' - সঞ্জয় সিংহ কর্তৃক গৃহীত মনোজ মিত্রর সাক্ষাৎকার।

১২) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৫

১৩) ব্যঙ্গের প্রয়োজন কী চাণক্য - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.৫২

১৪) ঐ, পৃ.৫২

১৫) ঐ, পৃ.৫২

১৬) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৫

১৭) নেকড়ে - মনোজ মিত্র - অপেরা - ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রীট - কোলকাতা-০৯ - বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ.৭৩

১৮) ঐ, পৃ.৬৩

১৯) ঐ, পৃ.৭১

২০) কিছু লোক কিছু নাটক - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৪

২১) ঐ, পৃ.১৫

২২) চাক ভাঙা মধু - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩, পৃ.৯

২৩) ঐ, পৃ.৩৯

২৪) ঐ, পৃ.৪৮

২৫) ঐ, পৃ.২১

২৬) ঐ, পৃ.২১

২৭) ঐ, পৃ.৩৫

২৮) নাট্যকার মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - এর ভূমিকা - পবিত্র সরকার, পৃ.৭

২৯) শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটিরামায়ণ' গ্রন্থের মুখবন্ধ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - অপেরা - শ্রাবণ ১৪১২,পৃ৭

৩০) শিবের অসাধ্যি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ.৩০৮

৩১) ঐ, পৃ.৩০৮

৩২) ঐ, পৃ.২৯৪

৩৩) ঐ, পৃ.৩১৭

৩৪) ঐ, পৃ.৩১৯

৩৫) নরক গুলজার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড -মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২,পৃ.১০৫

৩৬) আনন্দবাজার পত্রিকা - জুন, ১৯৭৭

৩৭) নরক গুলজার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৭২

৩৮) ঐ, পৃ.৭২

৩৯) নাটককার মনোজ মিত্র - জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস্ ১৯৯৩, পৃ. ৮৬

৪০) The tree haunted me - Manoj Mitra - PCP - 25.10.1986

৪১) মহাবিদ্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৪১০

৪২) মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগৎ - বিষ্ণু বসু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র -দ্বিতীয় খন্ড-এর ভূমিকা

৪৩) 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটিরামায়ণ' গ্রন্থের মুখবন্ধ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ.৭

৪৪) উৎপল দত্ত - এপিক থিয়েটার (১৯৭৩) পত্রিকা। মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ডের 'নাট্য পরিচিতি' অংশে উৎকলিত

৪৫) সুন্দরমের শোভাযাত্রা - নৃপেন্দ্র সাহা - গণশক্তি - ১১.০২.১৯৯২

৪৬) নাট্যকার মনোজ মিত্র ঃ ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ - চন্দন সেন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ডের ভূমিকা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩

পুরাণ-আশ্রিত নাটক

প্রত্যয়গত অর্থে 'পুরাণ' বলতে বোঝায় 'পুরাকালীন'। প্রকৃতপক্ষে পুরাণ হ'ল, অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। তবে সাধারণভাবে প্রাচীন কাহিনি বা উপাখ্যান, মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি, এমনকি প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলী ও প্রচলিত লোককথাও পুরাণ বলে গৃহীত হয়ে থাকে। অভিধান মতে, পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত – মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ ইত্যাদি আঠারোটি মহাপুরাণ। এছাড়াও রয়েছে আরো আঠারোটি উপপুরাণ। উনিশ শতকের বাংলাদেশে পৌরাণিক নাটক একটি মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। বাঙালি চরিত্রের ভক্তিভাবুকতা এবং দৈব বিশ্বাস এই ধরণের নাটকের আনুকূল্য করেছে। পুরাণ কাহিনিকে নাটকে রূপান্তরিত করার পক্ষে অনেকগুলি সমস্যা থাকলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী যে পৌরাণিক নাটকের জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ

> ''উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই যদিও বাংলা দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তার প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছিল কিন্তু ধর্মপ্রাণ বাঙালী তার পুরাণকে কখনই ত্যাগ করে নি। কৃত্তিবাস-কাশীরামদাসের রচনা উনবিংশ শতাব্দীর জীবনবেদ বলা চলে।''[১]

এসব নাটকে অভিধানিক অর্থের পুরাণের পরিবর্তে রামায়ণ-মহাভারত এবং প্রচলিত লোককথাকেন্দ্রিক লৌকিক পুরাণের ব্যবহারই বেশি হয়েছে। অলৌকিকতা এবং অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার, দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার, ভক্তিরসের অবাধ বিস্তার বাংলা পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিঃসন্দেহে বাংলা পৌরাণিক নাটকের প্রাণপুরুষ। কিন্তু এই ধারাটির সূচনা আরো অনেক আগে। বাংলায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'-কে পৌরাণিক নাটকই বলতে হবে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রুক্মিণীহরণ', মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', রাজকৃষ্ণ রায়ের দু'একটি নাটক প্রভৃতি প্রাক্-গিরিশ বাংলা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রাবণবধ', 'দক্ষযজ্ঞ', 'নলদময়ন্তী', 'চৈতন্য-লীলা', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'জনা', 'পান্ডবগৌরব' ইত্যাদি। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' ও 'নরনারায়ণ'ও উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক।

ভক্তিভাব বর্জন করে পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রকে আধুনিক বাস্তবের পটভূমিকায় সন্নিবেশিত করা শুরু হ'ল দ্বিজেন্দ্রলালের সময় থেকে। 'পাষাণী', 'সীতা' ও 'ভীষ্ম' নাটকে তিনি পুরাণকে উপস্থিত করেছেন বাস্তব প্রেক্ষাপটে। পুরাণের আধারে বাস্তব রস পরিবেশনের এই ধারাটি বিশেষ গতি লাভ করে রবীন্দ্রোত্তর যুগে। এ যুগে যাঁরা পুরাণভিত্তিক নাটক লিখলেন তাঁদের নাটকের সঙ্গে পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাটকের কোনো সাদৃশ্য নেই। পুরাণের ঘটনা বা চরিত্র গৃহীত হয়েছে কিন্তু ধর্মভাব প্রচার, দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ প্রভৃতি নাট্যকারের লক্ষ্য নয়। এসব নাটকে কখনো রাজনীতির রূপক হিসেবে পুরাণ ব্যবহৃত হয়েছে, কখনো বা পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কখনো পুরাণের নিন্দিত, অবজ্ঞাত ঘটনা বা চরিত্রকে নতুন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ আধুনিক জটিল জীবনকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করার জন্যই পুরাণ ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরণের পুরাণাশ্রিত নাটক রচনার সূত্রপাত বলা যেতে পারে মন্মথ রায় থেকে। তাঁর 'কারাগার' নাটক পৌরাণিক পটভূমিকায় পরাধীন জাতির তীব্র মুক্তিবাসনা। পুরাণের খলচরিত্র কংস এখানে নাট্যকারের সহানুভূতি লাভ করে

ট্রাজিক রস সংবেদনার আশ্রয়। 'দেবাসুর', 'সাবিত্রী', 'চাঁদসদাগর', 'সীতা', প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য পুরাণাশ্রিত নাটক। নাটক সবসময়ই যুগবৈশিষ্ট্য, দর্শকরুচি এবং রঙ্গমঞ্চের প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নাটকের সামাজিক গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ ''সমকালীন যুগ, সমকালীন অভিনেতা এবং সমকালীন দর্শকের মধ্যে সেতুবন্ধনই নাটকের দায়িত্ব — সে নাটক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি যে কোন কাহিনী-সঞ্জাত হোক না কেন।''[২] এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে রচিত একই ধারার নাটকে ভিন্নতা লক্ষিত হয়। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল বা দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক তাই মেলে না। প্রত্যেকেই নিজের যুগ ও দর্শকরুচির অনুকূল করে নাটক রচনা করেছেন। এই যুগরুচির পরিবর্তনের ফলেই বিশ শতকে পৌরাণিক নাটকের অবলুপ্তি ঘটল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায় প্রমুখ বিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত পৌরাণিক নাটকের ধারায় কিছু নাটক রচনা করলেও ক্রমশ যুগের চাহিদা হয়ে উঠতে থাকে সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। এই প্রেক্ষাপটে পৌরাণিক নাটকের অবলুপ্তির কারণ নির্দেশ করেছেন নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসকার ঃ

> ''বাংলার বিগত শতাব্দীর পৌরাণিক নাটক প্রধানতঃ বিশ্বাস ও ভক্তিরসাশ্রিত ছিল, আজ জাতির মন হইতে বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব দূর হইয়া গিয়া যুক্তিবাদের বিকাশ হইয়াছে। যুক্তিবাদের সম্মুখে পৌরাণিক আদর্শ টিঁকিয়া থাকিতে পারে না, সেইজন্য আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাটকের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।''[৩]

কিন্তু পুরাণপ্রীতি বাঙালির মজ্জাগত। গিরিশচন্দ্র যথার্থই বলেছিলেন, 'বাঙালির মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।' আজও পুরাণের আধারে যে কোনো বিষয়ের উপস্থাপনা বাঙালি পাঠক-দর্শকের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য হয়ে থাকে। তাই আধুনিককালেও অনেক নাট্যকার সামাজিক সত্য প্রকাশে পুরাণকে আশ্রয় করে থাকেন। আলঙ্কারিক লক্ষণ অনুসারে এগুলি পৌরাণিক নাটক নয়, এদের বলা চলে পুরাণ-নির্ভর নাটক। নতুন যুগের এই নাটক সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ঃ

> ''এগুলি পৌরাণিক নাটক নয়, এদের বলা চলে 'পুরাণ-নির্ভর নাটক'। সিদ্ধরসের নিখুঁত অনুসারী পৌরাণিক নাটক রচনা আর সম্ভব নয়। পুরাণের পরিচ্ছদে সমকালই সেখানে প্রতিষ্ঠা পায়, যেমন পাচ্ছে লোহার ভীম, কুরুক্ষেত্র, মারীচ সংবাদ, নরক গুলজার, শিবের অসাধ্যি ইত্যাদি নাটকে। উত্তরকালেও এমনই ভাবে আরো অসংখ্য পুরাণ নির্ভর নাটক লেখা হতে পারে যার নায়ক নায়িকা হয় অভিমন্যু, নয় মেঘনাদ কিংবা সীতা — অবশ্যই তাঁদের জীবন সমস্যার সঙ্গে ভবিষ্যতের মানুষের সমস্যা মিলবেই। এইভাবেই জন্ম নেবে নতুন পৌরাণিক নাট্যধারা।''[৪]

মনোজ মিত্রের নাট্যরচনার শিকড় প্রোথিত দেশজ মাটিতে। তাঁর যে কোনো নাটকই প্রবলভাবে সামাজিক কিন্তু সেই সামাজিক বিষয়কে তিনি প্রকাশ করেছেন দেশজ সংস্কৃতির বিভিন্ন আধারে। সে আধার কখনো পুরাণ, কখনো গ্রামীণ বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি কখনো বা কথকতার ভঙ্গি। পটভূমি হিসেবে তিনি পুরাণকে ব্যবহার করেছেন 'অশ্বত্থামা' (১৯৬৩ / ১৯৭২-৭৩), 'তক্ষক' (১৯৬৭), শিবের অসাধ্যি (১৯৭৪), 'নরক গুলজার (১৯৭৪), 'পুঁটি রামায়ণ' (১৯৮৯-৯০), 'যা নেই ভারতে' (২০০৫), 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৭), 'হনুমতী পালা বা মন্দোদরী হরণ' (২০০৯) নাটকে। এরমধ্যে 'শিবের অসাধ্যি', 'নরক গুলজার' এবং 'পুঁটি রামায়ণ'-এ সমকালীন সমাজ-

রাজনীতির প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে বলে এই নাটকগুলিকে 'রাজনৈতিক' বর্গের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। এই বর্গে আমরা প্রধানত আলোচনা করব 'অশ্বত্থামা', 'তক্ষক' এবং 'যা নেই ভারতে' নাটক তিনটির। ১৯৬৩ সালে রচিত এবং ১৯৭২-৭৩ সালে পুনর্লিখিত 'অশ্বত্থামা' নাটকের কাহিনিসূত্র সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতের 'সৌপ্তিক পর্ব' থেকে। গদাঘাতে ভগ্নোরু দুর্যোধন পড়ে আছেন কুরুক্ষেত্রের এক প্রান্তে। বুকে তাঁর প্রতিহিংসার দুরন্ত বাসনা। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং অশ্বত্থামা এসেছেন দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধনের বিলাপ এবং ভীমের অন্যায় আচরণের বর্ণনা শুনে উত্তেজিত অশ্বত্থামা একাই পাণ্ডববিনাশের সংকল্প করেছে। নিশীথ-অভিযানে কৌরব সেনাপতি পদে বৃত হয়েছে অশ্বত্থামা। রাত্রির অন্ধকারে তিন বীর চললেন পাণ্ডব শিবিরের দিকে। কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ঃ

"... হেন কর্ম না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিৎ।।"[৫]

এই পরামর্শে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অশ্বত্থামা। জন্মাবধি অন্নদাতা দুর্যোধনকে তুষ্ট করতে তিনি পাণ্ডবসংহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ — হোক তা অন্যায় যুদ্ধে। পাণ্ডবের শিবির রক্ষা করছেন স্বয়ং মহাদেব। যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করতে না পেরে অশ্বত্থামা মহাদেবের স্তব করলেন। প্রীত মহাদেব পাণ্ডবপুরী রক্ষার একবছরের শর্ত পূরণ হয়েছে বলে অশ্বত্থামাকে দ্বার ছেড়ে দিলেন, সঙ্গে দিলেন নিজের খড়্গ। সেই খড়্গের আঘাতে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে মুণ্ডচ্ছেদ করলেন দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের। পরম উল্লাসে ছিন্নশির নিয়ে এসে যখন দেখালেন দুর্যোধনকে, তখন নির্বংশ হবার শোকে দুর্যোধন দেহত্যাগ করলেন।

মহাভারতীয় এই কাহিনীকে সামান্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নাটকে গ্রহণ করেছেন মনোজ মিত্র। আধুনিক নাটক বলেই মহাদেব কর্তৃক পাণ্ডবের দ্বাররক্ষা এবং অশ্বত্থামার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের অলৌকিক ঘটনাটি এড়িয়ে গেছেন। তার পরিবর্তে পাণ্ডবদের শিবিরে অসতর্কতার কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন তাঁদের শোকরজনী পালনকে। বর্ণনামূলক মহাকাব্যের কাহিনিকে করে নিয়েছেন দ্বন্দ্বমূলক নাটকের উপযোগী। এই দ্বন্দ্বমুখরতা প্রধানত চরিত্র-আশ্রয়ী। মহাভারতে কৃপাচার্য অশ্বত্থামার সৈনাপত্য গ্রহণের কোনো বিরোধিতা করেন নি। কৃতবর্মার সঙ্গে তিনিও সংগ্রহ করে এনেছেন অভিষেকবারি। কিন্তু সেখানে ইঙ্গিত ছিল কৃপাচার্যের ভিন্ন ভাবনার। অশ্বত্থামা নিদ্রিত পাণ্ডবদের হত্যার পরিকল্পনা করলে তিনি বাধা দিয়েছেন। সদসৎ ভাবনা তাঁর চরিত্রে ছিল, আর ছিল অশ্বত্থামার প্রতি ভালোবাসা। এই ইঙ্গিতের সুযোগ নিয়ে মনোজ মিত্র কৃপাচার্যকে স্থাপন করেছেন আধুনিক শাসকশক্তির যুদ্ধবাসনার বিপ্রতীপে। শাস্ত্রজীবী এই ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সারাজীবন অন্নদাতা দুর্যোধনের সঙ্গ দিয়েছেন — কুরুবংশের স্বার্থরক্ষা করেছেন। কুরুক্ষেত্রের আকাশ-বাতাস যখন মৃত্যুর নিঃশ্বাসে ভারী তখন তিনি অশ্বত্থামাকে নিয়ে পাণ্ডবের মার্জনা ভিক্ষা চাইতে যেতে চেয়েছেন অথবা বহুদূরে কোথাও নিভৃত কুটিরের শান্ত আশ্রয়ে অশ্বত্থামাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। অশ্বত্থামার সৈনাপত্য গ্রহণের বিরোধিতা করেছেন তিনি। দীর্ঘ ধ্বংসলীলার শেষে বিপুল শক্তিকে আহ্বান করেছেন সৃজন-স্বপ্নের দিকে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির হননেচ্ছার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে সে স্বপ্ন। অশ্বত্থামাকে নিশীথ-অভিযানের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। বুঝেছেন, রাজার অন্ন সত্যিই গুরুপাক। সে অন্নের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আর বিষক্রিয়া গলা টিপে ধরে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার। যাঁর স্বপ্ন দেখে সুস্থ সবল মানব সমাজের, শাসকের ইচ্ছায় তাঁদের হাতেই ধ্বংস হয় ভবিষ্যৎ। রাজার পালিত ঘাতক যে কোনোদিন মহান ধর্মকে চূর্ণ করতে পারে না — নাটকের শেষে এই বার্তা ঘোষিত হয়েছে কৃপাচার্যের কণ্ঠে।

কৃতবর্মা মহাভারতে নির্বাক চরিত্র। নাট্যকার মনোজ মিত্র এই চরিত্রটিকে কৃপাচার্যের সৃজনভাবনার বিপরীতে ধ্বংসের প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। রাষ্ট্রশক্তির সহায়ক এই চরিত্রের মাধ্যমেই ঘোষিত হয়েছে রাষ্ট্রের আদেশ। সে আদেশের সঙ্গে কখনো মিশে গেছে ব্যক্তিগত ইচ্ছাও। অশ্বত্থামাকে কৃপাচার্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করে যুদ্ধে উদ্বোধিত করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন কৃতবর্মা। অশ্বত্থামাকে নিয়ে তাঁর এবং কৃপাচার্যের টানাপোড়েন নাটককে গতিমুখর করেছে। রাজানুগত্য এবং সেই সূত্রে রাজকীয় ক্ষমতার আংশিক আস্বাদন কৃতবর্মা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পান্ডবনিধনে ক্ষুদ্র ভোজ রাজ্যের রাজা হয়েও যে তার ভূমিকা থাকছে – এই ভেবে তিনি উল্লসিত। অশ্বত্থামা যতবার হতাশায় ভেঙে পড়েছে কিংবা কৃপাচার্য তাঁকে উদ্বোধিত করেছেন শান্তির বাণীতে, ততবার কৃতবর্মা তাঁকে উত্তেজিত করেছেন যুদ্ধে, তাঁর মধ্যে জাগিয়েছেন ধ্বংসের উদ্দীপনা। রাজা দুর্যোধনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই এই নাটকে – রাজার প্রতিভূরূপে আছেন কৃতবর্মা। রাষ্ট্রের পক্ষে তিনিই চেয়েছেন প্রতিদান ঃ ''অনাহারে শুকিয়ে একবস্ত্রে ঐ শিশুপুত্রের হাত ধরে দাঁড়াননি কুরুরাজের দুয়ারে হাত পেতে? ... কে আশ্রয় দিয়েছিল ... কে অন্ন দিয়েছিল ... কে দুবেলা শাস্ত্রপাঠের সুযোগ দিয়েছিল আপনাদের।''[৬] এভাবেই যুগে যুগে রাষ্ট্র কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সাধকের কাছে চেয়েছে প্রতিদান। উশুল করেছে অন্নের মূল্য। কৃতবর্মা সেই শাসক শক্তির সহায়ক যাঁরা সব কিছুকে বিচার করেন স্বার্থের মাপকাঠিতে। কৃতবর্মা চতুর, কূটকৌশলী। কৌশলে তিনি পান্ডবশিবিরের অসতর্ক অবস্থার কথা জেনে নিয়েছেন কৃপাচার্যের কাছে আর সেই সংবাদে অশ্বত্থামাকে প্রলুব্ধ করে প্রবৃত্ত করেছেন যুদ্ধে।

মহাভারতের অশ্বত্থামা চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। প্রথম থেকেই সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মুখ। কিন্তু নাটকের অশ্বত্থামা তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ। এই দ্বন্দ্বই চরিত্রটিকে ট্রাজিক করেছে – আধুনিক নাটকের উপযোগী করেছে। অনন্যসাধারণ বীর অশ্বত্থামা এমন সময় কৌরব সেনাপতির দায়িত্ব পেয়েছে, যখন তাঁর আর কিছুই করার নেই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য এই চারজনের পর পঞ্চম কৌরব সেনাপতি অশ্বত্থামার সঙ্গী কেবল কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা। দায়িত্ব নিশীথ-অভিযানের, পঞ্চপাণ্ডব সংহারের। যুদ্ধের প্রথমদিন তাঁকে সেনাপতি করলে ফল অন্যরকমও হতে পারত। কিন্তু তখন জুটেছে শুধুই উপেক্ষা। অশ্বত্থামা অভিমানী হয়েছে, তবু আজীবন থেকেছেন কৌরব-অনুগত, দুর্যোধনের রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু আজ কুরুক্ষেত্রের মহারণের অন্তিমপর্বে হিসেব যে তাঁর মিলছে না। আঠারো দিনে আঠারো হাজার মানুষ হত্যা করেও মূল লক্ষ্য যে আজও অধরা – পাণ্ডব এখনও জীবিত। আবার দুর্যোধনকেও তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। সারাজীবন কি কেবল ভুল করে গেলেন? বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা রাজশক্তিকে রক্ষা করতে না পেরে গ্লানিজর্জর, কুরুক্ষেত্রে সহস্র বক্ষের অকারণ রক্তপাতে অনুতপ্ত, একবারও প্রকৃত লক্ষ্যে আঘাত হানতে না পেরে হতাশ, অন্তত একবার সাফল্যের জন্য লোলুপ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এই শেষলগ্নে একদিকে দুর্যোধনের প্রতিনিধি কৃতবর্মা তাঁকে যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন, অন্যদিকে মাতুল কৃপাচার্য তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন নির্জন নিভৃত জ্ঞানতপস্যার শান্ত আশ্রয়ে। কোন্ দিকে যাবে সে – এই দ্বন্দ্বেই মহাভারতের অশ্বত্থামা হয়ে উঠেছে আধুনিক জটিল জীবনের সংক্ষুব্ধ চরিত্র। কখনো ভেবেছে, কৌরব বা পাণ্ডব কোনো রাজদ্বারেই আর কৃপাভিক্ষা করবে না, মাতুল কৃপাচার্যকে নিয়ে চলে যাবে দূর নির্জনে। গুল্মলতায় কুটির বাঁধবে, দুরন্ত শীতে কদম গাছের নিচে আগুন জ্বালবে, শৈলচূড়া থেকে আনবে দ্রাক্ষাফল, বনে বনে শিকার করবে কচি হরিণ, বৃদ্ধ

সজারু। সন্ধ্যাবেলায় কৃপাচার্যের পায়ের কাছে বসে শুনবে 'ভূলোক দ্যুলোক নভোমন্ডল আর জীবনের অগাধ সব রহস্যকথা', সব রক্ত মুছে ফেলবে, নীরবে নিভৃতে অশ্রুপাত করে ধুয়ে দেবে দু'চোখের অন্ধতা। কিন্তু ঘাতক শাসক কেন সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে দেবে তার পালিত ঘাতককে? তাই স্বপ্নাবেশের পর মুহূর্তেই কৃতবর্মা অসতর্ক পাণ্ডবশিবিরের সংবাদ দিয়ে অশ্বত্থামার মধ্যে জাগিয়ে তোলেন সাফল্যের জন্য লুব্ধতা। সেই যে শৈশবে দুর্যোধন তাঁর কুলনাশ করে ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়ে বুকে এঁকে দিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের রক্ততৃষ্ণা — আজ উপযুক্ত অবসরে জিহ্বা বিস্তার করেছে সেই তৃষ্ণা। সারাজীবন যে সাফল্যের সন্ধান সে করেছে, আজ তার সুযোগ। বিভ্রান্তির আর কোনো অবকাশ নেই। শোকমগ্ন পান্ডবেরা নিরস্ত্র, ধ্যানমগ্ন। একসঙ্গে পাওয়া যাবে পাঁচজনকে। চকিতে জেগে ওঠে অশ্বত্থামার ক্রমাগত ব্যর্থ হতে থাকা সাফল্যলুব্ধ মন। প্রস্তুত হয় সে নিশীথ-অভিযানের জন্য। রাতের অন্ধকারে পান্ডব শিবিরে ঢুকে ছিন্ন করে পঞ্চশির। উপহার দিতে আনে দুর্যোধনকে। কিন্তু কৃপাচার্য আবার জাগান দ্বন্দ্ব। কে শত্রু, কেন শত্রু? যে পান্ডবেরা ধর্মরাজ্য গড়তে চেয়েছে তাঁরা কেন হবে অশ্বত্থামার শত্রু? শৈশব থেকে ভুল শত্রু চিনিয়েছে শাসকশক্তি। পান্ডবদের ওপর নিজের কোনো রোষ তো ছিল না অশ্বত্থামার। সে কেবল রাজার বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করেছে মাত্র। এবার অশ্বত্থামার মানসদ্বন্দ্ব — তবে কি এতদিন সে স্বজনবধ করল? আজন্ম যা সত্য বলে জেনেছে, আজ কৃপাচার্যের কথায় যখন তা মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে তখন অশ্বত্থামা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। শত্রু-মিত্র, ভালো-মন্দ জ্ঞান তাঁর গুলিয়ে যাচ্ছে। শক্তি চাইছে সে চিরদিনের আশ্রয় দুর্যোধনের কাছে ঃ ''মহারাজ, আমাকে উদ্ধার করো ... আমি বড় একা। ... তুমি আমাকে ঘিরে থাকো। দূর করো যত লজ্জা সংশয় ভয় ... শক্তি দাও।''[৭] এই আশ্রয় না পেলে লুপ্ত হয়ে যায় অশ্বত্থামার অস্তিত্ব। এখানেই তাঁর ট্র্যাজেডি। এতদিন যাঁকে ধ্রুব বলে জেনে নিজের প্রাণপাত করেছে, আজ দেখছে তার স্বার্থান্ধ রূপ। আর যাঁদের জেনেছে শত্রু বলে — তাঁদের মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছে স্বজনকে। এই নিরালম্ব অবস্থায় শাসককে আঁকড়ে ধরেই সে শক্তি পেতে চেয়েছে, বিবেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শেষবারের মতো ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছে। রাজাকে বলেছে ঃ

> ''বলো মহারাজ, এই শেষ রক্ত! ... আর হিংসা নয়, আর ধ্বংস নয় — এবার সৃজন! ... বলো মহারাজ, এই ধরিত্রীর তৃণমূলে জল দেব। তাকে লালন করব! অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে ..''[৮]

কিন্তু আবারও যে ভুল! পঞ্চপাণ্ডবের পরিবর্তে সে হত্যা করেছে তাঁদের পাঁচ শিশুপুত্রকে। অশ্বত্থামার নিদারুণ ট্রাজিক উচ্চারণ ঃ ''ভুল! ভুল! আবার ভুল করেছি আমি ... অন্ধ! অন্ধ! আমি ভীষণ অন্ধ!''[৯] নিজের অজ্ঞাতেই অশ্বত্থামা হয়ে গেছে 'নরঘাতী যৌবন'।

মনোজ মিত্র নিজেই বলেছেন যে, বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর আছে কিন্তু দলীয় রাজনীতিতে আস্থা নেই। প্রত্যক্ষ রাজনীতির আঁচ তাঁর নাটকে তাই কম। তবে সাধারণভাবে রাজনীতির স্খলন-পতনের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁর নাটকে দেখা যায়। মনোজ মিত্রের যে সামান্য কয়েকটি নাটকে সমকালীন প্রত্যক্ষ রাজনীতির ছায়াপাত ঘটেছে বা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে 'অশ্বত্থামা' তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এই নাটকের অনেক অংশই সমানভাবে শাসকশক্তির বিরোধী। কারণ রাষ্ট্রশক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সব যুগেই মোটামুটি এক। ১৯৭২-৭৩-এ পুনর্লিখিত এই নাটকে সাতের দশকে

পশ্চিমবঙ্গের উত্তাল রাজনীতির ছায়া আছে। পুরাণের অশ্বত্থামাকে অবলম্বন করে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, সমকালের শাসক শ্রেণির অনুগত বাঙালি যুবকের চিত্তের উদ্‌ভ্রান্তি। শাসকের প্ররোচনায় ভুল হয়ে গেছে শত্রু-মিত্র বিচার। ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা লুপ্ত – শুধু নির্বিচারে আদেশ পালন করে যাওয়া। নিজের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করতে যৌবনকে কাজে লাগিয়েছে শাসকশক্তি, তাকে করে তুলেছে 'নরঘাতী'। যে যৌবন ভাঙাচোরা পৃথিবীতে বলিষ্ঠ মানবসমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিল, সেই যৌবনকে শাসকশক্তি চালিত করেছে বিপথে। যে শক্তি ছিল এই নতুন পৃথিবী গড়ার কারিগর, শাসকের প্ররোচনায় সেই স্বজনকেই হত্যা করেছে অশ্বত্থামার মতো ট্রাজিক যৌবন। এই ব্যর্থ যৌবনের হাহাকারে ভারী হয়ে আছে নাটক, যেমন ভারী হয়েছিল সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে ঃ ''শত্রু চিনি না! শত্রুকে আঘাত করতে পারি না! শেষ মুহূর্তে ভুল করি! একটা দৃষ্টিহীন বিশাল খড়্গ কাঁধে আমি জনারণ্যে ঘুরপাক খাই।''[১০] সমকালীন রাজনীতি সমাজে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল তার ছবি এঁকেছেন মনোজ মিত্র রূপকের অকারে। কুরুক্ষেত্র উঠে এসেছে সমাজ-বাস্তবতার ক্ষত বুকে ধারণ করে ঃ

''কৃপ ।। ... অশ্বত্থামা, কুরুক্ষেত্রে কাতারে কাতারে মৃতদেহ ...

অশ্ব ।। নিরন্তর বন হতে পিপীলিকার সারি ফেলে ...

কৃপ ।। বেরিয়ে আসছে শৃগাল কুকুর ...

অশ্ব ।। আকাশে শকুনি ... কৃষ্ণকায় উল্কা ...

কৃপ ।। মহাভোজ ... দেশ জুড়ে আজ মহাভোজ। ষট্‌বিংশতি সহস্র মানুষ।

অশ্ব ।। অকারণ ... কী অকারণ রক্তপাত।''[১১]

ক্রমাগত ভুল মানুষ হত্যা করে করে ক্লান্ত যৌবন আজ আত্মঘাতী হতে চায়। এই যৌবন আদর্শের প্রতি অনুগত ছিল, আদর্শের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। কিন্তু আদর্শের মধ্যেই যখন দেখেছে স্বার্থান্ধতা, তখন নিরালম্ব হয়ে পড়েছে। দুর্যোধনের সহায়তা নিঃস্বার্থ ছিল না, অনুগ্রহের বিনিময়ে সে কিনতে চেয়েছে আনুগত্য। মাতুল কৃপাচার্য অশ্বত্থামার দৃষ্টি উন্মোচিত করেছে, তাকে জানিয়েছে, রাজার অন্ন কখনো নিঃশর্ত হতে পারে না। আদর্শের এই স্খলন বিভ্রান্ত করেছে অশ্বত্থামাকে। কিন্তু তবু আদর্শকে ছেড়ে যেতে পারে না সে। শাসক দুর্যোধনের হাতে ব্যবহৃত যৌবন অশ্বত্থামা, কিন্তু যখন সে তা উপলব্ধি করে তখন অনুতাপই হয় একমাত্র সম্বল। রাষ্ট্রের পালিত এই ঘাতকবাহিনীর উল্লেখ সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতাকেই স্মরণ করায়। এই ঘাতকবাহিনীর বিনাশ অনিবার্য বলে আশা প্রকাশ করেছেন নাট্যকার এবং কপিধ্বজ রথে পান্ডবদের আগমনবার্তার মধ্যে দ্যোতিত করেছেন বামপন্থী আদর্শ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতকেই। অর্থাৎ এই নাটকে মনোজ মিত্র পুরাণকে ব্যবহার করেছেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা থেকে মুক্তির তাগিদে এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিষ্ঠার বাসনায়। কৃপাচার্যের সংলাপে সেই অভিপ্রেত বক্তব্যেরই প্রকাশ ঃ

''ঘাতক আমরা, রাজার পালিত ঘাতক ... আমাদের সাধ্য কি কৃতবর্মা, মহান ধর্মকে চূর্ণ করি। যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে – অধর্মের বিনাশে! ... ঐ কপিধ্বজ রথে দ্যাখো গান্ডীবধারী অর্জুন! নাশ করবে ... নাশ করবে এই ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের! মহাকালের বিচার! মুক্তি নেই ... আমাদের মুক্তি নেই ...''[১২]

ধর্মযোদ্ধাদের হাতে ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের বিনাশ এবং তারপর এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা করেছেন মনোজ মিত্র।

এই নাটকে সংলাপ রচনায় আশ্চর্য সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। মহাভারতীয় গাম্ভীর্য যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। ভাষা হয়েছে ওজস্বিনী। কৃপাচার্যের আক্ষেপ, কৃতবর্মার চাতুর্য এবং অশ্বত্থামার ট্রাজিক হাহাকার প্রকাশে এই নাটকের সংলাপ অতুলনীয়। কতগুলি জায়গায় নাট্যসংলাপ কাব্যসৌরভমন্ডিত। যেমন কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা যখন দুই বিপরীত দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন অশ্বত্থামাকে ঃ

"কৃপ ।। চলে এসো অশ্বত্থামা ...

অশ্ব ।। ... বেলা ডুবে যায় গোধূলি হারায় ... আঁধার ঘনায় শিলায় শিলায় ...

কৃত ।। আঁধার ... আঁধার নামছে! প্রশস্ত লগ্ন ...

অশ্ব ।। শৈলচূড়ে গুল্মলতায় ...

কৃপ ।। আঁধার ঘনায় পেঁচার চোখে ...

অশ্ব ।। রাত্রি নামে নদীর কূলে ... বৃক্ষশাখায় ... চরাচরে ..."[১৩]

এধরণের সংলাপ মঞ্চের মায়াময় প্রতিবেশে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন চরিত্রের কন্ঠে উচ্চারণে অপূর্ব নাট্যমুহূর্তে সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এই সংলাপ পাঠ্যনাটক হিসেবেও নাটককে সার্থক করে তোলে। দীর্ঘ অনাবশ্যক ভুল রক্তপাতের পর অন্তত একটি সার্থক লক্ষ্যভেদের জন্য অশ্বত্থামার তীব্র আকুলতা ঃ "একটা পাহাড় — কয়েকটা পতিত শস্যক্ষেত্র আর একটা শূন্য জনপদ পার হতে পারলে আমার সাফল্য! সঠিক শিকার! একটা রাত্রি! রাত্রিশেষে মুছে যাবে আমার সমস্ত অকীর্তি।"[১৪] আবার অশ্বত্থামা যেখানে কৃতবর্মাকে বর্ণনা দিচ্ছেন পান্ডবসংহারের ঃ

"অশ্ব ।। দেখি পাঁচ ভাই শ্রান্ত ক্লান্ত পাশাপাশি শুয়ে ...

কৃত ।। ঘুমায় ওরা?

অশ্ব ।। ঘুমায় ওরা, বর্মবিহীন সংজ্ঞাহীন শিথিল বেশবাস ...

কৃত ।। শিয়রে প্রদীপ ...

অশ্ব ।। জ্বলে না প্রদীপ, একটিও ধূপ ... শিয়রে তাদের খোলা বাতায়ন ...

কৃত ।। বাহিরে জ্যোৎস্না?

অশ্ব ।। কোমল জ্যোৎস্না লুটায় তাদের বাজুপরে আর কেশদামে ...

কৃত ।। হ্যাঁ হ্যাঁ ...

অশ্ব ।। মন্দ বাতাস বহিছে সেথা, থরথর ভাসে বনযূথিকার বাস ...

কৃত ।। বাহিরে ঝিল্লি?

অশ্ব ।। বাহিরে ঝিল্লি নীরব হলো! মিলায় জ্যোৎস্না ... হারায় দৃষ্টি ... কোথা গেল চলি
সিক্ত যূথীর বাস ..."[১৫]

ক্রিয়াপদের সামান্য স্থান পরিবর্তনে এবং সুনির্বাচিত শব্দের ব্যবহারে গদ্যসংলাপ এখানে কাব্যময়তায় উত্তীর্ণ। গোটা নাটক জুড়েই এধরণের সংলাপের বিপুল আয়োজন। কখনও তা বিশ্লেষণ করেছে চরিত্রের অন্তর্লোক, কখনো উদ্ভাসিত করে তুলেছে রক্তস্নাত ভারতবর্ষের স্বরূপ। কেবল সংলাপ নয়, এই নাটকের মঞ্চনির্দেশগুলিও অপূর্ব সাহিত্যগুণমন্ডিত। মনোজ মিত্র যেন বিস্মৃত হয়েছেন, তিনি অভিনেয় নাটক লিখেছেন, না গল্প-উপন্যাস-কবিতার মতো পাঠ্য সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। এর ফলে নাটকটি পাঠ করার সময় সংলাপের গাম্ভীর্যের সঙ্গে মঞ্চ নির্দেশের যথাযোগ্য সঙ্গত অপূর্ব স্বাদুতার সৃষ্টি করে। যেমন, নাটকের সূচনায় ঃ

> ''তখন গোধূলিবেলা। দিগন্তে উজ্জ্বল হলুদ আলো। প্রান্তরের মাঝখানে একটি যুদ্ধরথ দাঁড়িয়ে ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। ... কৃপের বিস্ফারিত দৃষ্টি সম্মুখে দূরদূরান্তে স্থির, অনিমেষ। কৃতবর্মাও নীরব নিশ্চল ভয়ার্ত। চরাচর নিঃশব্দ।''[১৬]

এ নিছক মঞ্চনির্দেশের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বস্থিত পরিবেশ ও চরিত্র ব্যাখ্যা। মঞ্চনির্দেশে মনোজ মিত্র যখন লেখেন ঃ ''দিঙ্‌মন্ডলের আলোকে অশ্বক্ষুরের পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলি উড়ছিল — রাশি রাশি স্বর্ণচূর্ণ যেন।''[১৭] তখন তিনি যেন মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করেন আসন্ন সন্ধ্যায় ভগ্নোরু দুর্যোধনের কাছে অশ্বত্থামার আগমনকে। মঞ্চনির্দেশে একেবারে পাঠ্য সাহিত্যের মতো উপমাও ব্যবহার করেন তিনি। যেমন ঃ ''অশ্বত্থামা অভিমানী সর্পের মতো বড় বড় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে থাকে।''[১৮] নাটকের মঞ্চরূপেই কথা নিশ্চয়ই খেয়াল থাকে না তাঁর, যখন তিনি নিবিষ্ট মনে লেখেন ঃ ''নেপথ্যের একাধিক যুদ্ধাশ্বের হ্রেষারব ঘনায়মান অন্ধকারকে ভারী করে তুলছিল।''[১৯] নিশীথ পর্বের সূচনাটি তো ঠিক যেন একটি ছোটগল্পের প্রথম কয়েকটি বাক্য ঃ

> ''তখন মধ্যরাত্রি। ঘনঘোর তমসা। প্রান্তরে পরিত্যক্ত রথখানির ভিতরে মৃদু আলো জ্বলছিল। তারই আলোছায়ায় চতুর্ধার চিত্রিত। দিগ্বলয়ে বিন্দু বিন্দু তিনটি মশাল জ্বলে উঠতে দেখা গেল। ক্রমে অশ্বক্ষুরধ্বনি ভেসে এলো। তিনটি বেগবান তুরঙ্গম মধ্যনিশীথ প্রকম্পিত করে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করছিল। রথের মধ্যে নিদ্রা টুটলো সেই অদৃশ্য রথী দুর্যোধনের। তার চেতনা দলিত মথিত করে অশ্বগুলি এগিয়ে আসছে।''[২০]

এইভাবে অভিনেয় নাটক একই সঙ্গে পেয়েছে পাঠ্য নাটকের গৌরব। পুরাণকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে স্থাপন করায়, আধুনিক মানুষের হৃদয়যন্ত্রণা প্রকাশে, দূষিত রাজনীতির প্রভাবে মানবতার লাঞ্ছনার করুণ চিত্রাঙ্কনে, বিষয়োপযোগী ভাষার ব্যবহারে 'অশ্বত্থামা' হয়ে উঠেছে মনোজ মিত্রের একটি সার্থক সৃষ্টি।

নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের বৈশিষ্ট্যই হ'ল — নাট্যভাবনায় একটা বিষয় যখন এল, তখন তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একাধিক নাটকে ব্যবহার করা। এভাবেই তিনি ১৯৬৭ সালে পুরাণ আশ্রয় করে আবার লিখলেন একাঙ্ক নাটক 'তক্ষক'। মহাভারতের আদিপর্বে শৃঙ্গী কর্তৃক মহারাজ পরীক্ষিৎকে শাপদান এবং তার প্রতিক্রিয়া এই নাটকের বিষয়। 'অশ্বত্থামা'য় পুরাণ ব্যবহৃত হয়েছিল সমকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আঘাত করতে, তাই সেখানে ছিল রাজনীতির প্রত্যক্ষ উত্তাপ। কিন্তু 'তক্ষক' নাটকে জীবন-সম্পর্কিত বিশেষ এক দর্শনকে তিনি প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুর আলোকে দেখেছেন জীবনকে। জেনেছেন, মৃত্যুর চেয়ে জীবন অনেক বড়, অনেক মহান। এই নাটকের দ্বন্দ্ব জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত জয়ী হয় জীবন, আর মৃত্যু তার পায়ের কাছে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে।

মহাভারতীয় কাহিনীর খুব বেশি পরিবর্তনের প্রয়োজন এখানে হয়নি। দু'একটি ইঙ্গিতকে বিস্তৃততর করেছেন মাত্র। মৃগয়ায় গিয়ে আহত হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে তৃষ্ণার্ত রাজা পরীক্ষিৎ এসে পৌঁছেছেন ঋষি শমীকের তপস্যার স্থানে। বারংবার ডেকেও ঋষির ধ্যান ভাঙাতে ব্যর্থ, পিপাসায় কাতর রাজা অধৈর্য হয়ে একটি মরা সাপ ঝুলিয়ে দেন ঋষির গলায়। ঋষিপুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দেয়, সাতদিনের দিন তক্ষকের দংশনে মৃত্যু হবে রাজার। ঋষি ধ্যানভঙ্গের পর কুপিত হন নিজের সন্তানের প্রতি – কেন সে শাপ দিল ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অতিথিকে? পিতাপুত্রের ভাবনাগত এই বিরোধের যে আভাস মহাভারতে ছিল, মনোজ মিত্র তাকে বিস্তৃততর করে দু'জনকে উপস্থিত করেছেন জীবন এবং মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে। ঋষির কন্ঠে তুলে দিয়েছেন শাশ্বত বাণী ঃ ''পুণ্যার্জনই সব নয় শৃঙ্গী, পুণ্য রক্ষা করতে শেখো!''[২১] রাজা তৃষ্ণার্ত জেনে শৃঙ্গী অনুতপ্ত হয় কিন্তু ব্রহ্মশাপ সে ফিরিয়ে নেবে না কিছুতেই। তাঁর অনুরোধে শমীক মায়াসরোবর সৃজন করলেন রাজার পথে, সৃজন করলেন ঝর্ণা, তন্ত্রিপালের মাধ্যমে পাঠালেন সুমিষ্ট ফল কিন্তু ততক্ষণে রাজার মধ্যে শুরু হয়ে গেছে মৃত্যুভয়। সরোবরের সবুজ তৃণাঙ্কুরকে তাঁর মনে হ'ল তক্ষক, বহতা ঝর্ণাকে মনে হ'ল তাঁর দিকে ছুটে আসা বিষধর সাপ, তন্ত্রিপালের নিঃস্বার্থ সেবাকে সন্দেহ করলেন, মন্ত্রিও রেহাই পেলেন না তাঁর সন্দেহ থেকে। অবশেষে সারথি তন্ত্রিপাল শেখালো রাজাকে জীবন-উপভোগের তত্ত্ব। ব্রহ্মশাপ সত্য হলেও তো মৃত্যু আসবে সপ্তম দিনে। তার আগে ছ'ছটা দিন – ছ'ছটা সমুদ্রে প্রাণ ভরে বাঁচা কেন নষ্ট করবেন? কেন মরার আগে মরবেন? রাজা শিখলেন মৃত্যুর ওপর জয়ী হবার মন্ত্র। যখনই মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ঘুরে দাঁড়ালো জীবন, তখন জ্বালা শুরু হ'ল মৃত্যুর। জীবনের কাছে এই পরাজয় সে মেনে নিতে পারে না। শৃঙ্গী তাই রাজাকে মুক্তি দিতে চায় ব্রহ্মশাপ থেকে, তক্ষকের দংশন নিতে চায় নিজের ব্রহ্মতালুতে। কিন্তু রাজা তো আর জিততে দেবেন না শৃঙ্গীকে – জিততে দেবেন না মৃত্যুকে। তিনি যে জেনেছেন ঃ ''মৃত্যুকে ভয় করে বাঁচা যায় না ... প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, আঘাত করে তাকে পরাজিত করে তবেই না জীবনকে ভোগ করা যায় ...''[২২] শৃঙ্গীর অভিশাপে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেই এই বোধ জেগেছে রাজার। জীবন-উপভোগের এই সুযোগ তিনি হারাতে চান না। মৃত্যুকে তিনি আহ্বান করছেন প্রসন্ন চিত্তে ঃ ''মিনতি করি, সাতদিনের দিন সহস্র ফণার ভয়ংকর সাজে সজ্জিত হয়ে তুমি দেখা দাও।''[২৩] জীবন যখন মৃত্যুকে ভয় পায় না তখন মৃত্যু বড় অসহায়। সেই অসহায়তা দেখা গেছে শৃঙ্গীর মধ্যে। পরীক্ষিতের পায়ে আছড়ে পড়ে সে ক্ষমা ভিক্ষা করছে ঃ ''ক্ষমা করো ... ক্ষমা করো পরীক্ষিৎ ... আমি হেরে গেছি ... দয়া করো! দয়া! দয়া!''[২৪] পরীক্ষিৎ জয় করেছেন মৃত্যুকে, তাই তাঁর ''পায়ের কাছে একটা তক্ষক ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে .. হতভাগ্য নিজের বিষে জ্বলছে আর ছটফট করছে।''[২৫]

প্রথম জীবনে দর্শনের ছাত্র এবং পরে অধ্যাপক মনোজ মিত্রের দার্শনিক সত্তাই এখানে প্রধান। নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তিনি এখানে জীবন-মৃত্যুর স্বরূপকে বিশ্লেষণ করেছেন। দেখেছেন, মৃত্যু হ'ল জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। বুঝেছেন ঃ ''সেই তো মূর্খ, যে সেই পরিণতিকে মানে না – আবার সেই তো কাপুরুষ যে তার ভয়ে ভীত হয়।''[২৬] মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়, বরং জীবনের পরিপূরক – এই ভাবনাই এখানে রূপায়িত। পরিপূর্ণ জীবন উপভোগের পর অনিবার্য মৃত্যুকে মেনে নেওয়াই পৌরুষ। যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তার ভাবনায় জীবনের দিনগুলিকে অনাবশ্যক বিস্বাদ করার কোনো কারণ নেই। নাট্যকার মনোজ মিত্রের এই জীবনভাবনা প্রকাশ পেয়েছে সারথি তন্ত্রিপাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মহাভারতে এই চরিত্রটি ছিল না। নাট্যকারের সৃজনী ভাবনায় এই চরিত্র স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। 'সারথি' হয়েই সে

রাজাকে দেখিয়েছে জীবনের পথ। শমীক এবং শৃঙ্গী চরিত্র দুটি এই নাটকে জীবন এবং মৃত্যুর রূপকে উপস্থিত করেছে। শমীকের সৃষ্টির মাঝে বারবার ধ্বংসের মূর্তিতে হানা দিয়েছে শৃঙ্গী। তাঁদের কথোপকথনে গভীর দার্শনিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ

"শৃঙ্গী ।। তুমি জীবন ... তুমি স্থিতি! আমি তক্ষক ... আমি মরণ। মহাপ্রলয়! এ অরণ্য যে বিরাট রহস্যময় বিশ্বের প্রতীক পিতা! পিতা, পিতা, পরীক্ষিৎ এসব দেখেছে?

ঋষি ।। (চমকে) কী সব?

শৃঙ্গী ।। জীবন-মৃত্যুর এই রূপ?

ঋষি ।। শৃঙ্গী!

শৃঙ্গী ।। তাদের এক রূপ? তারা যে আলাদা কিছু নয় ... তারা অভিন্ন এক দেহে লীন ...

ঋষি ।। শৃঙ্গী!

শৃঙ্গী ।। পিতাপুত্রে আমরা জীবন-মৃত্যু! সে কি দেখেছে, মৃত্যু জীবনেরই সন্তান। সে কি পেয়েছে জীবনমৃত্যুর এই রহস্য উন্মোচন করতে?"[২৭]

'অশ্বত্থামা' নাটকের সাফল্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করতে না পারলেও এই নাটকের সংলাপও বিষয়বস্তু এবং তত্ত্বভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মহাভারতীয় গাম্ভীর্য মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সংলাপ তো যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। যেমন, তপস্যারত ঋষি শমীকের কাছে তৃষ্ণার্ত পরীক্ষিতের আর্তি ঃ "অটল অচল ক্ষুধাতৃষ্ণাজয়ী মহাত্মা, বলো ... আমাকে বলো ... কেমন করে মানুষ প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে ওঠে ... কেমন করে বুকের তৃষ্ণাও তুচ্ছ করা যায়!"[২৮] অথবা তন্ত্রিপালের নিঃস্বার্থ সেবাকে ষড়যন্ত্র মনে করে পরীক্ষিতের সংলাপ ঃ "রাজার শিরে সহস্র ফণা সে তো শুধু নাগনাগিণী তোলে না ... তোলে সহস্র লোভী প্রজা ... সন্দেহ, হিংসা, ঘৃণা, প্রতারণা, ভয় ... পাঁচটি পোষা কবুতর ... হস্তিনার প্রাসাদচূড়ায় বসে রাত্রিদিন বকম্ বকম্ করে।"[২৯]

এসব সংলাপ নাটকের পাঠ্যগুণ যথেষ্ট বাড়িয়ে তুলেছে। অভিনয়ের সময় মঞ্চেও এধরণের সংলাপ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে সার্থক হয়ে থাকে। সংলাপের মতই এ নাটকের মঞ্চনির্দেশগুলিও সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ, কখনো বা সংলাপের চেয়ে বেশিই। যেমন, নাটকের সূচনায় ঃ "অন্ধকারে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। ক্ষুরধ্বনি কখনো সতেজ উচ্চরোল, কখনো দূরাগত।"[৩০] শেষ দৃশ্যের সূচনায় মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ "শৃঙ্গী ও ঋষি। তাদের থমথমে মুখচোখে বুকের মাঝে উথাল পাথাল ঝড়ের ইঙ্গিত। তাদের নিঃশব্দ দ্রুত পদচারণায় তীব্র উত্তেজনা। সমগ্র পরিবেশ দুর্বোধ্য রহস্যজালে ঘেরা।"[৩১] গাম্ভীর্যপূর্ণ সংলাপের পাশাপাশি এ ধরণের মঞ্চনির্দেশ নাটক পাঠের সময় এক রমণীয় স্বাদুতা সৃষ্টি করে।

'যা নেই ভারতে' (২০০৫) নাটকের কাহিনিবীজ সংগৃহীত হয়েছে মহাভারত থেকে, কিন্তু সেই কাহিনির ফাঁকফোকরে ছায়া ফেলেছে সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং চরিত্রসমূহ। মহাভারতের যে মহান ভাবটি প্রায় সিদ্ধরসে পরিণত, মনোজ মিত্র সেই ভাবটিকে ভেঙেচুরে যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছেন, সেখানেও পুরুষতান্ত্রিকতা, শাসকের যুদ্ধপ্রিয়তা, বর্ণভেদ-সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রভৃতি সবই ছিল আজকের পৃথিবীর মতোই। পুরাণকে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করতে গিয়ে মহান ভীষ্ম প্রতিভাত হয়েছেন যুদ্ধবাজ, ক্ষমতাপ্রিয় রাজনীতিক হিসেবে, আর ধৃতরাষ্ট্র হয়ে উঠেছেন শান্তিকামী শাসক। কঞ্চুকী এবং পাতকিনীর মতো কাল্পনিক অথচ সম্ভাব্য চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি তাদের সাহায্যে ভেঙে দিয়েছেন মহাভারতীয় গাম্ভীর্য। ভীষ্ম, ব্যাস প্রকৃতি চরিত্রের বিভিন্ন আচরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী করে কঞ্চুকী ধরিয়ে দিয়েছে তাদের অন্যতর পরিচয়টি। আর পাতকিনীর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে রাজবাড়ির কলঙ্ককাহিনি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর লাঞ্ছনা সেকালের মতোই সত্য একালেও। তাই অম্বিকার সংলাপে আমরা শুনি সর্বকালের মানবীর স্বর ঃ ''ভীষ্ম পারে না, পারতে হবে অম্বিকাকে! যত দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে নারীকে। তার বেলা পঙ্কে পতন নয়! স্বর্গের ঐশ্বর্যের প্রত্যাশী সে হতে পারে না! যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে হবে তাকে?''[৩২] এই নারীকেই রাজবংশ রক্ষার কারণে ভীষ্মের নির্দেশে শয্যাসঙ্গিনী হতে হয় ব্যাসদেবের। অথচ ব্যাসদেব নয়, তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ ছিল ভীষ্ম। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা এখানে মূল্যহীন, কারণ পুরুষের দৃষ্টিতে সে কেবল বংশরক্ষার উপায়, পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র। নারীত্বের এই অবমাননা যেমন মহাভারতে ছিল, তেমনি আছে আধুনিক ভারতেও। ভীষ্ম-নিয়ন্ত্রিত কুরুবংশের মধ্যে মনোজ মিত্র দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে। এই শক্তি গান্ধার রাজ্য বিধ্বস্ত করে গান্ধারীকে লুণ্ঠন করে এনেছে আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত গান্ধারকে পুনর্গঠিত করার নামে সেই রাজ্যের ওপর নিজেদের অধিকার কায়েম করেছে। আধুনিক বিশ্বে শক্তিধর রাষ্ট্র এভাবেই সাহায্যের নামে নিজেদের 'উপনিবেশ' গড়ে বিভিন্ন দেশে। নারী তাই উদ্যত প্রতিশোধ গ্রহণে। পান্ডু নির্বীর্য, গান্ধারী নিজের জরায়ু বিনষ্ট করে নির্বংশ করবে কুরুবংশ, প্রতিশোধ নেবে নিজের পিতার ছোটো রাজ্যের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের। পান্ডু সিংহাসন ত্যাগ করে স্ত্রী-দের নিয়ে বনবাসী হয়েছে, তাই ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসেছে। সিংহাসনে বসেই সে নিষিদ্ধ করেছে অশ্বমেধ, বন্ধ করতে বলেছে যুদ্ধ। ভীষ্মের যুদ্ধপ্রিয়তার বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে শান্তির বাণী। নতুন ভাবনায় উদ্বোধিত ধৃতরাষ্ট্র স্পষ্ট বলেছে ঃ ''অশ্বমেধ কোনো যজ্ঞই নয়। ওটা অবাধ লুণ্ঠনের একটি শাস্ত্রীয় পন্থা মাত্র''[৩৩] কিন্তু ভীষ্ম, যে ভীষ্ম সংসারও করে না, রাজত্বও করে না, যুদ্ধ ছাড়া তার করণীয় আর কী আছে? তাই নিজের যুদ্ধবাসনা চরিতার্থ করতে সে ব্যগ্র হয়। সিংহাসন সে নেবে না, কিন্তু সিংহাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। তাই পান্ডুর সন্তানদের বরণ করে নেওয়া হয় কুরুপুরে। মনোজ মিত্র ভারতকাহিনিরই সূত্রের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যায় প্রশ্ন জানিয়েছেন পান্ডবদের অস্তিত্ব নিয়ে ঃ

> ''দেবতার তত্ত্বটি চমৎকার। একটাই খটকা, দেবতারা যদি ক্রন্দনে সাড়াই দিলেন, তা হলে পান্ডুর ক্রন্দনে সাড়া দিয়ে তার অক্ষমতাই তো দূর করতে পারতেন। সেটাই হত দেবতার পক্ষে শোভনসুন্দর। তা না করে নিজেরাই সন্তানদান করতে গেলেন কেন? দেবতাদের কি একটু চতুর লাগছে না ভগবান?''[৩৪]

এই ঘটনাকে নাট্যকার ব্যাখ্যা করেছেন দুই বিপরীত ভাবনার দ্বন্দ্ব হিসেবে। একদিকে রয়েছে যুদ্ধবাজ রাজনীতিকরা, অন্যদিকে অবহেলিত, প্রান্তিক মানুষের ঐক্যবোধ। এই ব্যাখ্যা প্রকাশিত ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে ঃ

> ''আমরা একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের শিকার। যাঁরা আমাকে কোনোদিন সিংহাসনে দেখতে চান নি, আজও মেনে নিতে পারছেন না ... যাঁদের পেশিশক্তি আর অস্ত্রশক্তির গৌরব আমি কেড়ে নিচ্ছি ... ঐ অজ্ঞাতকুলশীল বালকগুলিকে দাঁড় করিয়েছেন তাঁরা!''[৩৫]

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, চক্রান্ত প্রতিরোধের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকেও বাহিনী গড়তে হয়। সেই বাহিনী গড়ে ওঠে রাজধানীর অদূরে বেড়ে ওঠা রাজবাড়িরই উচ্ছিষ্ট জংলি মানুষদের নিয়ে।

ভারতকাহিনির আধারে মনোজ মিত্র যে আসলে সমকালীন ভারত তথা বিশ্বপরিস্থিতির কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট হয়েছে নাটকের একাধিক ইঙ্গিতে। যুদ্ধ এবং শান্তির যে দুই বিপরীত দর্শনের দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন তা আধুনিক পৃথিবীরই দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেভাবে পররাজ্য লুণ্ঠন ও গ্রাস করে, ধ্বংসের পর পুনর্গঠনের নামে সেই দেশে স্থায়ী ঘাঁটি গাড়ে, তা প্রদর্শিত হয়েছে গান্ধার রাজ্য আক্রমণের মধ্যে। আধুনিক ভারতের সমাজে শ্রেণিবিভেদ এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে ঃ

> ''আমি বংশের সুবিধা ে গ করি, তুমি বঞ্চিত। আর সমাজের সব বঞ্চিত অংশ যেমন ক্ষোভ যন্ত্রণা লুকিয়ে অধিক মাত্রায় মূলস্রোতে লগ্ন থাকতে চায়, সর্বক্ষণ প্রমাণ করতে চায় সে কতো বিশ্বস্ত, কতো ঐতিহ্যানুগত, কতো তৃপ্ত, কৃতার্থ – তুমিও তাই বিদুর।''[৩৬]

বঞ্চিত মানুষকেই চিরকাল প্রমাণ করতে হয় নিজের বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য, সুবিধাভোগী শ্রেণির সেই দায় নেই। রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণে মনোজ মিত্রের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একাধিক নাটকে। আলোচ্য নাটকেও সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে ঃ

> ''আমি তো বুঝতে পারছি না, তপস্যা ছেড়ে দল বেঁধে সহসা তাঁরা নগরীতে হানা দিচ্ছেন কেন? রাজকার্যে মুনিঋষির হস্তক্ষেপ রাজ্যটাকে উচ্ছন্নে পাঠাবে। শীঘ্র ওঁদের গিরিগুহায় ঢুকে যেতে বলুন ...। অন্যথায় বিতাড়িত হবেন।''[৩৭]

মনোজ মিত্র বলতে চান, এই হস্তক্ষেপ সেকালেও কল্যাণ করে নি, একালেও ভালো করতে পারে না।

'অশ্বত্থামা' এবং 'তক্ষক'-এর মতো এই নাটকের সংলাপেও রক্ষিত হয়েছে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য। সূচনার মঞ্চনির্দেশেই সেই গাম্ভীর্য প্রকাশিত – 'অন্ধকারে ছায়ামূর্তি সঞ্চরমান।' কিন্তু সর্বত্র এই গাম্ভীর্য ইচ্ছে করেই রক্ষা করেন নি নাট্যকার। কারণ, তিনি ভারতকাহিনির খোলসে আসলে ভরে দিতে চেয়েছেন সমকালীন ভারতকেই। বিশেষত কঞ্চুকী এবং পাতকিনীর সংলাপ প্রাত্যহিকতার কাছাকাছি। এদের মাধ্যমেই নাট্যকার মহাভারতের মহান ভাবটিকে চূর্ণ করেছেন। একদিকে মহাভারতের চরিত্রগুলির সংলাপের গাম্ভীর্য, অন্যদিকে কঞ্চুকী-পাতকিনীর সাধারণ সংলাপ নাটকে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। এই দু'রকমের সংলাপের দ্বারা সৃষ্ট নাট্যরসের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নোদ্ধৃত অংশটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

"ভীষ্ম ।। কী হল, প্রভাত না হতে কীসের কোলাহল ? গান্ধাররাজ সুবল নিজের প্রয়োজনেই এখানে অবস্থান করছেন ! যুদ্ধবিধ্বস্ত গান্ধাররাজ্য গড়ে তুলতে তিনি আমাদের সাহায্যপ্রার্থী । এতে তোমাদের বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না । যাক্ । তোমরা সবাই আছো ... অম্বিকাও আছো ... ভালই হল । কদিন ধরে একটা কথা ভাবছি । পুত্রেরা বড় হয়েছে, রাজ্যের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে । এবার বোধহয় শাসনভার ওদের হাতে তুলে দিয়ে আমার মতো প্রবীণের সরে দাঁড়ানোই ভাল ।

কঞ্চুকী ।। নিশ্চয় ভাল । বোধহয় কেন, অবশ্যই ভাল । যে ব্যক্তি পণ করেছে কোনোকালে কোনো অবস্থাতেই রাজমুকুট মাথায় তুলবে না ... তার পক্ষে বছরের পর বছর অন্যের হয়ে রাজত্ব করার যে কী বিড়ম্বনা ... (ভীষ্মের পাশে এসে চোখ মটকে) সত্যি ছাড়বে ? নাকি আরও কিছুদিন যেমন চলছে চালাবে ?

ভীষ্ম ।। না । আর না । বড় দীর্ঘকাল চালানো গেল । আমার তো ক্লান্তিও আসতে পারে কঞ্চুকীমশাই ...

কঞ্চুকী ।। আসতে পারে কি, আসা উচিত । না এলে বুঝতে হবে -- তোমার কোনো অভিসন্ধি আছে । সত্যি বলতে কি, রাজা না হয়েও তুমি যতকাল রাজত্ব করলে, এতটা কিন্তু রাজা হয়েও লোকে করে উঠতে পারত না ! (চোখ মটকে) সব ছেড়ে দেবে, নাকি কিছু কিছু হাতে রাখবে ?"[১৩৮]

ভীষ্মের সংলাপ ত্যাগের যে মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, কঞ্চুকীর সংলাপ টেনে বের করছে তার ভেতরকার কৌশলটিকে, মহত্ত্বের আবরণে ঢাকা অগৌরবটি ।

এই তিনটি নাটকের পটভূমি পুরাণকথা, কিন্তু মনোজ মিত্র সেই পুরাণের আধারে প্রকাশ করেছেন সমকালীন সমাজসত্য এবং দর্শনভাবনা । যে কারণে তিনি নাটকে ইতিহাসের পটভূমি বা রূপকের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন, পুরাণ-নির্ভরতাও সেই একই কারণে । এ যেন সমকালকে একটু দূরত্বে স্থাপন করে দেখা এবং সমকালকে চিরকালের সঙ্গে লগ্ন করে দেওয়া ।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক - পুস্তক বিপণি - ২৭ বেনিয়াটোলা লেন - কলকাতা-০৯ - দ্বিতীয় সংস্করণ - বৈশাখ ১৪০০, পৃ.২৬৫-৬৬

২) ঐ, পৃ.২৬৫

৩) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খন্ড) - আশুতোষ ভট্টাচার্য - ১৯৬১ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক' গ্রন্থে উৎকলিত

৪) বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক, পৃ.২৭২

৫) সৌপ্তিক পর্ব - মহাভারত - কাশীরাম দাস - অক্ষয় লাইব্রেরী - শ্রাবণ ১৩৯৩

৬) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, অগ্রাহায়ণ ১৪০১, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ.৬২

৭) ঐ, পৃ.৭৮

৮) ঐ, পৃ.৭৮

৯) ঐ, পৃ.৭৯

১০) ঐ, পৃ.৬১

১১) ঐ, পৃ.৬১

১২) ঐ, পৃ.৭৯

১৩) ঐ, পৃ.৬৮-৬৯

১৪) ঐ, পৃ.৭০

১৫) ঐ, পৃ.৭৪

১৬) ঐ, পৃ.৫৫

১৭) ঐ, পৃ.৫৫

১৮) ঐ, পৃ.৬৩

১৯) ঐ, পৃ.৭০

২০) ঐ, পৃ.৭২

২১) তক্ষক - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪০২, পৃ.৪২৫

২২) ঐ, পৃ.৪৩৮

২৩) ঐ, পৃ.৪৩৮

২৪) ঐ, পৃ.৪৩৮

২৫) ঐ, পৃ.৪৩৮

২৬) ঐ, পৃ.৪৩৫

২৭) ঐ, পৃ.৪৩৬-৩৭

২৮) ঐ, পৃ.৪২৩

২৯) ঐ, পৃ.৪৩৪

৩০) ঐ, পৃ.৪১৯

৩১) ঐ, পৃ.৪৩৫

৩২) যা নেই ভারতে - মনোজ মিত্র -মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ.৯

৩৩) ঐ, পৃ.৩২

৩৪) ঐ, পৃ.৩৯

৩৫) ঐ, পৃ.৩৯

৩৬) ঐ, পৃ.৪০

৩৭) ঐ, পৃ.৩৯

৩৮) ঐ, পৃ.১৯

ইতিহাসের পটে লেখা নাটক

ঐতিহাসিক নাটক নাটকের বিষয়গত অন্যতম বিভাগ। সাধারণভাবে বলা চলে, যে নাটকের বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে গৃহীত, তাই ঐতিহাসিক নাটক। সমালোচকের ভাষায় ঃ ''ইতিহাসের কোনো ঘটনা বা কাহিনি, যথা, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রনায়কের উল্লেখযোগ্য কোনো বৃত্তান্ত ইত্যাদি নিয়ে লেখা নাটকই ঐতিহাসিক নাটক।''[১] কেবল বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে গৃহীত হলেই হবে না, দেখতে হবে সেই বিষয়বস্তুতে নাটকের উপযোগী দ্বন্দ্ব আছে কিনা। ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারকে ইতিহাসের তথ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়; বর্ণিত কালের উপযোগী ভাষা, আচরণ এবং পোষাক যথাযথ রক্ষা করতে হয়, ইতিহাসসখ্যাত চরিত্রকে কোনোভাবেই বিকৃত করার অধিকার তাঁর নেই। ইতিহাস যেখানে নীরব বা অস্পষ্ট, কেবল সেখানেই তিনি কল্পনার আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু সেই কল্পনাকেও হতে হয় সম্ভাব্যতার সূত্র-অনুসারী। ঐতিহাসিক চরিত্রের মানবিক পরিচয়ের প্রকাশও ঐতিহাসিক নাটকে প্রত্যাশিত। অনৈতিহাসিক চরিত্রকে নাট্যকার ইতিহাসের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে স্থাপন করতে পারেন। ইতিহাস থেকে নাটকের উপাদান গ্রহণ করা হলে তার প্রকৃতি কেমন হবে, অর্থাৎ ইতিহাস ও নাটকের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মন্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক ঃ

> ''যা সত্যি সত্যি ঘটেছে তা বর্ণনা করাই কবির কাজ নয়, বরং যা ঘটা সম্ভব বা অনিবার্য তার বর্ণনা করাই কবির কাজ। কবি আর ঐতিহাসিকের পার্থক্য এই নয় যে একজন পদ্যে লেখেন আর একজন লেখেন গদ্যে ... আসল পার্থক্য হল যে একজন বলেন যা ঘটে গেছে তার কথা, আর একজন বলেন তার কথা যা ঘটা সম্ভব। এই জন্যই কাব্য ইতিহাসের চেয়ে বেশি দার্শনিক এবং বেশি গভীর কারণ ইতিহাস বলে নির্দিষ্ট তথ্যের কথা, আর কাব্য বলে সার্বজনীন সত্য।''[২]

বাংলা নাটক বিশেষ বিশেষ কালপর্বে বিশেষ উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে আশ্রয় করেছে। সে উদ্দেশ্য কখনো নবজাগরণের কালে অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, কখনো পরাধীন জাতির হৃদয়যন্ত্রণা প্রকাশ করে স্বাধীনতার জন্য উদ্দীপনা সঞ্চার। প্রাথমিকভাবে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলি লেখা হয়েছে ইতিহাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদৌল্লা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি' প্রভৃতি সব নাটকেরই কাহিনি গড়ে উঠেছে কোনো না কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রে রেখে। কিন্তু আধুনিককালে দেখা গেছে ইতিহাসের বিচিত্র ব্যবহার। কখনো প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে আঘাতে জর্জরিত করতে, কখনো অতীতের পটভূমিকায় স্থাপন করে আঘাতকে প্রত্যক্ষতার আঁচ থেকে দূরে স্থাপন করতে, আবার কখনো বা সম-সময়ে হাঁপিয়ে উঠে নিভৃত মানসমুক্তির প্রয়োজনে আধুনিক বাংলা নাটক অতীতচারী হয়েছে।

'শোভাযাত্রা' (১৯৯০) এবং 'দর্পণে শরৎশশী' (১৯৯১) কিংবা আরো একটু আগে 'কিনু কাহারের থেটার' (১৯৮৮) থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, মনোজ মিত্রের এবারের প্রবণতা পেছন ফেরার দিকে, শিকড় সন্ধানের দিকে। ১৯৮৮ সালের 'কিনু কাহারের থেটার' থেকে শুরু করে ১৯৯৭-৯৮ সালে রচিত 'ছায়ার প্রাসাদ' পর্যন্ত যেন শিকড় সন্ধানের দশ বছর। এর মাঝখানে অন্য ধারার নাটক

একেবারেই নেই এমন নয়, তবে এই পর্বে তাঁর প্রধান সৃষ্টিগুলিই ইতিহাস-আশ্রিত। সে ইতিহাস কখনো বাস্তব, আবার কখনো বা কাল্পনিক। কিন্তু কাল্পনিক হলেও সম্পূর্ণতই ইতিহাসের সম্ভাবনা-প্রসূত। এই পর্বে তাঁর প্রধান তিনটি সৃষ্টি 'গল্প হেকিমসাহেব' (১৯৯২-৯৩), 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫) এবং 'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭-৯৮)।

মনোজ মিত্রের নাটকে ইতিহাস-চর্চা ঐতিহাসিক নাটক রচনার সাধারণ কারণগুলির দ্বারাই পুষ্ট। নাটক রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে তিনি যাই ব্যবহার করুন না কেন, তাঁর লক্ষ্য সমকালীন সমাজ। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই মূলত তাঁর নাট্যরচনা। ফলে ইতিহাসের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন সমকালকে প্রতিফলিত করতেই। তিনি নিজেই এই কারণের কথা জানিয়েছেন একটি সাক্ষাৎকারে ঃ

> "বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীতচর্চা করেছি। নইলে আর পুরাতনে কী প্রয়োজন? কিছু একটা অনুসন্ধানের জন্যই মাটি খোঁড়াখুঁড়ি। ... শেকড় জ্যান্ত থাকলে, তাতে জলসিঞ্চন করা। তাকে জাগানো, বাড়ানো, ফুল ফলের স্বপ্ন দেখা।"[৩]

এই স্বপ্ন দেখা, এই অনুসন্ধান বর্তমানের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মানসিক বিশ্রাম পেতেই। আরও বাস্তব কারণের কথা বলেছেন তিনি একই সাক্ষাৎকারে ঃ

> "মানুষ কিন্তু পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার জন্যই ঘাঁটে না, তার প্রয়োজনে বর্তমানে লাগে বলেই সে অতীতকে টানে। অনেকসময় বর্তমানকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে ধরতে গেলে নানারকম চাপের মুখোমুখি হতে হয়। বাহ্যিক এবং মানসিক। এরকম একটা প্রয়োজন থেকেও নাট্যকার ফিরে যেতে পারেন অতীতে।"[৪]

এই বক্তব্যর সূত্রেই ইতিহাস লগ্ন হয়ে যায় বর্তমানের। সমকালের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তাপের আঁচকে কিছুটা সহনীয় করে তোলার জন্যই নাট্যকার ইতিহাসের ব্যবধান রচনা করেছেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে জমিদার, তালুকদার, তহশীলদার, পত্তনিদার প্রভৃতি অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর নিরন্তর শোষণে দেশে যখন বিষম আকাল, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এক নিঃস্বার্থ পরোপকারী হেকিমের গল্প 'গল্প হেকিমসাহেব' (১৯৯২-৯৩)। এরপর মনোজ মিত্র আবার ইতিহাস আশ্রয় করেন ১৯৯৫ সালে। লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে দেশীয় রাজার প্রাণান্তকর অবস্থা এবং রাজ্য ও বংশ রক্ষার্থে আদিম জনজাতির আশ্রয়গ্রহণ অবলম্বনে রচিত নাটক 'দেবী সর্পমস্তা'। এই দুই নাটকে তাঁর বিচরণ নিকট-অতীতে। কালগত ব্যবধান দেড়শ থেকে দুশো বছরের মধ্যে। কিন্তু এর পরের নাটকে তিনি বেছে নিলেন খ্রী. পূ. তৃতীয় শতকের এক অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যু এবং অশোকের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়কাল বিন্দুসারের রাজত্ব, যা ইতিহাসে খুব একটা উজ্জ্বল নয়। সেই অস্থির সময়ের নাট্যচিত্র 'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭-৯৮)।

ইতিহাস-আশ্রিত নাটক বা উপন্যাস দু'ভাবে রচিত হতে পারে। প্রথমত, ইতিহাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীকে মুখ্য ভূমিকায় স্থাপন করে আর দ্বিতীয়ত, অনৈতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করে ঐতিহাসিক চরিত্রকে অপ্রধান অংশে স্থাপন করে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ইতিহাসের বিশেষ সময়কালে

সাধারণ মানুষের জীবনের স্পন্দনটি ধরা সম্ভব। ইতিহাসখ্যাত চরিত্রের পরিবর্তনসাধন অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে নাট্যকারের কাঙ্ক্ষিত সত্যের প্রতিষ্ঠা অনৈতিহাসিক চরিত্রের সাহায্যেই বেশি সম্ভব। মনোজ মিত্র তাই এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই গ্রহণ করেছেন এবং ইতিহাসকে যুক্ত করে দিয়েছেন বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদারের আশ্রয়ে থাকা হেকিমের গল্পে তাই অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায় মানবকল্যাণের জন্য অসম সংগ্রামে লিপ্ত এক যোদ্ধাকে । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই হেকিমের মধ্যে দেখেছেন 'অগ্রগতির রুদ্ধ দরজার সামনে নিষ্ফল করাঘাতরত ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিনিধি'কে। ওয়ালী খাঁ বা পশুপতি পোদ্দার যে শোষকের সেই চিরন্তন সত্তা, যারা প্রজাকল্যাণ ততদূর পর্যন্ত বরদাস্ত করেন যতক্ষণ তা নিজেদের প্রতিস্পর্ধী না হয়ে ওঠে – সেকথাও ইতিহাসের আড়াল ঘুচিয়ে সহজেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সব যুগেই সামাজিক মানুষেরা যে একইভাবে নিগৃহীত হন ওয়ালী আর পশুপতিদের হাতে – 'গল্প হেকিমসাহেব' সেকথাই স্মরণ করায়। শিক্ষায় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসকের হাতে সত্যসন্ধানীর জুতো পেটা খাওয়া, ব্যর্থতা-হতাশা নিয়ে প্রতিভার দেশত্যাগ, বিশ্বজুড়ে কায়েমি স্বার্থের একই রূপ, প্রতিবেশী দেশে অন্তর্ঘাত প্রভৃতি একালের সমস্ত বিষয়কেই মনোজ মিত্র তুলে ধরেছেন দু'শো বছর আগেকার পটভূমিকায় ঃ ''মনোজ মিত্র সময়টাকে দেড়শ বছর পিছিয়ে রাখলেও বক্তব্যের স্পষ্টতায় ঋজুতায় অত্যন্ত আধুনিকমনস্ক''[৫] চিরন্তন এই শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনীকে তিনি ধরেছেন বাংলার প্রাচীন লোককথার আদলে । 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকের চিরন্তনতা মনে করায় রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি ঃ ''আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।''[৬] যে অত্যাচার সহ্য করেছিলেন সত্যসন্ধানী গালিলিও গালিলেই, হেকিমের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার তারই সমগোত্রীয়।

'দেবী সর্পমস্তা' নাটকের আশ্রয় কাল্পনিক ইতিহাস। 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতিতে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে আবদ্ধ সিংহগড়ের রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপ পড়েছেন 'স্বত্ববিলোপ নীতি'র খপ্পরে। রেসিডেন্ট সাহেবের স্ত্রী চান কুলদেবী সর্পমস্তার ১০৮টি মরকতখন্ডে গাঁথা মালা। একদিকে বংশের ঐতিহ্য, অন্যদিকে রেসিডেন্টের আব্দার না মানলে রাজ্যের সংকট। বিশ্বাসঘাতকতার ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারেই সেনাপতি ধনঞ্জয় ইংরেজের পক্ষে, তার লক্ষ্য সিংহাসন। পুরোহিত প্রভাকর শর্মা কিছুতেই সিংহগড়ের ঐতিহ্য তুলে দেবেন না ইংরেজের হাতে। একদিন গভীর রাতে দেবীর কণ্ঠহার আর নিজের কন্যা গৌরীকে নিয়ে তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করেন। সঙ্গ নেয় বিদূষক রঙ্গলাল। গিয়ে উপস্থিত হন বহু দূরবর্তী এক আদিবাসী গ্রামে, যে গ্রাম থেকে লোকেন্দ্রপ্রতাপের পূর্বপুরুষ হরণ করে এনেছিল দেবী সর্পমস্তাকে। প্রাণ বাঁচাতে প্রভাকর শর্মা গৌরীকে দেবী সর্পমস্তার মানবীরূপ বলে প্রচার করেন। সরল আদিবাসীরা সেকথা বিশ্বাস করে গৌরীকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা করে। এরপর দেবীর মানবায়নের গল্প, যা ইতিহাসের সঙ্গে ততটা সম্পৃক্ত নয়। এদিকে মালার ভাগ না পেয়ে হতাশ রঙ্গলাল ফিরে গিয়ে সংবাদ দিলে লোকেন্দ্রপ্রতাপ সসৈন্য আসেন মরকতমালা উদ্ধারে। সাঁওতাল আদিবাসীরা নিয়ে যেতে দেবে না মালা। নিয়ে যেতে দেবে না তাদের দেবীকে। নানা ঘটনা পরম্পরায় অবশেষে লোকেন্দ্রপ্রতাপ ইচ্ছেকে বিয়ে করে ফিরে পান লুপ্ত যৌবনশক্তি। সাহেবদের মুঠো থেকে সিংহগড় উদ্ধারে প্রাণ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় আদিবাসীরা। এই ইতিহাস কাল্পনিক কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যটি চিরন্তন।

'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭-৯৮)-এর কালপর্বকে অনেকটাই পিছিয়ে নিয়ে গেছেন মনোজ মিত্র। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর এবং অশোকের আগে বিন্দুসারের যে স্বল্পকালীন রাজত্বকাল অবক্ষয়ে চিহ্নিত সেই সময়কে তিনি মিলিযে দিয়েছেন সমকালের রাষ্ট্রব্যবস্থার অবক্ষয়ের সঙ্গে। সমালোচক এই নাটকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিশ শতকের একেবারে শেষ পর্বের ভারতবর্ষকে ঃ

> ''নাটকে উপস্থাপিত নানা বিষয়ে আমাদের সমকালকে আমরা চিনে নিতে পারি – স্বৈরাচার, অপশাসন, গুপ্তচর ও ঘাতকসমেত পুলিশরাজ, রাজনীতির ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতি, কুসংস্কার, জাতপাতের সমস্যা, দলিত জাগরণ, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশে সরকারি বাধা, নারীর অবমাননা, ডাইনি বানিয়ে নির্যাতন ইত্যাদি।''[৭]

এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস আর সমকাল এক বিন্দুতে এসে মিশেছে। সুদূর চন্দনা গ্রাম থেকে শুরু করে রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত সর্বত্রই কুসংস্কারের কালো ছায়া। অশিক্ষিত গ্রামবৃদ্ধ থেকে রাজা বিন্দুসার – সকলেই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। কুসংস্কারকে তারা ব্যবহার করেন সমস্যা থেকে প্রজার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। শ্মশান-ঠাকুর দ্বৈপায়নের পালিতা কন্যা সুভদ্রাঙ্গীকে তাই পিশাচিনী সাজিয়ে গ্রামছাড়া করা হয়। দ্বৈপায়ন নিজের কন্যা আর গোবৎস গচ্ছিত রাখে রাজার কাছে কিন্তু রাজা ব্যর্থ হন সাধারণ প্রজার সম্পদ রক্ষায়। সমাজের কুসংস্কারের ছায়া থেকে পাটলিপুত্রের প্রাসাদে এসেও কুসংস্কার, নির্যাতন থেকে সুভদ্রাঙ্গী রেহাই পায় নি। পুত্রকাম্য সুভদ্রাঙ্গীকে গ্রহণ করেছেন বিন্দুসার। নাটকের শেষে প্রিয়দর্শী অশোক যে সুভদ্রাঙ্গীর সন্তান এবং সে-ই যে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করবে – এই ইঙ্গিত আছে।

ইতিহাস-আশ্রিত এই তিনটি নাটকেই মনোজ মিত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চেয়েছেন একটিই কথা। তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে, একটি থিম অবলম্বনে একাধিক নাটক লেখা তাঁর অভ্যাস। আলোচ্য তিনটি নাটকে তিনি দেখিয়েছেন, সভ্যতার যা কিছু সম্পদ, তা রক্ষিত হয় সাধারণ মানুষদের দ্বারাই – তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, মন্ত্রহীনদের দ্বারাই। রাষ্ট্র বা শাসকশক্তি উচ্ছৃঙ্খলতায়, বৈনাশিক দর্পে যা ছড়িয়ে ফেলে, গুঁড়িয়ে ফেলে, পরম মমতায় তাকেই গুছিয়ে রাখে মন্ত্রহীনেরা। ইতিহাসের চাকাকে সচল রাখে তাঁরাই। 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটকে হেকিমের মহামূল্যবান আবিষ্কার কতটা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় কাজে লাগবে – তাই নিয়েই ব্যস্ত হয়েছে পশুপতি পোদ্দার এবং ওয়ালী খাঁ। যতক্ষণ হেকিম এবং তাঁর আবিষ্কার তাঁদের স্বার্থরক্ষা করেছে, ততক্ষণই হেকিম তাঁদের কারো কাছে 'বেটা', কারো কাছে 'ভাই'। শাসকস্বার্থের সঙ্গে প্রজাকল্যাণের সংঘাতে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে হেকিমকে। কোথাও জুতোপেটা, কোথাও পদাঘাত সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। যে 'সুবিদ্যা' আবিষ্কার করতে চেয়েছিল হেকিম, বৃহত্তর মানবকল্যাণের স্বার্থে কোনো তালুকদারই তার নিঃস্বার্থ আনুকূল্য করে নি বা সেই আবিষ্কার রক্ষা করতে চেষ্টা করে নি। বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে ব্যবহৃত হয় শাসকদের লড়াইয়ে, আপন চেতনায় বিশ্বাস স্থাপন করে এগিয়ে যেতে চাইলে কীভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় মানুষকে, এই নাটক সেই চিরন্তন ইতিহাসকেই স্মরণ করায়। যখন প্রত্যক্ষ আঘাত এসেছে ওয়ালী খাঁর শরীরে, জবাব দিয়ে গেছে পীরজাদা ডাক্তার, তখন তার মনে পড়েছে হেকিমের কথা, হেকিমের আবিষ্কারের কথা। কিন্তু তখন হেকিম হারিয়ে ফেলেছে পুঁথি, ভুলে গেছে ওষুধ তৈরির পদ্ধতি। এরপরই মনোজ মিত্র দেখান, ইতিহাসের চিরন্তন সত্য – হেকিমের পাশে এসে দাঁড়ায়

গঙ্গামণি আর ছায়েম। হেকিমের পোড়োভিটেতে ছায়েমের শুয়ে থাকা যেন সেই সুবিদ্যাকেই পাহারা দেওয়া। তারই হাতে পড়েছে হেকিমের তালপাতার পুঁথি। মনোজ মিত্রের নাটকের বৈশিষ্ট্য মেনেই তালুকদার ওয়ালী খাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছায়েমের প্রতিবাদ উচ্চকিত নয় -- চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ওয়ালী খাঁর মুখোমুখি কথা বলার সাহস ছায়েমের নেই, কিন্তু সে নীরবে সরিয়ে নিয়ে গেছে পুঁথি -- ওয়ালী খাঁর পক্ষে যে পুঁথি হতে পারত সঞ্জীবনী সুধা। একেবারে শেষে সেই পুঁথি নিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে হেকিমের কাছে। সুবিদ্যার আকর যোগ্য লোকের হাতে তুলে দিয়ে নিজেও হতে চেয়েছে পুণ্যের শরিক। গঙ্গামণিও এসে দাড়িয়েছে বিধ্বস্ত হেকিমের পাশে , তাঁকে উজ্জীবিত করেছে ঃ

> "ওঠেন হেকিম সাহেব। চলেন দাওয়াই বানাবেন না, দাওয়াই। চলেন আমি গাছতলায় চুলা খুঁড়ে দিচ্ছি। আপনি শুধু বসে বসে দাওয়াইটি বানিয়ে দিবেন, আমি মাথায় নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করে বেড়াব।"[৮]

ওয়ালী খাঁ হাকিমের গোলাপ বন্ধ করে বাঈজীকে খুশি করেন, আর গঙ্গামণিরা সুবিদ্যাকে রক্ষা করতে পরম নিষ্ঠায় ফোটায় রক্ত গোলাপ। দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারণ করে ঃ "আমি দিব না হতে বৃথা। চলেন পাত্রে জোছনা ধরব আমরা, ধরে রাখব! আকাশ দিগন্তে বিদ্যুতের ঝলকানি উঠলে, সেই ঝলকানিটিও ধরে রাখব।"[৯] এই বিদ্যুৎ ঝলকানির অন্যতর ইঙ্গিতেই শেষ হয়েছে নাটক। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক যে বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছিল, মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ই যখন বড় হয়ে উঠেছিল, তখন মনোজ মিত্র ইতিহাসের দূরত্বে সৃষ্টি করেলেন হেকিমের মতো চরিত্র, যে বিপন্ন মানুষের কোনো পরিচয় বিচার না করে হেঁকে ফিরেছে 'দাওয়াই চাই গো ... দাওয়াই'। এই দাওয়াই ধ্বস্ত মানবতাকে সুস্থ করার দাওয়াই। কালগত ব্যবধান সৃষ্টি করে একটু দূর থেকে মনোজ মিত্র এই নাটকে দেখেছেন সমকালের সমাজসত্যকে। সেই বিষয়টিই স্বীকৃতি পেয়েছে সমালোচকের দৃষ্টিতে ঃ

> "মনোজ মিত্রের নাটক 'গল্প হেকিমসাহেব' কিন্তু কোনও গল্পকথা বা হেকিম সাহেবের জীবনগাঁথাকে মঞ্চস্থ করেনি, তুলে ধরেছে এক অতি চেনা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বাস্তবতা। রূপক কাহিনীর আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক নিষ্ঠুর সত্য যা সমকালীন সমাজব্যবস্থার এক নিষ্ঠুর সত্যকে তুলে ধরে।"[১০]

'দেবী সর্পমস্তা' নাটকেও কাল্পনিক ইতিহাসের আশ্রয়ে ইতিহাসের চিরন্তন সত্য প্রকাশিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগে যুগে অন্ত্যজরাই আশ্রয় দিয়েছে, সেবা করেছে নাগরিক মানুষদের। রাজ্যহারা রামচন্দ্র পেয়েছিলেন নিষাদদের আশ্রয়, জতুগৃহে পান্ডবদের হয়ে পুড়ে মরেছিল নিষাদ মাতা ও তার পাঁচ পুত্র, রাজ হরিশ্চন্দ্রকে আশ্রয় দিয়েছিল চন্ডালেরাই। এই সেবা, আত্মোৎসর্গের প্রতিদানে নাগরিক মানুষের কাছে তারা পেয়েছে শুধু প্রবঞ্চনা। অন্ত্যেবাসী মানুষকে কোনোদিন মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করেনি কোনো শাসক। চিরন্তন সেই সত্য উচ্চারিত হয়েছে দেওয়ানের সংলাপে ঃ

> "মহারাজ এই বনচারী মানুষদের কোনওদিনই কি আপনি প্রজা বলে পালন করেছেন? রাজ্যের কোনও সুফল কি ভোগ করে এরা? ... এদের ওপর অভিমান বা ক্রোধ প্রকাশের অধিকার আছে কি আপনার, কিংবা বলপ্রয়োগের?"[১১]

নগর চিরকাল হরণ করেছে অন্ত্যজ মানুষের সম্পদ, সুযোগ নিয়েছে তাদের সরলতার। যাদবেন্দ্র সিংহ কর্তৃক দেবী সর্পমস্তার মূর্তি হরণ কিংবা প্রভাকর শর্মা কর্তৃক গৌরীকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা তারই

দৃষ্টান্ত। যুগে যুগে সঙ্কটাপন্ন নগর সভ্যতা সাহায্যের জন্য যখনই হাত বাড়িয়েছে অনার্য অসভ্য জাতির প্রতি তখনই তারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ঃ

> "রাজারা যখনই রাজ্য হারিয়েছেন, ছুটে এসেছেন এইখানে ... বনে জঙ্গলে অন্ত্যজ সমাজের দ্বারে। আমাদের ইতিহাস পুরাণ পরম্পরা তাই বলছে, সঙ্কটপন্ন নগর সভ্যতাকে রক্ষা করে আসছে বনপাহাড়। এটাই এদেশের শক্তি ... শক্তির ভান্ডার।"[১২]

দেবী সর্পমস্তা অন্ত্যজদেরই দেবী, লোকেন্দ্রপ্রতাপের পূর্বপুরুষ তাঁকে হরণ করে এনেছিলেন নগরে। আবার সেই দেবীর মরকতমালার ওপর যখন রেসিডেন্ট সাহেবের স্ত্রীর লুব্ধদৃষ্টি পড়ল, তখন সেই মরকতমালা নিয়ে প্রভাকর শর্মা আশ্রয় পেলেন সেই অন্ত্যজদেরই কাছে। লোভী ইংরেজ যখন লোকেন্দ্রপ্রতাপের রাজ্য গ্রাস করতে উদ্যত, তখন সিংহগড়ের স্বাধীনতা রক্ষায় তারা প্রাণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অবিনাশী এক পাপবোধ রাজাকে পরিণত করেছিল অক্ষম, ক্লীব মানুষে। তাকে যৌবনশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে অন্ত্যজকন্যা ইচ্ছা। স্বত্ববিলোপ নীতির ফাঁড়া কেটেছে। যুগে যুগে নাগরিক মানুষ বারবার ঠকিয়েছে তাদের, কার্যসাধনের পর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু তবু তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় নি, চরম বিপদের দিনে বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের প্রসারিত হাত — রক্ষা করেছে সভ্যতাকে, সচল করেছে ইতিহাসকে।

'ছায়ার প্রাসাদ' সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রে রেখে ইতিহাসের পটচিত্র অঙ্কন। ঐতিহাসিক চরিত্র বিন্দুসার-চাণক্যের পাশাপাশি নাট্যকার মনোজ মিত্র এই নাটকে স্থাপন করেছেন অনৈতিহাসিক চরিত্র দ্বৈপায়নকে। এই চরিত্রটি অনৈতিহাসিক কিন্তু ইতিহাসের সম্ভাবনা-প্রসূত। অবক্ষয়ী রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা কীভাবে বিপর্যস্ত হয়, তাদের নিরাপত্তা কীভাবে বিঘ্নিত হয় তা-ই দেখিয়েছেন নাট্যকার এই নাটকে। সমালোচক তাই এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন ঃ "মনোজ মিত্রের সৃজনী কল্পনার বিচিত্র বিন্যাসে তবু মানুষের ইতিহাস নয়, মূর্ত হয়ে উঠেছে ইতিহাসের মানুষ।"[১৩] প্রতিটি দৃশ্যের সূচনায় ছোটো ছোটো ছড়ার আকারে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, যা দৃশ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়কে নির্দেশ করে। ইতিহাসের যে দোর্দন্ডপ্রতাপ চাণক্যকে আমরা দেখেছি, নাটকের চাণক্য তার ছায়ামাত্র। বৃদ্ধ, অশক্ত সেই চাণক্যকেই বিন্দুসারের ভয়, কারণ তিনি জনবিদ্রোহের নায়ক। তিনি ঘোষণা করেছেন, শূদ্রের গলা থেকে ঘন্টা খুলে দেবেন। চাণক্যের কলম কেড়ে নিয়ে তাকে পাটলিপুত্রের প্রাসাদে বন্দী করে স্বস্তি পেতে চান বিন্দুসার। সেখানে চাণক্য মারা যান কিন্তু জাগিয়ে দিয়ে যান, নাড়িয়ে দিয়ে যান বিন্দুসারের বিবেকবোধকে। আসলে বিন্দুসারও 'রক্তকরবী'র রাজার মতোই ব্যবস্থার শিকার, সু এবং কু-এর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। সুভদ্রাঙ্গী সেই অভাগিনী, যাকে পিশাচিনী সাজিয়ে রাষ্ট্র নিজের অক্ষমতা ঢাকতে চেয়েছে। এক সময় সে নিজেও বিশ্বাস করে ফেলেছে যে, প্রকৃতই সে পিশাচিনী। নাটকের শেষে এই নারীকেই শক্তিরূপিণী হিসেবে দেখান মনোজ মিত্র। অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে সে থেকে যায় প্রাসাদে। তাঁরই কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে নবযুগের আগমন-সম্ভাবনা ঃ "আমার প্রিয়দর্শী ধ্বংস করবে শাস্ত্রবিধান, এই সাম্রাজ্যের যত অনাচার।"[১৪] সুমন যেন মহারাজ বিন্দুসারের শুভচেতনার মূর্তরূপ। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে যে শুভচেতনা অবদমিত হয়ে আছে বিন্দুসারের মধ্যে, তাই প্রকাশিত চাণক্য-শিষ্য সুমনের মধ্যে। সে যেন 'মুক্তধারা'র সেই অভিজিৎ, যে নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল সাধারণ প্রজার অধিকার। সুমনও তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে ... মিলিয়ে গেছে ... সে জীবিত না মৃত কোনো সংবাদ নেই। কিন্তু সে জাগিয়ে গেছে বিন্দুসারের অন্তরাত্মাকে, জাগিয়ে গেছে শাসকের অনুতাপবোধকে। সুমনের সংলাপেই

উচ্চারিত হয়েছে সেই শাশ্বত বাণী ঃ "সব যুদ্ধেরই ফল এক! যুদ্ধ যখন শেষ হবে, শস্যক্ষেত্রে শস্য থাকবে না, মানুষের হৃদয়ে থাকবে না স্নেহ-প্রেম-মমতা। স্বার্থান্ধ কিছু শ্রেষ্ঠী বণিক মানুষের আত্মা সওদা করে ফিরবে।"[১৫] চাণক্য এই নাটকে নীরব অথচ সবচেয়ে মুখর চরিত্র। এই চাণক্য জরাগ্রস্ত, স্থবির – অথচ পাটলিপুত্রে তাঁর দীর্ঘ ছায়া। বিন্দুসার রাজ্যে দেখেন চাণক্যের ষড়যন্ত্রের ছায়া; মহামাত্য মনে করেন, চাণক্যের ছেড়ে যাওয়া পদে কাজ করছেন বলেই তিনি যথেষ্ট বিকশিত হতে পারছেন না। চাণক্য শূদ্রমুক্তির ডাক দিয়েছেন – শূদ্ররা জেগে উঠেছে। পারিষদ-নিয়ন্ত্রিত বিন্দুসার চাণক্যের কলম জোর করে স্তব্ধ করেছেন, তাকে বন্দী করেছেন পাটলিপুত্রে। পাটলিপুত্রের রুদ্ধ বাতাসে প্রাণধারণ করতে পারেন নি চাণক্য, কিন্তু তিনি বিন্দুসারের মনের অর্গল খুলে দিয়ে গেছেন, মৃত চাণক্য বিন্দুসারের মনে জাগিয়েছেন অনুশোচনা। ক্ষৌণি সেই ধর্মধ্বজীদের প্রতিনিধি, যুগে যুগে যারা ধর্মকে ব্যবহার করে শাসককে কাজে লাগিয়েছে স্বার্থপূরণে। দন্ডপাল স্বার্থান্বেষীদের সভায় উপেক্ষিত এবং পদচ্যুত, পদলেহী সখারাম তার স্থলাভিষিক্ত। হংসী জেদী ও প্রতিবাদী, সেই সঙ্গে আছে শূদ্র বলে অসহায়তা। ইতিহাস আমাদের বারবার একথাই শিখিয়েছে যে, শাসকশক্তি যখন সভ্যতা নাশ করে, তখন তা রক্ষার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয় সাধারণ, প্রান্তবাসী মানুষ। নিম্নবর্গের ব্রাহ্মণ দ্বৈপায়ন সেই মানুষের প্রতিনিধি। এই চরিত্রটি সম্পর্কে মনোজ মিত্রের বক্তব্য ঃ

> " 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্বৈপায়নকে পেয়েছি কল্পনায়। দ্বৈপায়ন সেই লোক, সে যা কিছু পরিত্যক্ত সেগুলোকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে রাখে। শ্মশানে পড়ে থাকা মানবশিশু, রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া গো-শাবক ইত্যাদি সবই। এই যে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঘরকন্না সাজানো – এই কাজটার মধ্যে রয়েছে গৃহিণীপনা। তাই পুরুষটির আধখানা রমণী। অতএব মনে রাখবেন আমি কোনো নপুংসকের জীবনযন্ত্রণা দেখাবার জন্য চরিত্রটা দাঁড় করাইনি। সাধারণ মানুষ তুচ্ছ জিনিসকে সংগ্রহ করে লালন পালন করে, এর ওপরেই সভ্যতা সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে। সরকারি ভাবে কখনোই সংস্কৃতি রক্ষিত হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধন আছে চরিত্রটির মধ্যে। সে আকাশের জ্বলজ্বলে সন্ধ্যাতারাকে মনে মনে ছোটো বোন ভেবে আপন করে নেয়। একটা আধমরা গাছ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ভারতীয় দর্শনের সবার ভেতরে আত্মাকে দেখতে পাওয়া – যে গাছ হোক, গবাদি পশু হোক বা নদীই হোক যেখানে যা কিছু চলমান – বিকাশমান – তার সঙ্গেই আত্মীয়তা।"[১৬]

নিম্নবর্গের এই ব্রাহ্মণ নারী-পুরুষের বিচিত্র সমবায়ে তৈরি, গভীর মানবিক তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। ইতিহাসের নায়ক যখন ধ্বংস করে সমাজ-সভ্যতা, তখন এই সাধারণ মানুষদের হাতেই তা রক্ষিত হয়। নাটকে বিন্দুসার নিজেও তা স্বীকার করেছেন। তিনি জানেন, সুভদ্রার সন্তান পাটলিপুত্রের প্রাসাদে নিরাপদ নয়। চাণক্য-উত্তর পাটলিপুত্রে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে চলবে অন্ধ কু-সংস্কারের রাজত্ব – সুভদ্রার সন্তানকেও পিশাচ বলে ধ্বংস করা হবে। তাই শ্মশানের জিনিস 'কুড়িয়ে বাড়িয়ে রাখে' যে দ্বৈপায়ন তার ওপরেই তিনি ভার দিতে চান পাটলিপুত্রের মহাশ্মশানের অনাদৃত প্রাণ প্রিয়দর্শীকে রক্ষা করার ঃ "সম্রাট যা রক্ষা করতে পারে না, তুমি তা পারো ... সম্রাট যা অবহেলা করে তোমরা তা ধরে রাখো। তাই জগৎ সংসার চলে। নিয়ে যাও তোমার প্রিয়দর্শীকে ... আমার আতঙ্ক ঘুচাও ..."[১৭] বিন্দুসারের এই সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মনোজ মিত্র পাঠক-দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন ইতিহাসের গর্ভে লালিত চিরন্তন মানবসত্যের দিকে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - কুন্তল চট্টোপাধ্যায় - রত্নাবলী-৩৯ এ পটুয়াটোলা লেন -কোলকাতা-০৯ -চতুর্থ সংস্করণ - অক্টোবর, ২০০৪, পৃ.১১৩

২) ইতিহাস ও কাব্য - অ্যারিস্টটল - কাব্যতত্ত্ব - অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ - প্যাপিরাস - গণেন্দ্র মিত্র লেন - কোলকাতা-০৪ - ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ.৬৯

৩) অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা - ২ - ১৪০৭/কথোপকথন ঃ নাট্যভাবনা

৪) ঐ, পৃ.

৫) তৃণমূল স্তরের নাটক 'গল্প হেকিমসাহেব' - নির্মল ধর - প্রতিদিন-১৫.০১.১৯৯৫

৬) প্রস্তাবনা - রক্তকরবী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রবীন্দ্র-রচনাবলী - ষষ্ঠ খন্ড - পশ্চিমবঙ্গ সরকার - ফাল্গুন ১৩৯২, পৃ.১৯৪

৭) মনোজ মিত্রের অসামান্য অভিনয় - মনসিজ মজুমদার - আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩ জুলাই ১৯৯৯

৮) গল্প হেকিমসাহেব - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২, পৃ.১৬২

৯) ঐ, পৃ.১৬৩

১০) বারবার দেখা যায় গল্প হেকিমসাহেব - দেবাশিস মজুমদার - সোনার বাংলা - ০৭.০১.১৯৯৪

১১) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩৬৮

১২) ঐ, পৃ.৩৭৮

১৩) অস্থির আবর্তমান সময়ের নাট্যচিত্র 'ছায়ার প্রাসাদ' - অশোক মুখোপাধ্যায় - প্রতিদিন - ৩০.১০.১৯৯৮

১৪) ছায়ার প্রাসাদ - - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-চতুর্থ খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০, পৃ.১৪৯

১৫) ঐ, পৃ.১৪৪

১৬) কথোপকথন ঃ নাট্যভাবনা - অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা - ২ - ১৪০৭

১৭) ছায়ার প্রাসাদ - - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৪৮

আঙ্গিক যখন রূপক

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে কোনো নাটককেই 'রূপক' বলা হয়েছে, কারণ সেখানে একজন অন্য আরেকজনের রূপ ধরে অভিনয় করে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের আদর্শে বাংলায় যে সাহিত্যতত্ত্ব গড়ে উঠেছে সেখানে 'রূপক নাটক' নাটকের একটি বিশেষ শ্রেণি বলে পরিগণিত। ইংরাজি Allegory শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবেই এখানে 'রূপক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যাব্রাম্‌স রূপকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ

> "An allegroy is a narrative in which the agents and action, and sometimes the setting as well, are contrived not only to make sense in themselves, but also to signify a second, correlated order of persons, things, concept or events."[১]

রূপকের মূল কথাটিই হ'ল আপাতসরল একটি কাহিনির আড়ালে একটি গূঢ় ভাবসত্যের ব্যঞ্জনা। বাইরের কাহিনি নয়, নাট্যকারের অভিপ্রেত এই ভেতরের গূঢ় সত্যটি। বাইরের খোলসটি পাঠকের বুদ্ধির দুয়ারে নাড়া দিয়ে ভেতরের সত্যটিকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। বাইরের আবরণ ভেঙে এই ভেতরের সত্যে পৌঁছতে পাঠক-দর্শককে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না, সামান্য বুদ্ধির প্রয়োগেই তা সম্ভব হয়। নাট্যকারও রূপক ভাণ্ডার অসংখ্য ইঙ্গিত তৈরি রাখেন। রূপক নাটকের আবেদন মূলত বুদ্ধির কাছে। এই নাটক স্পষ্টতই উদ্দেশমূলক। সেই উদ্দেশ্য সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য যে কোনো কিছু হতে পারে। এই ধরণের নাটকে নাট্যকারের একটি শিক্ষা দেবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু সেই অভিপ্রায়টিই মুখ্য হয়ে উঠলে শিল্পরচনা হিসেবে নাটকটি ব্যর্থ হয়। নাট্যকার যা বোঝাতে চান বা যে শিক্ষা দিতে চান, তা করতে হয় যথাযথ শিল্পরূপ মান্য করেই।

নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্র নিজের কালের কাছে দায়বদ্ধ। সমাজে যে ভ্রষ্টাচার, অনিয়ম ও নৈতিকতার পতন দেখেছেন,তারই বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদের ধরণ স্বতন্ত্র। সমকালীন বাংলা নাটকের প্রচলিত প্রবণতা অনুয়ায়ী বিশেষ মতাদর্শ আরোপ করে সমস্যা সমাধানের পথ তাঁর নয়। তাঁর অস্ত্র রঙ্গ, ব্যঙ্গ, শ্লেষ। মনোজের এই ভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন ঃ

> "বাংলা নাটকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে একশ বছর আগে প্রাথমিক যে একটা পথ চলা গোছের সরণি তৈরি হয়েছিল মনোজ মিত্র আজকে সে পথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্রটি তিনি ছিন্ন করেন নি"[২]

এই সমালোচক মনোজ মিত্রকে বঙ্কিমের ভাষায় 'রসিক লাঠিয়াল' এবং 'সূক্ষ্ম ল্যানসেট'ধারী ডাক্তার বলে মনে করেছেন, যিনি "প্রয়োজনে মোটা লাঠি ব্যবহার করেছেন আবার প্রয়োজনে সূক্ষ্ম ল্যানসেট"[৩]। সামাজিক জঞ্জাল যখন পাহাড় প্রমাণ তখন সব সূক্ষ্মতা ঝেড়ে ফেলে তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন মোটা লাঠি। স্লোগান-সর্বস্বতা নয়, তথাকথিত বিপ্লবের প্রকাশ নয়, কমেডির মধ্য দিয়েই মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার দলিল রচনা করেছেন, হাসতে হাসতেই চিনিয়ে দিয়েছেন শত্রুকে। মনোজ মিত্রের এই ভঙ্গিটি কেউ কেউ আবার পছন্দ

করেন নি । হাসির আড়ালে গভীর কথা চাপা পড়ে যায় বলে তাঁরা আক্ষেপ করেছেন। এমনকি কেউ কেউ তাঁর নাটকের গল্পের কাঠামোকে সমাজিক যাত্রা পালার বিষয়ের সঙ্গেও তুলনা করেছেন ঃ "গল্পের এই কাঠামো কিন্তু অধিকাংশ সামাজিক যাত্রাপালার বিষয়ও বটে"[৪]। হাসি-মজা-হুল্লোড়ে আটকে থেকে মনোজের নাটক গভীরতর বোধের জগতে নাড়া দিতে পারে না বলে এই সমালোচকদের সিদ্ধান্ত ঃ "কিছু আলটপকা মন্তব্যেই আটকে থাকে তাঁর নাটক, হয়তো এই রূপকথার ধরণে গল্প বলার ফলেই বর্তমান কালের একটা ভাসা ভাসা চেহারাই প্রকাশ করা যায়"[৫]। আসলে মনোজ মিত্রের বলার ভঙ্গিটি একান্তভাবে তাঁরই।

এই ভঙ্গিতে স্লোগান নেই, আরোপিত বিপ্লব নেই, কিন্তু এমন অনেক নাট্যসংলাপ আছে যেগুলি দেখলে বোঝা যায়, তাঁর কৌতুকের শরসন্ধান ব্যর্থ হয়নি । মনোজ মিত্র আধুনিক কালের নাট্যকার কিন্তু তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনার ধরণ traditional. এ বিষয়ে তাঁকে মধুসূদন দীনবন্ধুর তুল্য মনে করেছেন সমালোচক ঃ

> "কোনও মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে নয় – নিছক নাটক তৈরি এবং অন্তরের তাগিদে মধুসূদন এবং দীনবন্ধু কাজ করেছেন, তাঁদের প্রহসনগুলি তৈরী করেছেন। মনোজ মিত্রও তাই করেছেন। মনোজ যে সময়ে জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন সেই সময়ের কাছেই তাঁর দায়। জীবনের জটিলতাকে তাঁর সময়ের নিরিখেই তিনি ধরতে চেয়েছেন । জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা ও অস্তিত্বের আঁকাড়া উপস্থাপনা; লোভ, বেঁচে থাকার ইচ্ছে, স্বার্থ, ভালোবাসা নিয়ে তাঁর উপাখ্যান। সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিশাপ ও ব্যভিচার দেখিয়ে দিয়ে মনোজ পাপীদের অনন্ত নরকে পাঠাতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। শত্রুকে চিনিয়ে দেন মনোজ হাসির বিস্ফোরণে"[৬]

এই কাজ করতে গিয়ে মনোজ মিত্র কিন্তু নাটককে বক্তব্যসর্বস্ব করে তোলেন নি । নিজের সমকালে মনোজ মিত্র দেখেছেন ক্রমাগত শত্রু সংহার এবং মুখোশ ছিঁড়তে ছিঁড়তে ক্লান্ত, 'রূপের দিক থেকে দীন' বাংলা নাটককে। তাই নাটককে একটি সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন । তাঁর বক্তব্য তাই কখনো ইতিহাসের আশ্রয়ে, কখনো পুরাণ-কাঠামোয়, কখনো বা রূপকের আড়ালে প্রকাশ পেয়েছে।

মনোজ মিত্র তাঁর কয়েকটি নাটকে রূপকের আদল ব্যবহার করেছেন। তবে মাঝে মাঝেই রূপকের খোলসটি ভেঙে গিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে নির্ভেজাল বাস্তব। এই ইলিউশন ভেঙে দেওয়া নাট্যকারের ইচ্ছাকৃত। এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯), 'পুঁটিরামায়ণ' (১৯৮৯-৯০), 'রাজার পেটে প্রজার পিঠে' (১৯৮৮), 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' (১৯৯২) নাটক চারটিকে। এদের মধ্যে প্রথম দুটি পূর্ণাঙ্গ এবং পরের দুটি একাঙ্ক। এছাড়াও কেউ কেউ এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন 'রাজদর্শন' (১৯৮২) এবং 'গল্প হেকিমসাহেব' (১৯৯২-৯৩) নাটক দুটিকেও। আমাদের বিচারে অবশ্য 'রাজদর্শন'কে সামাজিক এবং 'গল্প হেকিমসাহেব'কে ঐতিহাসিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন। তবে উল্লেখ্য যে, এই গুচ্ছ বিভাজনে কিছু অদল-বদল হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন এই চারটি নাটককেই বিষয়বস্তুর নিরিখে রাজনৈতিক বর্গের অন্তর্ভুক্তও করা চলে অনায়াসে।

'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭)-এর পর মনোজ মিত্রের উল্লেখযোগ্য নাট্য সৃষ্টি 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯)। এই সময়কালে ভারতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন। ১৯৭৭-এর মার্চ মাসে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে এবং কেন্দ্রে জনতা পার্টি ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮-এ জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে যায়, ১৯৭৯-তে পতন ঘটে মোরারজি দেশাই-এর জনতা সরকারের, ১৯৮০-র জানুয়ারিতে ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফেরেন ইন্দিরা গান্ধী। এই রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের অবস্থা তুলে ধরেছেন মনোজ মিত্র 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে রূপকথার ভঙ্গিতে। কেন তিনি প্রত্যক্ষ ভাষণের পরিবর্তে রূপকথার আড়াল নিলেন সে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। কিন্তু বক্তব্য বিন্যাসের জন্য যে কোন আঙ্গিক ব্যবহারের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই নাট্যকারের আছে। মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত, সে বক্তব্য যথেষ্ট শিল্পিত রূপে পরিবেশিত হয়ে সমস্যার গভীরে পৌঁছতে পেরেছে কিনা এবং সমাধানের কোন ইঙ্গিত দিতে পেরেছে কিনা।

রূপনগর নামে এক কল্পিত রাজ্যের রাজা বিচিত্রদন্ত। অন্ধ বৃদ্ধ কঙ্কের তিন শিষ্য নীলকমল, হীরামন আর সুবর্ণ রাক্ষসকে বন্দী করে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে কুশাসন ও শোষণ থেকে। রাক্ষস বন্দী হয়েছে। যে জাদুদন্ডের সাহায্যে রাক্ষস মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখত তা বিসর্জিত হয়েছে অতল সমুদ্রে। কিন্তু রাক্ষসের সংহার ছাড়া স্বস্তি নেই। সেই সংহার নির্ভর করছে দুর্গম হিমপাহাড় থেকে আনা মৃত্যুবাণের ওপর। তিন বন্ধু নীলকমল, হীরামন আর সুবর্ণ যাত্রা করেছে হিমপাহাড়ের দিকে। যে আনতে পারবে মৃত্যুবাণ, যার হাতে মৃত্যু হবে রাক্ষসের, সেই হবে রূপনগরের রাজা, পাবে কঙ্কের পালিতা কন্যা চন্দ্রলেখাকে। এখান থেকেই নাটকের সূচনা। রাক্ষস কারাগারে বন্দী থাকলেও বাইরে আছে তার অনুচরেরা। ধনপতি, বিচারপতি আর সেনাপতি প্রেতের ছদ্মবেশে বিভেদ সৃষ্টি করে তিন বন্ধুর মধ্যে। মাঝপথ থেকে ফিরে আসে হীরামন আর সুবর্ণ। নীলকমল এগিয়ে চলে। এদিকে জেলের জালে উঠে আসে সেই জাদুদণ্ড। কঙ্ককে দেখাতে নিয়ে এলে তা পড়ে চন্দ্রলেখার হাতে। চন্দ্রলেখা ভালোবাসে কেবল হীরামনকে। জাদুদণ্ড হাতে পেতেই জেগে ওঠে মানুষের চিরন্তন লোভ। চন্দ্রলেখা জাদুদণ্ড তুলে দেয় হীরামনের হাতে। হীরামন রাক্ষসের কাছে শিখে নিক মানুষকে মেষ বানাবার খেলা। হয়ে উঠুক অপরাজেয়। নিজে রাজা হয়ে চন্দ্রলেখাকে করুক রাণী। আত্মসুখ চরিতার্থ করতে সুবর্ণকে জাদুদণ্ড চুরির মিথ্যে অপবাদ দিয়ে জেলে পাঠায় চন্দ্রলেখা। হীরামন কারাগারে যায় রাক্ষসকে লোভ দেখিয়ে জাদুর খেলা শিখতে কিন্তু মুহূর্তের ভুলে রাক্ষসই তাকে মেষ বানিয়ে ফেলে এবং মুক্ত হয়ে গিয়ে সেই মেষকে দিয়ে চালায় নরমেধ যজ্ঞ। এদিকে নীলকমল গিয়ে উপস্থিত হয় হিমপাহাড়ে জ্ঞানী মানুষের কাছে। সেই মানুষ তাকে বললেন, রাক্ষস মারার কোনো মন্ত্র নেই, কোনো পৃথক অস্ত্র নেই। নির্লোভ নিষ্পাপ অভ্রান্ত মানুষ শুদ্ধ জাগ্রত মানুষ রাক্ষসের মহাকাল। জগতে কেউ মহান পবিত্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় না। বারংবার অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাকে সবকিছু অর্জন করতে হয়। সেই তপস্বী নীলকমলকে দিলেন পবিত্র আগুন। যে মানুষ এই আগুনের কুন্ডের মধ্য দিয়ে অদগ্ধ

বেরিয়ে আসতে পারবে সেই হবে রাক্ষসের মহাকাল। নীলকমল অনেক লোভ, অনেক ভয় জয় করে আগুন নিয়ে আসে কিন্তু আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে তা রক্ষা করতে পারে না। তার আগেই অবশ্য পন্ডিত কঙ্ক সেই আগুন নিক্ষেপ করেছেন মেষরূপী হীরামনের গায়ে। তাতে মেষের গায়ের চামড়াই কেবল পুড়েছে, বেরিয়ে এসেছে শুদ্ধ মানুষ হীরামন। নীলকমল এবং সুবর্ণও যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়েছে। তাদের তিনজনের সম্মিলিত আঘাতে মৃত্যু হ'ল রাক্ষসের। ব্যক্তিগত স্বার্থ শেষে আর প্রাধান্য পায়নি। ব্যক্তিস্বার্থ উত্তীর্ণ হয়েছে সমষ্টি চেতনায়। যে রাজপদ নিয়ে তিন বন্ধুর মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাস, সেই পদেরই বিলুপ্তি ঘটল ঃ "রাজা আর রইল না – আর ওরা তিনজন বলল – দেশকে মুক্ত করেছি আমরা – এবার মুক্তিকে পাহারা দেব আমরা"[৭]। রাজকুমারী চন্দ্রলেখার প্রসঙ্গটিও উহ্য রেখে রূপকথার আদলে 'তিন পরমা সুন্দরী কন্যে'র সঙ্গে তিন বীরের বিয়ের কথা বলা হ'ল। মনোজ মিত্রের নাটকের শর্ত মেনেই মানুষের জয়ের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হল ঃ

> "যেই না রাক্ষসের রক্ত মাটিতে পড়া অমনি রূপনগরের আকাশ হল নীল, মাঠ হল সবুজ, নদী রূপালি, আর চাঁপার বনে থোকা থোকা হলুদ ফুল ফুটল! আর ফুলের দলে একে একে ভেসে উঠল রূপনগরের হারানো সন্তানদের মুখ ... শিশিরে ধোয়া নির্মল মুখগুলো ..."[৮]

বিশ শতকের সত্তরের দশকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নাট্যরূপ 'মেষ ও রাক্ষস'। ভারতবর্ষের অস্থির সেই রাজনৈতিক আবহ এই নাটকের প্রেক্ষাপট, যখন অশুভ শক্তি দীর্ঘ ক্ষমতা ভোগের পর ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ক্ষমতা দখলকারী শক্তির লোভ ও অনৈক্যের ছিদ্রপথে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়া এবং পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার রূপক হিসেবেই এই কাহিনি গৃহীত হতে পারে। মনোজ মিত্র অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের ভাবনা অনুসারেই অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটান শুভবুদ্ধির জাগরণের মাধ্যমে। রূপকের আধারে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট – স্বার্থলোভী, স্বেচ্ছাচারী যে মানুষেরা মানুষকে মেষ বানিয়ে কার্যসিদ্ধি করে তাদের নিধনে চাই সফল নেতৃত্ব। যে নেতা হবে তাকে অনেক প্রলোভন জয় করে, অগ্নিপরীক্ষায় শুচি হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। হিমপাহাড়ে যে তপস্বীর কাছে আছে রাক্ষসবধের আগুন তারই মুখে উচ্চারিত হয়েছে নাটকের মূল মেসেজ ঃ "মানুষ! নির্লোভ নিষ্পাপ অভ্রান্ত মানুষ ... শুদ্ধ জাগ্রত মানুষ তার মহাকাল"[৯]। এই শুদ্ধ মানুষকেই তো মনোজ মিত্র খুঁজেছেন পরিবার থেকে রাষ্ট্র – সর্বত্র, সর্বদা। রূপকের মাধ্যমে তিনি যেমন চিনিয়ে দিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট কালখন্ডের প্রেক্ষাপটে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডকে, তেমনি আবার অনেক সময়ই তাঁর সংলাপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্বিশেষ সত্য। নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই রূপক। রাক্ষস সমকালীন এবং চিরন্তন শোষক। আর সুবর্ণ-হীরামন-নীলকমল সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধি। পন্ডিত কঙ্ক অন্ধ। সে সত্য ও বিবেকের প্রতীক। তপ্ত শলাকা বিঁধিয়ে রাক্ষস তাঁর চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। শাসকের প্রাথমিক লক্ষ্য সবসময় শিক্ষাকে অন্ধ করে দেওয়া। কঙ্ককে অন্ধ করা তারই প্রতিফলন। কিন্তু কঙ্ককে অন্ধ করে তার আদর্শকে রুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়েছে তাঁর, পাঠশালাও বন্ধ করতে পারেনি রাক্ষস। কঙ্কের হাতের মঙ্গলদীপ অনির্বাণ। তাঁরই শিষ্যরা রাক্ষসকে বন্দী করেছে, তারাই হিমপাহাড়ে চলেছে রাক্ষসের মৃত্যুবাণ আনতে। কঙ্কের অন্ধতার আরো একটি ব্যাখ্যা নাটকে

আবিষ্কার করা যায়। কঙ্ক স্নেহে অন্ধ। এই স্নেহ পালিতা কন্যা চন্দ্রলেখার প্রতি। সেই অন্ধ স্নেহ এবং বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে চন্দ্রলেখা জাদুদণ্ড তুলে দিয়েছে হীরামনের হাতে। সংগ্রামী মানুষের মধ্যেও যে স্খলন-পতন আসে, লোভ পথভ্রষ্ট করে, তার দৃষ্টান্ত সুবর্ণ এবং হীরামন। মাঝপথ থেকে ব্রত অসম্পূর্ণ রেখে তারা ফিরে এসেছে। জাদুদণ্ড হাতে পেয়ে হীরামনের লোভ জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে মানুষের চিরন্তন প্রভুত্ব বাসনা। এই লোভের ফলেই সে পরিণত হয়েছে রাক্ষসের হাতিয়ার মেষ-এ। মেধাহীন, বোধ-বুদ্ধিহীন এই মেষ শাসকের ইঙ্গিতে স্বজনের বুকের রক্ত ঝরিয়েছে, নগরকে করেছে শ্মশান। শাসকের চিরকালীন তিন সহচর – বণিক, সেনাপতি এবং বিচারপতি । নাটকে প্রাথমিক ভাবে এদের প্রেতরূপে তুলে ধরে নাট্যকার সেই বিশেষ সময়ে এই শ্রেণির মানুষদের প্রেতসদৃশ আচরণকেই প্রতীকায়িত করেছেন। তিন তরুণের হিমপাহাড়ে যাত্রা এরা পণ্ড করতে চায়। কারণ রাক্ষসের পতন হলে এদের পতনও অনিবার্য। তপস্বী চরিত্রটি কীসের প্রতীক তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে বৈপ্লবিক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসার অর্থ নিষ্কাশন করেছেন কেউ (রবিবাসরীয় জনতা- মেষ ও রাক্ষস - চৈতালী চট্টোপাধ্যায়), কেউ বা একজন তাত্ত্বিকের কাছে দেশের নেতাদের যাত্রা (বিশ্বনাথ বসুর চিঠি) বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু খুব সহজভাবে ভাবা যায়, এই তপস্বী মানুষের শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতীক। যে চৈতন্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে কিন্তু তার উদ্বোধনের জন্য বা তার কাছে পৌঁছনোর জন্য অনেক দুরূহ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। যে অমোঘ অস্ত্রে তিনি হিমপাহাড়ের ডাকিনীকুল নির্মূল করে স্বপ্নের রাজ্য গড়েছেন তা আসলে মানুষের জাগ্রত বিবেক। বিশ্বের যেখানেই অশুভ শক্তির বিনাশ সম্ভব হয়েছে সেখানেই ক্রিয়াশীল থেকেছে এই শুদ্ধ চৈতন্য – এটাই মনোজ মিত্রের বিশ্বাস।

নাটকের অসংখ্য সংলাপে মনোজ মিত্র চিনিয়ে দিয়েছেন নির্দিষ্ট কালসীমাকে। তিন প্রেতের স্বরূপ উন্মোচনের পর নীলকমলের সংলাপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সমকাল ঃ "দীর্ঘ পথের যাত্রায় আমায় করেছে একা। প্রেত, তোরা সত্যিই প্রেত। পালাবদলের দিনে তোদের খেলা প্রেতের খেলা "[১০]। 'পালাবদলের দিন' শব্দ দুটিতেই রূপকথার আবরণ ভেঙে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সমকাল। জরুরি অবস্থার সময় মানুষের যেভাবে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল তার ইঙ্গিত আছে কঙ্কের সংলাপে ঃ "বিচিত্রদন্তের রাজ্যে কারো তো মাথা তোলার উপায় ছিল না। প্রতিবাদে যখনি মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি তার মাথায় ..."[১১] রাজনীতির সেই জটিল আবর্তের সময় শত্রু-মিত্র-ভেদ নির্ণয় দুষ্কর। কঙ্কের কণ্ঠে সেই আক্ষেপ ঃ "শুধু কণ্ঠ শুনে তো ঠাওর করতে পারি না – মানুষ আজ কে মানুষের পক্ষে, কে বা রাক্ষসের"[১২]। দুই ডাকাত বেনারসী ও তোতোপুরীর সংলাপে কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বহিষ্কারের হুমকি এবং শেষপর্যন্ত লোক দেখানো ঐক্যের প্রতি কটাক্ষ আছে ঃ "দলে যদি আর একটা লোক থাকত, তোকে আমি ভোটের জোরে দলছুট করে দিতুম। নেহাত দুজনের দল বলে ভোটে যেতে পারছি না!"[১৩] 'মায়ের থানে' 'ঐক্যের নাড়া' বাঁধার উল্লেখ নেত্রীর কর্তৃত্বের প্রতিই স্পষ্ট ইঙ্গিত। সমকালকে চিনিয়ে দেবার পাশাপাশি মনোজ মিত্র চিরন্তন সত্যকেও দেখিয়ে দিতে ভোলেন না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে প্রভুত্ব বাসনা, উপযুক্ত অবসরে যা প্রকাশিত

হয়। ক্ষমতার লোভ মানুষকে কীভাবে লালায়িত করে তার দৃষ্টান্ত হীরামনের সংলাপ ঃ "আমার চাই রাজার খেলা। যে খেলায় রাজা হওয়া যায়, রাজা থাকা যায়, মানুষকে ভেড়া বানিয়ে পায়ে চেপে রেখে যুগ যুগ সিংহাসন দখলে রাখা যায়"[১৪]। মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপের চিরন্তনতার গুণেই ওপরের সংলাপটি উত্তরকালের পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতেও সমানভাবে প্রযোজ্য হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে হীরামন সাধুর পোশাক দেয় রাক্ষসকে, ছদ্মবেশে কারাগার থেকে বেরিয়ে যেতে, প্রতিশ্রুতি দেয় মুক্ত রাক্ষসকে অবসরপ্রাপ্ত মহারাজার সম্মান দেবার। সাতের দশকে নকশাল নিধনের নামে যে নির্বিচার নাশকতা নেমে এসেছিল যুবকদের ওপর তার ইঙ্গিত আছে সুবর্ণর সংলাপে ঃ "দ্যাখো ... দ্যাখো এখনো আমার বুকে পিঠে রাক্ষসের ভীষণ নখের দাগ আঁকা রয়েছে"[১৫]। অসংখ্য যুবকের দেহে বিদ্ধ গুলির চিহ্নকেই স্মরণ করায় এই সংলাপ। 'গুপ্তহত্যা' সেই উত্তাল সময়ের একটি পরিচিত শব্দ। মুক্ত রাক্ষস মেষের মাধ্যমে যে রক্তশোষণ চালিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে 'গুপ্তহত্যা' শব্দটি জুড়ে দিয়েই মনোজ মিত্র রূপকথাকে নিয়ে আসেন একে বারে বাস্তবে ঃ"সে এখন ছদ্মবেশ ধরেছে। না ধরে উপায় নেই। হৃতসর্বস্ব রাক্ষস মুমূর্ষু। ছদ্মবেশের আড়ালে এবার সে গুপ্তহত্যায় নেমে পড়েছে। একজোড়া সিং চালিয়ে সংগোপনে একে একে বুক চিরে ফেলে – সে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে তার সিংহাসনের দিকে"[১৬]। যুবশক্তির একটি অংশ তখন শাসকের হাতের পুতুল। বোধ-বুদ্ধি-মেধা কিছুই তাদের নেই, আছে কেবল অস্ত্র। শাসকের নির্দেশে তারা বইয়ে দিচ্ছে রক্তনদী। এই ঘাতক শক্তি শাসকের বড় আদরের। রক্ত ঝরিয়ে আসার পর সুরা ধরতে হয় তাদের মুখে। ভুলিয়ে রাখতে হয় চৈতন্যকে। সামান্য ধ্বন্যাত্মক শব্দের কুশলী ব্যবহারেই মনোজ মিত্র সেখানে অনায়াসে ফুটিয়ে তোলেন সমকালের অনুষঙ্গ। ধনপতির সংলাপ ঃ "এই যে খাও ... চুকু চুকু চুকু" স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ 'ঢুকু ঢুকু ঢালো চুকু চুকু পিও / এশিয়ার মুক্তিসূর্য যুগ যুগ জীও'। নগরে এখনো অনেক কানা পন্ডিত বেঁচে আছে, বেঁচে আছে অনেক ছেলে। তাই ঘাতক মেষকে তোয়াজ করে রাখতে হয়। মেষের মাথা সাফ – কোনো বোধ-বুদ্ধি সেখানে নেই। তাই স্বজনের বুক চিরে রক্তপান করানো সম্ভব হয় তাকে দিয়ে। যৌবনের এই অপচয় দেখে কঙ্কের যে আর্তনাদ তা দেশের যে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই বেদনাসঞ্জাত প্রতিক্রিয়া ঃ "ওরে দেখে যা ... দেখে যা তোরা ... আমাদের গর্ব ... আমাদের আশা ... আমাদের ভবিষ্যৎ ... আমাদের দেশের যৌবন আজ একটা চতুষ্পদ জানোয়ার হয়ে আমদেরই বুকের ওপর দাপাদাপি করে"[১৭]।

'মেষ ও রাক্ষস' রূপকের আধারে রাজনৈতিক নাটক। কিন্তু প্রচলিত বাংলা রাজনৈতিক নাটকের মতো বক্তব্য-সর্বস্বতা বা আরোপিত বিপ্লবের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান নেই। কোনো 'ইজম' নয়, সমাধানে পৌঁছতে মনোজ মিত্র তাঁর নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য মেনেই নির্ভর করেছেন মানুষের শুদ্ধ চৈতন্য এবং জাগ্রত বিবেকের ওপর। ফলে এই নাটকের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। সবচেয়ে সমালোচিত হয়েছে রাক্ষস নিধনে সিংহাসন বা চন্দ্রলেখাকে পাবার স্বপ্নের ব্যক্তিস্বার্থের বিষয়টি। অর্থাৎ দেশপ্রেম বা কোন মহৎ আবেগের বশে নয়, ব্যক্তিস্বার্থেই তিনজন চলেছিল হিমপাহাড়ের দিকে রাক্ষসের মৃত্যুবাণ আনতে।

ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার স্বপ্নে মশগুল যুবশক্তির দ্বারা রাক্ষস তথা অশুভ শক্তির বিনাশ কি সম্ভব? শেষে রাক্ষস বিনাশে হীরামনের একক প্রয়াস বিপ্লবের সাফল্যে সংঘশক্তির ভূমিকার মতো প্রধান বিষয়কে উপেক্ষা করেছে বলেই সমালোচকদের অভিমত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাটকের প্রথম অভিনয়ে সম্ভবত রাক্ষস নিধনে হীরামনের একক প্রয়াস দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ছাপা নাটকে আমরা দেখি মঞ্চনির্দেশ ঃ "তিনদিক দিয়ে রাক্ষসকে ঘিরে ধরে তিনজন। তিনজনের অস্ত্র একযোগে রাক্ষসের দেহ বিদীর্ণ করে"[১৮]। কঙ্কও পবিত্র মানুষকে সম্বোধন করেছেন বহুবচনে ঃ "যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে তোমরা এলে আজ পবিত্র মানুষ। এ আগুন আর তোমাদের কাউকে পোড়াবে না"[১৯]। ব্যক্তিস্বার্থের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করেছেন একাধিক সমালোচক। একথা সত্য যে, রাজসিংহাসন এবং চন্দ্রলেখাকে প্রাপ্তির বাসনাই প্রাথমিক ভাবে তিন যুবককে হিমপাহাড় যাত্রায় প্রণোদিত করেছে। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্যই হীরামন এবং সুবর্ণ মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে। হিমপাহাড়ের পবিত্র আগুন হাতে পেয়ে নীলকমলের মধ্যে জেগে উঠেছে অহংবোধ, মাথাচাড়া দিয়েছে সিংহাসনের লোভ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ততক্ষণ সাফল্য তাদের অনায়ত্ত। যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে যখন তারা অর্জন করেছে পবিত্রতা, তখন হিমপাহাড়ের পবিত্র আগুনের মধ্য দিয়ে অদগ্ধ বেরিয়ে আসার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তখনই তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে রাক্ষসের দেহ বিদীর্ণ হয়েছে। মানুষের এই সংকীর্ণতা থেকে মহত্ত্বে উত্তরণই তো দেখাতে চান মনোজ মিত্র। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার নয়, স্খলন-পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ গোটা মানুষের ছবি ফুটিয়ে তুলে শেষপর্যন্ত মানুষেরই মধ্যে নিহিত মহত্তর সম্ভাবনার জাগরণ ঘটান তিনি। তাছাড়া নাটকে রূপকথার আদলটি রক্ষা করতেও রাজত্ব এবং রাজকন্যা প্রাপ্তির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গটি সহায়তা করেছে। রূপকথার মতোই এই নাটকেও রাজত্ব (সিংহাসন)এবং রাজকন্যা (চাঁদ) প্রতীকায়িত। দুরূহ কর্ম সম্পাদনের শেষে এক পরম প্রাপ্তির আশ্বাসের বাণী। কিন্তু নাটকের শেষে রাজকন্যা-প্রাপ্তির প্রসঙ্গটিকে গুরুত্বহীন করে দিয়ে এবং অর্জিত মুক্তিকে যৌথ প্রয়াসে রক্ষা করার কথা বলে নাট্যকার রূপকথার খোলস ছিঁড়ে নাটককে অনায়াসে বর্তমান-লগ্ন করে দেন ঃ

"নটী ।। কেউ না – রাজা আর রইল না – আর ওরা তিনজন বলল – দেশকে মুক্ত করেছি আমরা ... এবার মুক্তিকে পাহারা দেব আমরা।

মঞ্চাধ্যক্ষ ।। 'অতঃপর' কী হল ?

নটী ।। বিয়ে হল। তিন পরমা সুন্দরী কন্যের সাথে তিন বীরের বিয়ে হল।"[২০]

'পুঁটিরামায়ণ' (১৯৮৯-৯০) নাটকে রামায়ণের কাহিনির খোলে মনোজ মিত্র ভরে দিয়েছেন আধুনিক কালের গণতন্ত্র তথা প্রশাসন-যন্ত্রের অন্তঃসারশূন্য স্বার্থসর্বস্ব দীর্ঘসূত্রিতাকে। রামায়ণের আদলে কান্ড বিভাজন করেছেন, তবে সাতের পরিবর্তে দুই। প্রথম কান্ডে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় কান্ডে চারটি দৃশ্য। প্রত্যেক দৃশ্যের সূচনায় রামায়ণের মতোই শিরোনাম রয়েছে। হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচি বিরচিত এই পুঁটিরামায়ণে রাম, সীতা, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, হরধনুভঙ্গ,

হনুমান, জাম্বুবান, জটায়ু, গন্ধমাদন, লঙ্কাদাহন ইত্যাদি সবই আছে, অতিরিক্ত আছে রচয়িতা পুঁটিরাম বাগচি স্বয়ং। বিশ শতকের যে পুঁটিরাম ঃ

> ''বছরে আড়াই মাস টাকে চুল গজাবার অব্যর্থ ডাক্তারি ... দেড়মাস বাইসাইকেল কারিগরি, পৌনে তিনমাস তেলাপিয়া মাছের আড়তদারি, পাঁচমাস সাড়ে সতেরো দিন খোলা জানালায় আঁকশি ঢুকিয়ে গেরস্ত ঘরের থালাঘটিবাটি হাতাখুন্তি ঝাড়াঝুড়ি''[২১]

করে, সে রচনা করেছে এই 'সবিশেষ পাতলা রামায়ণ' এবং নিজেও ঢুকে বসে আছে সেই রামায়ণের খোলের মধ্যে। বক্কেশ্বর ফেরিওয়ালা তার সাগরেদ টেঁপাকে নিয়ে এই রামায়ণ ফেরি করে ... দু'টাকায় পাঁচটা সঙ্গে একটা কার্বোরাইজড দেশলাই ফ্রি। 'এই রামায়ণ কিনতে যাদের আঁতে ঘা লাগবে তাদের জন্য বিনামূল্যে দেখানো হচ্ছে এর বিষয়বস্তু'।

পুঁটিরামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড মঞ্চের ওপর দৃশ্যমান। হনুমান লঙ্কাপুরী লণ্ডভণ্ড করে যখন রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বাদানুবাদের পর রাবণের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করে সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে তখন অকুস্থলে আবির্ভাব হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচির। বিংশ শতাব্দীর পুঁটিতন্ত্র তিনি চালু করেলেন ত্রেতা যুগের স্বর্ণলঙ্কায়। রাবণকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মোহে মুগ্ধ করলেন, ইন্দ্রজিৎকে বোঝালেন ভাবমূর্তির গুরুত্ব। তদন্ত কমিশন বসিয়ে কীভাবে ফাঁসি দিয়ে 'আইন-মাফিক হত্যাকাণ্ড' সংঘটিত করতে হয় তা শুনিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। হনুমানের ফাঁসির জন্য তৈরি হল বিচারবিভাগ, কারাবিভাগ। বন্দিকে ধর্মকথা শোনাবার জন্য পার্ট টাইম কাজ জুটল পন্ডিতের। রক্ষীপ্রধান শল্লক পুঁটির পরামর্শে জানল, কীভাবে গর্জন তেলের সঙ্গে রেড়ির তেলের ভেজাল দিয়ে আর রাবড়ির মধ্যে ব্লটিং পেপার গুঁজে দিয়ে উপার্জন বাড়ানো যায়। প্রায় সকলেই বাড়তি আয়ে উৎসাহিত, কেবল নাট্যকারের পীড়িত বিবেকের যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে বৈদ্য চরিত্রের মাধ্যমে। সমাজ এবং রাষ্ট্রের অধঃপতন নাট্যকারের হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ ঘটায় তারই উচ্চারণ যেন বৈদ্যর সংলাপে ঃ

> ''ভালো হচ্ছে? আপনি বলছেন ভালো হচ্ছে? পাঁচ টাকার ওষুধ দিয়ে রোজ পাঁচ হাজার টাকার বিল করছি। টাকা নিচ্ছি আর বাড়ি ফিরে শুধু কাঁদছি। আপনারা কাঁদেন না অ্যাঁ, টাকা মেরে আপনাদের মন খারাপ হয় না! ... ওহোহো পুঁটিরাম এমন সিস্টেমের চাকায় বেঁধেছে ... গোল্লায় যাচ্ছি, তবু থামতে পারছিনে? কাঁদবো না? ... বুঝতে পারছেন না কী হচ্ছে ... হতে চলেছে কেউ বুঝতে পারছেন না আপনারা?''[২২]

আধুনিক গণতান্ত্রিক সভ্যতার সমস্ত কু এবং কূট কৌশল পুঁটিরাম চালু করে দিয়েছেন স্বর্ণলঙ্কায়। বিভীষণের ভেতরকার সিংহাসনলোভী সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছেন।শক্তিকে অথর্ব করে রাখার অব্যর্থ উপায় 'পাতার নেশা' চালু করেছেন লঙ্কাপুরে। নতুন ব্যবস্থার মোহে রাবণ মেনে নিয়েছেন পুঁটির সব ব্যবস্থা। লঙ্কাপুরে এখন পুঁটি ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সমস্যা একটাই – ফাঁসুড়ের অভাবে হনুর ফাঁসি আটকে আছে। লঙ্কাপুরীতে হীন নীচ কুলাঙ্গার কেউ এগিয়ে আসছে না ফাঁসুড়ের পদ নিতে অথচ পদটি হীন নীচ কুলাঙ্গারের জন্য সংরক্ষিত। পেশাগত বিশেষ দক্ষতা ঃ ''মনে হিংসা থাকবে না, দৃষ্টিতে থাকবে জিঘাংসা। অধরে লেগে থাকবে হাসি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে লোকটাকে মনে হবে চির উপবাসী''[২৩] দরখাস্তের ফর্ম বিক্রি,

ফটো তোলা, পোস্টাল অর্ডার নেওয়া ইত্যাদি সব দায়িত্ব পুঁটিরামের। এমন কি ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যানও পুঁটিরাম। সব আয়োজন সত্ত্বেও একমাত্র ফাঁসুড়ের অভাবে আটকে অছে ফাঁসি।

লঙ্কাপুরীতে বন্দী হনুকে নিয়ে সবাই শুরু করেছে স্বার্থ চরিতার্থতার খেলা। সকলেরই অবৈধ আয়ের উৎস বন্দী হনু। এদিকে ফাঁসি দিতে না পেরে দশাননের সম্মানহানি ঘটছে। মান রক্ষার্থে হনুমানকে তিনি ক্ষমা করে দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু হনুমান দেখতে চায় দশাননের ক্ষমতা। কালনেমির পরামর্শে হনুকে পালাবার অবসর দিয়ে পেছন থেকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়। এই কলঙ্কজনক কাজের দায়িত্ব পায় কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ। নেশাগ্রস্ত কুম্ভকর্ণের হিতাহিতবোধ লুপ্ত আর সিংহাসনের দাবী তুলে নির্বাসিত বিভীষণ যে কোনো মূল্যে দশাননের মার্জনা চায়। কিন্তু এখানেও বিভীষণ হনুমানকে মুক্তি দেবার বিনিময়ে নিজের সিংহাসনপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে চায়। হনুমান বিভীষণের সে প্রয়াস ভেস্তে দেয়। ফাঁসুড়ে জোগাড় করতে এবার পুঁটিরাম সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে বিয়ের লোভ দেখায়। যে ফাঁসুড়ের চাকরি নেবে সে লাভ করবে সুন্দরী যুবতী দাসী মাছরাঙাকে। এই সূত্রে লঙ্কাপুরে দাসীর বিয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তবু কোনো প্রার্থী নেই ফাঁসুড়ের পদে। পুঁটিরাম বিংশ শতাব্দীর মানুষ। তিনি জানেন, হীন নীচ কাপুরুষ কুলাঙ্গার সত্তা আছে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই। উপযুক্ত অবসর সৃষ্টি করতে পারলেই তা বেরিয়ে আসবে নিশ্চিত। তাই তার পরামর্শে ফাঁসুড়ের পদের জন্য ঘোষিত হল দেশের সর্বোচ্চ স্কেল। সুযোগ-সুবিধা লঙ্কেশ্বর দশাননের চেয়েও বহুগুণ বেশি। এবার খসে পড়ল আবরণ। মনের অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল হীন নীচ কুলাঙ্গার সত্তা। উপস্থিত হল লাখ লাখ আবেদনকারী। রাজপন্ডিত, রাজবৈদ্য থেকে শুরু করে রাজভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, রাজমাতুল কালনেমি প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ কুলাঙ্গার রূপে প্রতিষ্ঠা করে চাকরিটা পেতে চায়। কারো লোভ অর্থে তো কারো সুন্দরী নারীতে। নিজেকে কুলাঙ্গার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রত্যেকেই নিজেদের কুকীর্তির তালিকা পেশ করেছে। শেষে পুঁটির পরামর্শে ফাঁসুড়ের চাকরী দেওয়া হয় 'কালজয়ী কুলাঙ্গার' পুঁটিকেই আর আবেদনকারীদের আসামী করে ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ হয়। প্রথম ঝোলানো হবে পন্ডিতকে। তার আগে পন্ডিতকে পড়তে হবে পুঁটি আর মাছরাঙার বিয়ের মন্ত্র। কিন্তু ততদিনে লঙ্কায় জেঁকে বসেছে পুঁটিতন্ত্রের মহিমা। সবাই শিখে গেছে কাজ ঝুলিয়ে রাখতে। পণ্ডিত তাই মন্ত্র শেষ না করে 'না-না-না' করে ঝুলিয়ে রাখে। ফাঁসিও ঝুলে থাকে। সকলেই পণ্ডিতকে উৎসাহ দিয়ে চলে ফাঁসি ঝুলিয়ে রাখতে। পুঁটিরাম-মাছরাঙার বিয়েও ঝুলে থাকে অনন্ত প্রতীক্ষায়।

মনোজ মিত্র এই নাটকে ব্যবহার করেছেন রামায়ণ কাহিনির আদল। প্রাচীনকালে গায়েনরা যেমন পটের ছবি দেখিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি গেয়ে বেড়াতেন, ঠিক সেভাবেই যেন বক্কেশ্বর ফেরিওয়ালা এবং তার সাগরেদ টেঁপা একালের পুঁটিরামায়ণের গায়েন। সমাজ-রাজনীতির ভ্রষ্টাচারকে কটাক্ষ করার জন্য মনোজ মিত্র এখানে রামায়ণ কাঠামোকে ব্যবহার করেছেন। তবে রাবণ-বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ-কালনেমি এবং হনুমান থাকা সত্ত্বেও এই রামায়ণ যে নিতান্তই একালের তা স্পষ্ট ত্রেতাযুগের রামের পরিবর্তে কলিযুগের

পুঁটিরামের অনুপ্রবেশে। পুঁটিরাম কালজয়ী কুলাঙ্গার। স্বরচিত রামায়ণের খোলে সে স্বয়ং বিরাজমান কলিযুগের পোশাক পরিচ্ছদ এবং জিনিসপত্রসহ। রাবণসহ লঙ্কাপুরীর সকলকে বিংশ শতাব্দীর জিনিসপত্র এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে তাক লাগিয়ে নিজের আখের গোছাতে চায় পুঁটিরাম। লঙ্কাপুরীতে চালু করে পুঁটিতন্ত্র। নাট্যকার এই পুঁটিতন্ত্রের মাধ্যমেই রঙ্গ-ব্যঙ্গ শ্লেষের তীর নিক্ষেপ করেন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকগুলির প্রতি। সীতাহরণকে রাবণ ব্যাখ্যা করেন 'নির্যাতিতা নারীর উদ্ধার' হিসেবে। হনুমান-মাল্যবান-কালনেমি-রাবণের সংলাপে দু'একটি মাত্র বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগে মনোজ মিত্র অনায়াসে ফুটিয়ে তোলেন মানবাধিকার রক্ষার নামে সারা বিশ্বের ওপর মার্কিন খবরদারির অনৈতিক প্রয়াসকে ঃ

> "হনুমান ।। পররাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপারে কেন তোরা গলাইবি মাথা!
>
> মাল্যবান ।। তোরা বলিস ঘরোয়া ব্যাপার ...
>
> আমরা বলি ব্যাপার মানবাধিকার রক্ষার!
>
> কালনেমি ।। দৃষ্টি ভঙ্গির তফাৎ বুঝিলি বজ্জাত।
>
> রাবণ ।। জগতে যেখানে উঠিবে জাগি মানবাত্মার আক্ষেপ ...
>
> সেখানেই পড়িবে রাবণের হস্তক্ষেপ।
>
> শোনরে নরাধম রামের শাবক,
>
> রাবণ হৈতে চাহে বিশ্বের নৈতিক অভিভাবক"[২৪]

পুঁটিরামের দৃষ্টিতে রাবণ 'জগতের সেই আদি পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নায়ক', কালনেমি 'রাবণের পলিটিক্যাল অ্যাডভাইসার' আর ইন্দ্রজিৎ 'হিজ ম্যাজেস্টির সাম্রাজ্যবাদী কারবারের এক নম্বর স্তম্ভ'। এই পরিচয়ের সূত্রেই রামায়ণের আগল ভেঙে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ হয়ে ওঠেন একালের সহযাত্রী। রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা রাজনীতির ভ্রষ্টাচারের প্রতি বিদ্রূপ মনোজ মিত্রের অন্যান্য নাটকের মতো এই নাটকেও সহজলভ্য। পুলিশি ব্যবস্থার প্রতি তাঁর কটাক্ষ ঃ "আমাদের কালের রক্ষী বাহিনী মানে পুলিশ কেমন শান্তশিষ্ট নম্র, সাতচড়ে রা কাড়েন না। অবশ্য দুষ্ট লোক বলে থাকে, তারা কথায় কথায় গুলি ছোঁড়ে"[২৫] নেতাদের ভাবমূর্তিপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করেতেও ছাড়েন নি তিনি ঃ "একটু ভাবমূর্তির জন্যে আমাদের কালের নেতারা মাথা কোটাকুটি করছেন, আর আপনি গড়া জিনিস গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন। ধরে রাখুন জেনারেল, ইমেজটাকে ধরে রাখুন। আখেরে ঐ ভাবমূর্তি ভাঙিয়ে খেতে পারবেন"[২৬] সাংসদদের অসংসদীয় আচরণও রেহাই পায়নি তাঁর ব্যঙ্গ থেকে ঃ "আমাদের কালে সংসদে কক্ষনো মারামারি হয় না। বড়জোর জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি ... ব্যস্"[২৭] মন্ত্রি হতে নেতাদের আগ্রহকেও ব্যঙ্গ করেছেন তিনি ঃ

> "আমাদের কালে দেখগে যা, মন্ত্রী হবে শুনে ঘাটের মড়াও তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে বসে। শুধু সে নয়, তার নাত বৌ-এর কোলের ছেলেটাকেও মন্ত্রী করবে বলে ছুটোছুটি করে"[২৮]

গণতন্ত্র, রাজনৈতিক মূল্যবোধ, আইনশৃঙ্খলা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রভৃতি গালভরা শব্দের আড়ালে যে অন্তঃসারশূন্যতা চলছে আধুনিক দেশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় তার দিকে আঙুল তুলেছেন নাট্যকার, তবে সবটাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের আবরণে। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতাকে কটাক্ষ করেছেন তিনি ঃ "আমাদের কালে বিচারব্যবস্থা মানে খালাস-ব্যবস্থা। তদন্তের রায় যতদিনে বেরুবে তদ্দিনে বিবাদী চিরতরে খালাস"[২৯] অতি প্রত্যক্ষ বিষয় সম্পর্কেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তদন্ত কমিশন বসানো হয় ঘটনার সত্যতা নিরূপণে। তাই সভায় সকলের সামনে হনুমান রাবণের গালে চড় মারলেও পুঁটিরাম তদন্ত কমিশন বসাতে বলে সত্যিই হনুমান চড় মেরেছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য। এই তদন্ত কমিশন সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য ঃ "তদন্ত মানেই হচ্ছে কর্তার ইচ্ছাপূরণ"[৩০] ফাঁসি মনোজ মিত্রের দৃষ্টিতে 'আইন মাফিক হত্যাকান্ড'। সমগ্র নাটক জুড়েই নাট্যকারের শ্লেষ ও রঙ্গের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। বক্কেশ্বরের গলায় তিনি শুনিয়েছেন আধুনিকতার ট্রাজেডি ঃ "ওইটাই তো মজা মামা মজা ওইটাই/ আধুনিক হতে মামা কুলাঙ্গার চাই"[৩১] শিক্ষকের প্রাইভেট টিউশন, চিকিৎসকের অসততা, ভেজাল কারবার প্রভৃতি কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। 'সিস্টেম' যখন মুখ্য হয়ে ওঠে তখন আসল কাজ চাপা পড়ে যায়, টিঁকে থাকে শুধু সিস্টেমের আড়ম্বর। সেই আক্ষেপ রাবণের সংলাপে ঃ "ওঃ মহাবিত্তশালী মহাপরাক্রমী রাজা রাবণ প্রশাসনের জালে জড়িয়ে পড়ে ক্রমশ অথর্ব অক্ষম জুবুথুবু দিশেহারা। একটা ফাঁসিও তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দেওয়া সম্ভব না"[৩২] দলীয় নেতা বা নেত্রীর কাছে রাজনীতিকদের পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া, যাতে প্রয়োজনে ফিরিয়ে নেওয়া যায়, রাজনীতির মূলস্রোতে টিঁকে থাকার বাসনা, পলায়নপর বন্দী হত্যা প্রভৃতি রাজনীতির অসংখ্য খুঁটিনাটিকে মনোজ মিত্র তুলে ধরেছেন এই নাটকে। তবে পুঁটিরাম তথা নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব মানুষের কুলাঙ্গার সত্তা উন্মোচনে। উপযুক্ত অবসর সৃষ্টি করে পুঁটিরাম টেনে বের করেছেন বিভীষণের রাজ্যলোভ, পন্ডিত-রক্ষীপ্রধানের উপরি আয়ের লোভ, কুম্ভকর্ণর মনুষ্যত্বনাশী নেশার লোভ, কালনেমির নারীলোভকে। যে লঙ্কাপুরে একজন মাত্র ফাঁসুড়ে পাওয়া যাচ্ছিল না, উপযুক্ত অবসর সৃষ্টি করেতেই সেখানে উপস্থিত হল লাখ লাখ আবেদনকারী – যারা প্রত্যেকেই নিজেদের শ্রেষ্ঠ কুলাঙ্গার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যগ্র। শেষপর্যন্ত সমস্ত কুলাঙ্গারের ফাঁসির আদেশ ঘোষণার মধ্যে নাটকের মনোজ মিত্র সুলভ সমাপ্তি।

মনোজ মিত্রের যে কোনো নাটকেরই প্রাথমিক লক্ষণ নাটক হয়ে ওঠা। আলোচ্য নাটকেও সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির প্রতি বহুবিধ কটাক্ষ সৃষ্টি করেও রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকে একে সমগ্র নাটক হিসেবে পূর্ণতা দিয়েছেন তিনি। ফেরিওয়ালা বক্কেশ্বর ও টেঁপার কৌতূহলোদ্দীপক প্রচারভঙ্গির মধ্য দিয়ে নাটকের সূচনা, লঙ্কার রাজসভায় রাবণের গালে হনুমানের চপেটাঘাতের পরমুহূর্তেই একেবারে কলিযুগের পোশাকে ত্রেতাযুগের রাজসভায় পুঁটিরামের আবির্ভাব, বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ধারণা ও বস্তুর সহযোগে লঙ্কার রাজসভায় বিস্ময় উৎপাদন, বিভীষণকে 'মীরজাফর' বলে সম্বোধন, রাবণের কাঁটাচামচ গিলে ফেলা, টর্চলাইট নিয়ে রাজসভায় চরম কৌতূহল প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

হনুমান ও মাছরাঙার মধ্যে রোমান্স, পুঁটিরামের অদ্ভুত এবং আশ্চর্য সংলাপ, পণ্ডিতের বিচিত্র মন্ত্রোচ্চারণ, রক্ষী কর্তৃক রাবড়ির মধ্যে ব্লটিং পেপার গুঁজে আয় বাড়ানোর উল্লেখ প্রভৃতি নাট্যগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। মাঝে মাঝেই রামায়ণের মতো কবিতার আকারে সংলাপ রচনা করে নাট্যকার রামায়ণের যুগের সৌগন্ধ এনেছেন কিন্তু সে সংলাপে নিতান্ত আধুনিক কালের অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে রূপকের আবরণটিকে ইচ্ছাকৃত খসিয়ে ফেলেছেন। যেমন, বিভীষণের সংলাপ ঃ "নির্বাসনে না হৈবে দমন/ অন্তরে জ্বলিছে হুতাশন/ শোনরে পামর ... / যথাকালে লঙ্কায় দিবে দেখা জনাব মীরজাফর"[৩৩] কৌতুক সৃষ্টিতে এসব সংলাপের ব্যবহার অনবদ্য। মনোজ মিত্র জানেন, বলার কথাটিকে শিল্পরূপের আধারে কীভাবে বলতে হয়। দৃষ্টি ও শ্রুতিনন্দন হিসেবে নাট্যশিল্পকে গড়ে তোলার কাজে তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত। তাই সমস্ত কাজের কথাকে ধারণ করেও তাঁর নাট্যসৃষ্টি একটি সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম। 'পুঁটিরামায়ণ' সেই সমগ্র শিল্পসৃষ্টিরই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

'রাজার পেটে প্রজার পিঠে', (১৯৮৮) মনোজ মিত্রের আর একটি রূপক নাটক। ভূমিকায় নাট্যকার একে 'কিশোর নাটক' বলে উল্লেখ করেছেন। অরণ্যরাজ্যের রূপকে মনোজ মিত্র এই নাটকে আসলে বলতে চেয়েছেন আমাদের পরিচিত প্রতিবেশেরই কথা, যেখানে বহুকে বঞ্চিত করে শাসক নিজের আখের গুছিয়ে নেয়। কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটকের বৈশিষ্ট্য মেনেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না শাসকের স্বার্থবুদ্ধি, তার পরিবর্তে জয়ী হয় সাধারণ প্রজারা। রাজার গুপ্ত সম্পদ প্রজাদের হাতে আসে।

বন-রাজ্যের রাজা সিংহ। তার রাজ্যচালনার মূল নীতি 'খরচা কমাও খাজনা বাড়াও'। খরচ কমানোর জন্য কতগুলি অদ্ভুত যুক্তি আছে তার। হাঁটা-চলা করতে সড়ক বানাতে চান না তিনি, কারণ হাঁটা-চলা করলেই পায়ে পায়ে সড়ক গড়ে ওঠে। হাসপাতালে ডাক্তার-নার্স-ঝাড়ুদারদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরার চেয়ে বাড়িতে মায়ের কোলে মাথা রেখে মরা অনেক শ্রেয় বলে হাসপাতাল অপ্রয়োজনীয়। দেশের সংকট সকলের কাছে তুলে ধরতে রাজা নিজে পরেন বৈঁচি ফলের মালা আর লোহার বর্ম। লোহার বর্ম দামে সস্তা, টেঁকসই, আবার কাচার খরচও নেই। রেপসিডে রান্না করা খোড়-চচ্চড়ি রাজার খাদ্য। অর্থ ব্যয়ের নাম শুনলেই রাজার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। রাজকর্মচারীরা কেউই পুরো বেতন পান না। বেতনের কথা তুললেই রাজার মনটা টকে যায়, একচোখে ছানি পড়েছে বলে মাকে তিনি আধখানা চশমা পরিয়ে রেখেছেন। খরা-পীড়িতদের বন্যার অঞ্চলে আর বন্যাপীড়িতদের খরার অঞ্চলে পাঠিয়ে একই সঙ্গে দুই সমস্যার সমাধান করা গেছে ভেবে তিনি অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। বন্যার্তদের ত্রাণ প্রসঙ্গে তার উক্তি ঃ

> "টাকা ছাড়া ত্রাণ করা যায় না? এই তো বললে খাদ্যশস্য ভেসে গিয়েছে। ভেসে আর কদ্দুর যাবে। যাও ওদের গিয়ে বলো যে যার খাদ্যশস্য খুঁজে পেতে ধরে এনে রাজভাণ্ডারে জমা দিয়ে যাক। তারপর আমি আমার মতো ত্রাণ ব্যবস্থা করবো"[৩৪]

প্রজাদের ত্রাণ দেবার পরিবর্তে তিনি নিজের পায়ের ধুলো মন্ত্রির হাতে দিয়ে বলেন যে, বন্যা

ও খরাপীড়িতদের মাথায় ছড়িয়ে দিতে। পদধূলির সাহায্যে তারা খরা ও বন্যার বিপদ থেকে মুক্ত হবে। কিপটে রাজার রাজ্যে মূর্তিমতী বিদ্রোহ ময়ূর। সে রংচঙে জামা পরে, পায়ে সোনার নূপুর বেঁধে, নেচে গেয়ে বেড়ায়। সে ফাঁস করে দিয়েছে রাজার লুকোনো রত্নগুহার সংবাদ। ময়ূরকে কিছুতেই কব্জা করতে পারেন না রাজা। এদিকে ছত্রধারী রাসভও একদিন শুনে ফেলেছে ঘুমের মধ্যে রাজা বিড়বিড় করে বলছিলেন, পাহাড়ের মাথায় সুন্দর সরোবরের ওপর ঝুলন্ত হিরের প্রাসাদ বানিয়ে শেষ জীবন তিনি আরামে কাটাবেন। সেখানে কাউকে এমনকি নিজের মাকেও নিয়ে যাবেন না। বন্যার্ত হরিণ-হরিণী এবং খরাপীড়িত শশকেরা রাজপ্রাসাদের সামনে বসে পড়েছে। রাজার অশ্বশক্তি এবং বিমান শক্তি (বাজপাখি) উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে দুর্বল, সুতরাং শক্তির জোরে অবস্থানকারীদের হটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। রাজাকে ভেট দেবার জন্য শরণার্থীরা যে নারকেল আর ঘি-গুড় এনেছিল তা দিয়ে রাজপ্রাসাদের সামনে তারা ভাজছে 'মুখসামালি পিঠে'। তাদের বক্তব্য, রাজাও যদি তাদের মতো নিজের ঘরে পিঠে বানাতে পারেন তা হলে ওরা ঘেরাও তুলে নেবে। কিপটে রাজার হাত ওরা খোলাবেই। ওরা দুয়ো দিচ্ছে – ওরা যা পারে রাজা তা পারেন না। অতিষ্ঠ হয়ে রাজা যখন প্রজাদের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছেন তখন এসে উপস্থিত গুপ্তঘাতক ঋক্ষ। যে গুপ্তঘাতক এর আগে রাজার আদেশে বিদ্রোহীদের পেট চিরে দিয়েছে, রাজার পিতাকেও যমালয়ে পাঠিয়েছে, আজ তারই ওপর রাজা ভার দিয়েছেন হরিণ-শশক নিধনের। ঋক্ষ বেরিয়ে গেছে কর্মসাধনে। আর রাজা আকুল হয়েছেন মুখসামালির গন্ধে। নিজে খরচ করবেন না, তাই রসনা তৃপ্তির জন্য তিনি আদেশ দেন শরণার্থীদের মুখের পিঠে ছিনিয়ে আনতে। ছিনিয়ে আনা সেই পিঠে রাজা যখন গোগ্রাসে গিলছেন তখনই ঋক্ষ এসে জানায় হরিণ-শশক বধের জন্য সে পিঠেতে সেঁকো বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত রাজা এবার নিজের সমস্ত গোপন কীর্তি প্রকাশ করে দেন। রত্নগুহার চাবি মায়ের হাতে দিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ প্রজাদের ফিরিয়ে দিতে বলেন, কারণ প্রজাদের নিঃস্ব করেই গড়ে উঠেছিল সেই ধনভাণ্ডার। কিপটে রাজার রাজ্যে ডাক্তার, ঔষধ, হাসপাতাল কিছুই নেই। তাই অসহায়ভাবে মরতে হবে রাজাকে। কিন্তু রত্নগুহার চাবি দিয়ে দেবার পর রাজা জানলেন বিষ নয় – পিঠেতে মেশানো ছিল মধু। পবননন্দনের পরামর্শে ঋক্ষ নিজের পূর্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কৌশলে কিপটে রাজার হাত খুলিয়েছে। প্রজাদের সম্পদ প্রজাদের হাতে ফিরে আসায় সকলের আনন্দ এবং ময়ূরের গানে নাটকের সমাপ্তি।

কিশোর মনের উপযোগী এই নাটকে মনোজ মিত্র অরণ্য রাজ্যের রূপকের আড়ালে আসলে মানব সমাজেরই কথা বলে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন ঃ "সবকে মেরে আপনা বাঁচা হয়না হয়না"[৩৫] বাঁচতে হয় সকলকে নিয়ে। সে বাঁচাতেই প্রকৃত আনন্দ। যারা স্বার্থপরের মতন বহুকে বঞ্চিত করে কেবল নিজেই বাঁচতে চায় তাদের মনোজ মিত্র কিপটে রাজার মতো দশাই করেন। কিশোর নাটক হলেও নাট্যকার এখানেও সুযোগমতো বলে দিয়েছেন তাঁর বলার কথাগুলি, অবশ্যই নাট্যিক শর্ত অক্ষুণ্ণ রেখে। সমস্যা সমাধানে শাসকের অদ্ভুত যুক্তির ইঙ্গিত আছে সড়ক ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং বন্যা ও খরার সমস্যা প্রসঙ্গে। হাসপাতালের

অব্যবস্থা সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন মনোজ মিত্র সুযোগ পেতেই ঃ''হাসপাতাল একটি সুবৃহৎ আস্তাকুঁড়, পুঁজ-রক্ত-মাছি-ব্যান্ডেজ। আমি বলছি, নাকে সর্দি নিয়ে ঢুকবে পেটে ছুরি-কাঁচি নিয়ে ফিরে আসবে''[৩৬] মনোজের দৃষ্টিতে হাসপাতাল হল 'হুশপাতাল', যেখানে ভরতি হলে বেহুঁশ হয়ে হুশ্‌শ্‌ করে পাতালে চলে যেতে হয়। দেশের সংকটকালে সকলকে কৃচ্ছ্রসাধনের উপদেশ দিয়ে এবং কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন না দিয়ে, প্রজাদের নিঃস্ব করে যে শাসক গোপনে নিজের বিলাসের উপকরণ সঞ্চয় করেন তিনি কেবল রূপকথার রাজ্যের অধিবাসী নন, বরং আমাদের পরিচিত জগতেই তার আনাগোনা। শরণাগত প্রজাকে রক্ষা নয়, শরণার্থীদের বল প্রয়োগে বিতাড়িত করা এবং তাদের সর্বস্ব হরণ করা যে শাসকের নীতি তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন মনোজ মিত্র এই নাটকে।

'' 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' তে হবু রাজা ও গবু মন্ত্রীর বহুচেনা প্রায় আর্কিটাইপাল জুটিকে মনোজ ব্যবহার করেন চারপাশের সমাজ রাজনীতির ভ্রষ্টাচারকে ব্যঙ্গের চাবুকে ফালাফালা করার জন্য''[৩৭] – বলেছেন শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়। ১৯৯২ সালে রচিত এই নাটকে দ্বিতীয় হবু ও দ্বিতীয় গোবুর রাজত্বকাল বর্ণনা করতে গিয়ে মনোজ মিত্র আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন ফাঁকফোকরের দিকে আঙুল তুলেছেন। জ্যোতিষী ইন্দুগুপ্তের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে প্রথম হবুচন্দ্র নোবেল পুরস্কার আশা করেছিলেন। তিনি সেই আশায় এবং তার মন্ত্রী প্রথম গোবুচন্দ্র নোবেল পুরস্কারের প্রাইজমানির ভাগ পাবার আশায় থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে পাগল হয়ে যান এবং তাদের স্থান হয় পাগলা গারদে। এরপর শাসনভার গ্রহণ করেন দ্বিতীয় হবু-গোবু। এই দ্বিতীয় হবুও জ্যোতিষী বাঁকাশশীর কথায় বিশ্বাস করেছেন, তার হাতে নোবেল প্রাইজের রেখা ফুটে উঠেছে। মন্ত্রি গোবু নিজেদের বাবাদের কথা স্মরণ করিয়ে রাজাকে সাবধান করেছেন। কিন্তু রাজা তখন নোবেলের স্বপ্নে বুঁদ। তবে বেশ কিছু সতর্কতাও তিনি নিয়েছেন। বাঁকাশশীর কাছ থেকে বাহাত্তর ঘন্টার টাইম বেঁধে নিয়েছেন, গোবুর পীড়াপীড়িতে চন্দ্রপুলিকে দায়িত্ব দিয়েছেন আচরণে অস্বাভাবিকতা কিছু দেখলেই সতর্ক করতে। সাগরপার থেকে নোবেলকর্তার ফোন এসেছে, দ্বিতীয় হবুচন্দ্র পাবেন নোবেল শান্তি পুরস্কার। যে দেশে দিন দুপুরে চুরি ডাকাতি খুন জখম ধর্ষণ চলে অবাধে, সেই দেশের শাসক পাবেন নোবেল শান্তি পুরস্কার। এই সময় দেশের কোথাও সামান্যতম অশান্তির সংবাদে ফস্‌কে যেতে পারে নোবেল। তাই যে কোনো প্রকারে শান্তি স্থাপন এখন একমাত্র লক্ষ্য। গোবু প্রাইজামানির হাফশেয়ার চায়, কারণ তার বিশ্বাস, তারই দক্ষ পরিচালনায় দেশময় শান্তি বিরাজিত। বাঁকাশশী তাকে পাগল প্রতিপন্ন করার ভয় দেখিয়ে নতি স্বীকারে বাধ্য করেন। বাঁকাশশীরই পরামর্শে দেশের সমস্ত দুষ্কৃতীকে আত্মসমর্পণে আহ্বান জানান রাজা হবুচন্দ্র। সে আহ্বানে সাড়া দেয় দস্যু, চোর এবং পকেটমার। রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশা ত্যাগ করতে রাজি কিন্তু তাদের প্রতিদিনের উপার্জন রাজকোষ থেকে মিটিয়ে দিতে হবে। যদিও প্রত্যেকের দৈনিক উপার্জন সমান নয় তবু এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন – এই যুক্তিতে প্রত্যেকেরই দাবী দৈনিক সাড়ে পাঁচ লাখ। রাজকোষে অর্থ নেই, সুতরাং বাঁকাশশীর পরামর্শে সকলকে মন্ত্রি করে নেওয়া হল। চোর

ডাকাত পকেটমার এবং তাদের আত্মীয়দের নিয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মন্ত্রিসভা গড়লেন দ্বিতীয় হবুচন্দ্র। গোবুর সব দপ্তর কেড়ে নিয়ে অন্যদের দেওয়া হলে ক্ষিপ্ত গোবু ফোনে নোবেলকর্তার কাছে হবুচন্দ্রের নামে ভাংচি দিতে যায় আর তখনই আবিষ্কৃত হয় ফরেন এক্সচেঞ্জ ফুরিয়ে যাওয়ায় সাগরপারের লাইন একমাস থেকে বন্ধ। জ্যোতিষী বাঁকাশশীই বাইরে থেকে ফোন করে হবুচন্দ্রকে প্রলুব্ধ করেছেন। এই বাঁকাশশী আসলে ছদ্মবেশে সেই ইন্দু গুপ্ত, হবু-গোবুর কুশাসন থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করাই যার উদ্দেশ্য। চোর-ডাকাত-পকেটমার রূপে যারা এসেছে তারাও আসলে সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক শক্তি। দেশের সমস্ত দপ্তরের চাবি এসেছে সাধারণ মানুষের কাছে, প্রথম হবু-গোবুর মতো দ্বিতীয় হবু-গোবুও পাগল হয়েছে এবং তাদের আর বংশধর নেই বলে হবু-গোবুর কুশাসন থেকে দেশ রক্ষা পেয়েছে। মনোজ মিত্রের নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই শেষপর্যন্ত অন্যায়কে পর্যুদস্ত করে ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

হবু-গোবুর রাজতন্ত্রের রূপকের আড়ালে মনোজ মিত্র এই নাটকে রঙ্গ এবং ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপ করেছেন সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে। রাষ্ট্রপ্রদত্ত পুরস্কারগুলির প্রদান ব্যবস্থার অস্বচ্ছতা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যঙ্গ ঃ

> "হবু ।। ... দ্যাখো আর সব খেতাব পুরস্কার – মানে দেশরত্ন দেশমুক্তা দেশচুনি দেশপান্না দেশহীরা ...
>
> চন্দ্রপুলি ।। মানে যে যে খেতাব পুরস্কার এই দেশে মহারাজ নিজ হস্তে বিতরণ করেন ...
>
> হবু ।। এ পর্যন্ত তার সবগুলিই আমি পেয়েছি, মানে ...
>
> চন্দ্রপুলি ।। মানে মহারাজই মহারাজকে বিতরণ করেছেন ..."[৩৮]।

দেশে অপরাধ যতই ঘটুক না কেন, তাকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা শাসকের চিরন্তন। হবুচন্দ্রও চব্বিশ ঘন্টায় আড়াইশো চুরি ডাকাতির সংবাদ পেয়ে বলেন ঃ "মাত্তর আড়াইশো। তবে তো পরিস্থিতি পুরো কনট্রোলে। বলো, শান্তি বিরাজ করছে"[৩৯]। হবুর এই সংলাপ সহজেই মনে করিয়ে দেয় পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত যে কোনো অপরাধের পর এ রাজ্যকে 'শান্তির মরূদ্যান' বলে শাসকের আত্মশ্লাঘা অনুভবের বিষয়টিকে। দেশে অবস্থা যেমনই থাক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলতে যে কোনো শাসকই হবুচন্দ্র ঃ "আওয়াজ ছাড় – এ দেশ শান্তির দেশ, মহাশান্তির দেশ ... দেশজুড়ে একটা শান্তি উৎসব লাগা"[৪০]। দেশের অক্ষম পুলিশি ব্যবস্থাও রেহাই পায় না মনোজ মিত্রের ব্যঙ্গ থেকে ঃ

> " যে দেশে দিনদুপুরে চুরি ডাকাতি খুনজখম ধর্ষণ মর্ষণ সবই চলে, সে দেশে টাকা ব্যয় করে পুলিশ প্রশাসন সাজিয়ে রাখার কী দরকার। তার চেয়ে আমাদের মতন কাকতাড়ুয়া পুষুন মহারাজ ... আর কিছু না হোক খোকাখুকুরা আমাদের দেখে একটু ভয় পাবে"[৪১]

বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতাকেও কটাক্ষ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ

"গোবু ।। ধরা না হলে কী হয়েছে, তদন্ত চলছে। যথা সময়ে তদন্তের ফল জানতে পাবে!

হবু ।। তুমি না পেলে তোমার ছেলে পাবে ...

গোবু ।। সে না পেলে নাতি পাবে ...

হবু ।। দীর্ঘদিন তদন্ত না হলে সেপাই দারোগা চৌকিদার হাকিম মোক্তারদের চলবে কি করে বাপু?"[৪২]

অদ্ভুত যে এক স্থিতাবস্থাকে শান্তি বলে প্রচার করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন শাসক এবং প্রতিবাদহীন নিশ্চেষ্টতায় সেই স্থিতাবস্থাকে মেনে নিয়ে বালিতে মুখ গুঁজে থাকে যে মধ্যবিত্ত তার প্রতি মনোজ মিত্রের ব্যঙ্গ ঝাঁঝালো রূপ নিয়েছে। বিনা প্রতিবাদে সব মেনে নেবার স্থবিরতা তাঁকে এখানে ক্ষিপ্ত করেছে। প্রয়োগমূলক রাজনীতির কারণে অধস্তন ব্যক্তিও কী ভাবে ওপরওয়ালার নেতা হয়ে ওঠে তাও দেখিয়েছেন তিনি ঃ "দেখুন, আমি ক্লাস ফোর স্টাফ হতে পারি, কিন্তু ইউনিয়নের সেক্রেটারি"[৪৩] রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনোজ মিত্র Serious. কৌতুকের আবরণ নয়, ব্যঙ্গ তখন উন্মুক্ত এবং তীব্র। চোর দস্যু পকেটমার নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন হবুচন্দ্র। এতদিন যেসব অপকর্ম করতে হত লুকিয়ে চুরিয়ে এবার থেকে তা করা যাবে প্রকাশ্যে। মন্ত্রীত্ব মানেই মনোজ মিত্রের দৃষ্টিতে প্রকাশ্যে অপকর্ম করার লাইসেন্স ঃ "আর তো লুকোছুপি থাকল না, চোরাগোপ্তা থাকল না, মেহনত থাকল না – কিন্তু আমদানি থাকল। আরো বেশি থাকল"[৪৪]

সমাজ-রাজনীতির ভ্রষ্টাচারকে ব্যঙ্গের চাবুকে পীড়ন করতে গিয়ে মনোজ মিত্র কিন্তু নাটককে বক্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি। নাটকীয়তার শর্ত প্রাথমিকভাবে রক্ষা করেছেন। হবু-গোবুর কাহিনি বয়নের ভূমিকা হিসেব গান ব্যবহার করেছেন, একটি নির্দিষ্ট ঘটনা (হবুচন্দ্রের নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা) অবলম্বনে কাহিনির সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি দেখিয়েছেন, আগাগোড়া কৌতুকের আবরণটি রক্ষা করেছেন। চন্দ্রপুলি, প্রেমশশী, বাঁকাশশী প্রভৃতি চরিত্র কমেডির মাপে রচিত। নেপথ্যে পাগলাগারদে বন্দী প্রথম হবুচন্দ্র ও প্রথম গোবুচন্দ্রের কণ্ঠস্বর এবং বাদ্যযন্ত্রের উৎকট আওয়াজ নাটকীয় প্রতিবেশ রচনা করেছে ও দ্বিতীয় হবু-গোবুর সম্ভাব্য পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছে। হবু-গোবুর সংলাপে মনোজ মিত্রের নিজস্ব ধরণে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে ঃ

"গোবু ।। (লাফাতে লাফাতে) মহারাজ! সাগরপারের কল! নোবেল প্রাইজের বড়কর্তা হটলাইনে আপনাকে ডাকছে মহারাজ!

(শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল হবু – তারপর ঘোর অবিশ্বাসে –)

হবু ।। যাঃ

গোবু ।। হ্যাঁ, এ বছর প্রাইজের জন্যে আপনার নাম প্রস্তাবিত হয়েছে!

হবু ।। (লজ্জায় রাঙা হয়ে) দূর! ইয়ার্কি মেরো না তো !

গোবু ।। (হবুর দিকে রিসিভার বাড়িয়ে ধরে) মাইরি মহারাজ, বাবার দিব্যি! কোন্ শালা ইয়ে করে ...

হবু ।। (লজ্জায় সন্দেহে আশায় অবিশ্বাসে বিচিত্র হয়ে উঠে তোতলাতে শুরু করে) যাঃ আ-আমার নাম প্র-প্রস্তাব হবে কেন ? ধ্যা-অ্যাৎ-আ-আ-মি কে-এ একটা ?"[৪৫]

এসব সংলাপে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মঞ্চের ওপর অভিনয়রত মনোজ মিত্র। কৌতুকের এই আবরণ সরিয়ে আবার প্রয়োজনের সময় মনোজ মিত্র Serious কথাটিও বলিয়ে নেন তাঁর চরিত্রকে দিয়ে ঃ

"উচ্ছব মচ্ছোব দিয়ে সত্যিকথাটা আড়াল করা যাবে না মন্ত্রিমশাই! এখনো যদি ঐ চোর ডাকাত খুনে লম্পটদের শাসন না করেন, আমরাও পাল্টা আওয়াজ ছাড়বো – দেশে শান্তি নেই ! শান্তি পুরস্কার জলে পড়ছে!"[৪৬]

রূপকের আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে প্রধানত যে চারটি নাটকে তার মধ্যে 'মেষ ও রাক্ষস' Serious নাটক, বাকি তিনটি কমেডির ভঙ্গিতে রচিত। তবে সবগুলি নাটকেই মনোজ মিত্রের আক্রমণের লক্ষ্য সমাজ-রাজনীতির ভ্রষ্টাচার। কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ-অনুসারী ইচ্ছাপূরণের নাটক নয় মনোজ মিত্রের, তবে তাঁর আছে নিজের বিশিষ্ট নাট্যরচনার ধরণ। সেখানে পরিনামে শুভশক্তির জয় ঘোষিত হয় কিন্তু তা কখনো আরোপিত মনে হয় না, নাট্যদেহের নিপুণ গঠন কৌশলের সুচারু পরিণতিরূপেই উপস্থাপিত হয়। তিনি নিজের বলার কথাটিকে বেশিরভাগ সময়েই বলেন কৌতুকের আবরণে, তবে কখনো কখনো প্রয়োজনে কৌতুককে দূরে সরিয়ে নির্মম ব্যঙ্গের শরও নিক্ষেপ করেন। কোনো বিশেষ আদর্শ-অনুসারী নয় বলে মনোজ মিত্রেব আঘাত কোনো বিশেষ কারো দিকে নয়, বরং তা এক সাধারণীকৃত প্রতিবাদের রূপ পায়। কেনো কোনো সমালোচক তাঁর নাট্যরচনার এই ভঙ্গিটিতে গভীরতার অভাব খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু মধুসূদন-দীনবন্ধুর উত্তরসূরী মনোজ মিত্রের নাট্যরচনা কোনো বিশেষ মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সামাজিক জঞ্জাল অপসারণের জন্য। সে জঞ্জাল সরাতে গিয়ে তিনি সেখানেই প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানেই রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের তীর নিক্ষেপ করেছেন। যেখানেই দেখেছেন ভ্রষ্টাচার সেখানেই যেন কান মুলে দেখিয়ে দিয়েছেন সত্য পথটিকে। তবে তাঁর এই শোধন-প্রয়াস সবসময়ই সহমর্মীর বেদনা-সঞ্জাত। এই কারণেই তাঁর দৃষ্টি প্রসন্ন, বাণী সরস। তিনি জানেন স্খলন-পতন মানুষের-ই বৈশিষ্ট্য। স্খলিত, পতিত মানুষকে তিনি ধুলো ঝেড়ে-মুছে পৌঁছে দেন শুদ্ধ চৈতন্যের জগতে, সেখানেই তাঁর অনন্যতা।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) 'সাহিত্য প্রকরণ - হীরেন চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থে উৎকলিত। তৃতীয় সংস্করণ - বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ - কলকাতা- পৌষ ১৪০৬, পৃ.১৩৭

২) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস্-১৯৯০, পৃ.৩৫০

৩) ঐ, পৃ.৩৫০

৪) মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু-স্যাস্-১৯৯৩, পৃ.৮৫

৫) ঐ, পৃ.৯১

৬) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস্-১৯৯০, পৃ.৩৫০

৭) মেষ ও রাক্ষস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.- ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ - মাঘ ১৪১৩, পৃ.৯৫

৮) ঐ, পৃ.৯৫

৯) ঐ, পৃ.৮৫

১০) ঐ, পৃ.৬৩

১১) ঐ, পৃ.৬৫

১২) ঐ, পৃ.৬৬

১৩) ঐ, পৃ.৬৮

১৪) ঐ, পৃ.৭৩

১৫) ঐ, পৃ.৭৯

১৬) ঐ, পৃ.৮০

১৭) ঐ, পৃ.৯২

১৮) ঐ, পৃ.৯৫

১৯) ঐ, পৃ.৯৫

২০) ঐ, পৃ.৯৫

২১) পুঁটিরামায়ণ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২৯৭

২২) ঐ, পৃ.৩০৯

২৩) ঐ, পৃ.৩০৬

২৪) ঐ, পৃ.৩০০

২৫) ঐ, পৃ.৩০২

২৬) ঐ, পৃ.৩০২

২৭) ঐ, পৃ.৩০৩

২৮) ঐ, পৃ.৩১৫

২৯) ঐ, পৃ.৩০৪

৩০) ঐ, পৃ.৩০৫

৩১) ঐ, পৃ.৩০৬

৩২) ঐ, পৃ.৩২৪

৩৩) ঐ, পৃ.৩১৭

৩৪) রাজার পেটে প্রজার পিঠে - মনোজ মিত্র - অপেরা - ৬৫ সূর্যসেন স্ট্রীট - কোলকাতা-০৯ - মাঘ ১৩৯৯, পৃ.২৪

৩৫) ঐ, পৃ.৬৩

৩৬) ঐ, পৃ.১৬

৩৭) দশ আঙুলের অঞ্জলি - 'মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্ক'-এর ভূমিকা - অশোক মুখোপাধ্যায় - অপেরা - ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রীট - কোলকাতা-০৯ - মাঘ ১৪০৭

৩৮) নিউ রয়্যাল কিস্‌সা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ.২৬১

৩৯) ঐ, পৃ.২৬৫

৪০) ঐ, পৃ.২৬৯

৪১) ঐ, পৃ.২৬৬

৪২) ঐ, পৃ.২৬৬

৪৩) ঐ, পৃ.২৭৯

৪৪) ঐ, পৃ.২৮০

৪৫) ঐ, পৃ.২৬৭

৪৬) ঐ, পৃ.২৬৯

রহস্য নাটক ঃ 'পাহাড়ী বিছে' ও 'বেকার বিদ্যালংকার'

নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু এবং পটভূমি নির্বাচনে মনোজ মিত্রের লেখনীকে বলা চলে সর্বত্রগামী। দীর্ঘ নাট্যজীবনে তিনি দু'টি রহস্যনাটক রচনা করেছেন – 'পাহাড়ী বিছে' (১৯৭৬-৭৭) এবং 'বেকার বিদ্যালংকার' (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৯৮)। প্রথমটির পটভূমি শৈলশহর দার্জিলিং এবং দ্বিতীয়টির পটভূমি কোলকাতার অভিজাত অঞ্চল সল্টলেকের এক অফিস বাড়ি। 'পাহাড়ী বিছে' নাটকে ভয়াল ভীষণ রহস্য সৃজন করেছেন নাট্যকার। যমজ দুই বোন কণা এবং রত্না আকৃতিতে একরকম হ'লেও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত। অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক রাজা রায় 'হোটেল মুনমুন'কে কেন্দ্র করে অবৈধ ব্যবসা চালায়। ঝকঝকে মুখোশের আড়ালে সে ঢেকে রাখে নিজের কদর্য রূপ। ধনী মেয়েদের নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা আকর্ষণ করে তাদের সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে খুন করে সে। সম্পত্তির লোভে এই রাজা রায় বিয়ে করেছে কণাকে কিন্তু বিয়ের পর থেকে কণার বোন রত্নার প্রতিই তার আকর্ষণ। ছোটোবেলা থেকেই কণার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ রত্নাও রাজাকে ছিনিয়ে নিয়ে কণাকে আঘাত দিতে চায়। রত্না কোলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়ে। কণার বাড়িতে থাকেন তাদের এক কাকা। তাদের বাবার সমস্ত সম্পত্তি কণার নামে লিখে কাকা রত্নার জন্য কেবল মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে রত্নার আক্রোশ আরো তীব্র। রত্নাকে ভালোবাসার পাশাপাশি রাজা ভালোবাসে অর্থ। মালিনী, ডোরা, কণা, রত্না প্রত্যেকের সঙ্গেই সে ভালোবাসার অভিনয় করেছে মাত্র। কণা যখন কিছুতেই নিজের সম্পত্তি রাজার নামে লিখে দিচ্ছে না, তখন রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার পরিকল্পনা ছিল, সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার পর কণাকে ডিভোর্স করে রত্নার সঙ্গে ঘর বাঁধবে। কিন্তু সম্পত্তি না পেয়ে সে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। এদিকে রত্না পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে চলে এসেছে দিদির বাড়িতে। সে ক্রমাগত রাজাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। রাজা অনেকবার ভেবেছে কণাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার কথা, কিন্তু মন স্থির করে উঠতে পারেনি। যেদিন রত্নার মুখে খবর পেল যে, কণা উকিল ডেকে উইল করছে এবং সম্ভবত পূর্বপ্রেমিক সুব্রত'র স্কুলের নামে সব দান করে দিচ্ছে, সেদিন সম্পত্তি হাত থেকে বেরিয়ে যাবার আশঙ্কায় রাজা বিপর্যস্ত। মদের টেবিলে চৌধুরীর পরামর্শে রাজা সেদিন চরম সিদ্ধান্ত নেয়। কণাকে 'মাইনাস' করে তার জায়গায় রত্নাকে কণা বলে চালাবে আর রত্না তখন কণা সেজে সম্পত্তি লিখে দেবে রাজার নামে। রত্নার চিন্তাক্ষমতা লোপ করতে তাকে ড্রাগে অভ্যস্ত করে তুলতে থাকে রাজা।

কণা এই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে চিঠি লিখেছে পূর্বপ্রেমিক সুব্রতকে। রাজার মুখোশ ছিঁড়ে দিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ডোরা ল্যামবার্ট যেদিন বুঝেছে যে, রাজা তার সঙ্গে প্রতারণা করছে সেদিন সে কণার কাছে এসে জানিয়ে দিয়েছে রাজার আগের সব কীর্তি, জানিয়ে দিয়েছে কণাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা। কণার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হয়েছে ঃ "ওর মুখোশ আমি ছিঁড়ে দেবো। ও যেমন আমার জীবনটা নষ্ট করেছে ... যদি বেঁচে থাকি ... তেমনি আমিও ওর ..."[১]। কিন্তু সুব্রত এসে পৌঁছবার আগেই রাতের অন্ধকারে সিল্কের ফাঁস জড়িয়ে রাজা সাঙ্গ করল হত্যালীলা। কিন্তু কাকে সে হত্যা করল? কণা না রত্না? সুব্রত এসে যাকে দেখল তাকে তো তার কণা বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন তবে সে সুব্রতকে

এবং কাকাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল? পাহাড়ী কিশোরীর গায়ে কণার চাদর দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুব্রত বুঝতে পারে, রাজা কণাকে হত্যা করে রত্নাকে কণা সাজিয়ে রেখেছে। এই বুঝে ফেলার শাস্তি হিসেবেই তাকে বন্দী হতে হয়। অন্যদিকে ডোরা ল্যামবার্টও কাল্পনিক এক টেপ রেকর্ডারে রাজার সব কথা ধরা আছে বলে রাজাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। ডোরা এবং সুব্রতকে হোটেলের গুমঘরে রেখে হোটেলে আগুন দিয়ে দার্জিলিং-এর পাট চুকিয়ে রাজা আবার অন্য জায়গায় গুছিয়ে বসবে। কিন্তু তার আগে আরো একটা 'মাইনাস' করবে সে এবং তা রত্নাকে। রত্না দিনরাত কণার ভূত দেখছে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। হত্যার সব প্রমাণ সে নিয়েছে পুড়িয়ে ফেলার জন্য, তবু তার স্বস্তি নেই। তাই তাকে 'মাইনাস' করে সমস্ত প্রমাণ লোপ করতে চায় রাজা রায়চৌধুরী। পাহাড়ী বিছের বিষ দিয়ে যখন সে হত্যা করতে যায় তখনই তাকে চমকে দিয়ে প্রকাশিত হয় আসল সত্য- আগে যাকে হত্যা করা হয়েছে সে আসলে রত্না আর এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে কণা। এই কণার কাছে রাজার সমস্ত অপকর্মের প্রমাণ মজুত। এদিকে ডোরার নীরব প্রেমিক লাল সিংয়ের চেষ্টায় সুব্রত এবং ডোরা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে। শেষে সুব্রত, কাকাবাবু এবং পুলিশ (যে কিনা এতদিন 'হাতিয়া' নামের আড়ালে রাজার দলে কাজ করছিল সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে) এসেছে এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে অন্যমনস্কভাবে অন্যের জন্য আনা পাহাড়ী বিছের কৌটোয় হাত দিয়ে ফেলায় তীব্র দংশনে রাজার মৃত্যু হয়েছে। কণা-সুব্রত'র নতুন জীবনের ইঙ্গিতে নাটক শেষ করেছেন মনোজ মিত্র।

এই নাটকে স্মাগলিং-ব্ল্যাকমেলিং আছে, গুলি-বন্দুক আছে, গুন্ডার ছদ্মবেশে পুলিশ আছে, ভাড়াটে গুন্ডা আছে, গুমঘর আছে, হোটেলের বারে গান আছে, তীব্র নাট্যোৎকণ্ঠা আছে, Dramatic Relief হিসেবে গড়গড়ি এবং চৌধুরীর কৌতুক আছে – এককথায় পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী রহস্য নাটকের সব মশলাই এতে মজুত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই নাটক প্রথম অভিনীত হয় রামমোহন মঞ্চে ১৭ মার্চ, ১৯৯১, পর্ণিকা এন্টারপ্রাইজ-এর প্রযোজনায়। নাটক জমিয়ে দেবার সব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও পড়তে গিয়ে বারবার মনে হয়, এধরণের নাটক মনোজ মিত্রের উপযুক্ত বিচরণক্ষেত্র নয়। যে কৌতুক তাঁর শরসন্ধানের মূল অবলম্বন, এই নাটকে গড়গড়ি চরিত্রে তা অনেকটাই স্থূল। কণা ও রত্নার মধ্যে মিল কতটা – প্রকৃতপক্ষে তা বোঝাতেই গড়গড়ির নাটকে উপস্থিতি। কিন্তু তার ভাঁড়ামো কোনো কোনো সময় মাত্রাছাড়া। নেপালি বৃদ্ধ এবং তার নাতিকে নিয়ে এসে নাটকে একটা আঞ্চলিক সৌগন্ধ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন নাট্যকার। তবে সম্ভবত কোলকাতার দর্শকের বোধগম্য করার জন্যই সংলাপে নেপালি ভাষার ইচ্ছাকৃত বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। কণার মৃত্যুসংবাদ নিশ্চিত করে রহস্যজাল ঘনীভূত করার জন্যই এই দৃশ্যটির উপস্থাপনা। যে রকম চরিত্রের আশ্রয়ে সাধারণত তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়ে থাকে, এই নাটকে তার ইঙ্গিত আছে কেবল কাকাবাবু, লাল সিং এবং সুব্রত চরিত্রে। কাকাবাবু সহায়-সম্বলহীন আশ্রিত। তিনি একান্তভাবে কণার শুভচিন্তক। লাল সিং ডোরা ল্যামবার্টের নীরব প্রেমিক। চরম বিপদের সময় সে গোপন দরজা দেখিয়ে দিয়ে ডোরা এবং সুব্রতর প্রাণ বাঁচিয়েছে কিন্তু নিজে লুটিয়ে পড়েছে গুলির আঘাতে। সুব্রত কণার প্রেমিক কিন্তু নিজের আর্থিক দুর্বলতা তাকে প্রেমে প্রত্যয়ী করতে পারে নি। ব্যর্থতার বিষাদ থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে সে গ্রহণ করেছে শিশু-সাহচর্য। বস্তির ছেলে-মেয়েদের বিনে পয়সায় শিক্ষা দেবার

আদর্শ নিয়ে সে গড়ে তুলেছে 'শিশুমেলা'। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও বলতে হয় যে, 'পাহাড়ী বিছে' মনোজ মিত্রের প্রতিভার প্রতি সুবিচার নয়। নাটক জুড়ে অসংখ্য রোমহর্ষক ঘটনা, একের পর এক ঘটনা এবং সুখদায়ক পরিণতি অনেকটাই সিনেম্যাটিক। সম্ভবত এই কারণেই তাঁর নাট্যধারায় 'পাহাড়ী বিছে' প্রায় নিঃসঙ্গ।

'পাহাড়ী বিছে'র মঞ্চসাফল্য সম্ভবত মনোজ মিত্রকে উৎসাহী করেছিল আর একটি রহস্য নাটক 'বেকার বিদ্যালংকার'-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করতে। ১৯৯১, মার্চ মাসে 'পাহাড়ী বিছে'র মঞ্চায়নের পর আশ্বিন, ১৩৯৮ (সেপ্টেম্বর - অক্টোবর, ১৯৯১) এ 'বেকার বিদ্যালংকার' -এর চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশ সেই অনুমানকেই দৃঢ়তর করে। ১৯৬৬ সালে একাঙ্ক হিসেবে লিখেছিলেন 'বেকার বিদ্যালংকার'। এখন তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন যদিও ছাপা গ্রন্থে অভিনয়ের কোনো সংবাদ নেই, তবু অভিনয়-সাফল্যের উপযোগী সব রসদই এখানে বর্তমান। 'পাহাড়ী বিছে'র সঙ্গে এই নাটকের প্রধান পার্থক্য হ'ল-রহস্য এখানে এসেছে মানবিক সংকটের আধারে সমাজবিশ্লেষণী সূত্র নিয়ে। নাট্যকার এখানে আবার স্বভূমিতে অধিষ্ঠিত। শাণিত ব্যঙ্গ, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর অশ্রুসজল হিউমারে তিনি সাজিয়েছেন রহস্যের বাতাবরণটিকে।

শীর্ণকায় বিদ্যালংকার 'ক্রনিক বেকার'। সেই আঠারো বছর বয়স থেকে তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরির বাজারে সে ক্রমাগত ডিগবাজি খেয়েছে। কোনো ডিগ্রি-ডিপ্লোমা অর্জন করতেই তার বাকি নেই। অ্যানাটমি-ফিজিওলজিতে তার যথেষ্ট জ্ঞান, রাজভবনের মাটিতে খেজুর চাষ সম্ভব কিনা সেকথা সে জানে, রাষ্ট্রসংঘে প্রতিদিন কত কিলো ধুনো পোড়ে সে তথ্যও তার নখদর্পণে। এখন সুন্দর করে ডিগবাজি খেতেও সে জানে। তা সত্ত্বেও তার চাকরি হয় নি। ভারতবর্ষের অসংখ্য কোটি বেকারের অন্যতম প্রতিনিধি শীর্ণকায় ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে একদিন বোম তৈরি করে পৌঁছে যায় ভরদ্বাজ ট্রেডিং কোম্পানির সল্টলেকের অফিসে এবং নিজেই যেচে ইন্টারভিউ দিতে শুরু করে। এই অফিসে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসের দু'নম্বর আধিকারিক পবন সরকারের এক চপেটাঘাতে মৃত্যু হয় শীর্ণকায়ের। লাশ নিয়ে এবার বিপদে পড়ে যায় পবন। যে ভোম্বল ডাক্তার অপারেশন করতে গিয়ে রোগীর পেটে ছুরি কাঁচি গজ রেখেই সেলাই করে দেন, তিনি পর্যন্ত ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে চান না। সম্ভব-অসম্ভব নানা ভাবনার মাঝে হঠাৎ পবনের অধস্তন কর্মচারী মন্টুর মাথায় আসে অদ্ভুত এক প্ল্যান। খিদিরপুর ডকের বাজপাখি মানে Mr. Hawk ভরদ্বাজ ট্রেডিং কোম্পানিতে তিনশো বাহান্ন পেটি চায়ের অর্ডার দিয়ে পেয়েছেন এক পেটি কম। পবন সেই এক পেটি চা বিক্রি করে দিয়েছে বাগড়ি মার্কেটে। Hawk সাহেব বারবার হানা দিচ্ছেন সেই চায়ের জন্য। এই সুযোগে শীর্ণকায় বিদ্যালংকারকে চায়ের পেটিতে ভরে কামাসকাটকায় চালান দেবার প্ল্যান করেছে মন্টু। ভারতবর্ষ এই একটা জিনিসই প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রফতানি করতে পারে — খাঁটি নির্ভেজাল বেকার।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় হঠাৎ ইন্সপেক্টর সোমনাথ মল্লিকের আগমনে। তিনি উড়ো ফোনে খবর পেয়েছেন বেলা তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে ভরদ্বাজ ট্রেডিং কোম্পানির অফিসে একটা খুন হয়েছে। এই খুনের তদন্ত যত এগোয় তত উদ্‌ঘাটিত হয় বিচিত্র রহস্য। উচ্চাভিলাষী

মন্টু সেনের ভেতরকার দরদী মনটিকে চেনা যায়, ভোম্বল ডাক্তার যে এই শীর্ণকায়কেই পেটে ছুরি কাঁচি গজ রেখে সেলাই করে দিয়েছিলেন সেকথাও প্রকাশ পায়, Hawk সাহেব যে আসলে খুবই নরম মনের, বন্দরের দালালিতে যে সে আনফিট এবং তা ঢাকা দিতেই যে তার এত হম্বিতম্বি – জানা যায় সেকথাও। এসবের মধ্যেই চলতে থাকে নেপথ্যের স্টোররুমে চায়ের পেটিতে শীর্ণকায়কে ভরে প্যাকিংয়ের কাজ। চালান দেবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে মুখ খোলা ডাব নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন পাহাড়ী বিদ্যালংকার – বেকার বিদ্যালংকারের বাবা। ছেলে যেখানেই ইন্টারভিউ দিতে যায় সেখানেই তিনি ডাব নিয়ে যান। তার মুখে দারিদ্রলাঞ্ছিত জীবনের বর্ণনা শুনতে শুনতে মন্টু নিজেকে আবিষ্কার করে সেই দারিদ্রেরই অঙ্গ হিসেবে। নিজের প্ল্যান সে নিজেই ফাঁস করে দেয় সকলের সামনে। বাক্স ভেঙে কিন্তু সকলে আরো আশ্চর্য। ভেতরে শীর্ণকায় নেই। ঠিক তখনই বাইরে থেকে প্রবেশ করে জলজ্যান্ত শীর্ণকায়। বেকার মরে না। বেকারের মৃত্যু নেই। চাকরির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে শীর্ণকায় শিখেছে তেরো ঘন্টা পর্যন্ত নিঃশ্বাস না নিয়ে বেঁচে থাকতে, এমনকি ভোজবাজিও সে শিখেছে। একে একে সব রহস্যের সমাধানসূত্র দিয়েছে শীর্ণকায়। পঞ্চানন ও কিষেণলালের সাহায্যে সে পবনের অনৈতিক সব কাজের সংবাদ সংগ্রহ করেছে, তারপর সকলের সামনে হাঁড়ি ভেঙেছে। কাজলের সঙ্গে পবনের প্রেম, কাজলের মিথ্যে অসুস্থতা, ঘুষের টাকায় তিন তলা বাড়ি ইত্যাদি কিছুই গোপন থাকে নি। চাকরি পাবার জন্য সুচারু পরিকল্পনা করেছে শীর্ণকায়। তারই প্ল্যান অনুসারে পাহাড়ী বিদ্যালংকার ফোন করেছিল থানায়। যে দুটি বোম শীর্ণকায় রেখেছিল বাজে কাগজের ঝুড়িতে সেগুলি যে আসলে তুলোর বল, তাও প্রকাশ পেয়েছে নাটকের শেষে। কৃতকর্মের দায়ে পবন গেছে জেলে আর তার জায়গায় কাজে নিযুক্ত হয়েছে শীর্ণকায়। নিজের জন্য 'ভেকেন্সি' এভাবেই 'ক্রিয়েট' করে নিয়েছে সে।

গ্রন্থপরিচয়ে এই নাটককে বলা হয়েছে 'দুঃসহ কৌতুক'। সত্যিই এখানে নিজের চারপাশের জগতের নির্মম বাস্তবকে প্রতি মুহূর্তে চিনে নিতে নিতে কৌতুক 'দুঃসহ' হয়ে ওঠে। হাসি এখানে যেন মিহি কাচের মতো ছড়িয়ে পড়ে হৃদয়কে রক্তাক্ত করে তোলে। রহস্য নাটক হলেও মনোজ মিত্রের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন – প্রাণবন্ত কৌতুক, তীক্ষ্ণ সংলাপ, ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, চরম আকস্মিকতা প্রভৃতি থাকার ফলে 'বেকার বিদ্যালংকার' নাটকীয়তায় সার্থক হয়ে উঠেছে। কৌতুকের শর নিক্ষেপ করে কার্যসিদ্ধি, যা তাঁর নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তা এখানেও লক্ষণীয়। অফিসে চাকরি করতে এসে দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা, অধস্তন কর্মচারীকে exploit করা প্রভৃতি সাধারণভাবে মনোজের কৌতুক ও ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে এই নাটকে। কিন্তু নাটক এসব সাধারণত্ব অতিক্রম করে যায় শীর্ণকায়ের মঞ্চে প্রবেশের পর থেকে। আর্ত আবেদনে শীর্ণকায় যখন বলে ঃ

> "চাকরি ... একটা চাকরি ... দেবেন স্যার? ...বলুন কি কোয়ালিফিকেশন চাই?
> আর কি শিখলে একটা কাজ পাবো? মানুষের বুকে বোম মারা শেখার পরেও
> আরো কি শিখতে হবে – আরো কি মূল্য দিতে হবে আমাদের ..."[২]

তখন আমাদের অতি পরিচিত পাশের বাড়ির ছেলেটিকেই আমরা যেন দেখি মঞ্চের ওপর। মন্টু অফিসের কর্মচারী। পবন তাকে ব্যবহার করে। তাকে দিয়ে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের টিকিট কাটায়, নানারকম ফাইফরমাশ খাটায়। মন্টুর বাড়িতে বারোটা লোক, তিনটে বোন, বড়দার ক্যান্সার, সবাই চেয়ে আছে

তার দিকে। মন্টুকে তাই বিবেকের টানাপড়েন সত্ত্বেও পবনকে বাঁচাবার কথাই ভাবতে হয়। কারণ পবনের রিপোর্টের ওপরই তার চাকরি থাকা-না-থাকা নির্ভর করছে। এরকম অতি সাধারণ বিষয় অবলম্বনেই মনোজ মিত্র গেঁথে তোলেন সার্থক নাট্যমুহূর্ত ঃ "পবনদাকে ধরাবো? তাহলে আমার চাকরি ! প্রমোশন! টাকা! দরকার ... ভীষণ দরকার ! টাকা চাই আমার !"[৩] এই অফিস-কাটা মন্টু, এই টাকার জন্য উদ্‌গ্রীব মন্টুই কিন্তু বেকার ছেলের পিতার আর্তিতে বিহ্বল হয়ে সত্য প্রকাশ করে দেয় নিজের ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়েই ঃ "চাই না ... চাই না ... আপনার পা-চাটা হয়ে বাঁচতে! মরে যাই যাবো তবু আপনার মুখোশ আমি ছিঁড়ে দেবো! খুনী!"[৪] মনোজের average চরিত্রেরা এভাবেই মুহূর্তে হয়ে ওঠে above the common level. এই চরিত্রের মুখেই তাই উচ্চারিত হয় নাটকের মর্মবাণী ঃ

> "বলুন ভারতবর্ষ এর চেয়ে ভালো জিনিস আর কি রপ্তানি করতে পারে পৃথিবীতে! যে জিনিস ভারতে অঢেল আছে ... সব প্রোডাক্‌সন বন্ধ হলেও যার প্রোডাক্‌সন দিনে লক্ষ লক্ষ বেড়েই যায় ... প্রচুর ... সারপ্লাস ... তা হলো বেকার। আমরা এবার সেই বেকার চালান দেবো দূর দূর দেশে।"[৫]

আবার যে চরিত্রগুলি নিতান্ত তুচ্ছ তাদের মধ্যেই প্রকৃত মহত্ত্বের অস্তিত্ব দেখেন মনোজ মিত্র। তাই পঞ্চানন ও কিষেণলাল শীর্ণকায়ের সহযোগী হয়। নাটকে সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে শীর্ণকায়ের যন্ত্রণা — একজন বেকারের যন্ত্রণা। যোগ্যতা যাচাইয়ের নামে কত অদ্ভুত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তার ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার রাজভবনের উদ্যানে খেজুর চাষ বা রাষ্ট্রসংঘে প্রতিদিন কত ধুনো পোড়ে সেই প্রসঙ্গ এনে। এযুগে বেকারকে সবকিছু শিখতে হয় — অ্যানাটমি থেকে ভোজবাজি পর্যন্ত। সেই সংবাদ তিনি যখন দেন বেকারের পিতার মুখে তখন সাধারণ সংলাপই রচনাগুণে চোখের কোণে জল এনে দেয় ঃ "আমার খোকা সব শিখেছে — চাকরির জন্য সব শিখেছে, মায় ভোজবাজিও শিখেছে।"[৬] নাটকের শেষে বিদ্যালংকারের আনা বোমকে তুলোর বল হিসেবে পরিচিত করেছেন মনোজ মিত্র, কিন্তু নাটকে এই ইঙ্গিত চাপা থাকে নি যে, ভয়াবহ বেকার সমস্যার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে!

মনোজ মিত্রের নাট্যধারায় মাঝে মাঝে এধরণের সৃষ্টি যেন কিছুটা স্বাদবদল। নাট্যকার যেন নিজের বলার কথাটিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশন করে দেখতে চেয়েছেন — ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়। মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখিয়েছেন 'পাহাড়ী বিছে' নাটকে আর জ্বলন্ত এক সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখেছেন 'বেকার বিদ্যালংকার' নাটকে। উভয় ক্ষেত্রেই আঙ্গিক রহস্য-নাটকের। তবে প্রথম নাটকে যখন রহস্যই প্রাণ, দ্বিতীয়টিতে সেখানে রহস্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে সামাজিক সমস্যার প্রতিক্রিয়া। রহস্য নাটকে জমাট রহস্য ঘনিয়ে তোলা এবং সেই রহস্যের জাল ভেদ করার দিকেই নাট্যকারের লক্ষ্য থাকে। যে কোনো রহস্যগ্রন্থের মতো রহস্য নাটকের আকর্ষণও রহস্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত। নাটকের আঙ্গিক হিসেবে রহস্যময়তার ব্যবহার খুব একটা সার্থক হয় না। মনোজ মিত্রের এই দুটি নাটকও মহৎ সৃষ্টির মর্যাদা পেতে পারে নি। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির নাটকীয় মূল্য কিছু বেশি হ'লেও তা তাঁর প্রথম শ্রেণির নাটকগুলির পাশে দাঁড়াবার মতো নয়। এই নাটক দু'টি, সুতরাং, নাট্যকারের লেখনীর বিচিত্রগামিতার নিদর্শন হয়েই থেকে গেছে। কোনো নতুন বক্তব্য বা নির্মাণকলার পরিচয় দিতে পারেনি।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) পাহাড়ী বিছে (১/৫) - মনোজ মিত্র - অপেরা - চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৯, পৃ.৫০

২) বেকার বিদ্যালংকার (প্রথম অর্ধ) - মনোজ মিত্র - অপেরা - চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৮, পৃ.২৩

৩) ঐ, পৃ.৪২

৪) বেকার বিদ্যালংকার (দ্বিতীয় অর্ধ)-মনোজ মিত্র, পৃ.৮১

৫) বেকার বিদ্যালংকার (প্রথম অর্ধ)-মনোজ মিত্র, পৃ.৫৯

৬) বেকার বিদ্যালংকার (দ্বিতীয় অর্ধ)-মনোজ মিত্র, পৃ.৮৫

চতুর্থ অধ্যায়

নাট্যকার মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টি

চতুর্থ অধ্যায়

নাট্যকার মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টি

কোনো একজন মানুষের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে তাঁর বেড়ে ওঠার পরিবেশ, পরিবার এবং অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। শৈশবে যে ভাবনা এবং ধারণার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, পরবর্তী জীবনে তার দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হয় মানুষ। যাঁরা সৃজনকর্মে যুক্ত থাকেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মে সেই শৈশব-অর্জিত অভিজ্ঞতা কোনোভাবে প্রতিফলিত হয়। চেতন বা অবচেতনে থেকে যাওয়া সেইসব ভাবনা এবং ধারণা জীবনের পরবর্তী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর জীবনবোধের মৌল কাঠামোটি গড়ে তোলে। যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই এই গড়ে ওঠার পৃষ্ঠপটটি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত সৃজনশীল মানুষের ক্ষেত্রে তাঁদের সৃজনকর্মটিকে বুঝে নিতে জীবনবোধ গড়ে ওঠার পটভূমিটি উপলব্ধি করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকার মনোজ মিত্র জন্মেছেন অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ধূলিহর গ্রামে। জীবনের প্রথম বারো বছর তিনি সেখানেই কাটিয়েছেন। এই বারো বছর তাঁর জীবনের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। খুলনা অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের শান্তভাব, সরলতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জলজঙ্গলের সম্পদ প্রভাব ফেলেছে তাঁর ভাবনায়। জল-গাছ-মাটির সাহচর্যে বেড়ে ওঠা জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানে। নিজেও পেয়েছেন প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য। সেই খুলনা অঞ্চলের বর্ণনা মনোজ মিত্র দিয়েছেন এভাবে ঃ

> ''খুলনা চিরকালই বড় শান্ত সরল উদাসী আর সহিষ্ণু। জলজঙ্গলের সম্পদে ভরা, দুর্বারাজ আর দুর্বাকমল ধানে ঠাসা এমন পয়স্বিনী ভূমি গোটা বাংলায় আর কোথায় ছিল? দুধের মতো সাদা মনের মানুষ সব।''[১]

এই অঞ্চলের মানুষের সহজ সরল শান্তভাব আর কৌতুকপ্রিয়তার কারণ হিসেবে মনোজ মিত্র নির্দেশ করেছেন মাটির গুণকেই ঃ

> '' বনের মধু থেকে খেতের ফসল, নদীর মাছ থেকে গোরুর দুধ — সবই অঢেল, অপর্যাপ্ত। বোধকরি সেই কারণেই এ অঞ্চলের মানুষ শান্ত সহজ সরল, আর স্বভাবত কৌতুকপ্রিয়। কাজে কাজেই একটু আবার ঢিলেঢালা অলস প্রকৃতির। সবই মাটির গুণে।''[২]

এই সহজ সরল, কিছুটা ঢিলেঢালা জীবনের ছবি মনোজ মিত্রের অনেক নাটকেই লক্ষণীয়। ছোটোবেলায় প্রত্যক্ষ করা সেই প্রকৃতি-লালিত জীবনের ধারণাকেই তিনি বহন করে চলেছেন। সে জীবনে গাছপালা-নদনদী ছিল মানুষের পরম বন্ধু, নির্ভরতার আশ্রয় ঃ ''বেত্রবতী কূলে সুঁদোরবনের গা-ঘেঁষা গ্রামগুলিতে মানুষের সঙ্গীসাথী ছিল গাছপালা। ... ভৈরব-কপোতাক্ষ-বেত্রবতী তীরে জীবন ছিল গাছের মতোই অজঙ্গম এবং মূক।''[৩]

প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যের পাশাপাশি ছোটোবেলায় মনোজ মিত্র পেয়েছেন বর্ধিষ্ণু একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে ওঠার সুযোগ। পরিবার থেকেই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে উদার জীবনবোধ গড়ে ওঠার উপকরণ। মূল্যবোধের শিক্ষা তিনি পেয়েছেন প্রধানত ঠাকুমা এবং বাবার আচরণের মধ্য দিয়ে। তাঁর বাবা অশোক মিত্র ছিলেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। ১৯৪২-এর মন্বন্তরে বাংলাদেশের কৃষকেরা ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে মহাজনদের হাতে

তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য ঋণসালিশী বোর্ড যে বিশেষ আদালত গঠন করেছিল, অশোক মিত্র ছিলেন সেই ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। তাঁর পক্ষপাত ছিল সবসময়ই কৃষকের প্রতি। মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ "চাকরির পরিস্থিতিতে যতই বৈচিত্র্য থাক, হাকিমের রায়ে কোনো রকমফের ছিল না। কলমের খোঁচায় সর্বদাই দরিদ্র কৃষক জিতে যায়, হেরে মরে বিত্তবান উত্তমর্ণ।"[৪] পরবর্তীকালে মনোজ মিত্রের অনেক নাটকেই যে শেষ পর্যন্ত অসহায়, প্রান্তিক মানুষের জয় লক্ষিত হয় তার বীজ প্রোথিত ছিল সেই ছোটোবেলায় প্রত্যক্ষ করা বাবার আচরণের মধ্যে। শোষিত, অসহায় মানুষের পক্ষ নেবার জন্য তাঁকে কোনো বিপ্লবের তত্ত্বের পাঠ নিতে হয় নি, সে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বাড়িতেই। মানসিক প্রসারতার শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ঠাকুমা হেমনলিনী দেবীর মাধ্যমে। হেমনলিনী যেন বাংলাদেশের সেই হারিয়ে যাওয়া মমতাময়ী পরহিতৈষী, যাঁরা একসময় ছিলেন প্রায় প্রতিটি পরিবারেই। গ্রামের প্রত্যেকের অভাবের তালিকা করে পুত্রদের কাছে তিনি পত্র পাঠাতেন সেই অভাব পূরণের উপকরণ পূজার সময় নিয়ে আসার জন্য। হেমনলিনীর মধ্য দিয়েই শৈশবের মনোজ মিত্র জেনেছেন উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য। জেনেছেন, উৎসবের কয়েকটা দিন প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে উপেক্ষা করে, আত্মকেন্দ্রিকতা ভুলে গিয়ে মানুষ মুক্ত ও প্রসারিত হয়ে উঠত। নিজের চোখে দেখেছেন, পুজো উপলক্ষে চন্ডীমন্ডপের উঠোনে ছোটো ছোটো দোকানের যে বাজার বসত, সেখানে হেমনলিনী দেবী চাষিবউদের ধরে ধরে কাচের চুড়ি পরাতেন, খাস্তাগজা-জিলিপি-পাঁপড়ভাজা খাওয়াতেন। এই যে সকলকে নিয়ে আনন্দ করা — জীবনের মুক্তি এখানেই। নিজের পরিবারে মনোজ মিত্র দেখেছেন নিত্য অতিথির সমাগম — উৎসবের সময় স্বাভাবিকভাবেই তা কয়েকগুণ বেড়ে যেত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এসময় বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করত। অতিথি আপ্যায়ন করেই বাড়ির মেয়েদের উৎসবের দিনগুলি কেটে যেত। ধূলিহরের মিত্র বাড়িতে উৎসব ছাড়া অন্যান্য দিনেও ছিল অতিথি সমাগম। স্কুলের মাস্টারমশাই, পুরুতঠাকুরমশাই, নায়েব, গোমস্তা ছাড়াও কিছু আত্মীয়-অনাত্মীয় ছিল সেই বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। এছাড়া আসতেন অনুদান প্রাপকের বংশধরেরা। এই 'এসো-জন বসো-জন'রা থেকে যেতেন দু'তিনমাস পর্যন্ত। অতিথি অল্প সময়ের জন্য এলে বাড়ির সকলের মন খারাপ। দিন দশেকের আগে তাই কাউকেই ছাড়া হত না। অতিথিরাও রয়ে যেতেন। কেবল বিশেষ কোনো পরিবার নয়, সাধারণভাবে এ ছিল সে সময়কার যে কোনো বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছবি। মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ "গৃহস্থ কি অতিথি, কোনো পক্ষের কোনো তাড়া ছিল না। জীবন ছিল ওইরকম, শ্যাওলাছাওয়া পুকুরের জলের মতো নিথর নিশ্চল।"[৫] এরকম শিথিল প্রসারিত মানস-পরিবেশেই বড় হয়ে ওঠেন তিনি। এ এমনই এক পরিবেশ, যেখানে অতিথি এসে নিজেরই ঘরদোর বেছে নিতেন, গৃহস্থের পুকুরে মাছ বড় হয়ে গেছে দেখে বিক্রি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, বাড়ির ছোটো ছেলেদের পড়ার তদারকি করতে শুরু করতেন। এ এমনই এক পরিবেশ, যেখানে সন্ধেবেলা ছেলেদের পড়ার হ্যারিকেন টেনে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে মহাভারত পাঠ শুরু করে দিতেন পুরোহিতমশাই। স্লেট, পেন্সিল, বর্ণপরিচয়, ধারাপাত ভুলে ছেলেরাও সেই আসরে মজে যেত। পরবর্তী জীবনে মনোজ মিত্র দেশভাগের ফলে ভারতে চলে এসেছেন, ক্রমশ অভ্যস্ত হয়েছেন নগর জীবনে, কিন্তু বুকের মধ্যে লালন করেছেন সেই ধূলিহরের পরিবেশ। তাই তিনি আক্ষেপ করেছেন ঃ "ইংলন্ডের রাজপরিবারকে এখনো বাঁচিয়ে রাখা গেছে যখন, আমাদের বাংলার একটি একান্নবর্তী পরিবারকেও সংরক্ষণ করে রাখা যেত যদি।"[৬]

এই ধরণের আক্ষেপ মনোজ মিত্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, কারণ তিনি একটু পুরনো ধরণের মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আধুনিককালে মানুষ যখন প্রবলভাবে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মম্ভরিতা যখন তার প্রধান অলঙ্কার, তখন মনোজ মিত্র অন্তরে লালন করেন সেই ধূলিহরের মমতাভরা আবহ, যে আবহে গৃহকর্ত্রী বাড়ির ছেলের গৃহশিক্ষকের ভবিষ্যৎ নিয়ে পর্যন্ত চিন্তা করতেন, যে আবহে ছড়িয়ে ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর অনুভব। কেবল কি মানুষ, গাছপালা-জীবজন্তু থেকে শুরু করে মৃন্ময়ী প্রতিমাও সেখানে ছিল আত্মার আত্মীয়। ঠাকুমাকে তিনি দেখেছেন, নির্জন দুপুরে ঝড়ে ভেঙে পড়া আমগাছের গুঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করতে; দেখেছেন পুরোহিত ভালো ঠাকুরমশাইকে, যিনি রাতবিরেতে দেখতেন, পথের গাছপালা তাকে সঙ্গ দিচ্ছে, পাহারা দিচ্ছে। ঠাকুমা হেমনলিনী দেবী কাক পায়রা গোয়ালের গরু ছাগলকেও পেটপুরে পুজোর প্রসাদ খাওয়াতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এর ফলে ওদের পরজন্মের পথ পরিষ্কার হবে। ছোটোবেলায় ধূলিহর গ্রামে মনোজ মিত্র বড় হয়েছেন এইসব অনুষঙ্গের মাঝে, বড় হয়েছেন ঠাকুর্দার বিশাল বিশাল গোটাকয় বাগানের সাহচর্যে। গাছ সেখানে কতভাবে মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। মনোজ মিত্র স্মরণ করেছেন সেই গ্রামের এক বিশাল কদমগাছকে, যে গাছের নিচে গ্রামের সব কাজিয়া বিবাদের ফয়সালা হত। সেই গাছের মেঘবরণ ছায়ার নিচে গিয়ে দাঁড়ালে বাদী-বিবাদী উভয়েরই ঝাঁঝ কমে আসত। গাছ এবং প্রকৃতি সেখানে এভাবেই শুশ্রূষা দিত মানুষকে। সেই ছায়াঘন মায়াময় পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা মনোজ মিত্রের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বিশিষ্ট এক মূল্যবোধের। এই মূল্যবোধের ধারণা আধুনিক দৃষ্টিতে কখনো কখনো 'সেকেলে' কিন্তু তাতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। কালের দিক থেকে যে জগতে তাঁর অবস্থান, ভাবনার দিক থেকে তাঁর মধ্যে রয়ে গেছে সেই জগতের বিপ্রতীপ কিছু অনুভব। কেজো জগতে অনেকসময় তাঁর সনাতন ধারণা হয়তো বিরোধ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরকমই তাঁর মানসগঠন। সেই মানসগঠনের কারণেই অধ্যাপক হয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় তাঁর নিজের কাছেই গর্হিত মনে হয় : "আমি নিজেই এ ব্যাপারে রক্ষণশীলদের দলে। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনার সঙ্গে চলচ্চিত্রাভিনয় মেলানোর মত মানসিক প্রসারতা বা উচ্চতা আমার নেই।"[৭] পরবর্তী জীবনে সেই রক্ষণশীল মূল্যবোধকে তিনি লালন করেছেন জীবনে, প্রতিফলিত করেছেন নিজের সৃষ্টিতে। সংসার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে মূল্যবোধকে ধ্বস্ত হতে দেখে তিনি পীড়িত, ব্যথিত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছেন। যে কোনো উপায়ে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকেই নিজের সৃষ্টির লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন।

'নেকড়ে' (১৯৬৮), 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯), 'শিবের অসাধ্যি'(১৯৭৪), 'নরক গুলজার'(১৯৭৪), 'মেষ ও রাক্ষস'(১৯৭৯), 'রাজদর্শন'(১৯৮১), 'নৈশভোজ'(১৯৮৪), প্রভৃতি নাটকে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখেছেন সমাজ ও রাষ্ট্রে। শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বে মনোজের স্পষ্ট পক্ষপাত এখানে শোষিতের প্রতি, কিন্তু সেই পক্ষপাত প্রকাশিত শিল্পের শর্ত মেনেই। 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'তে মনোজ মিত্র ক্রোধী। তাই কংসারি ঠাকুর বা অঘোর ঘোষের ওপর নেমে আসে নীহারি বা বাদামীর প্রতিশোধ। শোষকের প্রতি এখানে ক্ষমাহীন নাট্যকার। ১৯৭৪-এ লেখা 'শিবের অসাধ্যি'তে তিনি কিন্তু কোনো আশার আলো দেখাতে পারেন নি। মানুষের আত্মশক্তির ওপর শেষপর্যন্ত তাঁর যে আস্থা স্থাপন তা অনেকটা আরোপিত ইচ্ছাপূরণ থেকে গেছে, মূল নাট্যবিষয়ের স্বাভাবিক পরিণতি হয়ে উঠতে পারে নি। 'নরক গুলজার'-এ মনোজ মিত্র আবার ক্রোধী। শ্লেষবাক্যে পাপী-

তাপীকে বিদ্ধ করার পর শেষপর্যন্ত সরাসরি লড়াইয়ে নামিয়েছেন মানিকচাঁদকে। শেকল ছিঁড়ে বেরিয়েছে সর্বহারা মানিক। নিজের সন্তানের জন্য, পরিবারের জন্য এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছে সে। তার কাছে পরাজিত হয়েছে সব অত্যাচারী। আসল লড়াইয়ের জন্য মানিককে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন নাট্যকার। আর অত্যাচারীদের সঙ্গে ভগবানকেও গাভীরূপে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন, যে গাভী নানাভাবে সেবা করবে মানিকদের। মনোজ মিত্র মানিকদের জয় চান এবং সেই জয়ের পথে সব বাধা দূর হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। যারা মানিকদের পদানত করতে চায়, শোষণ করতে চায় — তাদের এবং তাদের আশ্রয়দাতাদের গাভী রূপ দিয়ে মানিকের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে তাঁর সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে মনোজ মিত্র নির্দিষ্ট কোনো ইজমের পরিবর্তে রাক্ষস দমনে জোর দিয়েছেন মানুষের শুদ্ধ চৈতন্যের ওপর। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ বা বাইরে থেকে আরোপিত কোনো তত্ত্বের দ্বারা মানুষের মুক্তির পরিবর্তে তিনি এখানে এই দার্শনিক উপলব্ধির দিকে আমাদের নিয়ে যান যে, মানুষ ভুল করে, অজ্ঞানে পাপ করে, আবার সেই মানুষই অনুতাপে দগ্ধ হয়, নিজের পাপ নিজেই খন্ডন করে শুদ্ধ চৈতন্যে অভিষিক্ত হয়। তাঁর জীবনদৃষ্টি এখানে দার্শনিক প্রজ্ঞার দ্বারা ভাবলোকে উন্নীত। 'রাজদর্শন' নাটকেও মনোজ মিত্র শেষপর্যন্ত দেখান অভিরামের জয়। পরনির্ভরশীল লম্বোদরকে অভিরাম যেভাবে প্রাণিত করেছে, আহ্বান জানিয়েছে নতুন জীবনের দিকে – সে আহ্বান প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারেরই। 'নৈশভোজ' নাটকে অসংখ্য সামাজিক শেয়ালের মুখে ছাই দিয়ে শেষপর্যন্ত তুষ্টুকে বাঁচিয়ে রাখেন মনোজ মিত্র। উদ্বোধন ঘটান তার চৈতন্যের। তুষ্টুর পক্ষে তিনি দাঁড় করান ঢ্যাঙাকে, গরিবের পক্ষে গরিবকে। এই দাঁড়ানোতে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব নেই, আছে মানবিক সহানুভূতি।

রাষ্ট্র কিংবা সমাজের মতোই পরিবারের ক্ষেত্রেও মনোজ মিত্রের লক্ষ্য মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বিশ শতকের সাতের দশকের সূচনায় লেখা 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০) বা 'পরবাস' (১৯৭০) নাটকে মনোজ মিত্র দেখিয়েছিলেন আশ্রয়হীনতার সমস্যা। বেচারাম চাটুজ্যে পরিবারে অবাঞ্ছিত আর কেনারামের কোনো পরিবার নেই। পরিবারের প্রতি বিতৃষ্ণায় ঘর ছেড়েছিলেন যে বেচারাম, যাত্রাপার্টিতেও তিনি 'ফিট' হতে পারেন নি, কারণ সেখানেও চরম বৈষম্য। কিন্তু তিনি চান নিজের একটা জায়গা ঃ "একটা জায়গা আমার দরকার ... উটকো শ্যাওলার মতো আর ঘুরতে পারিনে ... একটা জায়গা ... নিজের জায়গা ..."[৮] এই আর্তিকে ব্যর্থ হতে দেন না মনোজ মিত্র। সমস্ত লোভ এবং স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে যে শিশু জিজ্ঞাসা করতে পারে 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?', তেমনি এক শিশুকণ্ঠকে উপস্থাপিত করেন তিনি চরম সংকটের মুহূর্তে। স্বার্থশূন্য ভালোবাসা নিয়ে সে বেচারামের পথ রোধ করে দাঁড়ায় ঃ "না। তুমি যাবে না। ... তুমি থাকবে ... আমার কাছে থাকবে !"[৯] বিবেকের মতোই সে উচ্চারণ করে যে, টাকা এবং গয়নার জন্য নকল একটা লোককে সকলে 'বাবা' বলে মেনে নিয়েছে। বেচারামবাবু যে শেষপর্যন্ত সবকিছু ফিরে পান, পরিবারে আবার 'ফিট' হয়ে যেতে পারেন তা আরোপিত ইচ্ছাপূরণ মনে হতে পারে কিন্তু এটাই মনোজ মিত্রের নাটকের বৈশিষ্ট্য। এখানেই তাঁর উদার জীবনদৃষ্টির পরিচয়। অসহায়, অবহেলিত—যাঁদের সংসার দূরে ঠেলে দিতে চায়, তাঁদের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করেন মনোজ মিত্র। এই করাটা কিন্তু ঘটে নাটকের শর্ত মেনেই। মানুষকে আরো একবার সুযোগ দিতে চান তিনি। তাই তাঁর নাটকে অনুতপ্তরা ক্ষমা

পেয়ে যায় — দীপ্তি, বুড়ি, প্রদীপ, শুভেন্দু, চারু — সকলেই হাসিমুখে বেচারামবাবুর পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। সবকিছু যথাযথ এবং যথাস্থানে রেখে এবং দেখেই মনোজ মিত্র এভাবে আঁকড়ে রাখতে চান নিজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। 'পরবাস'-এর গজমাধবের পরিবার নেই, দীর্ঘ ছত্রিশ বছর সে কাটিয়ে দিয়েছে গলু ওস্তাগর লেনের বাসাবাড়িতে। মামলায় হেরে সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে তাকে। এখানেও প্রবল আশ্রয়হীনতার সমস্যা। কোথায় যাবে গজমাধব? নানা ছুতোয় সে 'টাইম কিল' করে। শেষপর্যন্ত কিন্তু আর এক অনিকেত মন্দিরাকে সে ঘর ছেড়ে দিয়েছে। নিজের জীবনের অপূর্ণ সাধ পূরণ করতে চেয়েছে মন্দিরা-রতনের সংসার গড়ে ওঠার মধ্যে। মনোজ মিত্রের সহানুভূতি এখানে দেখাতে চেয়েছে, নিজেরা অনিকেত বলেই গজমাধব ও মন্দিরা পরস্পরের সমব্যথী হতে পেরেছে। মন্দিরা নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছে গজমাধবকে, আর গজমাধব নিজের 'ঘর' ছেড়ে দিয়ে গেছে মন্দিরাকে। আশ্রয়ের বিনিময়েও চেয়েছে জীবনে অন্তত একটি দিনের পূর্ণতা। ঘর ছেড়ে পথে নামলেও সে পেয়েছে মন্দিরার সহমর্মিতা, পেয়েছে পাঠকের সহানুভূতি। অসহায়, স্নেহবুভুক্ষু মানুষকে এই সহানুভূতিতে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা, যাকে সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানিয়েছেন বিশিষ্ট সমালোচক ঃ

> " কাফকার নিরাশ্বাস ভয়ংকর ভবিতব্য থেকে মনোজ আমাদের আস্তিকতায় ফিরিয়ে আনেন, এখানেই তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, মানবিকতার গভীর সূত্রেই তাঁর সমস্ত নাটকগুলি বাঁধা পড়ে। তাঁর সহানুভূতির বিস্তার দেখবার মতো। গজমাধবের মতো এক নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের নিঃসঙ্গতার মূল্যেই অন্যের 'সাজানো ঘরের চেহারা'-কে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখে।"[১০]

আধুনিক প্রজন্মের মূল্যবোধে ভাঙনের চেহারাটা স্পষ্ট তুলে ধরেছেন মনোজ মিত্র তাঁর 'দম্পতি' নাটকে। জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত মানুষের আশ্রয়হীনতার সমস্যা এখানেও প্রকট। মানুষ আশ্রয় পায় সম্পর্কের কাছে, আপনজনের কাছে, বিশ্বাসের কাছে। সমাজ তথা পরিবারে এই আশ্রয়ের ও আশ্বাসের অভাব পীড়িত করেছে মনোজ মিত্রকে। তিনি দেখিয়েছেন, কর্তা-গিন্নি-জিতেনবাবুর মতো মানুষদের অসহায়তা। নতুন যুগের নতুন ধরণ তাঁরা বুঝতে পারেন না। স্নেহসম্পর্ক এযুগে শিথিল, মূল্যহীন। তাই বড়খোকা জিতেনবাবুকে এককালীন কিছু টাকা দিয়ে বাবার চিকিৎসার ঋণমুক্তির দম্ভ অর্জন করতে চায়। কর্তা-গিন্নির সঙ্গে জিতেনবাবুর সম্পর্কের গভীরতার কোনো আন্দাজই তাদের নেই, বা থাকলেও তাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। নতুন প্রজন্মের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কাতর করেছে মনোজ মিত্রকে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি সমাজ তথা পরিবারকে এই বৈনাশিক বোধ থেকে রক্ষা করতে। তাঁর জীবনদৃষ্টির প্রসারতা এমনই যে, বাবা-মা দুই ছেলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে বহুদিনের পুরনো চাকর কানাইয়ের কী হবে সে ভাবনাও গুরুত্ব পায় নাটকে। ওপরতলার ভাড়াটে বকুল-শ্যামলের দাম্পত্যের মধ্যে দিয়েও তিনি দেখান একালের সম্পর্কের ভঙ্গুরতা। কিন্তু সেই ভাঙনকে চরম পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যেতে তিনি নিজেই যেন আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাই শেষপর্যন্ত আবার তাদের ফিরিয়ে আনেন সুস্থ বোধে, অবসান ঘটান ভুল-বোঝাবুঝির। এমনকি তাঁর 'সর্বব্যাপী সহানুভূতি' দোলনকেও উত্তীর্ণ করে দেয় পাঠক-দর্শকের সহমর্মিতায়। আর জিতেন ডাক্তারের মাধ্যমে তিনি দেখান পুরনো মূল্যবোধের জয় — অর্থপ্রত্যাশী ছেলেদের অর্থের প্রত্যাশা মিটিয়ে বেনামিতে নিজেই বাড়ি কিনে নিয়ে কর্তা-গিন্নিকে রেখে দেন সেখানেই। এই পুরনো মূল্যবোধ উদার এবং ক্ষমাপরায়ণ। তাই স্বার্থান্ধ ছেলেরাও শেষপর্যন্ত ক্ষমা পেয়ে যায় — আরো একবার সুযোগ পেয়ে

যায় নিজেদের শুধরে নেবার। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য় (১৯৮৮) যে ভাঙনের ছবি এঁকেছেন মনোজ মিত্র তা আসলে আধুনিক সমাজের সমস্যা, যা তিনি প্রতিফলিত করেছেন একটি পরিবারের আধারে। কিন্তু ভাঙনকেই চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিতে তিনি যেন ভয় পান, নিজের বিশ্বাসের ভূমি থেকে চ্যুত হবার আশঙ্কায় পীড়িত হন। তাই উন্মার্গ সময়ে তিনি সৃষ্টি করেন অলকানন্দার মতো এক 'মা'কে, যে কিনা সন্তানকে রক্ষা করে সমস্ত ঝড়-ঝাপ্টা থেকে। অসহায়, দুর্বল মানুষকে ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নেবার মতো মানুষের অভাব সংসারে কোনোদিন হয় না, মানবিকতার স্নিগ্ধ কোমল ধারাটি এঁদের দ্বারাই রক্ষিত হয় — নিজের এই বিশ্বাসবোধকেই মনোজ মিত্র রূপায়িত করেন অলকানন্দার মধ্য দিয়ে। দেবাহুতির মতো চরিত্রের বিপ্রতীপে আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অলকানন্দার সর্বংসহা মাতৃসত্তা। ধ্বস্ত মূল্যবোধ এবং ধ্বস্ত মানবিকতার ওপর জীবনের সুধাপাত্র হাতে অলকানন্দাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। আত্মকেন্দ্রিকতা যখন মানুষকে প্রবলভাবে গ্রাস করেছে তখন মনোজ মিত্র বিশ্বাস করতে চান সেই মানবিকতায়, যা পরার্থে বাঁচার মধ্যেই খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা ঃ "কারুর জন্যে কিছু করতে না পারলে, আমি কী নিয়ে থাকব। ফাঁকা হয়ে শূন্য হয়ে বাঁচব কী করে ভাই?"[১১] এই ভাবনার উৎস যে ধূলিহরের একান্নবর্তী পরিবার এবং পরহিতৈষিণী হেমনলিনী দেবীর মধ্যেই ছিল তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

পরিবারে মূল্যবোধের ভাঙনের সমস্যাকে মনোজ মিত্র একটু বিস্তৃত সামাজিক পরিসরে দেখেছেন 'আত্মগোপন', 'রঙের হাট', 'কুহুযামিনী' প্রভৃতি নাটকে। ব্যথিত চিত্তে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আধুনিক সমাজের বাজারসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। কে কত বেশি দামে বিকোবে তাই নিয়ে চলছে তীব্র প্রতিযোগিতা। সকলেই নিজের নিজের দর যাচাই করছে। সর্বোচ্চ দামের চরম মুহূর্তটিতেই মানুষ বিক্রি হবে। সেই মুহূর্তটি চিনতে পারাই আসল কাজ। ফস্কে গেলেই মানুষ মূল্যহীন। বাজার গ্রাস করে নিয়েছে মানুষের স্নেহ-মায়া-মমতা-সহানুভূতি-সহমর্মিতা, নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি সবকিছুকে। কিন্তু এই বৈনাশিকতাই কি জীবনের শেষ সত্য? নাট্যকার মনোজ মিত্র তা বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই খাদের অতলে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে মানুষকে টেনে ধরেন তিনি — চালিত করেন শুদ্ধ চৈতন্যের দিকে। 'আত্মগোপন' নাটকে তাই সহমর্মী কিছু মানুষের প্রসারিত হাত পাঁকের অতল থেকে উত্তরণে সাহায্য করে অপাকে — তীব্র নৈরাশ্যের মধ্যেও একঝলক আলোর ইশারা জাগায়। এই ইতিবাচকতাই মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা। একইভাবে 'রঙের হাট' নাটকে তিনি দেখিয়েছেন, ভুবনজোড়া বাজারের মধ্যেও আজও মায়া-মমতা-ভালোবাসা সবচেয়ে মূল্যবান। তাই মমতা বাজি রেখে শেষপর্যন্ত জিততে পারে না খালপাড়ের মেয়ে শান্তা। দালাল ফজলু তাই আগলে রাখে ফুটুকে — রক্ষা করে 'দুনিয়ার মানইজ্জত'। ফজলু যে বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে তা আসলে নাট্যকার মনোজ মিত্রেরই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের জগতেই তাঁর অবস্থান ঃ

> "দ্যাখো বহিন, বাজারে দেহ-র কোনো দাম নেই... ঐ খালপাড়ে জন্মেও দেখেছি, এপারে এসেও দেখছি ... গরু-ছাগলেরও দাম নেই আমার মা-বহিনেরও নেই। দাম যেটুকু যা আছে তা ঐ খোদাতালা তোমার কলজে ভরে যা দিয়েছেন ঐ মায়া মমতা ভালোবাসা – ঐ যে মণিমুক্তাগুলো – ঐগুলোরই দাম।"[১২]

এইসব মণিমুক্তার সংরক্ষণই তো মনোজ মিত্রের লক্ষ্য। 'কুহুযামিনী' নাটকেও তিনি শেষপর্যন্ত জীবনকে

ইতিবাচকতায় থিতু করেন। বিপদের সময় জোনাকি ফিরতে চায় স্বামী চন্ডীর কাছে। নাট্যকার দেখাতে চান, গৃহের বন্ধনই মানুষের শেষ আশ্রয়। জোনাকি শেষে তাই জায়গা পায় চন্ডীর পাশে, আবীরও ক্ষমা পেয়ে যায় নাট্যকারের।

নাট্যকার মনোজ মিত্র আধুনিক জীবন ও সমাজে সন্ধান করেছেন সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যের। যেখানেই এসবের অভাব দেখেছেন, সেখানেই তার হৃদয় বেদনার্ত হয়েছে। কখনো তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কখনো নিজের মতো করে প্রয়াস জারি রেখেছেন, কখনো তীব্র ক্রোধে প্রত্যাখ্যান করেছেন তথাকথিত নাগরিক আধুনিকতাকে। 'আমি মদন বলছি' নাটকে সৌন্দর্য-সন্ধানী মদনের চোখ দিয়ে নাট্যকার দেখেছেন সমাজের উঁচুতলার মানুষের ভেতরকার কুৎসিত দিকটি। 'সোন্দরের পূজারী' মদন নাগরিক জীবনে কোথাও সৌন্দর্য খুঁজে পায় নি। 'মদনের পঞ্চকান্ড'তেও মনোজ মিত্র মদনের চোখে দেখেছেন পরিবার তথা সমাজের অন্তঃসারশূন্য রূপটিকে। প্রত্যাশিত সৌন্দর্যের সন্ধান না পেয়ে মদন প্রত্যাখ্যান করেছে নাগরিকতাকে। এই প্রত্যাখ্যান আসলে নাট্যকারেরই। এই নাট্যকারই আবার 'দন্তরঙ্গ' নাটকে নিজের পরিচিত প্রতিবেশে স্থিত। পারস্পরিক সহমর্মিতার প্রকাশে উজ্জ্বল এই একাঙ্কটি। মনোজ মিত্র অনুভব করেছেন, এই ছুটন্ত সময়ে ব্যথা অনুভব করার সময় নেই মানুষের। এই সমাজ সবাইকে অচেতন করে রেখেছে। গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞায় মনোজ মিত্রের চরিত্র উচ্চারণ করেছে ঃ "ব্যথারা হারিয়ে যাচ্ছে। বিদায় বিচ্ছেদ কালে কালে সব ড্রাই হয়ে ঝুলে পড়ছে। এই সময় ... এই সমাজ ... সবাইকে অ্যানাসথেসিয়া করে রেখেছে।"[১৩] পোষা কুকুরের জন্য না, দাঁতের জন্য না, প্রিয়জনের জন্য না — আধুনিক মানুষ কারো জন্যই ব্যথা অনুভব করে না। নাট্যকার মনোজ মিত্র এই ব্যথার অনুভব জাগাতে চান। তিনি বোঝাতে চান, পরিবার মানে আসলে পরস্পরের জন্য কষ্ট ভোগ করা। সেই কষ্ট ভোগের আনন্দেই পরিবারের সম্পূর্ণতা। সেই আনন্দ পেতেই মনোজ মিত্রের চরিত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঃ " না। নকল দাঁত আমি পছন্দ করি না। যে দাঁত জীবনে টাটাবে না ... কষ্ট দেবে না ... যার কখনও ব্যথা চাগাবে না ... সেই নিষ্ঠুর নির্দয় বাঁধানো দাঁতের কোন স্থান নেই আমার চোয়ালে।"[১৪] ব্যথা না দিলেও যে কোনো কিছুকে 'নির্দয় নিষ্ঠুর' মনে হতে পারে সেই দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ করে দিয়ে মনোজ মিত্র বোঝান, পরিবার আসলে পরস্পরের দুঃখ কষ্টকে ভাগ করে নেওয়া, পরস্পরের সহমর্মী হওয়া। কৃত্রিমতা নয়, স্বাভাবিকতাতেই জীবনের প্রকৃত ছন্দ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ অবহেলিত, অবজ্ঞাতকে জীবনযুদ্ধে জিতিয়ে দেওয়া। এ যেন তাঁর রক্তের উত্তরাধিকার। ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক পিতা অশোক কুমার মিত্র কলমের খোঁচায় জিতিয়ে দিতেন দরিদ্র কৃষককে, আর পুত্রও কলমের খোঁচায় সারা জীবন জিতিয়ে চলেছেন কেনারাম বা বেচারাম, গজমাধব, বাঞ্ছারাম, তুষ্টু চামার, ঘন্টাকর্ণের মতো অসহায়, প্রান্তিক মানুষকে। এই মানুষেরা সমাজের বিরাট গণ্যমান্য কেউ নয়, সংসারেও এদের প্রয়োজনীয়তা সামান্যই। কেজো জগতের বিচারে এদের বাতিল মানুষই বলা চলে। মনোজ মিত্রের পুরনো ধরণের মূল্যবোধ সহানুভূতি বোধ করে এই অসহায় মানুষগুলির প্রতি। পুরনো মাত্রেই বাতিল — আধুনিকতার এই তত্ত্বের বিপ্রতীপতায় তাঁর যাত্রা। যে সহমর্মিতা হারিয়ে যাচ্ছে পরিবার তথা সমাজ থেকে, এই মানুষদের স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তাকেই সবলে ফিরিয়ে আনতে চান তিনি।

শিল্পের শর্ত যথাযথ মান্য করেই রচনা করেন এঁদের জয়ের প্রেক্ষাপট। তাই বেচারাম শেষ পর্যন্ত ফিরে পান সংসারে নিজের প্রতিষ্ঠা, গজমাধব ঘর হারিয়ে পথে নামলেও মন্দিরা এবং পাঠক-দর্শকের সহানুভূতিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকে, সমস্ত প্রতিকূলতা এবং ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে প্রবলভাবে বেঁচে থাকে বাঞ্ছারাম, ঘন্টাকর্ণ রুখে দাঁড়ায় শোষকের বিরুদ্ধে, বড়লোক বন্ধুদের করুণাকে উপেক্ষা করে নীতিশ আর শ্যামা নিজেদের পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী, নিজেদের 'সাতুই ফাল্গুন'কে উজ্জ্বল করে তোলে, গাঁয়ের বধূ মরালী, বেণীর মুখের ওপর চারটি দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে স্বামী কেষ্ট-দুলালের সম্মান রক্ষা করে।

দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে 'সর্ব্ব-ব্যাপী সহানুভূতি'র কথা বলেছেন, মনোজ মিত্রের সহানুভূতি অনেকটা সেই গোত্রের। ছোটো, বড়ো, প্রান্তিক — কোনো চরিত্রই তাঁর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি। এই সহানুভূতি একদিকে যেমন বর্ষিত হয়েছে অসহায়, দুর্বলের প্রতি, অন্যদিকে খল চরিত্রও তা থেকে বঞ্চিত হয় নি। অনুতাপের আগুনে পুড়ে যখন শুদ্ধ হয় তাঁর চরিত্ররা, তখন নাট্যকারের প্রসন্ন দৃষ্টি বর্ষিত হয় তাদের ওপর। 'দম্পতি' নাটকে যেমন বাড়ি বিক্রির টাকা ভাগ করে নিয়ে মা-বাবাকেও ভাগ করতে চলেছিল যে দুই ভাই, তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে কর্তা-গিন্নির শুভানুধ্যায়ী জিতেনবাবু যখন নিজেই বেনামিতে বাড়ি কিনে নিয়ে দম্পতিকে গৃহচ্যুত হতে দেন নি, তখন দুই পুত্রকে তাড়িয়েই দিচ্ছিলেন জিতেন ঃ ''দেড়লাখ টাকা পেয়েছ ... হাফ হাফ হয়েছে ... সাড়ে ছ'টায় আসাম মেল ... সাড়ে সাতটায় কালকা ... ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে ... যাও খোকারা বেরিয়ে পড়ো ! এরপর কিন্তু মিনিটে মিনিটে ঘর ভাড়া চার্জ করবো ... ''[১৫]। এই সংলাপ পাঠক-দর্শককে Poetic Justice-এর স্বস্তি দেয়। কিন্তু এই রূঢ়তা, এই প্রতিশোধপরায়ণতা মনোজ মিত্রের মানস-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মেলে না। তাই বড়খোকা-ছোটখোকা মাথা নিচু করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন জিতেনই তাদের পথ আগলায় ঃ

> ''যাচ্ছো কোথায় ? ট্যাক্সি আমি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি ! আরে আমি যেতে বললেই যাবি কেন ? জিতু কাকার ওপর তোদের জোর নেই ? আমার বাড়ি, তোদের বাড়ি না ? সেই বাড়ির গৃহপ্রবেশ আজ ! তে রাত্তির পার না করে কেউ যেতে পারবে না ! যা ঘরে যা।''[১৬]

মানুষকে তিনি এখানে এনেই দাঁড় করাতে চান। ধ্বস্ত মূল্যবোধের ওপর জয়ী করতে চান মানবিকতাকে। সেই মানবিকতার কাছে কেউ অস্পৃশ্য নয় — সকলকে নিয়েই তার সম্পূর্ণতা। সেই কারণেই সংসারে অপাঙ্‌ক্তেয় বেচারামবাবু যখন শেষে আবার নিজের সংসারে 'ফিট' হয়ে যান তখন যে পরিবারের সকলে নির্লজ্জ স্বার্থপরতায় কেনারামকে 'বাবা' বলে স্বীকৃতি দিতে চলেছিল তারাই মাথা নিচু করে এসে দাঁড়িয়েছে বেচারামের পাশে। সকলের স্নিগ্ধ হাসিতে নাটক শেষ করেছেন মনোজ মিত্র। এই হাসিতে পৌঁছনো, মানুষকে এই নির্মল হাসিতে পৌঁছে দেওয়াই নাট্যকারের অভিপ্রায়। তাঁর সহানুভূতি সেই হাসিরই পোষকতা করেছে। সহানুভূতি প্রবল বলেই 'আকাশচুম্বন' নাটকে শেষপর্যন্ত রূপা-সুপ্রিয়দের বহুতলটি ভেঙে পড়ে না। কাছের আর একটি বহুতলের ভেঙে পড়া দেখিয়ে নাট্যকার সচেতন করেন রূপা-সুপ্রিয়কে। আর একবার সুযোগ দেন জীবনের বনিয়াদ শক্ত ভিতের ওপর গড়ার।

এই সহানুভূতিরই অন্যতম রূপ পুরনোর প্রতি সহমর্মিতা, তাকে রক্ষা করার আপ্রাণ প্রয়াস,

আধুনিক যান্ত্রিক যুগে প্রাণের স্পর্শ সৃষ্টি করা। 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকে তাই কৈলাস অপেরার মালিক শেষপর্যন্ত ফিরিয়ে নিতে আসে বাঁশিওয়ালা রূপচাঁদকে ঃ "আমি সাফ বলে দিয়েছি, বাঁশি বাজাবে জ্যান্ত মানুষ ... এক বুক দরদ নিয়ে গাল ফুলিয়ে বাজাবে ... ও শালা সিনথেসাইজারের না আছে দরদ, না আছে ফুসফুস !"[১৭] এই 'দরদ'ই মনোজ মিত্রের অভীষ্ট। যে কোনো চরিত্রই নাট্যকার মনোজ মিত্রের সহানুভূতি-ধন্য। আসলে চরিত্র রচনায় তিনি ব্যবহার করেছেন বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে আপাতদৃষ্টিতে যে চরিত্রগুলি হয়তো খল কিংবা কৌতুকময়, কোনো এক বিশেষ সংলাপে তাদের অন্যতর পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে নাট্যকারের সহানুভূতিকে স্পষ্ট করে। একটি মাত্র সংলাপেই হয়তো চরিত্রের প্রতি পাঠক-দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে যায়। 'রাজদর্শন' নাটকে যেমন লম্বোদর ভট্ট আগাগোড়া একজন লোভী, পেটুক ব্রাহ্মণ। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই তিনি ব্যস্ত। মালপো খাবার জন্য যে কলার কাঁদি তিনি জমিয়ে রেখেছিলেন, স্ত্রী-সন্তানরা তা আত্মসাৎ করলে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন ঃ "মাগী বছর বছর বিয়োচ্ছে, আর আমার কপাল থেকে একটি করে সুখাদ্য উঠে যাচ্ছে র‍্যা ...। [সহসা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে] নির্বংশ করো ... হে ভগবান নির্বংশ করো ..."[১৮] নিজেকেই নির্বংশ করার এই অভিশাপের আপাত-কৌতুকময়তার গভীরে রয়েছে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অসহায় আর্তি। এই সংলাপে চরিত্রটির প্রতি পাঠক-দর্শকের যে অনুভূতি জন্মায়, সে সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ঃ

> "চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতার এ ব্যালেন্স বা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন বলেই মনোজ মিত্রের নাটকে নতুন একটি মাত্রা যোজিত হয়। লম্বোদরের প্রতি তাই বিরাগ জন্মায় না, ঘৃণাও নয়, বরং তার অস্তিত্বের নিষ্ফল উপায়হীনতা আশ্চর্য এক সহানুভূতিকে আকর্ষণ করে আনে।"[১৯]

'নাকছাবিটা' নাটকে যেমন রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন সাধারণভাবে স্বার্থপর, ক্ষমতালোলুপ চরিত্র হিসেবেই পরিচিত, যিনি একদা ত্যাজ্য পুত্রকে আবার সাদরে গ্রহণ করতে এসেছেন ভোটে জিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার বাসনায়। এই বরদাপ্রসন্ন বিপ্লবী পুত্র বীরেশ্বরকে ত্যাগ করেছিলেন ইংরেজদের খুশি রাখতে। কিন্তু নিজে মুখে যখন তিনি ব্যক্ত করেন নিজের সেই সময়কার অসহায়তার কথা, তখন ক্ষোভের পরিবর্তে তার প্রতি জাগে করুণা ঃ

> "সেদিন আর কী করতে পারতাম বলো। সাহেবদের খুশি না রাখলে সাতপুরুষের জমিদারিটা চলে যেত। যদি বলো জমিদারি রাখাটাই অপরাধ, আমি অপরাধী। কিন্তু অন্তর থেকে বলছি, বীরেশ্বর আমি তোমাকে নিয়ে গর্বও করি, হিংসাও করি ...। দেশের মানুষ তোমাকে ... তোমাদের যে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে — সেকি আমার ভাগ্যে কোনোদিন জুটবে !"[২০]

এই সংলাপ একদা দোর্দন্ডপ্রতাপ জমিদারের অসহায় অবস্থাটি প্রকাশ করেছে। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে পমমামা কমিক চরিত্র। বোনের 'চরিত্র' রক্ষায় তার নজরদারি প্রায় বাতিকের পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাংসারিক জগৎ সম্পর্কে প্রায় অনভিজ্ঞ, 'আলপাতালে' এই পমবাবুর দু-একটি মাত্র সংলাপে উন্মোচিত হয়ে যায় চরিত্রটির অন্তরের রিক্ততা ও বিষণ্ণতার দিকটি ঃ

> "কী হচ্ছে কী ? কান্নার কী হল ? অ্যাই লতু ... আরে বাবা, তোর বিয়ে দিতে পারিনি বলে নিজেও যে করেছি, তা তো নয় ... যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন তো কিছু করারও নেই। আর দুজনের জীবন তো কেটেই গেল। (লতিকার মাথায় হাত বোলায়) ভাইবোনে খারাপ যে কাটল তাও তো না।"[২১]

এই সংলাপ কেজো সংসারে ব্যর্থ এক অসহায় মানুষের, নিজেদের অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া এক সাধারণ মানুষের। অসহায়তা নিজের মুখে ব্যক্ত হয়েছে বলে চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে এবং নাটক জুড়ে সেই সহানুভূতির সুরটি বজায় থেকেছে। 'সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি'র আরেকটি দৃষ্টান্ত প্রকাশ পেয়েছে পমমামা চরিত্রটির মাধ্যমে। ডিমভরা পাবদা আনতে বাজারে গেছেন পমমামা, কিন্তু ফিরেছেন খালি থলে নিয়ে। বাজারে পাবদা নেই এমন নয়, উর্বশী মাছওয়ালী সেদিন বসেনি বলে খালি হাতে ফিরেছেন তিনি। তার দর্শন ঃ "রোজ যার কাছ থেকে তেলাপিয়া নিই, পাবদাটা আজ তার কাছ থেকে নেব না।"[২২] এই দর্শন আসলে নাট্যকার মনোজ মিত্রের। 'কুহুযামিনী' নাটকে স্বামী চণ্ডীগোপালের বন্ধু আবিরের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছে জোনাকি। প্রাথমিকভাবে জোনাকির সম্পর্কে যে ধারণা তৈরী হয়, ক্রমে তা ভাঙতে থাকেন মনোজ মিত্র। মানুষকে খাদের কিনারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেন তিনি এবং সে পরীক্ষায় মানুষের উত্তরণই দেখান। বাহ্যত গোঁয়ারগোবিন্দ হলেও চণ্ডীগোপাল যে স্ত্রীকে যথেষ্টই ভালোবাসে, তা এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে শুনেছে জোনাকি। আবির যে গাড়িতে তাকে চড়িয়েছে কিংবা যে টাকা তার পেছনে খরচ করেছে, সেগুলি সবই যে চণ্ডীগোপালের, তাও জানা হয়ে গেছে জোনাকির। কিন্তু এসব জানার আগে থেকেই জোনাকির মনের গতি চণ্ডীগোপালের দিকে। হাইওয়েতে আটকে পড়ে তার প্রথমেই মনে হয়েছে, সারাদিন খাটাখাটি করে 'মানুষ'টা ঘরে ফিরবে। এই আস্থা, বিশ্বাসের জগতেই মানুষকে থিতু করতে চান মনোজ মিত্র। চারপাশের বিশ্বাসভঙ্গের মাঝে রচনা করতে চান একখন্ড স্বপ্নস্বর্গ। অর্থসর্বস্ব দুনিয়ায় অর্থের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চান স্নেহ-ভালোবাসা-মমতাকে ঃ

" আবির ।। টাকা হাতে পেলেই বাজা! ইচ্ছে হয়, দেখি না বাজিয়ে ... টাকায় কত কী হয়, কত কী কেনা যায় ...

জোনাকি ।। হলো, কেনাবেচা হলো ?

আবির ।। ... অনেক অনেক কিছু কিনলাম, শুধু একটা জিনিস কিনতে পারলাম না। কেনা যায়ও না। ও জোনাকি, তোমায় কেনা যায় না।

জোনাকি ।। দুঃখু হচ্ছে ?

আবির ।। দুঃখ হবে কেন ? কিনতে তো বেরুইনি, দর করতে বেরিয়েছিলাম।... তোমার দরটা অনেক।"[২৩]

আবিরের শেষোক্ত কথাটিতে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জোনাকির গরিমা, অন্যদিকে তেমনি আবির নিজেও পেয়েছে পাঠক-দর্শকের সহানুভূতি।

'পাখি' একাঙ্কটিতে গোপাল নামে যে চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন তিনি, সেই পরিহিতৈষীর সবসময়ের চিন্তা বুড়োবুড়িদের নিয়ে ঃ "এক একদিন রাতে ঘুম আসে না ... সব বুড়োবুড়ি, কেউ যাদের দেখার নেই, সবার মুখগুলো ভাসে নিতুদা ..."[২৪] এই সহানুভূতি আসলে নাট্যকারের, যা ব্যক্ত হয়েছে চরিত্রমুখে। দেশের বাড়ি থেকে নীতিশের মায়ের চিঠি এসেছে দেখে গোপাল খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করলে বিবাহবার্ষিকীর আয়োজনের মাঝে নীতিশ সে চিঠি খুলতে চায় নি। শ্যামা

এবং গোপালের মতো আমরাও তখন নীতিশকে নিষ্ঠুর এবং পাগল বলেই মনে করি। কিন্তু মনোজ মিত্র চরিত্রের ওপর ফেলেন ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যেককেই সুযোগ দেন নিজের অবস্থানটি বুঝিয়ে বলার। তাই নীতিশের আত্মপক্ষ সমর্থনে বিষয়টি অন্যতর মাত্রা পেয়ে যায় ঃ

> "পাগল, হ্যাঁ আমি পাগল ! ছেলেবেলা থেকে উপোস করে করে আমি পাগল হয়ে গেছি।... মাঘ মাস থেকে মা বলছে দেখতে যেতে, পারি না ... খালি হাতে দেখতে যাবো কি ! মা যে কিছু আশা করে। চিঠি কেন ছিঁড়ে ফেলি!... পাড়ার লোক ধরে ধরে মা পত্তর দেয় । প্রত্যেকটা পত্রে অবস্থা খারাপ ... আরো খারাপ ... আরো! এতে কী লেখা আছে ... কী লেখা থাকতে পারে আমি জানি ... সেই এতটুকু বয়েস থেকে জানি কখন কোন্ চিঠি কোন্ খবর নিয়ে আসে! ভাল খবর কখনো আসে না রে ! সকাল থেকে আজও জানতাম আসছে ... একটা খবর আসছে। ভয় করছিল আমার। তাই হ'লো! আজকের দিনে এটা আমি পড়তে পারব না। একটা দিন ... মাত্তর কয়েক ঘন্টা আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। জীবনে আর কোনদিন কিছু চাইব না।"[২৫]

পাঠক-দর্শক এখানে থমকে দাঁড়ান, দ্বিধান্বিত হয়ে ভাবেন, কোন্‌টা প্রাপ্য নীতিশের — ধিক্কার অথবা সহানুভূতি। সে যেন এখানে দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠে বাঁধা এক অসহায় পশু, যে কিনা দু'টি মুহূর্তের জীবন ভিক্ষা চাইছে, দারিদ্র্যের পীড়নকে ভুলে অন্তত কয়েক ঘন্টা জীবনকে উপভোগ করতে চাইছে। 'কালবিহঙ্গ' নাটকে ত্রিকালজ্ঞ পাখির ধোঁকা দিয়ে মানুষ ঠকায় যে ভক্তরাম, তাকেও শেষপর্যন্ত সহানুভূতিতে উত্তীর্ণ করে দেন মনোজ মিত্র। ভক্তরামেরা আসলে ব্যবহৃত হয় সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের হাতে। একটা সীমার পর তারাও অসহায়। লোক ঠকাতে ঠকাতে কখন যেন তারা নিজেদেরও ঠকাতে শুরু করে নিজেদের অজ্ঞাতেই। তাই ছেলের কাছে পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিজের অজান্তেই সে হাতসাফাই করে ফেলেছে। উপেনের সংলাপে ভক্তরামের এই অসহায় অবস্থাটিকে ফুটিয়ে তুলে নাট্যকার ভক্তরাম চরিত্রের ওপর অন্য দিক থেকে আলো ফেলেছেন, যে আলোতে ভক্তরাম প্রতিভাত হয়েছে ব্যবস্থা এবং অভ্যাসের হাতে বন্দী এক অসহায় মানুষরূপে ঃ "বাবা হয়ে তুমি ছেলের উন্নতি চেয়েছো — এতো বেশি করে চেয়েছো, যে হাত সাফাইটা তোমার নজরেই পড়ছে না"[২৬] 'পরবাস'-এর একাঙ্ক রূপ 'কোথায় যাবো'তে গজমাধব প্রথম থেকেই একটি সিরিও-কমিক চরিত্র। কিন্তু কমেডির চরিত্রের ভেতরে যে অশ্রুর প্রবাহ থাকে তা যখন তুলে ধরেছেন নাট্যকার তখন গজমাধবের জন্য নীরবে দু-ফোঁটা চোখের জল পড়ে পাঠক-দর্শকের। সাধারণের চেয়ে হীনতর গজমাধবের জন্য বুকের কাছে একদলা কষ্ট পাকিয়ে ওঠে। করালী দত্তর ঘর ছেড়ে দিয়ে পথে নামবে গজমাধব, কোথাও যাবার মতো জায়গা তার নেই। কিন্তু তার মনেও তো আছে সাজানো-গোছানো এক সংসারের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকেই যখন সত্যি হিসেবে তুলে ধরে মন্দিরার কাছে, তখন তা যেন নিজেরও এক তৃপ্তির অনুভব ঃ

> "গজ ।। (বিষণ্ণ মুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ, খবর টবর সবই দেওয়া আছে। তারা আমার জন্যে রান্নাবান্না করে ... ঘরটর সাজিয়ে গুছিয়ে অপেক্ষা করবে ... এইরকম কথাই আছে... [কথার শেষে গজমাধবের মুখে নীরব হাসি ফুটে ওঠে]
>
> মন্দিরা ।। কোথায় যাচ্ছেন, নিজের বাড়ি ?
>
> গজ ।। (বিষণ্ণ মুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ! (বলেই গজমাধব মন্দিরাকে লুকিয়ে নীরবে হাসে) ...

মন্দিরা ।। বাড়িতে কে কে আছেন ?

গজ ।। (দুঃখে নীরবে হাসে) কে কে ... ইয়ে মানে ... সব ... সবাই ...

মন্দিরা ।। বুঝেছি ! আর বলতে হবে না। তিনি ... মানে আপনার উনি আছেন ... কেমন ? (গজমাধব চুপ) দেখতে কেমন ? নিশ্চয়ই আমার থেকেও সুন্দরী ...

গজ ।। (নীরবে ঘাড় নাড়ে) না না, শুধু এই কপালটায় যখন সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে ... লালপেড়ে শাড়ি পরে ... প্রদীপ হাতে ... যখন সামনে এসে দাঁড়ায় ... [গজমাধবের অশ্রু হাসি হয়ে যায়]''[২৭]

হাসি আর অশ্রুর মিশেলে গজমাধব এখানে যেন এতক্ষণের পরিচয়ের সীমা ছাড়িয়ে এক অপরিচয়ের জগতে উত্তীর্ণ। 'মহাবিদ্যা' নাটকে নগরের কোতায়াল নিজেই ধাঙড় তুলসীদাসকে অরক্ষিত এক বাড়িতে সিঁদ কাটতে বলছে গৃহবধূর গয়না চুরি করে আনার জন্য। কিন্তু সেই কোতায়ালের প্রতিও বর্ষিত হয়েছে নাট্যকার মনোজ মিত্রের সহানুভূতি। তিনি খুঁজেছেন চরিত্রের অসততার কারণটিকে, সেই কারণের জোরেই কোতোয়াল আর পুরোপুরি খল থাকেনি, হয়ে পড়েছে কিছুটা করুণার পাত্র ঃ

''মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি বেশ বড়লোকের ঘরেই। দানসামগ্রী গয়নাগাঁটি খাটপালঙ্ক পণের কড়ি ... কিছুই কম দিই নি। তবু আমার বড়লোক জামাই বেয়াই বেয়ানের মন উঠল না। মেয়েটাকে চিলেকোঠায় আটকে রেখে চাবুক দিয়ে চাবকায়। বলে যা তোর কোতোয়াল বাপের কাছ থেকে আরও গয়না নিয়ে আয়। (থেমে) এক পুঁটলি গয়না ছাড়া মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করা যাবে না ! (থেমে) গর্ত কাট !''[২৮]

গর্ত কাটতে বলাটা এবার আর ততটা অপরাধ বলে মনে হয় না। একইরকমভাবে 'প্রভাত ফিরে এসো'তে প্রভাত যখন ঝুমুরকে বেঁধে রেখে সমস্ত জিনিস নিয়ে যায় তখনও যে প্রভাতের প্রতি যথেষ্ট বিরূপতা জাগে না তার কারণ, মনোজ মিত্র আগেই আমাদের জানিয়ে দেন, সরল প্রভাতকে সবাই ঠকিয়ে ঠকিয়ে নিঃস্ব করে ছেড়েছে। ঝুমুরও অন্যের বাড়ি থেকে চেয়ে আনা জিনিসে নিজেকে এবং নিজের ঘর সাজিয়েছিল প্রভাতকে ফাঁদে ফেলে টাকা আদায় করবে বলে। আবার ঝুমুরের প্রতিও বিরূপতা জাগতে পারে না, কারণ ঝুমুরের টাকাটা প্রয়োজন স্বামী সৌম্যর পেসমেকারটা বদল করার জন্য। ঠিক যেমন 'দম্পতি' নাটকে দোলন ব্ল্যাকমেল করে শ্যামলকে, নিজের স্বামী সুদীপকে বাঁচানোর কারণটি তার পেছনে জুড়ে দিয়ে দোলনকে পাঠকের বিরূপতা থেকে বাঁচান মনোজ মিত্র। এভাবেই তাঁর সহানুভূতি-ধন্য হয়েছে যে কোনো ধরণের চরিত্র। আসলে মানুষের প্রতি রূঢ় হতে পারেন না তিনি। মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা বিপন্নতা আছে, সেই বিপন্নতাই তাকে অসহায় করে। সহৃদয় মন নিয়ে তিনি খুঁজেছেন সেই বিপন্নতার কারণটিকে।

এই সহৃদয়তাই তাঁকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে, যা কিছুই ঘটুক না কেন, মানুষ মূলত ভালো। তাঁর অনেকগুলি নাটকই তাই শেষ হয়েছে মনুষ্যত্ব এবং শুভবোধের জাগরণে। এই শুভবোধের জাগরণ ঘটানো এবং তাকে সমাজ-সংসারে লালন করাই নাট্যকার মনোজ মিত্রের জীবনবোধ। 'অশ্বত্থামা' নাটকের শেষে সাফল্য-লোলুপ, রক্তপিয়াসী অশ্বত্থামা অনুতপ্ত। রক্ত দেখে দেখে, ধ্বংস করতে করতে সে ক্লান্ত। তাই বৃহৎ এক সৃজনের বাসনায় সে অস্থির। ধরিত্রীর তৃণমূলে তখন সে জল

সিঞ্চন করতে চায়। পঞ্চপান্ডবের পরিবর্তে ভুল করে তাদের পাঁচ সন্তানকে হত্যা করে ফেলার পর জেগেছে অশ্বত্থামার শুভচেতনা। দুর্যোধনকে সে চিনেছে 'দুরাচার রাজা' রূপে। নিজেকে চিনেছে ব্যবহৃত এক অস্ত্ররূপে, যে অস্ত্র বারবার আঘাত হেনেছে ভ্রান্ত লক্ষ্যে। কিন্তু রাজার পালিত ঘাতকের সাধ্য কী মহান ধর্মকে চূর্ণ করার! অধর্মের বিনাশে যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে সনাতন ধর্ম। পান্ডবরা তাই অক্ষত। ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে রথ। সেই রথের আরোহীর হাতেই নাশ হবে ঘাতক বাহিনী। কৃপাচার্যের সংলাপে তারই ইঙ্গিত ঃ "ঐ কপিধ্বজ রথে দ্যাখো গান্ডীবধারী অর্জুন ! নাশ করবে ... নাশ করবে এই ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের ! মহাকালের বিচার ! মুক্তি নেই ... আমাদের মুক্তি নেই ..."[২৯] সমকালীন রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলাকে মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত করেও মনোজ মিত্র আস্থা স্থাপন করেছেন সেই শুভ শক্তির আবির্ভাবে, যা বিনাশ করবে সব অন্ধকার। 'চাক ভাঙা মধু' বা 'সাজানো বাগান' নাটকে শুভবোধের জাগরণ ঘটেছে শেষে নতুন জীবনের সম্ভাবনায়। বাদামী নিরুপায় আক্রোশে সড়কি চালিয়ে অঘোর ঘোষের বক্ষ ফাটিয়ে দেবার পর টালমাটাল পায়ে উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে গেছে দোলনার দিকে — নতুন জীবনের দিকে। মনোজ মিত্র মানুষকে এভাবেই এগিয়ে দেন ইতিবাচকতার দিকে, জীবনের সদর্থক অনুভবের দিকে। 'সাজানো বাগান' -এ শেষে নবজাত শিশুর কান্না শুনে ফলিডলের শিশি ফেলে দিয়ে বাঞ্ছার যে সংলাপ তা জীবনের সদর্থকতাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। মৃত্যুর প্রতীক ফলিডল ফেলে দিয়ে বাঞ্ছারাম এগিয়ে গেছে সেই ঘরের দরজার দিকে, যেখানে নবজাত সন্তান এসেছে — নতুন জীবন এসেছে। সেই শিশুকে উদ্দেশ্য করে বাঞ্ছার সংলাপ পুরোটাই জীবনের আহ্বান। প্রকৃতির মতো সহজ সে জীবন নবজাত শিশুকে দিয়ে যাবার অঙ্গীকার করেছে বাঞ্ছা। এই উত্তরাধিকারীর জন্যই তো বাগান সাজায়, জীবন সাজায় মানুষ। শুভবোধের জাগরণে মনোজ মিত্র প্রচলিত বাংলা নাটকের মতো বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেন না। তিনি মনে করেন, তত্ত্বের চেয়ে জীবন বড়ো, মানুষ বড়ো। 'শিবের অসাধ্য' নাটকে জোতদারের হাত থেকে কৃষকের মুক্তির উপায় হিসেবে মানুষের চৈতন্যের জাগরণের ওপরই ভরসা রেখেছেন নাট্যকার। বাইরে থেকে আসা কোনো নেতা বা আরোপিত কোনো তত্ত্ব তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, 'পরের কাছা' ধার করে পার পাওয়া যাবে না, চাষার ভাগ্য চাষা ছাড়া কেউ ফেরাতে পারবে না ঃ

"দুর্গা ।। মানুষের কাজ মানুষই করবে। মানুষের শত্রুকে মানুষই মারবে। মানুষের বুকে তুমি চৈতন্য জাগিয়েছ, এবার তাদের ভালো মন্দ তারাই বেছে নিক ... তাদের পথ তারা খুঁজে নিক। সেটাই হবে সব থেকে সুন্দর, সব থেকে মঙ্গলকর ...

শিব ।। তবে তাই হোক্ ! লেগে পড় ... ও ছিদেম, লেগে পড় ! পারবি পারবি ... পারলে তোরাই পারবি ! কিছু করতে হলে তোদেরই করতে হবে। লেগে পড় ! উল্টেপাল্টে দে । আসছে বছর আমরা এসে যেন দেখতে পাই, ও ছিদেম, ভবের অসুর নাশ হয়েছে, তোরা জয়ী হয়েছিস ... পৃথিবী সুন্দর হয়েছে, মধুর হয়েছে ... আসছে বছর আমরা তোদের ঘরে উঠব ... ও ছিদেম, আমরা তোদের ঘরে উঠব ..."[৩০]

এই একই চেতনার উন্মেষের কথা আছে 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে। রাক্ষসনিধনের ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে সেখানে মানুষের শুদ্ধ চৈতন্যকেই স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে ঃ "মানুষ ! নির্লোভ নিষ্পাপ অভ্রান্ত মানুষ ... শুদ্ধ জাগ্রত মানুষ তার মহাকাল !"[৩১] পৃথিবীতে কোনো মানুষই মহান পবিত্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় না, বারবার অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সবকিছু তাকে অর্জন করতে হয়। অনুতাপদগ্ধ এই শুদ্ধ মানুষেই মনোজ মিত্রের আস্থা। নীলকমল, সুবর্ণ আর হীরামন অর্জন করে সেই চেতনা, তাই তাদের অস্ত্রাঘাতেই রাক্ষসের নিপাত ঘটে। 'নৈশভোজ' নাটকেও 'সাধু' তুষ্টুর চৈতন্যের উদ্বোধনের মধ্যে নাটক শেষ করেছেন মনোজ মিত্র। মাথায় জট পড়তে দেখে তুষ্টু সংসার ভুলে ধর্মে মেতেছিল কিন্তু শকুনের নখরে জটা ছিন্ন হতে সে ভারমুক্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে শকুনের ব্যবহারে শিখেছে, সন্তানকে বুক দিয়ে আগলে রাখাই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। আত্মধিক্কারের মধ্যে তুষ্টুর যে নতুন চেতনার উন্মেষ, সেই চেতনাকে অভিনন্দিত করেন মনোজ মিত্র।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোথায় যেন মনোজ মিত্রের ভাবনার আত্মীয়তা। তারাশঙ্করের মতোই তিনি জানেন, পুরনোর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তবু তাঁর সহানুভূতি এবং দীর্ঘশ্বাস সেই পুরনোরই জন্য। এই 'পুরনো' আসলের মানুষের চিরকালীন মূল্যচেতনা। কালের গতি ফেরাতে পারেন না তিনি, কিন্তু বিলীয়মান কালের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল বা একটু দীর্ঘশ্বাস জেগে থাকে তাঁর রচনায়। সেই ছোটোবেলায় ধূলিহরে ছেড়ে এসেছিলেন যে সহজ শিথিল জীবন, সেই জীবনের প্রতি ভালোবাসা বজায় রেখেছেন সবসময়। বিশেষত, আধুনিক সময়ের সঙ্গে তুলনায় নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে সেই শিথিল জীবনচর্যার কথা। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে যেমন জটা নিজেদের পেশার পড়ন্ত অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সহজভাবে কটাক্ষ করেছে আধুনিক মানুষের ধূর্ততাকে ঃ

> "ইমন আকাল ... আজকাল এট্টা লোকেরেও সাপে কাটে না। (দাক্ষার চোখে ত্রাস) কাটবে কেনে? মুনিষ্যি অজকাল সব না খেয়েই অক্কা পাচ্ছে ... সাপ পজ্জন্ত আর গে পৌঁছয় না। হাঁ, সে আগের আমলে ছিলো ... ছিলো সব কাছাখোলা হালা-পাগলা লেতাই-গৌর মুনিষ ... কুমোর পাড়ায় এট্টা মাগী ছিলো, বুঝলিরে মাতলা, বেয়াল্লি বছরে তারে সাপে ছুঁয়েছে এককুড়ি ছ-বার।"[৩২]

'কাছাখোলা হালা-পাগলা লেতাই-গৌর মুনিষ' যে একালের সংসারে অচল, মনোজ মিত্র তা জানেন না এমন নয়, তবু তাঁর অন্তরের সহানুভূতি যে সেই মানুষের প্রতিই, তা গোপন থাকে না। 'শোভাযাত্রা' নাটকে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এমন এক উত্তরপুরুষকে, যিনি পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের দায় বহন করে চলেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই মনোজ মিত্রের সহানুভূতি এখানে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের প্রতি। কেউ কেউ এই সহানুভূতিকে দুর্বলতা বলে সমালোচনা করেছেন ঃ

> "শ্রীমিত্র সামন্ত সমাজ আর পুরনো অতীতের প্রতি একটু বেশি দুর্বলতা দেখিয়েছেন। সভ্যতার অনিবার্য বিবর্তনে সামন্ত সমাজ ও সভ্যতা একদিন অতীত হয়ে যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সমুখে যে সমাজের উপস্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়; সেই সমাজ তো অতীত হবেই। তাকে নিয়ে টানাপোড়েন আর হা-হুতাশ বেশীরভাগ সময়েই শূন্যগর্ভ কোনো আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কোনো মাত্রা পায় না।"[৩৩]

রাজনৈতিক বা সামাজিক তত্ত্বের দিক থেকে এই সহানুভূতি 'শূন্যগর্ভ আবেগ' মনে হতে পারে, কিন্তু মনোজ মিত্র জীবনকে তত্ত্বের ছাঁচে ফেলে দেখেন না। তত্ত্ব-অতিক্রমী বা তত্ত্ব-নিরপেক্ষ যে আলো-

ছায়া খেলা করে মানুষের জীবনে, তাকেই তুলে ধরেন নিজের সৃষ্টিতে, তাই তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে সিনেমার শুটিং-এ মহিষাদলে গিয়ে সেখানকার রাজার দেওয়ানবাড়িতে দেওয়ানের বংশধরের স্ত্রী-র মুখের কথা। ভাঙাচোরা সেই বাড়িতে তাঁরা বাস করছেন, বয়ে বেড়াচ্ছেন জগন্নাথের রথ। উৎসব আর হয় না, কিন্তু রথটি ফেলতেও পারেন না, বেচতেও পারেন না। সেই ভদ্রমহিলার মুখেই শুনেছিলেন, তাঁদের প্রতি গ্রামের লোকজনের বিরূপ মনোভাবের কথা। পূর্বপুরুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছেন তাঁরা, নীরবে সব গঞ্জনা সহ্য করে। মনোজ মিত্রের সহানুভূতিশীল মন অনুভব করেছে এই মানুষগুলির অসহায়তা, যারা প্রত্যক্ষ কোনো অপরাধ না করেও পূর্বপুরুষের অপরাধের বোঝায় পীড়িত এবং লজ্জিত। এই সহানুভূতি মানবের প্রতি, মানবতার প্রতি। এই নাটকে মনোজ মিত্র বাংলাদেশের গ্রামীণ উৎসবের ছবি এঁকেছেন। দুর্গোৎসব উপলক্ষে নিজেদের গ্রাম ধূলিহরে বাড়ির চন্ডীমন্ডপের সামনের উঠোনের যে মেলার স্মৃতি রয়ে গেছে, তাকেই রূপ দিয়েছেন এখানে। এই উৎসবের মেলায় হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদ ছিলনা। সকলেই অপেক্ষা করে থাকত বছরের ঐ কটা দিনের জন্য। নাটকেও অতসী-এন্তাজের কথোপকথনে সেরকম সম্প্রীতির সুরই ফুটেছে। এই সম্প্রীতি আরোপিত বা চেষ্টাকৃত নয়, এ জীবনের স্বাভাবিকতার মতোই সহজ ঃ

> "অতসী ।। গাঁয়ে এই একটাই যা বড় উৎসব ... সেটাও যদি বন্ধ হয়ে যায় ! বলো, লোকে কত আনন্দ করে
>
> এন্তাজ ।। হুঁ হুঁ পুরো সাতদিনের মেলা ! সাতটা দিন নিমতিতের কারো ঘরে হাঁড়ি চড়ে না গো ! ছেলে মেয়ে বৌ ঝি সব তো মেলায়, চরকি ঘুরছে ! আমার বুড়ি তো সারা জষ্টিমাস আম ছোঁয় না। ঐ বসে থাকে, কবে আষাঢ়ের মেলায় ফজলি উঠবে ..."[৩৪]

ধূলিহরের আশ্বিনের মেলা এভাবেই 'শোভাযাত্রা'য় হয়ে ওঠে আষাঢ়ের মেলা। আধুনিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই ছবি সমালোচিত হয়েছে। 'বাংলার সংগ্রামী চাষীদের নিয়ে এ এক ছেলেভোলানো রূপকথা' এবং 'বিলুপ্ত ফিউডাল প্রথায় অনুগত দাস মনোভাবাপন্ন চাষিদের জীবন-জঞ্জাল' বলে যাঁরা এর সমালোচনা করেছেন, তাঁদের প্রতি মনোজ মিত্রের বক্তব্যঃ " শুধু কেতাবী তত্ত্ব দিয়ে জীবনটাকে ব্যাখ্যা না করে, জীবনের জঞ্জাল দিয়ে তত্ত্বটাকে পরিপুষ্ট করুন। রূপবান তত্ত্বকথায় জীবনের সবটুকু রূপ ধরা পড়ে কি ?"[৩৫] আধুনিক জীবন থেকে এই আন্তরিকতাপূর্ণ উৎসব ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে মনোজ মিত্রের ক্ষোভ চাপা থাকে না ঃ

> "এখন প্যান্ডেল আর আলোকসজ্জা আর বিসর্জনের শোভাযাত্রা আর একাদশীয় জলসাতেই বরাদ্দের নব্বুইভাগ চলে যায়। এখন বারোয়ারি পুজোয় আয়োজকরা কিচেনে তালাচাবি লাগিয়ে পুজোর পাঁচদিন প্যান্ডেলে বসে ফ্রায়েড রাইস-টাইস খান। এই ব্যবস্থাই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। ... ঘরের দোরের সে বাজারের মর্ম এই শহরের মানুষ বুঝতে পারবেন না।"[৩৬]

আসলে মানসিকভাবে মনোজ মিত্র স্বস্তি পান সেই জগতে, যেখানে ছিল জীবনের একটা মূল্যযুক্ত রূপ। সেই রূপ নষ্ট হয়ে গেছে বলেই নিজের রচনায় তাকে ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছা। নতুনের মধ্যে সেই মূল্য নেই, পুরনোর মধ্যেও সেই মূল্যকে নেব না – সেই শূন্যতার মধ্যে নাট্যকার যেতে চান না। তাই নিজের সৃষ্টিতে সে জগৎ রক্ষা করা বা ফিরিয়ে আনায় তার সর্বতো প্রয়াস।

সেই কারণেই দেশজ পুরনো নাট্যকলার প্রতিও তাঁর গভীর মমতা। সেই নাট্যকলা বিস্মৃত হয়ে বাংলা থিয়েটারে কেবল বিদেশি নাট্যকলার প্রতিধ্বনি দেখে তিনি আহত হয়েছেন, আক্ষেপ করেছেন। বিদেশি নাটকের অনুবাদ বা বিদেশি নাট্যশৈলীর অনুকরণের বিরোধী তিনি নন, কিন্তু সেই জোয়ারে দেশীয় নাট্যকলার ভেসে যাওয়া তিনি সমর্থন করতে পারেন নি ঃ

> "অতিরিক্ত বিদেশমুখিনতায় একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ আমরা অবহেলা করেছি। দেশের মাটিতে ছড়িয়ে থাকা দেশজ নাট্যকলার পুনরুদ্ধার সাধন করিনি, তার বিবর্ধনে সচেষ্ট হইনি। তার মৌলশিক্ষা গ্রহণ করে তাকে আমাদের নবনাট্যের বার্তাবহ করে তুলিনি"[৩৭]

নিজের প্রতিটি সৃষ্টিরই উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন দেশজ মৃত্তিকা থেকে এবং 'কিনু কাহারের থেটার'-এর মতো একাধিক সৃষ্টিতে পুরনো নাট্যকলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। রোমান্টিকদের মতোই রূঢ় বাস্তবতা এড়াতে মনোজ মিত্র আশ্রয় নিতে চেয়েছেন অতীতের প্রেক্ষাপটে। সেখানেই খুঁজে পেয়েছেন স্বস্তি ও শান্তি। 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে সেই অতীতকেই তুলে এনেছেন তিনি। আধুনিক সমাজে যখন মানুষের কুশল জিজ্ঞাসা করার লোক ক্রমশ কমে আসছে, তখন তিনি উপস্থাপিত করলেন হেকিমকে, যিনি যেচে রোগীর কাছে গিয়ে চিকিৎসা করেন, পথে পথে হেঁকে বেড়ান 'দাওয়াই চাই গো - দাওয়াই'। হেকিম যেন গ্রামবাংলার সেই হারিয়ে যাওয়া ইষ্টকুটুম পাখি – যে প্রতিনিয়ত গৃহস্থের ভালো থাকা নিয়ে চিন্তা করে। মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতায় ব্যথিত মনোজ মিত্র একজন ভালো মানুষের গল্প বলার মধ্য দিয়ে যেন বাংলাদেশের এক সময়ের আন্তরিক পরিবেশটিকেই স্মরণ করতে চেয়েছেন। নাট্যকারের বুকে যে দরদ রয়েছে মানুষের জন্য, সেই দরদই তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন হেকিমের মধ্যে। সমাজদেহে যখন গভীর ক্ষত, মানবমনে যখন তীব্র ব্যথা, তখন হেকিম এলেন 'ব্যথা সারাই'-এর বার্তা নিয়ে। একইসঙ্গে পলাশপুর এবং দরিয়াগঞ্জের সাধারণ মানুষের জন্য কাঁদে হেকিমের হৃদয়। মনোজ মিত্র দেখাতে চান, হিন্দু বা মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই মন্দির বা মসজিদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুধার অন্ন এবং সাধারণ রোগের ন্যূনতম চিকিৎসা। যাঁরা এই ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর কথা বলে, তাঁরাই লাঞ্ছিত, প্রহৃত হয় – হেকিমের মতো।

বৃদ্ধ চরিত্রের প্রতি মনোজ মিত্রের সহানুভূতি একাধিক নাটকে লক্ষণীয়। আশৈশব নিজের রোগগ্রস্ত ঠাকুর্দাকে দেখা থেকেই সম্ভবত এই সহানুভূতির উৎসার। সেখান থেকেই মনে ভয় — নিজে যখন বুড়ো হব তখন কি হবে ! এই ভাবনাই তাঁকে প্রণোদিত করেছে চরিত্র হিসেবে বৃদ্ধদের তুলে আনতে। লক্ষণীয়, এই বৃদ্ধরা সমাজে বা পরিবারে খুব বিশেষ কেউ নয়, সংসারে তাদের অবস্থানও খুব পোক্ত নয়। অথচ তাঁরা জীবনকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসাটুকুকে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন মনোজ মিত্র। 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকে বঙ্কিম নামে যে বৃদ্ধকে এঁকেছেন মনোজ মিত্র, তার পেছনে যে রয়েছেন তাঁর ঠার্কুদা, সেকথা একাধিক লেখায় তিনি জানিয়েছেন। চোখের সামনে দীর্ঘদিন দেখেছেন রোগশয্যায় শায়িত বৃদ্ধের জীবনের জন্য আকুলতা ঃ

> "একটানা দীর্ঘকাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যশায়ী অন্নদাচরণের দিবসরজনী কেটেছে রোগচিন্তায়। স্বীয় প্রাণটুকু ছাড়া শেষ দিকে আর কিছু চিনতেন না ঠাকুর্দা। বেঁচে থাকার প্রাণান্ত লড়াই প্রথম দেখি ঠাকুর্দাদার মধ্যে।"[৩৮]

এই লড়াই-ই করেছে বঙ্কিম। নিজেকে প্রাসঙ্গিক ভেবে, গুরুত্বপূর্ণ ভেবে তৃপ্তি পেতে চেয়েছে। তাকে কি স্বার্থপর মনে হবে ! মনোজ মিত্রের নাট্যবয়ন-কৌশলের সূত্রে তা মনে হয় না, বরং একধরণের করুণাবোধ জাগে। বাড়ির ওপর ডাক্তারকে পেয়ে তিনি নিজেকে একবার দেখিয়ে নিতে চান, নিজের কাছে সব-সময়ের জন্য একজন লোক চান, খোকার জন্য ডাবের জল, লেবুর রস, মুসুম্বির রস আনা হচ্ছে শুনে লুব্ধ হন। এক শিশুর মরণ-বাঁচন সমস্যার মাঝে তার এইসব আচরণ সকলের বিরক্তি উদ্রেক করলেও মনোজ মিত্র বৃদ্ধেরই প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করার ফলে চরিত্রটি পাঠক-দর্শকের সহানুভূতি পেয়ে গেছে। এই নাটকে মনোজ মিত্রের আরো একটি কৃতিত্ব নীহার চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে। বাহ্যত নীহারও বঙ্কিমের প্রতি বিরক্ত অন্য সকলের মতোই। কিন্তু সংলাপের সামান্য দু-একটি মোচড় কিংবা নীরব দু-একটি নাট্যক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার অসহায়তা এবং সহানুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। বঙ্কিমের মতোই জীবনপিপাসু জটা ('চাক ভাঙা মধু'), কেনারাম ('কেনারাম বেচারাম'), গজমাধব ('পরবাস') বা বাঞ্ছারাম ('সাজানো বাগান')। এরা সকলেই বাঁচতে চায় — সব প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে, অবহেলাকে তুচ্ছ করে বা সহ্য করে সংসারলগ্ন থাকতে চায়। জটা যে অঘোর ঘোষকে বাঁচাবার ভাণ করে কৌশলে টাকা খিঁচে নিতে পরামর্শ দেয় মাতলাকে — সে তার জীবনপিপাসারই এক রূপ। হাতে টাকা পেয়ে সে গানবাজনার আসরে মৌজ করতে যেতে চায়। তার জীবনপিপাসা তারই মাপে। কেনারামেরও চাহিদা সামান্যই। রেললাইনে গলা দিতে গিয়েছিল সে, সেখান থেকে ধরে এনে নগেন পাঁজা তাকে 'ফিট' করেছে বেচারামবাবুর শূন্যস্থানে। ভরপুর সংসার দেখে লোভ জেগেছে কেনারামের ঃ ''পারবে, পারবে নগেন, এই সব আমার করে দিতে পারবে ? ''[৩৯] এটুকুই তো চায় কেনারামের মতো মানুষেরা, বেচারামের মতো মানুষেরা। সংসারে সবাই একটু যত্ন-আত্তি করবে, প্রয়োজনের জিনিসটি এগিয়ে দেবে। মনোজ মিত্র হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন এবং নাটকে রূপায়িত করেন বৃদ্ধদের এই জীবনাসক্তি। 'সাজানো বাগান'-এ নকড়ি বাগানের লোভে বাঞ্ছার সঙ্গে মাসকিস্তি বন্দোবস্ত করে। তার প্রবল আশা — বাঞ্ছা দু-এক কিস্তির পর আর বাঁচবে না। তাই নকড়ি আর মোক্তার বাঞ্ছার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হাসাহাসি করে, কিন্তু 'বোকা বাঞ্ছারাম' প্রবল বাসনায় বিড়বিড় করে ঃ ''বাঁচবো ... আমি বাঁচবো ...''[৪০] মনোজ মিত্র শিল্পিত ইঙ্গিত দেন, শোষকের কৌশলই হয়ে উঠতে চলেছে শোষিতের জীবনের রসদ। সেই ইঙ্গিতই ফলবতী হয়। পদ্ম, গুপি আর চোর মিলে বাঞ্ছার জীবনপিপাসাকে বাড়িয়ে তোলে। নকড়ির পরিকল্পনা মাঠে মারা পড়ে। মঞ্চনির্দেশে মনোজ মিত্র লেখেন ঃ ''পদ্ম বাঞ্ছার হাতে জল ঢেলে দেয়। তৃষিত বাঞ্ছা একে একে গুপি, চোর ও পদ্মের মুখের দিকে চেয়ে চক্‌চক্ করে জল খায়।''[৪১] বাঞ্ছার এই জল খাওয়া যেন জীবনেরই রসদ আহরণ।

প্রকৃতির প্রতি, মাটির প্রতি মনোজ মিত্রের টান গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে তাঁর বেড়ে ওঠার পরিবেশ। জলজঙ্গলের দেশ খুলনায় তিনি ছোটোবেলায় পেয়েছেন প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য। আবার ময়মনসিংহে দেখেছেন প্রকৃতির অন্যতর রূপ। বাবার চাকরির সূত্রে ময়মনসিংহ জেলার ঘাটাইল ও কালিহাতি-তে তাঁরা থেকেছেন পালা করে। এর মধ্যে ঘাটাইলের প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ '' ঘাটাইলে বাসার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত ধান খেত। দিগন্তে গারো পাহাড়ের চুড়ো। মেঘ এলে, বৃষ্টি এলে ছবিটা অপূর্ব হয়ে উঠত।''[৪২] ছোটোবেলার সেই প্রকৃতিকে ভালো লাগার, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার ছবি মনোজ মিত্র তাঁর একাধিক নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে।

'সাজানো বাগান' নাটকে যে বাগানের কথা বলেছেন মনোজ মিত্র, সে বাগান কিংবা বাঞ্ছারাম তাঁর কল্পনাপ্রসূত নয়। ধূলিহর গ্রামে বেত্রবতী নদীর কূলে কাপালিপাড়ায় তিনি দেখেছিলেন চাষী বাঞ্ছা বুড়োকে। সেই বুড়োর ছিল পান-সুপুরির বাগান। 'সাজানো বাগান'-এ বাঞ্ছা কাপালিকে রেখেছেন, কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে বাগানে, সে বাগানটি সেই গ্রামের মিত্র পরিবারের। সেই বাগানের বর্ণনা দিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ" বিদেশ-বিভুঁয়ে ফেলে আসা সেই গ্রামটির কথা ভাবলে আম-জাম-চালতা-সুপারি-নারকেল ঘেরা একখানা সাজানো বাগান চোখের উপর ভেসে ওঠে। বাগানের মাথায় শরতের ঝকঝকে আকাশ।"[৪৩] নাটকে এই বাগানের প্রতি বাঞ্ছার যে টান তা নাট্যকারেরই ভালোবাসা। গুপি পদ্মকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে দা-মশায়ের কাছে। বাগান-গাছ-পুকুর দেখে পদ্ম মুগ্ধ। পদ্মর দৃষ্টিতে গুপিও যেন নতুন করে দেখছে সবকিছু। উড়নচন্ডী গুপি পদ্মকে পেয়ে থিতু হতে চাইছে। নিজের সম্পর্কে সে বলেছে ঃ "পদ্মরাণীকে পাবার পর, গুপি জায়গা জমি চিনছে, মাটির মর্ম বুঝতে পারছে।"[৪৪] মনোজ মিত্র দেখাতে চেয়েছেন, নারী চেনায় শেকড়, নারী চেনায় মাটি। এই শেকড় এবং মাটির কাছেই মানুষকে ফেরাতে চান তিনি। তাঁর বাঞ্ছা তাই চলে মাটি ঘষ্‌টে, উপমা ব্যবহার করে গাছ-মাটি-কেন্দ্রিক। নারীর মতোই মমতাময়ী, স্নেহশীলা করে তিনি উপস্থাপিত করেন প্রকৃতিকে। তাই পদ্ম গ্রাম ছেড়ে না যাবার কারণ হিসেবে প্রকৃতির সাহচর্যের কথাই উল্লেখ করে ঃ "এমন গাছপালা ... ফাঁকা উঠোন ... দীঘির জল ... বাতাস ... এ ছেড়ে আমি যাবোই না !"[৪৫] নারী আর প্রকৃতি এখানে একাকার — উভয়েই স্নিগ্ধ, স্নেহশীলা, আশ্রয়দাত্রী। পদ্ম কারখানার মজুরের মেয়ে, নাগরিকতার কুটিল ও কুশ্রী অনুষঙ্গ জড়িত ছিল তার জীবনে। সেই পদ্ম গ্রামে এসে পেয়েছে মাটির স্পর্শ। মনোজ মিত্র এখানে শহর-গ্রামের বৈপরীত্যকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। যে গুপি বাগান বেচে সেলুন, দর্জির দোকান বা ভাটিখানা করতে চেয়েছিল, পদ্মর দৃষ্টিতে সে আবিষ্কার করেছে মাটির সৌন্দর্য। বিশিষ্ট সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "'খ্যাঁচ-খ্যাঁচ-খ্যাঁচ-খ্যাঁচ', 'ঘর্‌ঘর্‌ ঘর্‌ঘর্‌' বা 'চোঁ-ও-ও'র মতো ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে হয়তো সচতেনভাবেই শান্ত নিরিবিলি বাগানের বিপরীতে একটা শহুরে কোলাহলের অনুষঙ্গ তৈরী করতে চাওয়া হয়।"[৪৬] গ্রাম এবং শহরের এই টানাপোড়েনে গুপির মধ্যে শেষপর্যন্ত জয়ী হয় গ্রামের টান, মাটির টান। 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে কপোতাক্ষ তীরের অসংখ্য ছবি এঁকেছেন মনোজ মিত্র। পাঁচক্ষীরা নামটি সাতক্ষীরা মহকুমার সাদৃশ্যে গৃহীত বলেই মনে হয়। পাঁচক্ষীরায় আসার মধ্যে মনোরমা-শরৎশশী পার হয়েছে গঙ্গা, ইছেমতী, ভৈরব, কপোতাক্ষ। এইসব নদীর গন্ধ লেগে আছে নাটকে। আছে শরৎশশী বা হাসুর গ্রাম মেহেরপুরের কথা, সেই গ্রামের চড়কের সঙের কথা । টুকরো টুকরো ছবিতে বাংলাদেশের গ্রামসমাজ ও প্রকৃতি উদ্ভাসিত এই নাটকে। বিজয়াদশমীর দিন বেরিয়েছে মনোরমা-শরৎশশী। ঘাটে ঘাটে দুর্গা বিসর্জন দেখে শরৎশশীর মনে হয়েছে, দুর্গা যেন তার বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের এক চিরন্তন যন্ত্রণা ও বিষাদবোধকে এই নাটকে মূর্ত করে রেখেছেন মনোজ মিত্র। কপোতাক্ষ নদের তীরে শরৎপ্রকৃতিকে ছোটোবেলায় যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেভাবেই তুলে ধরেছেন এই নাটকে। ছোটোবেলার সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তিনি ঃ

> "কপোতাক্ষর দুকূলে ঠাসা আম জাম তাল সুপুরি বাবলা শিমূল যজ্ঞিডুমুর আর কাশবন বেলাশেষের লালহলুদে মাখামাখি। সেবার বিজয়াদশমীতে নৌকোয় বসে কপোতাক্ষ নদীর বুকে বিসর্জন দেখেছিলাম। মেজোকাকিমার পিত্রালয় থেকে আমরা ফিরছিলাম আমাদের বেতনা তীরের গাঁয়ে।"[৪৭]

জীবনের অধিকাংশ সময় নগরে বাস করেও মনোজ মিত্র অন্তরে লালন করেছেন সেই ছোটোবেলার নদী-প্রকৃতি-সম্বলিত গ্রামজীবনকে। ষষ্ঠীর ভোরে শ্যামবাজার আর গড়িয়াহাটের মোড়ে বাজা ঢাকঢোল যখন তাঁর কানে 'বুলেটের মতো ফাটে' তখন তিনি স্মরণ করেন 'পুববাংলার নাব্য অঞ্চলে জলজঙ্গলে'র বাজনা, যে বাজনা ঃ "এমন ঝাঁঝালো ছিল না। তার মিঠে বোলে ছিল শ্যামল মেদুরতা।"[৪৮] সেই শ্যামল মেদুরতারই বিস্তার 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে। গ্রামবাংলার স্নিগ্ধতা, শীতলতা যেন ছায়া বিস্তার করে আছে এই নাটকে। এ যেন নাট্যকারের শিকড়-সন্ধান। স্বস্তির আশায়, শীতলতার আশায় ব্যাকুল অতীত-দর্শন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত গভীর যে, সমস্ত ব্যাধির প্রতিষেধক প্রকৃতিতেই আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন। 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে হেকিমের মুখে তিনি বলিয়েছেন ঃ

> "বাঈ সাহেবা সব রোগেরই প্রতিবিধান আছে এই দুনিয়ায়। তামাম দুনিয়ার হিম্মতের চেয়ে একটি ব্যাধির দবদবা কখনো বেশি হতে পারে না বাঈ। এই সবুজ গাছপালা মেঘ জোছনা মিঠে পানি মিঠে হাওয়ার চেয়ে কটি বীজাণুর তাকৎ বেশি, এ কখনো হয় ?"[৪৯]

এ কেবল কথার কথা নয়, গভীর বিশ্বাসবোধ থেকে উচ্চারণ। হেকিমের ওষুধে সঞ্চারিত হয় প্রকৃতির শক্তি, তবেই তো সে দাওয়াই হয় বলবতী ঃ

> "রাতভোর একটানা জোছনা খাবে, শীতল বাতাস খাবে ... হেকিমের দাওয়াই ফুলের সুরভি খায়, ফজরের নেহের খায় ... মধু খায়, মৃগনাভি খায়, বনের সবুজ খায় ... অনেক ক্ষুধা তার। আসমানের দিগন্তজোড়া কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝলকানি উঠলে, সেই ঝলকানিটিও খায়।"[৫০]

মনোজ মিত্র নিজে বিশ্বাস করেন, সমস্ত শক্তির উৎস প্রকৃতি, সেই শক্তিকেই বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করছে মানুষ। তাঁর বিশ্বাসই সঞ্চারিত হয়েছে চরিত্রের মধ্যে। কাল্পনিক ইতিহাস-আশ্রিত নাটক 'দেবী সর্পমস্তা' অরণ্য এবং অরণ্যবাসী মানুষকে নিয়ে রচিত। এই নাটকেও আছে প্রকৃতির ওষধি গুণের কথা। অসুস্থ জ্বরতপ্ত গৌরীকে ডাহুক সুস্থ করে তুলেছে লতাপাতার রস দিয়ে, আবার উদাস বিষবল্লরী খেয়ে ফেললে ডাহুক নিদান দিয়েছে ঃ

> " হা বাপ চিল পাড়িস না, তোহর মা জাগি আছে। চল্ ! হাঁট ! ছোট মোর সাথে ... ত্বরা চল্। তোহরে নিদান দিই ! ... ঘুমাবি না ! বাপ মোর ! আঁখিপাতা মুকত রাখ ... চল্ বাপ, বনে চল্ ... বনের বিষের নিদান আছে বনে !"[৫১]

নাট্যকার এখানে প্রাচীন ভারতীয় প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতির ওপর আস্থাশীল। দেবী সর্পমস্তা রূপে গাছটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে গৌরীর, সেই গাছটিও নাটকে একাধিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। আরণ্যক সংস্কারের পাশাপাশি গাছটির বিবর্তন গৌরীর মানস-পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রথমে গাছটি মরা, গৌরীর বিষণ্ন মনের মতোই নির্জীব, গৌরী যখন লোকেন্দ্রপ্রতাপকে বিয়ে করে সিংহগড়ে যাবার ভাবনায় আনন্দোচ্ছল, তখন কচি পাতা বেরিয়েছে গাছের পাঁজর ভেদ করে। নাগরিক জটিলতা, কৃত্রিমতার বিপরীতে এখানেও আরণ্য-প্রকৃতিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন মনোজ মিত্র। সেই বৈপরীত্য উপলব্ধি করেছেন লোকেন্দ্রপ্রতাপ ঃ

> " পিতার মৃত্যুর পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে আমি সিংহাসনে বসি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও আমি স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারিনি। চারদিকে শত্রু ! চারদিকে থাবার মধ্যে

হৃৎপিন্ড হিম হয়ে আসছিল। এই যে ক'টা দিন বনে আছি, প্রাণ ভরে বাঁচছি ! যেন স্বপ্নে বাঁচছি ! এই বন পাহাড়ের এত যে মায়া ...''[৫২]

মানুষকে এই প্রাকৃতিক শুশ্রূষার কাছেই পৌঁছে দিতে চান মনোজ মিত্র। তাই স্মরণ করান ইতিহাসের সত্য — এই বনপাহাড় বারবার রক্ষা করেছে সংকটাপন্ন নগরসভ্যতাকে, এই হ'ল এদেশের শক্তিভান্ডার ! লোকেন্দ্রপ্রতাপ তাই ইচ্ছার সাহচর্যে ফিরে পায় পৌরুষ, অরণ্যের মানুষকে সঙ্গে পায় সিংহগড় উদ্ধারে। প্রকৃতি ফিরিয়ে দেয় মানুষের হৃত সম্পদ। প্রকৃতির এই স্নেহশীলা, গৌরবময় মূর্তিই দেখেন ও দেখাতে চান মনোজ মিত্র।

মনোজ মিত্রের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনেকসময়ই দার্শনিকতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে মৌল সত্যকে তুলে এনেছেন তিনি। সে সত্যকে এমন শিল্পিত রূপে প্রকাশ করেছেন যে, তা হয়ে উঠেছে যেকোনো জীবনের পক্ষে প্রযোজ্য নির্বিশেষ সত্য। ভাষার ওপর তাঁর দখল প্রশ্নাতীত। সেই ভাষা দিয়ে এমনভাবে তিনি দার্শনিক উপলব্ধিকে উপস্থাপিত করেন, যা সহজেই পেয়ে যায় কাব্যিক গুণ। 'নাকছাবিটা' নাটকের শেষে এই দার্শনিকতা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জানকী আবিষ্কার করেছে, তার জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা সবই বড় মিছে ! জীবন তার কাছে যেন একটা হেঁয়ালি, একটা ঠাট্টা। কিন্তু মনোজ মিত্র জানেন, জীবন অনেক বড়ো, সেখানে প্রতিটি মুহূর্তই নতুন। অনাগত সেই মুহূর্তের দিকেই তিনি মানুষকে আহ্বান জানান কাব্যতীর্থর বাচনে ঃ ''জীবন সহজে শ্যাষ হইবার নয়। ফুরাইবার নয়। তুমি অহনো জানো না, পর মুহূর্তে তোমার জন্য কী আছে। হ, লাইফ ইজ ফুল অব সারপ্রাইজ ! আসো না, নতুন কইরা বাঁচি। সবাই মিলা।''[৫৩] এই প্রত্যয়ই তো জীবন। এই নতুন করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষাই তো জীবন। নুকু (জানকী)-র শঙ্খমুক্তার নাকছাবি খোয়া গেছে, তাই চিত্রা আর কাব্যতীর্থ নিজেদের সাধ্যের মধ্যে ঝুটা পাথরের একটি নাকছাবি বানিয়েছে। কিন্তু কোন্‌টা ঝুটা আর কোন্‌টা সত্য — সে বিচার কি সত্যিই সম্ভব ঃ ''কিন্তু কে কইতে পারে, আগামীকাল কেউ আবিষ্কার করতেও পারে, ঝুটা না, এইখানাই আসল শঙ্খমুক্তা ! সমুদ্রের গর্ভে ঝিনুকে জন্ম নিছে ... ভারি শুদ্ধ ... ভারি পবিত্র ... '' [৫৪] সত্য জন্ম নেয় হৃদয়ের তাপে। নুকুর জন্য সেই উত্তাপ আছে চিত্রা আর কাব্যতীর্থর। তাই ঝুটা পাথর-ই সেখানে সত্য হয়ে উঠবে আসল শঙ্খমুক্তার মতো, হয়ে উঠবে শুদ্ধ এবং পবিত্র। ব্যঞ্জনায় আরো একটি দার্শনিক ভাবনার ইঙ্গিত আছে এই নাটকে। ভালোবাসা কখন কোন্ রূপে প্রকাশ পায় বলা কঠিন। একসময় কাব্যতীর্থকে সহ্য করতে পারত না চিত্রা। শেষে সেই কাব্যতীর্থকে চিত্রার বাড়িতে দেখে জানকীর মতোই আমাদেরও চমক লাগে। চিরকালের 'স্টান্টবাজ' চিত্রার এও কি এক স্টান্ট! বীরেশ্বর রক্ষা করেছিল, ঠাঁই দিয়েছিল কাব্যতীর্থকে — সেকথা মনে রেখেই যেন চিত্রা স্থান দিয়েছে তাকে। ভালোবাসার এ এক অন্যতর প্রকাশ। কেবল 'স্টান্ট' বলে তখন আর মনে হয় না বিষয়টিকে। নাট্যকার কিন্তু বিষয়টিকে ভাঙেন না বা বিশদ করেন না, একটা অস্পষ্ট রহস্যময়তা রেখে দেন। এই রহস্যময়তাতেই সৌন্দর্যের বিকাশ। একটা আলো-আঁধারি, একটা বোঝা-না-বোঝার মধ্যে দোলায়িত হয় পাঠক-দর্শকের চিত্ত, মনে হয় কী যেন একটা ছোঁয়ার আছে অথচ ছোঁয়া যাচ্ছে না।

মহাভারত-আশ্রিত নাটকগুলির মধ্যে দার্শনিক ভাবনা সবচেয়ে প্রবল 'তক্ষক'-এ। জীবন এবং মৃত্যু যে আপাত সত্য মাত্র, কোনোটিই যে চরম সত্য নয়, তা দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র এই নাটকে।

আপাত-বিপরীত মনে হলেও জীবন এবং মৃত্যু অভিন্ন, তারা একই দেহে লীন। ঋষি শমীক যতবার পরীক্ষিৎকে আকৃষ্ট করেছেন জীবনের দিকে, ততবারই তার পুত্র শৃঙ্গী মৃত্যু-রূপে হানা দিয়েছে। পিতা-পুত্র তাঁরা জীবন-মৃত্যু। মৃত্যু জীবনেরই সন্তান। এই মৌল সত্য যেদিন উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় মানুষের কাছে, সেদিন মানুষ মৃত্যুভয়ের অতীত হয়। পরীক্ষিৎ জেনেছে সেই সত্য, তাই আর সে ভয় পায় না মৃত্যুকে। সে বুঝেছে, মৃত্যুকে ভয় করে বাঁচা সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে আঘাত করে, পরাজিত করেই জীবন-উপভোগ সম্ভব। তাই তাঁর দৃপ্ত উচ্চারণ ঃ " মরতে আমার ভয় নেই ঋষি, লজ্জাও নেই ! হ্যাঁ, সপ্তম দিনে আমি মরব। সপ্তম দিন ! সপ্ত সমুদ্র দূরে ! তার পূর্বে ছয় দিন আমি বাঁচব,বিরাট হয়ে বাঁচব !"[৫৫] পরীক্ষিতের মধ্যে যখন এই উপলব্ধি জেগেছে তখন তক্ষক তাঁর পায়ের কাছে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। নিজের বিষে সে জ্বলছে আর ছটফট করছে — মৃত্যুর ওপর জয়ী হয়েছে জীবন। 'অশ্বত্থামা' নাটকেও বলেছিলেন মৃত্যুর ওপর, ধ্বংসের ওপর জীবনের জয়ের কথা। তাই ক্রমাগত হত্যা আর ধ্বংসে ক্লান্ত অশ্বত্থামাকে অস্থির করে তুলেছে এক বৃহৎ সৃজনের বাসনা। সে উচ্চারণ করেছে আর্ত প্রাণের ব্যাকুলতা ঃ "বলো মহারাজ যতো প্রাণ নাশ করেছি আমরা, তত প্রাণ সৃজন করব আমরা ! বলো মহারাজ, এই ধরিত্রীর তৃণমূলে জল দেব ! তাকে লালন করব ! অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে..."[৫৬] কিন্তু সৃজনের জন্য, শান্তির জন্যও চাই শক্তি। ধৃতরাষ্ট্রকে তাই প্রবল শক্তির মোকাবিলা করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবলতর শক্তিধর বাহিনীর সংস্থান করতে হয়েছে ('যা নেই ভারতে')। রাজপুরীর পরিত্যক্ত যে সন্তানেরা বনে-জঙ্গলে বড় হয়েছে, সেই সন্তানদের আহ্বান জানিয়েছে ধৃতরাষ্ট্র। আহ্বান জানিয়েছে দেবতা-সাধু-যোদ্ধাদের মিলিত চক্রের বিরুদ্ধে জয়ী হতে। মনোজ মিত্র মহাভারতের অনালোকিত অধ্যায়ে আলো ফেলে দেখিয়েছেন, মহাকাব্য যাদের যুদ্ধোন্মাদ আখ্যা দিয়েছে, সেই ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী শান্তির জন্যই লড়েছিলেন। মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটে মনোজ মিত্র দেখান চিরন্তন জীবনসত্য — ক্ষমতা দখল এবং ভোগ করার জন্য যুদ্ধবাজ রাজনীতিবিদদের যুদ্ধোন্মাদনা এবং তার বিপরীতে বঞ্চিত মানুষের প্রতিরোধ। মহাভারতীয় সিদ্ধরসকে ভেঙে দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন আধুনিক ভারতীয় জীবনকেই। যে অন্ত্যজ, মন্ত্রবর্জিতদের ধৃতরাষ্ট্র আহ্বান জানিয়েছে তাদের কথা আরো একাধিক নাটকে বলেছেন মনোজ মিত্র। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, 'দেবী সর্পমস্তা' এবং 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটক দুটির কথা। প্রথমটিতে সিংহগড়ের রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আরণ্যক অধিবাসীরা। অরণ্য-নারী ইচ্ছার সাহচর্যে রাজা ফিরে পেয়েছেন পৌরুষ। ডাহুকের কণ্ঠে মনোজ মিত্র শুনিয়েছেন অরণ্যচারী মানুষের ত্যাগের ইতিহাস ঃ "রামরাঘব যঁবে এল বনবাসে, কাহারা দিল রে ঠাঁই? মোদের পূর্বপুরুষ ! রাজ্যহারা পান্ডব আসে বনবাসে, মোদের পূর্বপুরুষ পরাণ দিল জতুঘরে পুড়ি ! হরিশ্চন্দ্র রাজায় ঠাঁই দিল চন্ডালে।"[৫৭] পক্ষান্তরে নগর সভ্যতা চিরদিন উপেক্ষাই করেছে এই বন-পাহাড়ের মানুষকে, এখানকার শক্তি-ভান্ডারকে। রাজ্যের কোনো সুফল এরা কোনোদিন ভোগ করে না, শাসক কোনোদিন প্রজা বলে এদের লালন করে না। তবু এঁরাই এগিয়ে আসে ত্যাগে। 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকে দ্বৈপায়ন ঠাকুর ব্যক্তিমানুষ হয়েও এই প্রান্তিক শ্রেণিরই প্রতিনিধি। এই শ্রেণির মানুষেরাই অবহেলায়, অনাদরে ছড়িয়ে থাকা সবকিছুকে সংহত করে, হয়ে ওঠে সভ্যতার চালিকাশক্তি। ইতিহাস শাসকের কথা বলে, এদের ভুলে যায়, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের স্রষ্টা এঁরাই। মনোজ মিত্র নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান সেই অনাদৃত, অবহেলিতদের।

যে সহানুভূতির প্রকাশ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রান্তিক মানুষের প্রতি, পারিবারিক ক্ষেত্রেও সেই সহানুভূতির অভাব পীড়িত করেছে মনোজ মিত্রকে। কেবল মানুষ নয়, মনুষ্যেতর পোষ্যদেরও জড়িয়ে যে জীবন ফেলে এসেছেন ধূলিহরে, কোলকাতার নাগরিক প্রেক্ষাপটে সেই জীবনবোধের অভাবে বারবার বেদনার্ত হয়েছেন। মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে দৃঢ় ভিত্তি মনোজ মিত্রের অন্বিষ্ট, তা ভেঙে পড়ার সূত্রে দার্শনিক সত্যের উদ্ভাসন ঘটেছে 'বৃষ্টির ছায়াছবি' একাঙ্কটিতে। নাট্যকার মনোজ মিত্র এখানে দেখিয়েছেন, প্রতিটি মানুষের জীবনই মৌলিকভাবে এক। প্রত্যেকেই আসলে এক একটি চরিত্রের অভিনেতা। তাই "সব চন্দনারাই নন্দিতা ... সব নন্দিতারাই ..."[৫৮] আসলে সব গল্পই ঘুরেফিরে সেই একইরকম। তাই মানুষকে ভুলতে হয়। নাটকের শুরুতে অভিনেত্রী চন্দনা অভ্যাস করছিল 'অয়দিপাউস' নাটকের সংলাপ ঃ " তুমি ভুলে যাও অয়দিপাউস। এসব কথা ভুলে যাও। এ জীবনে যদি বাঁচতে হয় তো এসব কথা মনে রাখতে নেই। এ পৃথিবীতে যে ভুলতে পারে সেই বাঁচতে পারে। ভুলে যাও অয়দিপাউস, তুমি ভুলে যাও।"[৫৯] চন্দনা ভুলে গেছে তার অতীত জীবন, ভুলে গেছে ওপরে ওঠার পথে মাড়িয়ে আসা সব পাঁক। আগন্তুক ছেলেটি কেন আবার মনে পড়ায় সেসব! বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় চন্দনার সংটলেকের ফ্ল্যাটে উঠে আসে 'অয়দিপাউস' নাটকের নতুন ভাষ্য। কিছু মুহূর্তের জন্য গুলিয়ে যায় পাগলামি আর সুস্থতা। সত্য হয়ে ওঠে ছেলেটির সংলাপ ঃ "এটা এমন একটা রোগ — পৃথিবীর সব লোককেই প্রমাণ করতে পারো অসুস্থ, আবার সুস্থও বলতে পারো। মানে অসুস্থ বলেও চিনতে পারবে না, আবার সুস্থ বলেও না।"[৬০] আসলে ভুলতে না পারলেই মানুষ 'পাগল' হয় আর পারলে সুস্থ হয়। ভুলে থাকা তাই সুস্থ হয়ে বাঁচার আবশ্যিক শর্ত।

খুলনা অঞ্চলে যখন শৈশব অতিবাহিত করেছেন মনোজ মিত্র তখন সেখানকার জীবন ছিল শিথিল। আধুনিকতার তাড়া তখনো সেখানে লাগে নি। ফলে জীবন ছিল নিছক যাপন করার নয়, বরং উপভোগ করার। জল-জঙ্গল-প্রকৃতি, মানুষ, মনুষ্যেতর জীব নিয়ে সে ছিল সমগ্র জীবন, আধুনিক নগর সভ্যতার মতো ক্লিশে খণ্ডজীবন নয়। মনোজ মিত্রের চেতনায় স্থিত সেই সহজ, সমগ্র জীবনের ছবি। নিজের রচনায় জীবনকে তাই তিনি আঁকেন বৃহত্তর ক্যানভাসে। সেই ক্যানভাসে ফুটে ওঠা সবগুলি ছবিই যে অবশ্য প্রয়োজনীয় এমন নয়, তবে সমস্তটা মিলেমিশে তা একটা সমগ্রতার আভাস সৃষ্টি করে। মনোজ মিত্র এই সমগ্রতার সন্ধানী। তাঁর নাটকে জীবন তাই ছড়ানো। আপাতদৃষ্টিতে এই বিস্তৃতি কোথাও কোথাও প্লটের শিথিলতা মনে হলেও জীবনের সম্পূর্ণতার দিক থেকে তা তাৎপর্যপূর্ণ। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে তাই জটার আত্মহত্যা করে মরে যাওয়া স্ত্রী-র কথা আসে, বাগ্‌দী পাড়ায় হরগৌরীর নাচের কথা আসে, অঘোর ঘোষের পাল্কি টেনে বেহারার কাঁধে সৃষ্টি হওয়া চিরস্থায়ী 'প্যাঁচড়া'র কথা আসে। আর এই সব কিছু আসার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সহজ গল্পগাছার মধ্য দিয়ে এমনভাবে এইসব বিষয় উপস্থাপিত করেন মনোজ মিত্র যে, নাট্যচলনে তা স্বাভাবিকভাবেই খাপ খেয়ে যায়। সমগ্রতার কারণেই 'কেনারাম বেচারাম' নাটকের প্লটে ঠাঁই পেয়ে যায় নেতা, পুলিশ সকলেই। ভাগ্নে ভৈরবও সেখানে অপ্রাসঙ্গিক থাকে না। 'দম্পতি' নাটকে অনায়াসে জায়গা করে নেয় দোলন বা অরূপ, রামদেও বা ম্যানেজার বা রহমান। কর্তা-গিন্নীর কলহকে একটু নিরপেক্ষ তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখার জন্যই যেন গোয়ালা রামদেও বা নাপিত পেল্লাদ চরিত্রের অবতারণা। দীঘার হোটেলের ম্যানেজার এবং বেয়ারা রহমান নাটকে কমিক রিলিফ সৃষ্টি করেছে। 'শোভাযাত্রা' নাটকে রান্নার ঠাকুর ঝড়েশ্বরের সঙ্গে ধনগোপাল-অতসী-সরসীর যে কথোপকথন তা গ্রামীণ বাংলাদেশের

উৎসবের সহজ আন্তরিকতার সুরকে স্পষ্ট করেছে। ঝড়েশ্বর রাঁধুনিমাত্র, কিন্তু উৎসবের সূত্রে এমন সম্পর্ক তার গড়ে উঠেছে যজমান পরিবারের সঙ্গে যে, নিজের সন্তান জন্মের সংবাদ দেয় সে এক বোতল করে ঘি নিয়ে এসে। ঝড়েশ্বরকে নিয়ে যে রসিকতা তাতেও উৎসবের সহজ আন্তরিক সুরটিই ফুটে উঠেছে। একই আন্তরিকতার প্রকাশ এন্তাজের সংলাপেও।

এইসব টুকরো টুকরো ছবি এঁকে মনোজ মিত্র খোঁজেন জীবনের পরিপূর্ণতাকে। তিনি আগে তত্ত্ব ভেবে নিয়ে জীবনকে সেই ছাঁচে ঢালাই করেন না। তিনি সন্ধান করেন জীবনের বৈচিত্র্য, জীবনের পরিপূর্ণতা। সেই সন্ধানে যা উঠে আসে তাকেই ধরে দেন পাঠক-দর্শকের সামনে। কোনো বিশেষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দায় তিনি গ্রহণ করেন নি। তত্ত্বের চেয়ে জীবন যে অনেক বড়ো সেকথা তিনি নিজে বুঝেছেন এবং সেই বোঝাটাই সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন। জীবনের পরিপূর্ণতার সন্ধানী বলেই 'আঁখিপল্লব' নাটকে আঁখি এবং পল্লবের ঘরের পাশে খুরশিদের পরিবার, এমনকি তার পোষ্য ভালুকটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খুরশিদের বোনদের প্রতি আঁখির বিরূপতা দূর হয়ে যায়। যে মুরগিছানার ডাক একসময় বিরক্তি উৎপাদন করত, তাই কত কাছের মনে হয়। বস্তি ছাড়ার কথা আর ভাবে না আঁখি, খুরশিদের বোনেদের ওপরই দায়িত্ব দেয় পল্লবের দেখাশোনার। এই রমণীয় প্রশান্তি, এই স্নিগ্ধ পরিপূর্ণতাতে পৌঁছনোই মনোজ মিত্রের অভীষ্ট। এই সমগ্রতার প্রেক্ষাপটেই অশ্লীলতাও জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে হরগৌরীর নাচ দেখতে যাবার প্রসঙ্গে জটা যে অশ্লীলতার ইঙ্গিত করেছে তা সুন্দরবন অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলে গেছে। কিংবা ধরা যাক, 'সাজানো বাগান'-এর বাঞ্ছারামের কথা। 'শালা' শব্দটি যেন তার বাচনভঙ্গির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই শব্দটি কিংবা এর চেয়ে আরো গভীরতর 'অশ্লীল' শব্দ যখন বাঞ্ছা ব্যবহার করে তখন তা একটুও অসঙ্গত মনে হয় না মনোজ মিত্রের চরিত্র নির্মাণ ও পরিস্থিতি বয়নের কৌশলে। সারা জীবন রক্ত জল করে যে বাগান গড়েছে বাঞ্ছা, তার প্রতি লোভ মৃত্যুর পরও ছাড়তে পারেন নি জমিদার ছকড়ি দত্ত। ভূত হয়ে তিনি ঠাঁই নিয়েছেন সেই বাগানে। সেই ভূতের প্রতি বাঞ্ছার ক্ষোভ ঃ ''ওঝা ডেকে তোমারে সোজা করে দেবো ! বাঞ্চোৎ। আমার নেবুগাছে চড়ে পোঁদপাকামি হচ্ছে।''[৬১] এই বাচনভঙ্গি এবং তৎসংক্রান্ত অশ্লীলতা বাঞ্ছাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ক্রোধ প্রকাশের ভাষা তাদের এরকমই। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের কবিতার অশ্লীলতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

> ''যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়েস্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।... যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা''[৬২]

মনোজ মিত্রের চরিত্রের যে অশ্লীল-বাচন, তা 'ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে' নয়, তা ক্রোধবশত অথবা চরিত্রের স্বাভাবিক জবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। চরিত্রগুলির জীবন ও প্রতিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই অশ্লীলতাকে জীবনের স্বাভাবিক চলনের অঙ্গীভূত বলেই মনে হবে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাংলার মানুষের সংলাপে আমরা এখনো এমন অনেক শব্দ ব্যবহার দেখতে পাই, যা তথাকথিত নাগরিক দৃষ্টিতে অচল। অথচ গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সে শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। 'গুয়োর ব্যাটা', 'কাপ্তিন',

'এঁটুলি', 'হারামজাদা' প্রভৃতি যেসব বিশেষণে বাঞ্ছা ভূষিত করেছে গুপিকে, সেগুলি নাগরিক বিচারে সবসময় শ্লীল এমন বলা যাবে না, কিন্তু এগুলি তার লজ্জ, যা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে বাঞ্ছার মতো চরিত্রের স্বাভাবিকতা এবং সঙ্গতি নষ্ট হয়। গুপি নিজের সন্তানের আগমন-সম্ভাবনা জানিয়েছে বাঞ্ছাকে। সেই সংবাদে বাঞ্ছার প্রতিক্রিয়া বাঞ্ছারই মতো ঃ

> "চার মাস ... চার মাস তোমাদের টাইম দিয়েছিলাম - চারমাসের মধ্যে এট্টা কাজকম্মো জুটুয়ে তোমরা তোমাদের মতো চলে যাবা — আমি আমার মতো চলে যাবো। তো কাজের মধ্যে তোমরা এই কাজ করলে ! বসে বসে পরের টাকা খেলে — বাগানের নিমগাছের হাওয়া খেলে — আর করার মধ্যে এই কম্মো ?"[৬৩]

এই অশ্লীলতা আরোপিত নয়, জীবনের তাপে সঞ্জীবিত।

মনোজ মিত্র বারংবার সমকালীন সভ্যতার দুর্বলতাকে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর এই পরিহাস একটা অস্ত্র। সমসাময়িক সমাজে যেভাবে মানবিক বোধ হারিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে জীবন পণ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, অর্থ যেভাবে মানবিকতার স্থানে অধিষ্ঠিত হচ্ছে তাকে তিনি বারবার আঘাত করেছেন। এই আঘাত করার জন্য তাঁর কাহিনি অনেক সময় কিছুটা বানিয়ে তোলা বলে মনে হয়, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য এই সমাজের মানুষকে হাসি এবং বিদ্রূপের মাধ্যমে জীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন করা। অর্থ উপার্জন নয়, মানবিক মূল্যবোধ অর্জনই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় — এই একটি কথা তাঁর নাটকে বারবার ঘুরে আসে। এই মূল্য সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণাই তাঁকে কখনো পরিহাস করায়, কখনো ক্রুদ্ধ করে তোলে, কখনো করে সহানুভূতিশীল। অন্তরের তীব্র ক্রোধকে সুকৌশলে পরিহাসের মোড়কে মুড়ে রেখে সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর অধিগত। এই ক্রোধ কখনো স্পষ্ট, যেমন — 'চাক ভাঙা মধু' বা 'নেকড়ে' নাটকে, কখনো বিদ্রূপময়, যেমন — 'নরক গুলজার', 'শিবের অসাধ্যি' বা 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে, আবার কখনো সহানুভূতিতে বিগলিত, যেমন — 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য়।

মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির মূল কথাটি হ'ল জীবনের অর্থ সন্ধান। নিজের সৃষ্টিগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর লক্ষ্য প্রধানত জীবনকে অর্থবহ করে তোলা। এই করে তোলার পথে বাধা অনেক। সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিকূলতা যেমন আছে, তেমনি আছে মানুষের লোভ-ঘৃণা-হিংস্রতা-প্রভুত্ববাসনার কারণে সৃষ্ট প্রতিকূলতাও। আধুনিক ভোগবাদী, বিলাসপ্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক সমাজে তিনি প্রতিনিয়ত দেখেছেন মূল্যবোধের বিনষ্টি। কিন্তু এই বিনাশকেই চরম বলে স্বীকার করেন নি তিনি। অসৎ এবং অমঙ্গলের সঙ্গে যে প্রতিনিয়ত মানুষের লড়াই চলছে, সেই লড়াইকে তিনি প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন নিজের নাটকে। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, মানুষের মধ্যেকার শুভচেতনার জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর নাটক সেই জাগরণের পথের দিশা দেখায়। জীবনের যে মূল্যচেতনায় তিনি বিশ্বাস করেন, সেই চেতনার সন্ধান পেয়েছেন অতীত কালে। অতীতের সেই জীবনবোধকেই তিনি ফিরিয়ে আনতে চান, লালন করতে চান। এই কাজে তাঁর প্রধান অবলম্বন সাধারণ মানুষ। এই মানুষেরাই লালন করে জীবনের সুকুমার এবং সদর্থক বৃত্তিগুলিকে, এরাই সচল রাখে সভ্যতার চাকা। এর পাশাপাশি মনোজ মিত্র প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন শক্তির রূপ। প্রকৃতির শুশ্রূষা আধুনিক জীবনের শূন্যতা মোচন করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন।

জীবন মানে তাঁর দৃষ্টিতে কেবল বেঁচে থাকা নয়, জীবন হ'ল সদর্থক এক অস্তিত্ব। আধুনিক সমাজ এবং রাষ্ট্র যখন কেবল নিজের অস্তিত্ব নিয়েই চিন্তিত, যখন অন্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাই প্রধান লক্ষ্য, তখন মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে বাঞ্ছারামের অস্তিত্ব রক্ষায় অনেক মানুষের বাড়িয়ে দেওয়া হাতকে তুলে ধরেন। যারা হাত বাড়িয়ে দেয় বাঞ্ছার অস্তিত্ব রক্ষায়, তাদের অস্তিত্বও বাঞ্ছার অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। আবার তিনি সৃষ্টি করেন জিতেনবাবু বা অলকানন্দার মতো চরিত্র, অন্যের অস্তিত্ব রক্ষাকেই যাঁরা জীবনের সার্থকতা বলে মনে করে। বাদামী, বেচারাম, তুষ্টু চামার বা ঘন্টাকর্ণের মতো যারা সবলের পীড়নে অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তাদেরও তিনি জয়ী করেন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে। অস্তিত্ব-ভাবনার পাশাপাশি মৃত্যুচেতনাও জীবনদৃষ্টির অঙ্গীভূত। মৃত্যুর বিপরীতে জীবনের প্রতিষ্ঠাই মনোজ মিত্রের নাটকের উপজীব্য। তাই তাঁর নাটকে রেললাইনে গলা দিতে গিয়েও বেঁচে যায় কেনারাম, মরতে মরতে বেঁচে ওঠে বাঞ্ছারাম, শেষ পর্যন্ত গাছ থেকে নেমে আসে 'জ্যান্ত' তুষ্টু, সিঁড়ির নিচের ঘরে বেঁচে থাকে বঙ্কিম। মৃত্যুর ওপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা দেন বলেই তাঁর পরীক্ষিৎ নিশ্চিত মৃত্যুর আগে প্রবল হয়ে বাঁচার প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়, জীবনের প্রাবল্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দেয়।

মনোজ মিত্র জীবনের দিকে তাকিয়েছেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে। তাই তাঁর নাটকে সব আধুনিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়, ষড়যন্ত্র-জটিলতাকে অতিক্রম করে সত্য হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ এক আশ্রয়ের আশ্বাস, জীবনের বহুমাত্রিকতাকে উপলব্ধির অনুভব। এই প্রসন্ন দৃষ্টির কারণেই জীবন তাঁর কাছে বর্ণিল এবং আনন্দময়। যে কোনো পরিস্থিতিতেই যে তাঁর চরিত্ররা জীবন নিয়ে রসিকতায় মেতে উঠতে পারে তার গভীরে রয়েছে নাট্যকারের জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা। মৃত্যু বা বিচ্ছেদকে নিয়েও পরিহাসের খেলায় মেতে উঠতে পারে তাঁর চরিত্র। এই বিষয়টিকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন সমালোচক ঃ

> "তাঁর কাছে জীবন হাজার যন্ত্রণা, প্রতিকূলতা, ক্ষুদ্রতা, সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মহান আর সাগরের মতোই গভীর রহস্যময়। তাই তাঁর কলমে মৃত্যুও ভয়ংকরতাকে অতিক্রম করে বিনোদনের উপলক্ষ হয়ে ওঠে।"[৬৪]

জীবনের বিচিত্র, বহুমাত্রিক রূপ তিনি দেখেন — সেই দেখার আশ্রয় কোনো তত্ত্ব নয়, মানুষ। সেই মানুষ, যার মধ্যে ঃ "সহস্র জটিলতা, আলো-আঁধার, লোভ-উদারতা, প্রেম আর নিষ্ঠুরতার দুরূহ দ্বান্দ্বিক সমন্বয়।"[৬৫] এই মানুষেরা তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় 'দোষ, গুণ, নীচতা, স্বাভাবিকত্ব আর অস্বাভাবিক আচরণের' সমন্বয় রূপে। সব দেখিয়েও শেষপর্যন্ত তাঁর ফিরে আসা কিন্তু মানুষের শুভবোধের কাছে, সদর্থক অস্তিত্বের কাছে। জীবনের প্রতি এই হ'ল তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি। সব ধ্বস্তভূমি পার হয়ে তিনি নিজে পৌঁছতে চান, তাঁর পাঠক-দর্শককে পৌঁছে দিতে চান এক শান্ত, স্নিগ্ধ, ছায়াসুনিবিড় জলাশয়ের কাছে। হতে পারে সময় প্রতিকূল, হতে পারে ভাঙনের প্রবল টান, কিন্তু নিজের বিশ্বাসের ভূমি থেকে স্খলিত হতে চান না মনোজ মিত্র। নিজে যা চান, সার্থক শিল্পরূপায়ণের মধ্য দিয়ে তাকে পাঠক-দর্শকের দরবারে উপস্থাপিত করাই তাঁর লড়াই। তাই তো শেষপর্যন্ত তাঁর নাটকে মেলে এক শীতল আশ্রয়। সেই প্রসন্ন জীবনদৃষ্টিকেই অভিনন্দিত করেছেন সমালোচক ঃ "শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধর্মীয়

ভণ্ডামি, রাজনৈতিক শঠতা, অবাধ লুণ্ঠন আর চতুর পেষণের উপর মনুষ্যত্বকেই ভালোবাসাকেই আঁকড়ে ধরেন মনোজ আর তাঁর পাঠক বা দর্শক।''[৬৬] সংসার বা সমাজে কু-এর অভাব নেই। মনোজ মিত্র সেসব দেখেন এবং দেখান, কিন্তু তাঁর নিরন্তর অভিযাত্রা সু-এর সন্ধানে — সেই অভিযাত্রায় তিনি অনায়াসে সঙ্গী করে নেন পাঠক-দর্শককে। নিজের নাটকের থিম সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলেন ঃ " My focus has always been on preservation and nourishment of values, of human resources."[৬৭] মানবসম্পদের এই রক্ষণ এবং পরিচর্যাতেই নিরলস মনোজ মিত্রের লেখনী।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র - দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা-৭০০০৭৩, জানুয়ারি ২০১১ - মাঘ ১৪১৭, পৃ.৩৭

২) ঐ, পৃ.৭১

৩) ঐ, পৃ.৬১

৪) ঐ, পৃ.২১

৫) ঐ, পৃ.১৭-১৮

৬) ঐ, পৃ.১৮

৭) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ - প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৬, পৃ.৪৪

৮) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ - মাঘ ১৪০৩, পৃ.১৬১

৯) ঐ, পৃ.১৫২

১০) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - এর ভূমিকা - পবিত্র সরকার, পৃ.১১

১১) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.১৯৮

১২) রঙের হাট - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৪১৩, পৃ.১৩৫

১৩) দন্তরঙ্গ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - প্রথম প্রকাশ 'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০, পৃ.৩০০

১৪) ঐ, পৃ.৩১৬

১৫) দম্পতি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০২, পৃ. ২২২

১৬) ঐ, পৃ.২২৩

১৭) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১০৪

১৮) রাজদর্শন - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ - অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ. ৮৭

১৯) মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগৎ - বিষ্ণু বসু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - এর ভূমিকা, পৃ. ৪-৫

২০) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ. ৪৬

২১) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৬৮

২২) ঐ, পৃ.১৯৯

২৩) কুহুযামিনী - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.৯৩

২৪) পাখি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৪৩৩

২৫) ঐ, পৃ.৪৩৩-৩৪

২৬) কালবিহঙ্গ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪০৯

২৭) কোথায় যাবো - মনোজ মিত্র দশ একাঙ্ক - প্রথম সংস্করণ-মাঘ, ১৪০৭ - অপেরা১-৬৫,সূর্য সেন স্ট্রীট,কলকাতা-০৯, পৃ. ১৫২-৫৩

২৮) মহাবিদ্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৪০৮

২৯) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৭৯

৩০) শিবের অসাধ্যি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১৯

৩১) মেষ ও রাক্ষস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৮৫

৩২) চাক ভাঙা মধু - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২০

৩৩) সুন্দরমের 'শোভাযাত্রা'- সীমা জয়ের নাটক - রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়-পশ্চিমবঙ্গ-বর্ষ ২৫, সংখ্যা ২৯,৩১-০১-১৯৯২

৩৪) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪২

৩৫) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ. ৬৪

৩৬) ঐ, পৃ.৬৪

৩৭) কিনু কাহারের থিয়েটার - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন - কলকাতা-০৯ - প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ২০০১, পৃ.১৪৪

৩৮) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ.১৬

৩৯) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.১১৮

৪০) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১১

৪১) ঐ, পৃ.২৩- ২৪

৪২) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ.২১

৪৩) ঐ, পৃ.৩৬

৪৪) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২০

৪৫) ঐ, পৃ.২২-২৩

৪৬) নাটককার মনোজ মিত্র : জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু স্যাস-১৯৯৩, পৃ. ৮৭-৮৮

৪৭) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ.৫৮

৪৮) ঐ, পৃ.৫৯

৪৯) গল্প হেকিমসাহেব - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.১৫১

৫০) ঐ, পৃ.১৪৮-৪৯

৫১) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩৮২

৫২) ঐ, পৃ.৩৭০

৫৩) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৫৩

৫৪) ঐ, পৃ.৫৩

৫৫) তক্ষক - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪৩৮

৫৬) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৭৮

৫৭) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩৬৯

৫৮) বৃষ্টির ছায়াছবি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪১০

৫৯) ঐ, পৃ.৩৯১

৬০) ঐ, পৃ.৪০৬

৬১) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৬

৬২) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ - ভূমিকা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - বঙ্কিম রচনাবলী - দ্বিতীয় খন্ড - কামিনী প্রকাশালয় - কলকাতা-০৯ - মাঘ ১৩৯৭, পৃ.৮৫২-৫৩

৬৩) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৩

৬৪) নাটককার মনোজ মিত্র : ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড-এর ভূমিকা

৬৫) ঐ

৬৬) ঐ

৬৭) To preserve and nourish values-Interview to Sankar Mazumdar - The Statesman - 28/10/2005

পঞ্চম অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাটকে সমাজচেতনা

চতুর্থ অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাটকে সমাজচেতনা

যে কোনো সার্থক শিল্পীকে, বিশেষত নাটকের রচয়িতাকে হতে হয় দায়বদ্ধ ও সমাজসচেতন। কারণ জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা নাটক স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে সমাজশোধনের দায়। মনোজ মিত্র বাংলা নাটকের এই জোরের জায়গাটিকেই মনে করেছেন এর দুর্বলতা। তাঁর মতে ঃ

> "ইহজীবনের জরুরি সমস্যা আমাদের নাটক যেমন তুলে ধরেছে, এমন আর কেউ ধরেনি। উৎপীড়ন অনাচার অবিচার ভন্ডামি চারপাশের যত শয়তানির মুখোশ ছিঁড়েছে আমাদের নাটক, অক্লান্তভাবে নির্মমভাবে ও ব্যতিক্রমহীনভাবে। আমাদের নাটকের অন্য নাম প্রতিবাদ, আক্রমণ।"[১]

এই দায়পালনের গুরুত্ব অস্বীকার করেন নি মনোজ মিত্র, কিন্তু যর্থাথ সহমর্মীর মতো উপলব্ধি করেছেন ঃ "এই বক্তব্য সর্বস্বতা, অহর্নিশি দায়িত্ব পালন বাংলা নাটককে ক্রমশ ক্লান্ত বৈচিত্র্যহীন অস্বাভাবিক করে তুলেছে। যে বিষয়কৌলীন্য ছিলো গর্বের, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘাড়ের বোঝা।"[২] বিষয়ের গুরুত্বকে কিছুমাত্র তরল না করেও মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে এই বোঝাকে লঘু করে দেন। নাটককে শিল্পকর্ম হিসেবে সার্থক করে তোলাই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে তিনি নিজের চারপাশের সমাজটাকে বিস্মৃত হন নি। যদিচ তাঁর সমাজচেতনা কিছুটা স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য ঃ

> "কোনো শিল্পি ও সাহিত্যিক সমাজের শ্রেণী সমূহের প্রতি সচেতন থেকেও তার সংগ্রামের সীমাকে কোনো নির্দিষ্ট গন্ডীতে বেঁধে রাখতে চান না। তার মানে এই নয় যে তারা শ্রেণীসমঝোতায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁরা মানুষ ও সমাজের ফাঁক-ফোকর গুলো আবিষ্কার করতে চান স্বকীয় উপলব্ধিতে, জীবনের রহস্যময় আলোছায়ার বৈচিত্র্যে তাই তাঁদের লেখায় প্রকাশ পায় এক ধরণের সহানুভূতি যা কখন বা ক্ষমারই নামান্তর। তারাশঙ্কর অথবা বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে তার উদাহরণ খুব কম নয়। মনোজ মিত্রকেও বোধ করি এই দ্বিতীয় ধারার লেখক বলে গ্রহণ করা যায়।"[৩]

কিন্তু কেবলই কি ক্ষমাপরায়ণ মনোজের লেখনী ? তাঁর নাটক পাঠে কিন্তু এর বিপরীত সত্যের পরিচয়ও মেলে। মনোজ মিত্রের নাটক সমগ্র চতুর্থ খন্ডের ভূমিকায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ

> "লোভ, বোকামি, ভন্ডামি, নষ্টামি দেখলে তাঁর (মনোজ মিত্রের) কলম তরবারির ধার পেয়ে যায়। সাধু সন্তের ভেকধরা ধর্মীয় জালিয়াতদের তিনি সহ্যই করতে পারেন না। কত যে গুঁইবাবা, মৌনীবাবা, দাড়িবাবা-র মুখোস তিনি নির্মম হাতে টেনে খুলেছেন তাঁর সারাজীবনের লেখায় তার আর ইয়ত্তা নেই। রাজনীতির ভেকধারী নেতার ছদ্মবেশে অপদার্থ-কামুক-অত্যাচারী-দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের কি কম হেনস্থা হয়েছে তাঁর হাতে। তেমনি সংসারের ছোট আঙিনায় ছোট স্বার্থ,ক্ষুদ্র কূটবুদ্ধি, ছোট ছোট নিষ্ঠুরতাকেও মেলে ধরেছেন মনোজ।"[৪]

অর্থাৎ বাংলা নাটকের মুখোস ছেঁড়ায় দায় তিনিও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কাজটি যেন

যান্ত্রিক না হয়, শিল্পরূপের আধারে সংঘটিত হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। বলার বিষয়ের পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলার ধরণটিকেও। কেবল ধরণটিতেই মজে না গেলে আবিষ্কৃত হবে ঃ

> "খোলস বা মোড়ক যারই হোক, স্বরগ্রাম যেরকমই হোক, শেষ পর্যন্ত অত্যাচারের শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের জয় ও প্রতিষ্ঠা, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সত্য ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা এবং মৃত্যুর বিকল্পে জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখানোর সংকল্প থেকে মনোজ মিত্র বিচ্যুত হন না।"[৫]

একেবারে প্রথম দিককার নাটকে মনোজ মিত্র সমাজে শোষক-শোষিতের লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে শোষিতের জয় প্রদর্শনে যথেষ্ট সিরিয়াস। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে 'নেকড়ে' (১৯৬৮) এবং 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯) নাটক দুটিকে। 'নেকড়ে' নাটকে নাট্যকার সরাসরি শোষিত মানুষের পক্ষ নিয়েছেন। ভূমিজ মানুষকে বঞ্চিত করে বহিরাগত যে শোষকেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে, এখানে তাদের প্রতি ক্ষমাহীন নাট্যকার। বহিরাগত কংসারি, শক্তি এবং ধর্ম – আক্রাম এবং গোঁসাইয়ের সাহায্যে দ্বীপের মানুষকে বঞ্চিত করে বিপুল সম্পদ জমিয়েছে। অধিকার করেছে নারীকে, কিন্তু মর্যাদা দেয় নি। সেই নারী নীহারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করেছে মানুষকে। প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে হার নিশ্চিত জেনে অবলম্বন করেছে কৌশল। একটা ভয়ের আবহ সৃষ্টি করে কংসারিকে ত্রস্ত করেছে। তার শক্তির উৎসগুলি, বুলডগ কুকুর এবং আক্রামকে হত্যা করে শোষক কংসারিকে নিঃসঙ্গ করেছে। তারপর নেমেছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। সেই সংগ্রামে শশাঙ্কর গুলিতে নীহারি পড়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। সেই ঘন্টার ইঙ্গিতে ছুটে আসে চাষীরা। তাদের গলার জয়োল্লাস। শোষকের বিরুদ্ধে জয় হয় শোষিতের। এই নাটকে মানুষকে প্রধানত শ্রেণিপরিচয়ে দেখেছেন মনোজ মিত্র। সমাজে ধনের অসম বন্টন এবং মাত্রাহীন শোষণের ফলে ভূমিলগ্ন মানুষ কিভাবে নির্যাতিত হয় তা দেখিয়ে সংঘশক্তির জাগরণের মাধ্যমে সেই শোষণ পীড়ন থেকে মুক্তির পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকের থিমও মোটামুটি একই। অঘোর ঘোষ এবং শঙ্কর এখানে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি আর মাতলা শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি। 'নেকড়ে'তে ছিল নারী নীহারি আর এখানে নারী বাদামী ও দাক্ষায়ণী। নারীর ওপর শোষকের পীড়নের ফল দাক্ষায়ণী। বাদামী অঘোর ঘোষ কর্তৃক অধিকৃত হলে তার পরিণতিও হবে দাক্ষায়ণীর মতোই। কংসারির মতোই অঘোর ঘোষ শোষণ করেছে অনেক মানুষকে। মাতলা অঘোর ঘোষের অত্যাচারে, নিজের জীবনের জ্বালায় অত্যাচারীর প্রতি কঠোর হয়ে তার মৃত্যু কামনা করেছিল। তাই সাপে কাটা অঘোর ঘোষকে সে ঝাড়াতে চায় নি। সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধস্পৃহা জেগেছিল তার মনে। কিন্তু মানুষ তো মৃত্যুকে সরিয়ে জীবনেরই উচ্চারণকে তীব্র করে। মাতলার মধ্যে তাই প্রাণের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, মানবিকতার জাগরণ ঘটে। কিন্তু শোষক অত্যাচারী অঘোরকে লেখক মানুষ করেন নি। তাই প্রাণ ফিরে পেয়েই অঘোর লোভের হাত বাড়িয়েছে বাদামীর দিকে। নীহারি সংঘশক্তিকে নেতৃত্ব দিয়েছিল শোষকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আর বাদামী নিজেই সংঘের প্রতিক্রিয়া ধারণ করে সড়কি চালিয়ে বুক ফাটিয়ে দিয়েছে অঘোর ঘোষের। বাদামীর এই 'হঠাৎ জেগে ওঠা নিরুপায় আক্রোশ'-এর

পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিশোধবাসনার ইঙ্গিত।

'নেকড়ে' এবং 'চাক ভাঙা মধু'-তে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা তীক্ষ্ণ, সতর্ক এবং সিরিয়াস। তবে 'নেকড়ে' যদি হয় গণনাট্যধারার উত্তরসূরী, 'চাক ভাঙা মধু' তবে নবনাট্যধারার। শোষক-শোষিতের লড়াই, শোষকের পরাজয় এই নাটকেও আছে, তবে তা জীবনের বহুমাত্রিকতাকে অস্বীকার করে নয়। শ্রেণিদ্বন্দ্ব দেখান মনোজ মিত্র, কিন্তু তা দেখাতে বা বোঝাতে শিল্পরূপকে অস্বীকার করেন না ঃ

> "তাদের (জটা ও মাতলা) শ্রেণির প্রতিবাদ ও ক্রোধ তাদের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হতে চায়, কিন্তু মনোজ মিত্র সেটা ধীরে সুস্থে, জটা-মাতলা-বাদামীর নানা মজাদার ও বিপন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে তৈরি করেন, দর্শক বা পাঠকের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে একবারেই বুঝিয়ে দেন না।"[৬]

সামাজিক দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে আরোপিত আর্দশবাদ আনেন নি তিনি। চরিত্রের পক্ষে যা স্বাভাবিক, সেই পথেই এগিয়ে নিয়েছেন নাটককে।

১৯৬৮ সালে লেখা 'কালবিহঙ্গ' একাঙ্কটিতে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজ এবং মালিক শ্রেণির স্বার্থে কুসংস্কারের কৌশলী ব্যবহার। ভক্তরামের মতো মানুষেরা পেটের দায়ে ব্যবসা করে মানুষের অন্ধবিশ্বাস নিয়ে। আর এই ব্যবসা করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই তারা কখন যেন মুনাফালোভী শ্রেণির দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে যায়। কারখানার মালিকের দালাল ডাক্তার, অন্ধ উপেনকে চক্ষুষ্মান সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ভক্তরামের 'ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গে'র ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা দেখাতে। ভক্তরাম গভীরভাবে বিশ্বাস করে, তার বিহঙ্গ সত্যিই ত্রিকালজ্ঞ। সেই বিশ্বাসবোধ এমনভাবে চারিয়ে গেছে তার মধ্যে যে, নিজের ছেলের কাছেও সে যন্ত্রের মতো হাতসাফাই করে চলে। এই ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করে মালিক শ্রেণি কীভাবে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য নষ্ট করে, তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয় তার স্বরূপ উন্মোচন করে শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন নাট্যকার। সূর্য শ্রমিকনেতা হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য এবং আদর্শে আস্থাশীল। ভক্তরামের ছেলে খোকার মধ্যে আদর্শবাদ এবং ধর্মবিশ্বাসের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। এই দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করেছে ভক্তরামের হাতসাফাই এবং ডাক্তারের ষড়যন্ত্র। দালাল ডাক্তার কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত। ভক্তরাম অসহায় ব্যবহৃত মানুষ। এই নাটকে মনোজ মিত্র ক্রোধী। যে ক্রোধ আমরা দেখেছি 'নেকড়ে' নাটকে, একই বছরে লেখা 'কালবিহঙ্গ' নাটকটিতে সেই ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। কুসংস্কার এবং মুনাফাখোর শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে মনোজ মিত্র এখানে খড়্গহস্ত। তাই নাটকের শেষে খাঁচা ভেঙে ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গকে উড়িয়ে দেওয়া হয়, সূর্যর সংলাপে প্রকাশিত হয় নাট্যকারের ঈপ্সিত বক্তব্য ঃ "মানুষের ভাগ্য চিরকাল লড়াই করে ফেরাতে হয়েছে, চিরকাল তাই হবে, পাখির ঠোঁটে চাকা ঘোরে না।"[৭] শোষকের বিরুদ্ধে এই লড়াই আমরা দেখেছি 'নেকড়ে' নাটকে, এই লড়াইয়ের কথাই আরো পরে শুনব 'শিবের অসাধ্যি'তে, একটু অন্যভাবে হলেও এই লড়াই-ই করবে বাঞ্ছারাম, সুবর্ণ-হীরামন-নীলকমল বা সাধু তুষ্টুরা।

১৯৬৩ সালে রানিগঞ্জে থাকাকালীন যে 'অশ্বত্থামা' নাটক লিখেছিলেন তা পুনর্লিখিত

হল ১৯৭২-৭৩ সালে। পুরাণের আশ্রয়ে রচিত নাটকে ভর পেল সমকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থা। অত্যন্ত Serious ভঙ্গিতে মনোজ মিত্র এই নাটকে তুলে ধরলেন সমকালীন ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের রাজনৈতিক ভ্রান্তি ও দিশাহীনতাকে। বিশ শতকের ষাটের দশকের শেষ দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গে প্রবল হয়ে ওঠে নকশাল আন্দোলন। বহু উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময় যুবক যেমন আদর্শের টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই আন্দোলনে, তেমনি ঢুকে পড়েছিল অনেক বেনোজলও। আদর্শবাদের মোড়কে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধি করা অনেকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে আন্দোলনে দেখা দেয় বিভ্রান্ত অবস্থা। সেই বিভ্রান্ত যৌবনকে মনোজ মিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন অশ্বত্থামা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মহাভারতের নির্দ্বন্দ্ব অশ্বত্থামাকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ যৌবনের প্রতীকে। অশ্বত্থামা আজীবন থেকেছে আদর্শের প্রতি অনুগত, আদর্শ রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু আজ বিপুল বাহিনী নিঃশেষিত হবার পর তার মনে জেগেছে সংশয়। বহু রক্তপাতের পরও তো পান্ডব রয়ে গেছে অধরা, আর দুর্যোধনকে রক্ষা করাও সম্ভব হয় নি। আদর্শ যখন আশ্রয় দিতে পারছে না, তখন কী করবে অশ্বত্থামা ? অনুতাপই কি হবে একমাত্র অবলম্বন ? শত্রু চিহ্নিতকরণেই থেকে গেছে ভ্রান্তি। অকারণ রক্তপাতে দেশ জুড়ে শকুনির মহাভোজ। রক্তগঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগছে, কাদের মারলাম, কেন মারলাম ঃ ''অন্ধ! শত্রু চিনি না। শত্রুকে আঘাত করতে পারি না। শেষ মুহূর্তে ভুল করি। একটা দৃষ্টিহীন বিশাল খড়্গ কাঁধে আমি জনারণ্যে ঘুরপাক খাই!'' আদর্শ মুখ থুবড়ে পড়েছে, প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তবু প্রকৃত আদর্শবাদীর পক্ষে আদর্শকে ত্যাগ করা কঠিন। অশ্বত্থামা তাই মুমূর্ষু দুর্যোধনকে ছেড়ে যেতে পারেনা। আদর্শের চেয়ে বড় তার কাছে কিছুই নয়। এই আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই সে অন্তত একবার জয়ী হতে চায়, নিজের আদর্শকে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। আবার এই অশ্বত্থামাই রক্তপাতে ক্লান্ত, ক্রমাগত স্বজনবধে অনুতপ্ত। রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি দুর্যোধন ব্যবহার করেছে তার যৌবনকে, ব্যবহার করেছে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। যাদের হত্যা করেছে অশ্বত্থামা, তাদের প্রতি তার নিজের কোনো রোষ ছিল না, সব রোষ, সব ঘৃণা সেই রাজার, তারই বিকৃতবাসনা চরিতার্থ করেছে অশ্বত্থামার মতো যৌবন। নিজের কৃতকর্মের যথার্থতা নিয়ে তাই সংশয় জাগে অশ্বত্থামার মনে। অনুতপ্ত হৃদয়ে সে শপথ নেয় ধ্বংসের বিপরীতে প্রাণ সৃজনের।

শেষ চেষ্টাতেও অশ্বত্থামা হত্যা করতে পারেনি পাণ্ডবদের। আবার ভুল করেছে। নিয়ে এসেছে পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচ সন্তানের ছিন্নমুন্ড — ধ্বংস করেছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। কিন্তু আশাবাদী মনোজ মিত্র ভ্রান্ত আদর্শের বৈপরীত্যে দেখিয়েছেন সুস্থ আদর্শের জয়। রাষ্ট্রশক্তির পালিত ঘাতকের পক্ষে কোনদিন সম্ভব নয় সেই আদর্শের বিনাশ। তাই গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বেশে কপিধ্বজরথে ছুটে আসে নব যুগের নতুন আদর্শের বাহক — সেই আদর্শের দ্বারাই ধ্বংস হবে ভ্রষ্ট যোদ্ধারা। পাণ্ডবদের যে নতুন আদর্শের বার্তাবহরূপে উপস্থাপিত করেছেন মনোজ মিত্র তা যে আসলে কম্যুনিস্ট মতাদর্শ তার একাধিক ইঙ্গিত আছে নাটকে। একসময় পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তবু সাধারণ মানুষের মধ্যে

তারা অপ্রতিহত গতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নাটকে অশ্বত্থামার সংলাপে সেই বিষয়ের ইঙ্গিত আছে ঃ

> "যে করবে পান্ডবের নামে অশ্রুপাত, চক্ষু উপড়ে নেব তার! আমি অশ্বত্থামা ... দুর্যোধনের অশ্বত্থামা ! ... জনপদবাসী, আমি জানি কুটীরে কুটীরে তোমরা ওদের নামে দীপ জ্বালো! নিভিয়ে দাও! ... আমার আদেশ! আমি জানি, বুকের নীচে লিখে রেখেছ পান্ডবের নাম। মুছে ফেল ... নইলে ছিন্নভিন্ন করব ... পান্ডবের পুনরাগমনের সব পথ রুদ্ধ করব আমি!"[৮]

এখানে 'পুনরাগমন' শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে সমাজচেতনার দিক থেকে। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে কম্যুনিস্টরা একবার ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তারা ক্ষমতাচ্যুত হন। 'পুনরাগমন' কথাটি সেই পূর্ব ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়েছে। সেই কম্যুনিস্টদের অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশাতেই নাটক শেষ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ "ঘাতক আমরা, রাজার পালিত ঘাতক ... আমাদের সাধ্য কি কৃতবর্মা, মহান ধর্মকে চূর্ণ করি। যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে অধর্মের বিনাশে।"[৯]

অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ সালে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা অন্যতর এক পরিবেশ-পরিস্থিতির আকাঙ্ক্ষা করছে এবং সে জন্য বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর আস্থা স্থাপন করছে। রূঢ়, নিষ্করুণ প্রতিবেশে আশাহত মনোজ মিত্র সন্ধান করছেন অন্যতর এক ভূমির, যেখানে ধ্বংসের পরিবর্তে প্রাধান্য পাবে সৃজন, যেখানে হিংসার স্থান নেবে ভালোবাসা।

'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪) এবং 'নরক গুলজার' (১৯৭৪) নাটক দুটিতে দেব-দেবী, স্বর্গ-মর্ত্যের কাহিনির মধ্যে ধরেছেন সমকালীন সমাজের অস্থিরতাকে। নতুন যুগের নতুন দৈত্য হিসেবে নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন জোতদারকে, যে জোতদারের থাবা এবং শিং একসঙ্গে আছে। সমকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক অসঙ্গতির প্রত্যক্ষ ছাপ আছে 'শিবের অসাধ্যি'তে। দেবী দুর্গার মধ্যে রাষ্ট্রনায়িকার ছায়া আছে। 'গরিবি হটাও' স্লোগানের প্রতি ব্যঙ্গ আছে, মিসা আইন এবং ভেসেকটমির প্রসঙ্গ আছে, ক্যাবারে নাচের প্রসঙ্গ আছে। বিদ্যুৎহীন খুঁটি, ভোট নিয়ে জালিয়াতি, রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠীকোঁদল, শাসক-পুলিশ যোগসাজশ, নকশাল আন্দোলনের সময় শিক্ষার অধোগতি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সামাজিক বাস্তবতাকে মনোজ মিত্র জুড়ে দিয়েছেন এই নাটকে। জোতদার-চাষির দ্বন্দ্বে চাষিকে সাহায্য করতে আসেন নেতা, কিন্তু জোতদারের শোষণে ও কৌশলে সেই নেতা শক্তিহীন হয়ে পড়ছেন। তাই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হচ্ছে মানুষের চৈতন্যের জাগরণের ওপর। 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'তে শোষকের পরাজয় দেখানো গিয়েছিল।কিন্তু ১৯৭৪ সালে নাট্যকার যেন চোখের সামনে কোনো 'কান্তিময় আলো' দেখতে পাচ্ছেন না। তাই 'নেতা' শিব অসহায় ঃ "হল না রে ছিদেম, হল না। জোতদারের ব্যাকিং বহুদূর। দেবতাদেরও কব্জা করেছে। ও ছিদেম, জোতদার শিবেরও অসাধ্যি রে ... শিবেরও অসাধ্যি।"[১০] নাটকের শেষে ছিদেমদের উদ্দেশ্যে শিবের যে পরামর্শ তাও নাট্যদেহ থেকে উদ্ভূত নয়, আরোপিত বলেই মনে হয়। পৃথিবীকে আবার

সুন্দর ও মধুর দেখার যে স্বপ্ন উচ্চারিত হয়েছে তা নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষা ঠিকই, কিন্তু পরিণতির এই আশাবাদে পৌঁছনোর উপযুক্ত ক্রম রক্ষিত হয় নি। গরিবকে বাঁচতে হলে যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, লড়তে হবে, পরের কাছা ধার করে পার পাওয়া যাবে না — এগুলি সবই সত্য কথা, কিন্তু সত্য কথাকে শিল্পিত আকারে প্রকাশ করাই যথার্থ শিল্প। সেই শিল্পিত রূপটি এখানে অনুপস্থিত। আসলে সেই সময়ে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা অন্ধকার থেকে উত্তরণের কোনো দিশা খুঁজে পায় নি।

'নরক গুলজার'-এও উঠে এসেছে বিশ শতকের সত্তরের দশকের ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপটি। মস্তান, গুণ্ডা, রাজনৈতিক নেতা, মহাজন তখনকার সমাজে শোষকশ্রেণি আর শোষিত হল সর্বহারা, মানিক-ফুল্লরা যে শ্রেণির প্রতিনিধি। শোষক-শোষিতের লড়াই এখানেও প্রত্যক্ষ। গদি টেঁকাতে রাষ্ট্রশক্তি আঁতাত করে শোষকদের সঙ্গে। ব্রহ্মা এখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রতীকরূপে উপস্থাপিত। নাট্যকার এখানে স্পষ্টতই শোষিতের পক্ষে। তাই নাটকের শেষে প্রকাশিত তাঁর তীব্র ক্রোধ। সর্বহারা মানিক তাই জিতে যায় নেংটি-ঘোড়ুই-বাঁটুল-গুঁইবাবার বিরুদ্ধে। মর্ত্যে হবে চূড়ান্ত লড়াই। তাই পুনর্জন্ম হয় মানিক-ফুল্লরার। আর সব শয়তান এবং সেই সঙ্গে ভগবান ব্রহ্মারও পুনর্জন্মের আদেশ হয় — তবে তাদের জন্ম মানুষের নয়, গাভীর। সমস্ত শয়তান এবং তাদের নিয়ন্তাকেও গো-জন্ম দিয়ে মনোজ মিত্র যেন মনের রাগ মেটান। এপিক থিয়েটারের ঢঙে হাসি-মজা-হুল্লোড় এই নাটকেও আছে 'শিবের অসাধ্যি'র মতো, তবে এখানে শিল্পরূপ অনেকটাই সংহত।

'শিবের অসাধ্যি' এবং 'নরক গুলজার'-এ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে। জমিদারতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র এসেছে, কিন্তু মানুষ তো বদলায় নি। গণতন্ত্রের নামে চলছে শোষণ। যারা ছিলেন জোতদার, নতুন যুগে তারাই হয়েছেন মন্ত্রি। সাধারণ মানুষের দুরবস্থা একইরকম রয়ে গেছে। জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর কাজ করছে নতুন যুগের পুলিশ। ত্রিপাক্ষিক প্রভৃতি চতুর কৌশলের মধ্য দিয়ে আসলে চলছে প্রজাশোষণের সেই চিরন্তন কাহিনি। সে সময় পশ্চিমবঙ্গে যেন প্রকৃত অর্থেই চলছে ভূতের রাজত্ব। এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে সমাজসচেতন মনোজ মিত্র চিহ্নিত করেছেন সর্বহারার সর্বাত্মক সংগ্রামকে। সেই সংগ্রামে সর্বহারার জয় তাঁর কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু লক্ষণীয় যে, একই বিষয় বলতে গিয়ে 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'তে যে Serious ভঙ্গি নিয়েছিলেন তিনি, 'শিবের অসাধ্যি' বা 'নরক গুলজার' তার পরিবর্তে দেবতা ও ভূতের আধিপত্যে ফ্যান্টাসির দিকে এগোল। হাসি-মজা-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র ব্যবহার করলেন Epic নাটকের ফর্ম। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রত্যক্ষতা এরপর থেকেই এড়াতে শুরু করলেন মনোজ মিত্র। আবিষ্কৃত হল তাঁর নাট্যরচনার বিশেষ ভঙ্গিটি।

১৯৭৪ সালে লেখা মদন সিরিজের দুটি নাটক 'আমি মদন বলছি' এবং 'মদনের পঞ্চকান্ড'তে সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ অবস্থার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সুন্দরের সন্ধানী মদন গ্রাম থেকে শহরে এসেছে সৌন্দর্যের খোঁজে। এই গ্রাম ছেড়ে আসা প্রসঙ্গে

নাট্যকার তুলে ধরেছেন সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সমাজের সংকটের দিকগুলি। খানাখন্দ, ডোবা-নালায় ভরা গ্রামে বর্ষাকালে পাঁকে পথ রুদ্ধ, সর্বত্র পাটপচা দুর্গন্ধ, মানুষের ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় কিছুই নেই। ফসল যা হয়েছে সবই মিলিটারির খাবার হিসেবে ক্রোক করা হয়েছে। ঘ্যাঁটকোলের পাতা হয়েছে মানুষের খাদ্য, তেভাগা আন্দোলনে প্রাণ দিচ্ছে কৃষক। সেই 'অসোন্দর' গ্রাম থেকে গেঁড়ে মদন নগর কোলকাতায় এসেছে সুন্দরের সন্ধানে। কিন্তু সেই অস্থির সময়ে নাট্যকার মনোজ মিত্র এবং তার সৃষ্ট মদন সর্বত্রই দেখেছেন ঘোর অন্ধকার। জমিদারদের মতো নিজের নিজের এলাকাভাগ করে নিয়েছে মস্তানরা। সবচেয়ে করুণ অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রের। স্কুল-কলেজের ভর্তি থেকে পরীক্ষা — সবই তখন মস্তানদের আওতায়। 'জিপ' হাঁকিয়ে মস্তানরা দাপিয়ে বেড়ায় নির্বাচনের সময়। যুবশক্তি-র উল্লেখ, মিসা এবং ভেসেকটমির আতঙ্ক, রাজনীতিকের 'গান্ধীবাবা' নাম, শিক্ষাক্ষেত্রের অব্যবস্থা, জিপে চড়ে মস্তানদের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ থেকে কংগ্রেস শাসনকালের কথাই স্মরণ করায়। নাট্যকার মনোজ মিত্র স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতের সাহায্যে সেই দুরবস্থাকে ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট মদন বিস্মিত হয়ে দেখেছে ঃ ''কলকাতার বাবুরা ধারালো ছুরি নিয়ে ইনি ওনার পেট ফাঁসালেন, গাড়িতে আগুন ধরালেন, তার ছেঁড়লেন, বোমা ঝাড়লেন ... কীসে থেকে যে কী হলো বাবুমশায়রা, সোন্দর সোন্দর এস্টাচুগুলান কচুকাটা করলেন।''[১১] এই রাষ্ট্রবিপ্লবে সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন নাট্যকার। যে মানুষেরা নিতান্ত সাধারণ, তারা এই রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে বিপন্ন। নিজেদের মাথা বাঁচানোই তাদের পক্ষে কঠিন। 'এট্টা আচ্ছরয়'-এর জন্য তারা ব্যাকুল। মানুষের এই আশ্রয়হীন, অনিকেত অবস্থা এই সময় পীড়িত করেছে মনোজ মিত্রকে, কিন্তু পরিত্রাণের উপায় তিনি দেখাতে পারেন নি। 'নরক গুলজার'-এ সর্বহারা মানিক-ফুল্লরাকে শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেছেন, অত্যাচারীদের গো-জন্ম দিয়ে মনের রাগ মিটিয়েছেন, কিন্তু এখানে ভয়াবহ অবস্থার চিত্রণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। তাঁর মদন এই ভেবে আতঙ্কিত হয়েছে যে, শহর ভেসেকটমি করিয়ে তাকে খোজা করে রাখবে। উৎকেন্দ্রিক সেই সময়ে নাগরিক মানুষকে খোজা রূপেই দেখেছেন মনোজ মিত্র।

'সাজানো বাগান' ১৯৭৬-৭৭-এ লেখা নাটক। সামাজিক চেতনার দিক থেকে মনোজ মিত্র এই নাটকেও 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'র সমধর্মী। এখানেও শোষক ছকড়ি-নকড়ির বিরুদ্ধে ভূমিলগ্ন মানুষ বাঞ্ছা কাপালির প্রাণপণ লড়াই এবং সে লড়াইয়ে ভূমির ওপর বাঞ্ছার দাবী প্রতিষ্ঠিত। একদিকে উৎপাদক বাঞ্ছা, অন্যদিকে সংগ্রাহক ছকড়ি-নকড়ি — কে পাবে সাজানো বাগানের অধিকার? নাট্যকারের সহানুভূতি স্পষ্টতই বাঞ্ছারামের দিকে, প্রান্তিক মানুষের দিকে। দড়ি টানাটানির খেলায় তাই জয়ী হয় বাঞ্ছারাম, বাঞ্ছার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনা খাটিয়ার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নকড়ি। যেমন দমিত হয়েছিল কংসারি, অঘোর ঘোষ বা 'নরক গুলজার'-এর সব অত্যাচারীরা, তেমনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ছকড়ি-নকড়ি। প্রবলভাবে বেঁচে থেকেছে জীবনপিয়াসী বাঞ্ছা। এই নাটককে স্পষ্টতই ভূমিলগ্ন মানুষের সঙ্গে ভূমিগ্রাসী মানুষের দ্বন্দ্ব বলে চিহ্নিত করেছেন সমালোচকঃ

"The play becomes a glorified tug-of-war between a man rooted to his precious soil and aware of his individuality and a group of thrusting, rapacious individuals whose brittle lives make them crave for power and ultimately lead to their destruction."[১২]

ছকড়ি দত্তকে বাঞ্ছা ঠেকিয়েছে লাঠির জোরে, আর নকড়ি দত্তকে ঠেকিয়েছে প্রাণের জোরে। মাটি ঘষটে চলত যে বাঞ্ছারাম, অন্য মানুষদের সহায়তায় সে ক্রমে ধনুকের মতো বেঁকেছে, তারপর তীরের মতো সোজা হয়েছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা নকড়ি প্রথমে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, তারপর মড়ার খাটে শুয়ে পড়ে মরে গেছে। 'নেকড়ে' নাটকে কংসারি ঠাকুর কিংবা 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে অঘোর ঘোষের আমলে যে গ্রাম ছিল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই গ্রামেরই অন্যতর রূপ দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র 'সাজানো বাগান' নাটকে। সেই রূপটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমালোচক অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ

"চাকভাঙা মধু-র আদিম অন্ধকারময় গ্রামকে ছাড়িয়ে এসে নতুন গ্রামের চেহারা আঁকেন মনোজ, 'সাজানো বাগান'-এ। ছকড়ি-নকড়ি এখানে জোতদার হয়েও যাকে বলে টেবিলের অন্য প্রান্তে। অঘোর ঘোষের প্রবল দাপটের বদলে এরা আশ্রয় নিয়েছে ছলচাতুরির, কৌশলের।"[১৩]

বাঞ্ছা কাপালি তখন শর্ত দিচ্ছে জোতদারকে — তার মৃত্যুর পর কীর্তন করতে করতে, গুজিয়া ছড়াতে ছড়াতে, বোম্বাই খাটে চড়িয়ে বডি নিয়ে যেতে হবে, গব্যঘৃত মাখাতে হবে, আর একটি ষাঁড় উৎসর্গ করে দিতে হবে। কত সহজে বাঞ্ছা উচ্চারণ করেছে দিনবদলের কথাঃ "চেরটাকাল আপুনারাই নোকের দরজায় তাগাদায় গেছেন — লোকে দিয়েছে — আপুনারা নিয়েছেন — আজ আপুনারা দেবেন — আমরা নেবো।"[১৪]

মনোজ মিত্র জানেন, সভ্যতার ইতিহাসে শোষণ চিরন্তন। উৎপাদিত ফসলে চিরকাল পড়েছে লোভী শকুনের দৃষ্টি। শক্তিজীবী সম্প্রদায় বারবার শক্তির জোরে দখল করেছে শ্রমের ফসল। সেই শোষক শক্তিকে তিনি বাঞ্ছার জবানীতে চিত্রিত করেছেন 'অপদেবতা' রূপে ঃ

"আছেরে বৌ, ভূত আছে, কদ্দিন বলে আসছি, ঐ বাগানটা করার পর থেকেই এট্টা ভূত আমার পেছনে লেগেছে। এট্টা কাল অপছায়া আমার সুবজ লতাপাতা ফলফুলুরি ঘিরে ধরেছে। কতো তাড়াই — ছায়াটা সরে না। যুগ যুগ চলে যাবে ... ওই অপদেবতা পিথিবির যেখানে যতো ফসল ... সব গেরাস করবে বলে বসে থাকবে। ... কিছুতে ওরে কাটানো যাবে না রে।"[১৫]

'সাজানো বাগান' নাটকে সমকালে প্রচলিত আরোপিত বিপ্লবের স্লোগান নেই ঠিকই, কিন্তু, এসব সংলাপে নাট্যকারের চেতনার অভিমুখটি বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। যুগ যুগ বাহিত শোষণ বঞ্চনার অবসানে মনোজ মিত্রের অস্ত্র কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়, প্রবল জীবনাসক্তি।

যদিও এই জীবনাসক্তি পরোক্ষে তত্ত্বকেই পুষ্ট করে। বাঞ্ছা কাপালি শুধু জীবনের প্রাবল্য দিয়ে, নিজের বেঁচে থাকা দিয়ে, অস্তিত্ব দিয়ে ধীরে ধীরে অসহায় করে তুলেছে নকড়িকে। যে গড়গড়া জমিদারি শোষণের প্রতীক, নিজের মৃত্যুর আগে সেই গড়গড়ার নল ফাটিয়ে যাবার বাসনা ব্যক্ত করেছে বাঞ্ছা। অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে মনোজ মিত্র আশা করছেন শোষিত মানুষের উত্থান ঘটবে এবং নিজের নাটকে সেই উত্থানেরই একটি রূপ তিনি এঁকেছেন। নাট্যকারের এই চেতনাকে অভিনন্দিত করেছেন সমালোচক নৃপেন্দ্র সাহা ঃ

> ''মুখ্যু চাষীর অধিকার রাখার এই যে লড়াই, জমি নিয়ে বাঁচা-মরার যুযুৎসুর এই প্যাঁচ রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির সরল পথ ধরে আসেনি বলেই যে সাজানো বাগান প্রগতিশীল চিন্তার ধারার ফসল নয় এমন কোন সরল সিদ্ধান্তে না পৌঁছে আমরা বরং বলতে পারি শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'চাক ভাঙা মধু'র নাট্যকার 'সাজানো বাগানে' পৌঁছে শোষক শ্রেণীর মুখের উপর তোমার ফলিডল তুমিই বরং খাও বলার সাহস জুগিয়ে দিয়েছে।''[১৬]

সামাজিক চেতনার দিক থেকে পার্থক্য না থাকলেও নাট্যবয়ন কৌশল ও কথনভঙ্গিতে 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'র তুলনায় 'সাজানো বাগান' পৃথক। এই দুটি নাটকে ভঙ্গি ছিল Serious. তারপর 'নরক গুলজার' এবং 'শিবের অসাধ্যি'তে দেখা গেল চরম হুল্লোড়। 'সাজানো বাগান'-এ এসে Serious ভঙ্গি যেমন বর্জিত হল, তেমনি হুল্লোড়ও সংযত হল। জীবনের যে সহজ চলন, যে বক্র রসিকতার উত্তরাধিকার তিনি লাভ করেছিলেন খুলনা অঞ্চলের জীবনবোধ ও প্রকৃতির সাহচর্য থেকে তাকেই সঞ্চারিত করে দিয়েছেন এই নাটকে। জীবনের সেই স্বাভাবিক চলন থেকেই উৎসারিত হয়েছে প্রত্যয় এবং প্রতিশ্রুতি ঃ

> ''কাঁদে না কাঁদে না দাদা ভাই ... আয় রে পাখি ল্যাজ ঝোলা ... আমার ভায়ের সাথে কর খেলা ... কাঁদে না কাঁদে না ... কতো পাখি আছে আমার বাগানে ...হ্যাঁ ...হ্যাঁ ... ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায় ... হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল সকালে দেখো ... কতো আমের বোল ধরছে ... মুক্তোর দানার মতো মাটিতে চাদর বিছিয়ে থাকে ... গুনগুন গুনগুন ... কতো মৌমাছি ফাঁকে ফাঁকে গুনগুন করে ... হ্যাঁ হ্যাঁ ... দেখো, টুপুস টুপুস করে নাতের শিশির ঝরে পড়ছে ... জলপাই-এর পাতা বেয়ে শিশির ঝরে ঝরে পড়ছে ... হ্যাঁ হ্যাঁ ... সব তোমারে দিয়ে যাবো ... তোমার জন্যেই তো সাজায়ে রেখেছি গো ... হ্যাঁ হ্যাঁ ...''[১৭]

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই নতুন, সুস্থ পৃথিবীর অঙ্গীকারেই শেষ হয় নাটক। বাঞ্ছা কাপালির বাগানে নতুন জীবনের সঙ্গে যে নতুন ভোর নামে, জোতদার নকড়িদের মৃত্যুর পর সেই ভোরের জন্যই নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষা এবং আস্থা। 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে (১৯৭৪) কোন আশার বাণী শোনাতে পারেননি মনোজ মিত্র, কিন্তু তিন বছরের ব্যবধানে রচিত 'সাজানো বাগান' নাটকে তিনি 'শিবেরও অসাধ্যি' জোতদারের পরাভব দেখানোর মতো প্রত্যয় অর্জন করেছেন।

১৯৭৯ সালে মনোজ মিত্র যখন 'মেষ ও রাক্ষস' লিখলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শাসন দু'বছর অতিক্রান্ত। রূপকথার আদলে রচিত এই নাটকে তিনি যে সময়কালকে চিত্রিত করলেন তা বিশ শতকের সত্তরের দশকের ভারতবর্ষের অস্থির রাজনৈতিক আবহ। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার পর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী এবং জনতা সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আবার তিনি ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় বন্দী করা হয়েছে রাক্ষসরাজ বিচিত্রদন্তকে, কিন্তু তাকে বধ করার উপায় পাওয়া যায় নি। তিন বন্ধু সুবর্ণ-হীরামন-নীলকমল হিমপাহাড়ে চলেছে রাক্ষসবধের উপায় জেনে আসতে। পথে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে প্রেতরূপী তিন আমলা — সেনাপতি, বিচারপতি, ধনপতি। যারা বন্দী করেছিল রাক্ষসকে, তাদেরই ভেতরকার দ্বন্দ্বে মুক্ত হয়ে যায় রাক্ষস এবং যৌবনকে ঘাতক বানিয়ে চালিয়ে যেতে থাকে ধ্বংসলীলা। রাষ্ট্রের যে পালিত ঘাতককে আমরা দেখেছিলাম অশ্বত্থামার মধ্যে, তাকেই আবার দেখলাম হীরামন চরিত্রে। যুবশক্তির একাংশকে শাসক শক্তি তখন হাতের পুতুলে পরিণত করেছে। এই যুবশক্তি বোধবুদ্ধিহীন মেষ। শাসকের নির্দেশে তারা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে। মানুষকে ভেড়া বানিয়ে শাসক যুগ যুগ সিংহাসন দখলে রাখতে চাইছে। মনোজ মিত্র নাটকের একাধিক সংলাপে চিহ্নিত করেছেন সেই সময়ের যন্ত্রণাকে। তপ্ত শলাকায় শিক্ষকের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়ে শাসক রুখতে চেয়েছে চেতনার বিস্তারকে, মানুষ যখনই প্রতিবাদী কণ্ঠ তুলেছে তখনই তার ওপর নেমে এসেছে নির্মম পীড়ন, ভীষণ নখের চিহ্ন দেগে দিয়েছে মানুষের পিঠে। শাসক রাক্ষস যখন হৃতসর্বস্ব, তখন সে সাধুর ছদ্মবেশে নেমেছে গুপ্তহত্যায়। কিন্তু মনোজ মিত্র বিশ্বাস করেন মানুষের শুভ বোধে। তাই হিমপাহাড়ের আগুনে পুড়ে যায় হীরামনের মেষের চামড়া, বেরিয়ে আসে শুদ্ধ মানুষ। সেই মানুষ সুবর্ণ আর নীলকমলকে নিয়ে রাক্ষসবধ করে।

'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে সমকালীন সমাজের ছায়াপাত ঘটেছে প্রবল ভাবে। প্রেতরূপী তিন আমলা যে ভাবে সংঘশক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছে তা থেকে স্পষ্ট, তারা আবার ফিরিয়ে আনতে চায় রাক্ষসের শাসন। কারণ সেই শাসনেই তাদের স্বার্থসিদ্ধি। সেই কৌশল ধরে ফেলেছে নীলকমল ঃ "প্রেত, তোরা সত্যিই প্রেত। পালা বদলের দিনে তোদের খেলা প্রেতের খেলা।"[১৬] পালাবদলের দিনে বিশ্বাস ঘাতক ষড়যন্ত্রীদের এইভাবেই চিনিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। সেই অস্থির সময়ে শত্রু-মিত্র চেনাই কঠিন। মিত্রের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য শত্রু। শুধু কণ্ঠ শুনে বোঝা সম্ভব নয় কে মানুষের পক্ষে, আর কে রাক্ষসের! যে শাসনের অবসান ঘটানো হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ শেষ করতে না পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নয়। রূপকথার আদল বজায় রেখেই সেই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন নাট্যকার ঃ "দত্যিটাকে সবে আমরা কলসির মধ্যে ভরেছি ... একেবারেই নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে, ও যে আবার পারে জটপাকানো ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে পড়তে!"[১৭] এই দৈত্যের সম্পূর্ণ বিনাশ চান মনোজ মিত্র। তাই নির্ভর করেন মানুষের শুদ্ধ চৈতন্যের ওপর। এই চৈতন্য মানুষ অর্জন করে অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, অনেক যন্ত্রণায় পুড়ে। শেষ পর্যন্ত সেই শুদ্ধ চৈতন্যের মানুষের যৌথ নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই রাক্ষস-শাসনের অবসান ঘটবে বলে বিশ্বাস করেছেন

মনোজ মিত্র। শোষণ-নির্যাতনের অবসান ঘটাতে গেলে সততা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক এই নাটকে তত্ত্বগত ভ্রান্তির কথা বলেছেন। কারণ সংগ্রাম এখানে ব্যক্তিস্বার্থে (রাজত্ব এবং রাজকন্যা লাভ)। সুবর্ণ-হীরামন-নীলকমলের মতো যুবক কোনো মহৎ ভাবনা বা রাজনৈতিক তত্ত্বজ্ঞান ছাড়াই কীভাবে রাক্ষসকে বন্দী করে ফেলল, সে সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। মনোজ মিত্র সরাসরি রাজনৈতিক নাটক লিখতে চাননি। রাজনৈতিক তত্ত্বকে আত্মস্থ করে তিনি মানবিক টানাপোড়েনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাছাড়া নাটকের শেষে তাঁর লক্ষ্য ব্যক্তিস্বার্থ থেকে বৃহত্তর চেতনায় উত্তরণ। তাই প্রথম থেকে ব্যক্তিস্বার্থের কথা বলেছেন। যখন তারা ব্যক্তিস্বার্থ থেকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, কেবল তখনই তাদের দ্বারা রাক্ষসবধ সম্ভব হয়েছে। রাজত্ব পাওয়া বা রাজকন্যা চন্দ্রলেখাকে পাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বহীন বলেই নাটকের শেষে আর তা উল্লেখিত হয়নি। পরিবর্তে এসেছে যৌথ নেতৃত্বের কথা, এসেছে অর্জিত মুক্তিকে রক্ষা করার কথা ঃ "রাজা আর রইল না – আর ওরা তিনজন বলল – দেশকে মুক্ত করেছি আমরা – এবার মুক্তিকে পাহারা দেব আমরা!"[২০] 'আমি' নয় এবার প্রাধান্য পেল 'আমরা'। ব্যক্তি চেতনার পরিবর্তে উঠে এল সমষ্টি চেতনা। তখন পর্যন্ত এই সমষ্টি চেতনাতেই মনোজ মিত্রের আস্থা। তাঁর এই বিশেষ আদর্শবাদে আস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক ঃ "হীরামন, সুবর্ণ ও নীলকমলের মনের দৃঢ়তা, রাক্ষস রাজের অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা শোষণ রোধের শপথে কঙ্কের বলিষ্ঠ প্রেরণা অনেকটাই যুগ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শের বাতাবরণ সৃষ্টি করে।"[২১] রূপকথার বর্ম থাকলেও এই নাটক প্রতিফলিত করতে চেয়েছে সমকালের সমাজকেই। সেই সমাজের কু-গুলিকে দেখিয়ে তার প্রতিকারের পথ নির্দেশও করেছেন, তবে সেই উত্তরণের পথ নির্দেশ নির্দিষ্ট মতবাদ-অনুসারী ঃ "রূপকথার বর্ম পরিধান করাইয়া নাট্যকার অলিখিতভাবে সৎ, সাহসী ও আদর্শবাদী সংঘবদ্ধ মানুষেরই জয় সূচিত করিয়াছেন তবে নির্দিষ্ট মতবাদে।"[২২] অর্থাৎ ১৯৭৯ সাল পর্যন্তও আমরা দেখছি, মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে আস্থাশীল। যদিও তত্ত্বগত দিক থেকে হুবহু সেই রাজনৈতিক দর্শনকে নাটকে প্রতিফলিত করা বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইন মান্য করার প্রবণতা তাঁর নাটকে নেই, তবু মোটের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা, জোতদারের অত্যাচার প্রভৃতির প্রতিরোধে বামপন্থী আদর্শেই তিনি আস্থা স্থাপন করেছেন। নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় তিনি যে বলেছেন, রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস আছে কিন্তু দলীয় রাজনীতিতে আস্থা নেই – এ পর্যন্ত আলোচিত নাটকগুলির সমাজচেতনায় সেই বিষয়টিই স্পষ্ট। তাই রাজনৈতিক ভাবনার পাশাপাশি তাঁর নাটকে সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে মানুষের অন্তরস্থিত শুভ বোধের জাগরণ। কারণ তিনি জানেন ঃ "রাক্ষস নিধন করতে হলে সর্বাগ্রে চাই আত্মিক উত্তরণ। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনাকে পুড়িয়ে ফেলতে না পারলে সেটা সম্ভব নয়।"[২৩] সব সময় তিনি সমস্যা সমাধানের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের যে বৈজ্ঞানিক সড়ক, সেই সড়কের যাত্রী থাকেন নি, তা থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হয়েছেন। গণনাট্যের উত্তরাধিকার বহন করেও হয়ে উঠেছেন নবনাট্যের নাট্যকার।

১৯৮১ সালে লেখা 'রাজদর্শন' নাটক থেকে লক্ষণীয়, মনোজ মিত্র প্রত্যক্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবকে কিছুটা যেন এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই নাটকে তিনি অযোধ্যার রাজা নন্দের কাল্পনিক রাজত্বকালকে তুলে আনলেন। সাধারণীকৃত সমাজ সমালোচনা এই নাটকেও আছে, তবে আগের নাটকগুলির মতো প্রত্যক্ষত তা কাউকে আঘাত করে না। বাইরের দিক থেকে এই নাটকের কাহিনি এক রাজ পরিবারের। অক্ষম রাজার ভোগবিলাসের কারণে মৃত্যুর ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। রাজার অবর্তমানে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সিংহাসন দখলের জন্য লড়াই বাঁধে। প্রজাদের প্রতিনিধি বিদ্রোহী বৃষল শেষ পর্যন্ত সিংহাসন দখল করে। ভিতরের দিক থেকে লোভী ব্রাহ্মণের প্রতীকে সাধারণ মানুষের ভিক্ষা করে অবস্থা ফেরানোর ইচ্ছে এবং তা যে অসম্ভব তা-ই দেখানো হয়েছে। ভিক্ষা বা লোভ পরিত্যাগ করে নিজের শক্তির ওপর নির্ভরতার বিশ্বাসেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চান নাট্যকার। এও একধরণের লড়াই। এই লড়াই হল আত্মশক্তির জাগরণের, আত্মশক্তিতে আস্থা ফেরানোর। ১৯৮১ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রায় চার বৎসর অতিক্রান্ত তখন মনোজ মিত্র বুঝতে পেরে গেছেন শাসন ব্যবস্থা এমন একটা বিষয়, যেখানে শাসকের পরিবর্তন ঘটলেও ব্যবস্থা একই রকম থেকে যায়। স্বজনপোষণ, নীতিহীনতা, আখের গোছানো, রাজত্ব রক্ষায় পিশাচের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা প্রভৃতি ব্যবস্থার সমস্ত ব্যাধিই নতুন শাসনে প্রত্যক্ষ করে তিনি হতাশ হয়েছেন। শনিদেবকে দিয়ে বলানো সংলাপ যেন নাট্যকারের হতাশারই বহিঃপ্রকাশ ঃ

"দেবতা যদ্যপি পারে বদলাতে রাজা .....

পারে না বদলাতে শাসন, এমনি এ মজা!"[২৪]

ব্যবস্থার বদলে তাই তিনি আস্থা স্থাপন করতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের ওপরই। আত্মসুখসর্বস্বতার পাঁকে আবদ্ধ অযোধ্যাপুরীকে ধ্বংস করে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দরিদ্রের সন্তান বৃষলের ওপরই ভরসা করেছেন। অর্থাৎ দরিদ্রের জয় এবং প্রতিষ্ঠা এখানেও তাঁর কাম্য, কিন্তু সেই জয় কোনো বাইরের তত্ত্বের দ্বারা সাধিত হতে পারে বলে মনে করেন নি। ১৯৭৪-এ 'শিবের অসাধ্যি'তে বলেছিলেন পরের কাছা ধার করে পার পাওয়া যাবে না, কৃষককে নিজের অবস্থা নিজেকেই বদলাতে হবে।১৯৮১-তে এসে সেই কথাই বলতে চাইলেন আবার। তত্ত্বের পরিবর্তে মানুষের চৈতন্যের বিকাশেই আস্থা রাখতে চাইলেন।

'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫) নাটকেও অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের জাগরণের ওপরই ভরসা রেখেছেন নাট্যকার। সমাজের দিকে তাকিয়ে এই সময় দেখছেন, মানুষের লোভ লালসা ক্রমশ বাড়ছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শোষণ ও বঞ্চনা। লুব্ধ মানুষ আজ পশুর তুল্য। দুটি শেয়াল তাই এই নাটকে হয়ে ওঠে সামাজিক শেয়ালদেরই প্রতীক। তিন জোতদার ভাই চক্রধর, গদাধর এবং ধ্বজাধর শেয়ালের মতোই ওঁৎ পেতে আছে তুষ্টুর লাশের জন্য। প্রত্যেকেই স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় সেই লাশের মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের স্বার্থের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অন্যতম লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক ঃ "দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে একটি ব্যাখ্যা হল এই যে ব্যক্তিস্বার্থে শোষকদের মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে – আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে তা সত্য, আমাদের সমাজেও তা সত্য।"[২৫] সেই দ্বন্দ্বই "শেষ পর্যন্ত তুষ্টু ছকু ও ঢ্যাঙাকে এক সরলরেখায় দাঁড় করিয়ে

মহাজনি প্রথার বিরুদ্ধে গণসংঘর্ষ গড়ার প্রস্তুতি নিয়েছে।''[২৬] তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকে আমরা দেখেছিলাম রহিমের ট্রাজেডি কেবল হাকিমুদ্দির শোষণের ফলে হয়নি, ধর্মীয় সংস্কারও সেখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। মনোজ মিত্রের এই নাটকেও সামাজিক শোষণ ছাড়াও তুষ্টুকে পীড়িত করেছে তার ধর্মীয় সংস্কার। জীবন-বিস্মৃত আচারধর্ম নিয়ে সে মেতে উঠেছিল। তুলসী লাহিড়ীর রহিম আত্মহত্যা করেছিল, কিন্তু মনোজ মিত্র যে কোনো অবস্থাতেই মানুষকে পরাজিত দেখতে চান না। তাই প্রথমে তুষ্টু আত্মহত্যা করেছে বলে মনে হলেও শেষে গাছ থেকে নেমে আসে জটাভার মুক্ত 'জ্যান্ত' তুষ্টু। এই তুষ্টু নতুন বোধে উত্তীর্ণ, নতুন চেতনায় উদ্দীপিত। তাকে নিয়ে স্বার্থপর মানুষদের সমস্ত পরিকল্পনা সে ভেস্তে দেয়। ক্রুদ্ধ নাট্যকার 'নরক গুলজার'-এ যেমন অপরাধীদের গো-জন্ম দিয়েছিলেন, এখানে তেমনি শেয়াল-রূপী মানুষকে শেয়ালের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদিয়েছেন। ক্রোধ তীব্র বলেই এই নাটকে কৌতুকের অবকাশ কম। মন্দ চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত। মানুষের লোভ এবং স্বার্থপরতার পাশাপাশি অশুভ রাজনীতিক, ভণ্ড ধার্মিক, ঠক ব্যবসাদার, রাজনীতির নিয়ন্ত্রক মস্তান — সকলেই এই নাটকে মনোজ মিত্রের ক্রোধের লক্ষ্য হয়েছেন, হয়েছেন কোনো নির্দিষ্ট কালখণ্ডের পরিচিতিতে নয়, বরং যে কোনো কালের সাধারণীকৃত রূপ হিসেবে।

'নেকড়ে' (১৯৬৮) থেকে শুরু করে, 'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫) পর্যন্ত নাটকগুলিতে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনার ধরণটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তিনি মূলত শোষিত, পীড়িত, দরিদ্র মানুষের জয় চাইছেন যে কোনো মূল্যে। তিনি যেহেতু কোনো রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার বহন করেননি, কিংবা কোনো দলীয় রাজনীতিতে আস্থাশীল হতে পারেননি, তাই তাঁর এই চাওয়া কোনো বিশেষ তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয় নি। জীবনকে তিনি জেনেছেন তত্ত্বের চেয়ে অনেক বড় হিসেবে। তাই জীবনের অভিজ্ঞতাকে, জীবনের উপলব্ধিকে স্থান দিয়েছেন তত্ত্বের ওপরে। কিন্তু পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, দলীয় রাজনীতিতে আস্থা না থাকলেও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ যে তাঁর আছে, একথা মনোজ মিত্র নিজেই স্বীকার করেছেন। সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি নিজের সেই মতাদর্শকেই ভিত্তি করেছেন বলে জানিয়েছেন ঃ ''আমার নাটকে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিই উপজীব্য। সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণের পিছনে রাজনীতি অবশ্যই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আমার নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে। তবে দলীয় রাজনীতিতে আস্থা নেই।''[২৭] নিজের মতাদর্শগত বিশ্বাস নিয়েই তিনি সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ থেকেছেন। তাঁর চেতনায় মতাদর্শের প্রতি যে বিশ্বাস নিহিত, তা স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত হয়েছে নাটকে বর্ণিত সমস্যার সমাধানে। এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাট্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

> ''মনোজ মিত্র কখনোই কমিউনিস্ট পার্টির বা গণনাট্যের আওতায় ছিলেন না কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে জমিদার ও জোতদার সম্পর্কে, মহাজনিপ্রথা সম্পর্কে গণনাট্যের বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব এবং তার অনুসরণে রচিত গণনাট্যগুলির সঙ্গে মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু', 'শিবের অসাধ্যি' 'সাজানো বাগান' অথবা 'নৈশভোজে'র খুব একটা পার্থক্য নেই।''[২৮]

উৎপল দত্ত যে প্রোপাগান্ডা এবং অ্যাজিটেশন-এর কথা বলেছিলেন, মনোজ মিত্রের 'শিবের

অসাধ্যি' বা 'নৈশভোজে'র মতো নাটকে সেই প্রোপাগান্ডা যথেষ্ট রয়েছে বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথবাবু। 'শিবের অসাধ্যি' নাটকের শেষে যে শোষিত মানুষের উজ্জীবনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে অ্যাজিটেশনের প্রকৃত শক্তি হিসেবে শোষিত মানুষ স্বীকৃতি পেয়েছে বলে তাঁর অভিমত। অর্থাৎ চেতনাগত সাদৃশ্যের কারণে এই নাটকগুলিতে মনোজ মিত্র গণনাট্যধারার সহযাত্রী, আর দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে নবনাট্যধারার বাহক।

মনোজ মিত্রের সমাজচেতনার একটি ধারায় যেমন রয়েছে এই প্রতিবাদী নাটকগুলি, যেগুলিতে তিনি প্রধানত ক্রোধী এবং শোষিত নিপীড়িত মানুষের জয় প্রতিষ্ঠায় উৎসুক, অন্যধারায় তেমনি রয়েছে বিশেষ সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তি মানুষের জীবনসমস্যা-আশ্রিত নাটকগুলি। নিজের প্রথম নাট্যরচনা 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯) থেকেই এই ধারাটির সূচনা। নিজেরই পরিবারে দেখা এক ব্যক্তি এবং কিছু ঘটনা তুলে ধরে সেই নাটকে তিনি দেখিয়েছিলেন পরিবারে প্রান্তিক মানুষের অসহায় অবস্থানটিকে। এই ধারাতেও তিনি সবসময় দুর্বল, অসহায়, প্রতিবন্ধী, ভালোবাসার কাঙাল মানুষের পাশে থেকেছেন, সেই মানুষদের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন মর্যাদার ভূমিতে। 'পাখি' নাটকে তাঁর নায়ক তাই হ্যারিকেনের সেলসম্যান হয়েও অন্তত একদিনের জন্য অতিক্রম করতে চায় নিজের সীমাবদ্ধতা। নিষ্করুণ সমাজে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে বহু বাধা। গ্রামে থাকা বৃদ্ধা মায়ের চিন্তা উদ্বেগ বাড়ায়, পাওনাদাররা বাড়িতে উৎসবের আয়োজন দেখে একে একে এসে হাজির হয় এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ভাঙা টাকা প্রত্যেকেই কিছু কিছু নিয়ে যায়, সবশেষে বন্ধুদের চিঠি পড়ে জানতে পারে, তাকে খরচের হাত থেকে বাঁচাতে কেউ নিমন্ত্রণ খেতে আসছে না। সহমর্মী নাট্যকার কিন্তু ব্যর্থ হতে দেন না তাদের পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী — তাদের 'সাতুই ফাল্গুন'কে। তাই অন্ধকারে ছিন্ন আয়োজনের ওপর সত্য হয়ে থাকে শ্যামার জ্বালা পাঁচটি মোমবাতির অনির্বাণ শিখা। সমাজের উঁচু তলার মানুষের জীবনে যখন লোভ, স্বার্থপরতা আর কৃতঘ্নতারই প্রাধান্য, তখন মনোজ মিত্র অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করলেন স্নেহ-মায়া-মমতার প্রস্রবণ। 'টাপুর টুপুর' নাটকে মরালী-কেষ্টদুলালের মধ্যে সম্পর্কের যে বাঁধন তা পলিশ্‌ড নয়, কিন্তু নিখাদ।

'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯) লেখার পরের বছরই তিনি লিখলেন দুটি নাটক 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০) এবং 'পরবাস' (১৯৭০)। বৃহত্তর সমাজ এবং রাষ্ট্রে যখন চলছে শোষণ পীড়ন বঞ্চনা, মূল্যবোধের অবক্ষয় যখন সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করছে তখন পরিবার জীবনে উঁকি দিয়ে সেখানকার অবস্থাটা যেন দেখে নিতে চাইলেন মনোজ মিত্র। সেখানেও তখন একইরকমভাবে চলছে মূল্যবোধের অবক্ষয়, লোভ-হিংসা-স্বার্থপরতার কর্দয উপস্থিতি। 'মৃত্যুর চোখে জল'-এ যে বৃদ্ধকে দেখেছিলাম সিঁড়ির নিচের অন্ধকার ঘরে, 'কেনারাম বেচারাম'-এ তিনিই তো বেচারাম, তিনিই তো ক্রমাগত উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ি থেকে। এই হেড অব দি ফ্যামিলিদের চমৎকার উপমিত করেছে বেচারাম ঃ ''ইংরেজি ভাষার অ্যাপসট্রপি। মাথার পরে সাজানো থাকে কোনো উচ্চারণ নেই। আমরা বুড়ো মা-বাপও তাই। হেড অব দি ফ্যামিলি ... নো প্রোনানশিয়েশান।''[২৯]

পরিবারের মাথায় এদের আলঙ্কারিক উপস্থিতি কিন্তু কোনো কথা বলার ক্ষমতা নেই। কোনো উচ্চারণ নেই। মূল্যবোধের অবক্ষয় কোন পর্যায়ে গেলে কেবল সম্পত্তির জন্য একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে 'বাবা' বলে স্বীকার করে নেয় মানুষ, তা দেখে শিউরে উঠেছেন মনোজ মিত্র। বিপ্লবী ছোটো ছেলে থেকে শুরু করে পাড়ার রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত প্রত্যেকেই লোভী। কারো লক্ষ্য সম্পত্তি, কারো বা ফলস্ ভোট। এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নিজের মতো করে লড়াই চালিয়েছেন মনোজ মিত্র। সংসার যাদের বাতিল করে দিতে চায়, অপ্রয়োজনীয় বলে দূরে ফেলে দিতে চায় — তিনি তাদের সমাজ-সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই তিনি সৃষ্টি করেন টোটনের মতো শিশু চরিত্র। লোভ-হিংসা-স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে যে বড় করে তোলে মানবিকতাকে, মানবিক সম্পর্ককে। এই মানবিকতারই সন্ধান করেন মনোজ মিত্র। বিশ্বাস করেন, সমাজে কোথাও না কোথাও শেষপর্যন্ত থেকে যায় সেই মানবিকতার অস্তিত্ব।

'পরবাস' নাটকে মানবিকতার স্পর্শ গজমাধব পেয়েছে আর এক অনিকেত মন্দিরার কাছে। দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষকে আশ্রয় এবং জীবিকার সন্ধানে ভারতে আসতে দেখেছেন মনোজ মিত্র। যে মানুষেরা ওপারে ছিলেন যথেষ্ট স্বচ্ছল, এপারে এসে তারাই পড়েছিলেন নিতান্ত দুরবস্থায়। বেলগাছিয়া ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাসাবাড়িতে তখন থাকছেন মনোজ মিত্ররা। খুলনা যশোরের মানুষের কোলকাতায় প্রবেশপথের ধারেই সেই বাসাবাড়ি। ফলে পরিচিত, অর্ধপরিচিত অনেক মানুষের কাছেই তা ছিল 'ট্রানজিট হাউস'। সেই সূত্রে অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষকে তিনি দেখেছেন এবং তাদের আশ্রয় ও জীবিকার সমস্যা উপলব্ধি করেছেন। সেই সামাজিক সমস্যাই ভর পেয়েছে 'পরবাস' নাটকেও। বিষণ্ণ কৌতুকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন ছিন্নমূল মানুষের কাছে নগর কোলকাতায় একটা আশ্রয় তখন কত জরুরি। আবার সামাজিক সমস্যার মধ্যে ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্যও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে নিজের আশ্রয়ের বিনিময়ে তাঁর গজমাধব দেখতে চায় আর এক আশ্রয়হীনা মন্দিরার জীবনের পূর্ণতা।

১৯৭৮ সালে লেখা 'দম্পতি' ('শুকসারী') নাটকে তিনি আবার দেখালেন পারিবারিক বৃত্তে অবক্ষয়ের রূপ। এখানেও লোভের কেন্দ্রে সম্পত্তি। কর্মসূত্রে পরিবার বিচ্ছিন্ন — একজন আসাম একজন দিল্লি। বাড়ি আগলে রয়েছে বৃদ্ধ দম্পতি। এই বাড়ি বিক্রি করে টাকা এবং বাবা-মাকে ভাগ করে নিতে চায় দুই ছেলে। বাড়ির প্রতি মমতা, বাবা-মায়ের মত কিছুই তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কিন্তু নাট্যকার মনোজ মিত্র শৈশবেই জেনেছেন ভিটে থেকে উৎখাত হবার যন্ত্রণা, তাই কর্তা-গিন্নিকে তিনি উৎখাত হতে দেননা, জিতেনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন বাড়িতে। জিতেনের মতো চরিত্র বাস্তবে সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু নাটক বয়নের নিপুণ কৌশলে এই চরিত্রকে অসঙ্গত মনে হয় না। নাট্যকার মূল্যবোধের পুনঃস্থাপন করবেনই — এটা তাঁর লড়াই। সেই লড়াইয়ে অসহায় মানুষ, দুর্বল মানুষকে তিনি জয়ের পথে ফেরাবেনই। এই নাটকে ওপর নীচে দু'জোড়া দম্পতিকে দেখিয়ে পুরনো এবং আধুনিক মানসিকতার, বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। কর্তা-গিন্নির মধ্যে চরম বিরোধ,

কিন্তু তা শুক-সারীর মতোই আপাত বিরোধ — ভেতরে রয়েছে গভীর মিল। কিন্তু ওপরতলার আধুনিক দম্পতি শ্যামল-বকুলের মধ্যে সহনীয়তার নিতান্ত অভাব। বিচ্ছেদই তাদের দৃষ্টিতে সমস্যা সমাধানের সহজ পথ। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তথাকথিত আধুনিকতার প্রতি নাট্যকারের বিরূপতা গোপন থাকেনি।

মানুষের যখন বড় কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে, মানুষ যখন ক্রমশ হীন হয়ে পড়ছে তখন মনোজ মিত্র সৃষ্টি করলেন এক সর্বংসহা বিরাটহৃদয় মাতৃচরিত্রকে, সৃষ্টি করলেন অলকান্দাকে ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা'-১৯৮৮) সমাজ যখন পঙ্গু, অসহায়-অপ্রকৃতিস্থ — তখন দিলেন মায়ের শুশ্রূষা। পঙ্গুতা, স্থবিরতা এবং অস্বাভাবিকতাকে সময়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মনোজ মিত্র। রজনীনাথ, দেবাহুতি, শুভ, জয়দীপ সেই পঙ্গু, অসুস্থ সময়ের প্রতিনিধি। এই সময়ই তো চরম প্রয়োজন মায়ের মমতার। মনোজ মিত্র বিশ্বাস করতে চান, মানুষের মধ্যেই আছে শুভবোধ। চরম প্রয়োজনের সময়ই তার জাগরণ ঘটে। সেই বিশ্বাসকে চিহ্নিত করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক ঃ

> "খলতা, নিষ্ঠুরতা, দুর্যোগের আকস্মিকতা সত্ত্বেও জগৎ সংসার যে এখনও টিকে আছে, তার কারণ, কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অসহায়কে আশ্রয় দেন। ... বিরূপ অবস্থাতেও যখন তাঁরা সামাজিক বিরক্তি, সাংসারিক ক্লিষ্টতা, আপন দুঃস্থতা উপেক্ষা করে অসহায়ের পাশে এসে দাঁড়ান, তখন মানুষের মহত্ত্ব যত ছোট আকারেই হোক না কেন স্বীকার না করার উপায় থাকে না।"[৩০]

এই মহত্ত্বকেই তো স্বীকৃতি দিতে চান মনোজ মিত্র। তাঁর সমাজচেতনা অলকানন্দার মতো মায়েদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার কথা বলে। অলকানন্দার সঙ্গে গোর্কির মা এবং বাস্তবের মাদার টেরেজার তুলনা করে সমালোচক বলেছেন ঃ

> "সাহিত্য ক্ষেত্রে গোর্কির মা এক অনন্যসাধারণ চরিত্র। কিন্তু তাঁর প্রেক্ষাপটে ছিল শ্রমিক আন্দোলন, তাঁর কাজে ছিল গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য। আর বাস্তব ক্ষেত্রে এই পশ্চিমবাংলায় আমাদের মধ্যে রয়েছেন মাদার টেরিজা। ... তাঁর আছে প্রাতিষ্ঠানিক জোর। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগেও সেই মহৎ মাতৃত্বের প্রসাদ অকাতরে বিতরণ কি একেবারেই অসম্ভব ?"[৩১]

সম্ভব কি না, সেই পরীক্ষাই যেন নাট্যকার করেছেন অলকানন্দা চরিত্রে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, ধ্বস্ত সমাজকে সুস্থ করতে, মানবিকতাকে উজ্জ্বল করে তুলতে একজনের প্রয়াসে আরো অনেকের সহযোগিতা প্রয়োজন । রজনীনাথের সায় না থাকলে, বাদলের সহযোগিতা না থাকলে অলকানন্দার পথ চলা দুরূহ হ'ত । নাটকের শেষেও তাই সে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে। মনোজ মিত্রের মতোই তাঁর সৃষ্ট অলকানন্দাও বিশ্বাস করে যে, ভিতরের অন্ধকারটাই সব নয়, বাইরের আলো তার চেয়ে অনেক বড় । জমাট বাঁধা অন্ধকারকে নাশ করবেই ভোরের আলো । মানুষকে এই আলোর দিকেই নিয়ে যেতে চান নাট্যকার । তাই সমকালের একাধিক সংকট নিয়ে যুগের এক জটিল যন্ত্রণাদীর্ণ ছবি এই নাটকে ফুটে উঠলেও শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে থাকে নাট্যকারের সহানুভূতির বোধ। সমালোচকের কলমে সেই বোধেরই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ঃ

> ''মনোজ মিত্রের এই নাটকে অনেকগুলো বিষয় একের সঙ্গে অন্যে জড়িয়ে আছে বলে জটিল আধুনিক জীবনের একটা ছবি ফুটে ওঠে। মাতৃত্ব, পোষ্য সন্তানের সংকট, নারীমুক্তি, চরিত্রর ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়া, র‍্যাগিং-এর আঘাতে কিশোর মনের বৈকল্য, সবই দেখা হচ্ছে একটি বাস্তববোধসম্পন্ন অথচ সহানুভূতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে।''[৩২]

অর্থাৎ সামাজিক অবক্ষয়কে রুখতে এই পর্যায়ে সহানুভূতি এবং সহমর্মিতাকেই আশ্রয় করেছেন মনোজ মিত্র।

'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'(১৯৮৮) থেকে মনোজ মিত্রের সমাজ-রাজনীতি চেতনায় একটা বদল লক্ষ করা যায়। দলীয় রাজনীতিতে আস্থা না থাকলেও গণনাট্যের ভাবধারার সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী নাটকগুলির সাদৃশ্যের কারণ, শাসনক্ষমতায় মতাদর্শগত বদল ঘটলে গুণগত পরিবর্তন ঘটবে – এই আশা। কিন্তু ১৯৮১ সালে 'রাজদর্শন' নাটকের সময় থেকেই সম্ভবত তাঁর মোহভঙ্গ ঘটতে শুরু করেছে। ফলে সামাজিক কারণগুলির দিকে তাঁর নিক্ষিপ্ত তীর অনেকটাই সাধারণীকৃত হয়ে গেছে। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'-য় এসে তাঁর স্পষ্ট উপলব্ধি হচ্ছে যে, মানুষ – কেবল মানুষই পারে নিজের ভেতরকার মহৎ শক্তিকে উজ্জীবিত করে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে। এখান থেকে এই যে সাধারণীকৃত সমাজ-সমালোচনার সূত্রপাত, এর কারণ নিহিত রয়েছে নিজের নাট্যরচনার কালকে নাট্যকার কর্তৃক চিহ্নিত করার মধ্যে। সেখানে নবনাট্যের সময়কে বিবৃত করার পর তিনি বলেছেন ঃ

> ''এটা কি সেই বিশেষ সময়টার গুণে – যখন ভারতবর্ষের মাটিতে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যের, সর্বস্তরে সামাজিক দুর্নীতির টাইমবোমা পোঁতা হচ্ছিল ? অথবা সর্বকালই আসলে এরকম ? এখনও তাই ? আমরা দেখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি বলেই ঠাওর করতে পারছি না ? পৃথিবীতে এসব গোলাবারুদ হয়তো সবসময়ই পোঁতা হচ্ছে – কালকের মজুত আজ ফাটছে, আজকের সঞ্চয় আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করছে।''[৩৩]

বিশ শতকের শেষের দিকের এই লেখায় মনোজ মিত্র বলতে চাইলেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক দুর্নীতি সব কালেই ঘটছে। দেখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কথা বলে বাংলা নাটকের একদেশদর্শিতাকেই তিনি কটাক্ষ করেছেন। নিজে এই একদেশদর্শিতার দ্বারা আক্রান্ত হতে চান না বলেই সব যুগেই তাঁর নাটকে সমাজ-রাজনীতির শঠতা এবং ভণ্ডামি আক্রান্ত হয়েছে। কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে তিনি সত্যভাষণে পিছুপা হন নি।

'কিনু কাহারের থেটার'(১৯৮৮) নাটকে কিনুর 'গুরুচণ্ডালী' থিয়েটারের খোলসে যেমন তিনি অনায়াসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সমকালকে। স্বার্থপর রাজা-উজির, বিদেশি শাসকের প্রতিনিধি, ভণ্ড সাধু, ঘন্টাকর্ণ এবং উদাসিনীর মতো ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবহৃত মানুষ – এককথায় সমকাল তথা চিরকালের গোটা সমাজটাই এই নাটকে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। মনোজ মিত্র দেখাতে চান, যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অশ্বত্থামা বা হীরামন, ঠিক সেভাবেই সব যুগে

ব্যবহৃত হয় ঘন্টাকর্ণরা । উঁচু পদে আসীন মানুষদের চারিত্রিক স্খলন, ভন্ড গুরুর ফেরেববাজি, শাসকের কূটকৌশল ইত্যাদি সবকিছুই এখনে নাট্যকারের কটাক্ষের লক্ষ্য হয়েছে কিনু বা ঘন্টাকর্ণের মাধ্যমে। 'কিনু কাহারের থেটার'-এর মতোই 'পুঁটি রামায়ণ'(১৯৮৯-৯০)-এ হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচীসহ একালের গোটা সমাজটাকেই মনোজ মিত্র ভরে দিয়েছেন রামায়ণের খোলসে । এই নতুন রামায়ণে পুঁটিরাম বাগচীই নায়ক। রাবণ হ'ল জগতের আদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাষ্ট্রনায়ক, কালনেমি 'পলিটিকাল অ্যাডভাইসার', ইন্দ্রজিৎ 'মেজর জেনারেল'। বিশ শতকের পুঁটিরাম রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কায় ঢুকে গিয়ে সেখানে চালু করেছে বিশ শতকের এক একটি ব্যবস্থা । সেই সুযোগে নাট্যকার মনোজ মিত্র আধুনিক সমাজের কলুষগুলির দিকে কটাক্ষ করেছেন। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, সংসদে জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি, বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, তদন্তের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি সবকিছুকেই তিনি কৌতুকের শরে বিদ্ধ করেছেন । বিশ শতকের ভারতে তিনি দেখেছেন সিস্টেম-সর্বস্বতা । গণতন্ত্র রক্ষার নামে সিস্টেমের জাল এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে যে, তা থেকে বেরনো কঠিন । সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ফাঁক । সেই ফাঁকের সুযোগে সকলেই আখের গোছায় । ব্যথিত নাট্যকার লক্ষ্য করেছেন, শিক্ষক-পুরোহিত-রক্ষী-মন্ত্রি সকলেই লুব্ধ, সকলেই ভ্রষ্ট । মানুষের এই অবনমনে কষ্ট পেয়েছেন মনোজ মিত্র, কারণ মানুষই তাঁর কাছে চরম সত্য । সেই কষ্টের প্রকাশ বৈদ্য-র সংলাপে ঃ ''ভালো হচ্ছে? আপনি বলছেন ভালো হচ্ছে ? পাঁচ টাকার ওষুধ দিয়ে রোজ পাঁচ হাজার টাকার বিল করছি! টাকা নিচ্ছি আর বাড়ি ফিরে শুধু কাঁদছি! আপনারা কাঁদেন না অ্যাঁ, টাকা মেরে আপনাদের মন খারাপ হয় না!''[৩৪] এই কষ্টই ক্রোধের উৎসস্থল । তীব্র ক্রোধে মনোজ মিত্র প্রত্যাখ্যান করেন এই আধুনিকতাকে, যা মানুষকে নষ্ট করে, ভ্রষ্ট করে। নিজের চারপাশে যখন দেখেছেন সিস্টেমের ফাঁসে শাসন অথর্ব, যখন দেখেছেন রাজনীতিকদের তীব্র ক্ষমতালোভ, দেখেছেন বিবেক-মনুষ্যত্ব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি অনুভব করেছেন, মানুষের মধ্যে ক্রমশ অশুভ সত্তা বিস্তৃত হচ্ছে। তাঁর সৃষ্ট বক্কেশ্বর তাই বলে দেয় সার কথাটি ঃ ''আধুনিক হতে মামা কুলাঙ্গার চাই।''[৩৫] মনোজ মিত্র বলতে চান, এই কুলাঙ্গার সত্তা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে, কেবল বেরিয়ে আসার জন্য উপযুক্ত অবসর চাই । বৈদ্যর মতো চরিত্রর মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের অবমাননায় নাট্যকারের বেদনা প্রকাশ পেলেও এই নাটকে সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো ইঙ্গিত যেন তিনি দিতে পারছেন না । তথাকথিত আধুনিকতার ওপর আস্থাই যেন হারিয়ে ফেলছেন ।

১৯৯০ সালে মনোজ মিত্র যে 'শোভাযাত্রা' নাটক লিখলেন সেখানে সমাজকে এবং সামাজিক অবস্থায় পতিত মানুষকে দেখলেন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। 'নেকড়ে', 'চাক ভাঙা মধু', 'সাজানো বাগান', 'নরক গুলজার' প্রভৃতি নাটকে জমিদার-জোতদারদের দেখেছিলেন অত্যাচারী শোষক হিসেবে। সে শোষকের পরাজয় ঘটানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু 'শোভাযাত্রা'য় সামন্ততন্ত্রের উত্তরপুরুষ ধনগোপালের অসহায়তার দিকটি তিনি তুলে ধরলেন । সমকালীন সমাজব্যবস্থায় যে জমিদারি ব্যবস্থা বিস্মৃতপ্রায়, যা স্মৃতিতে কখনো কখনো উঁকি দেয় কেবল অত্যাচার ও শোষণ-পীড়নের ভার নিয়ে, যে ব্যবস্থা পার করে এসে মানুষ স্বস্তিবোধ করেছে – সেই ব্যবস্থারই এক অবশেষকে এই নাটকে যে মনোজ মিত্র অবলম্বন করলেন,

তার কারণটি নির্ণয় করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ

> ''এই সময়, যে সময় আচরণে চণ্ডাল, স্বভাবে উত্তাল, সে সময়ের প্রেক্ষাপটে নাটকটি পল্লবিত হয়েছে একটি প্রাচীন জীর্ণ জমিদারবাড়ি, সেই বাড়ির কয়েকটি চরিত্র ও এক বিবর্ণ রথকে ঘিরে। কথা হচ্ছে, চলতি সমাজব্যবস্থায় যা পরিত্যক্ত এবং গুরুত্বহীন, তা এই নাটকে এতটা গুরুত্ব পেল কেন ? পেল তার কারণ, শিল্প-সাহিত্যের যিনি প্রকৃত স্রষ্টা তিনি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনকে সমাজের চলতি প্রবণতা থেকে প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন করতে জানেন। পেল তার কারণ, বিষয় নয়, বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যেই তিনি তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করে থাকেন। অর্থাৎ সমাজ যা যেভাবে দেখায়, তাই তিনি দেখেন না এবং এখানেই তিনি আর পাঁচজনের চাইতে আলাদা।''[৩৬]

প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টির বিপরীতে তাই মনোজ মিত্র এই নাটকে দেখতে চেষ্টা করেছেন সত্যের অন্য পিঠটি এবং সে পিঠটিও তাঁর দৃষ্টিতে আর এক সত্য বলেই প্রতিভাত হয়েছে। 'শোভাযাত্রা' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় তাই হয়ে উঠছে ঃ ''সেই বিপন্ন মানুষ, সময় ও সমাজের কাছে যুগে যুগে যে শুধু অভিযুক্ত হয়ে নির্যাতিত হয় কিন্তু প্রকৃত বিচার পায় না।''[৩৭] প্রকৃত সামাজ-সচেতন শিল্পীর পক্ষেই কেবল সম্ভব সত্যের এই বিপরীত রূপ ফুটিয়ে তোলা; নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সময়কে বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণ আগে থেকে প্রতিপাদ্য ঠিক করে নিয়ে করা নয় বলে এর সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত অনুভূতি হয়। সেই অনুভূতিকেই ব্যক্ত করেছেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ঃ

> ''জমিদার অথবা জোতদার বাংলা নাটকে ভিলেন হয়, তাদের আক্রমণ করে অনেক নাটক প্রযোজিত হয়েছে, শেষ দৃশ্যে লাল মশাল জ্বালিয়ে, কিন্তু সেই জমিদার পরিবারের শেষ নিঃস্ব বংশধরকে সম্পূর্ণ অন্য ভূমিকায় এনে, এই প্রথম এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরী করলেন মনোজ মিত্র।''[৩৮]

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে যেন দ্বিধা জাগে — ধনগোপালকে নদুর দৃষ্টিতে ঘৃণা করা উচিত অথবা তার প্রতি সহানুভূতি বোধ করা উচিত? নাট্যকার এমনভাবে সামাজিক অবস্থায় পতিত এই চরিত্রটিকে আঁকেন যে, তার প্রতি আমাদের সহানুভূতিই জাগে।

'শোভাযাত্রা' নাটকটি রচনার পেছনে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বাস্তবতার অভিঘাত দেখেছেন সমালোচক নৃপেন্দ্র সাহা ঃ

> ''সারা ভারত জুড়ে যখন ধর্মীয় রথের রাজনীতি দেশটাকে সাম্প্রদায়িক ভেদচিহ্নে টুকরো করতে উন্মত্ত, তখন আমাদের নাট্যকার এক পারিবারিক ঐতিহ্যের ধর্মীয় বিশ্বাসের রথকে সামাজিক বিশ্বাস ও সংহতির রথে রূপান্তরিত করে দেখিয়ে দিলেন যে, সাহিত্য-শিল্প ও নাট্যর সামাজিক উপযোগিতাবাদে কেবল মার্কসবাদী বস্তুবাদীরাই বিশ্বাস করেন না, অমার্কসবাদী বস্তুবাদীরাও মান্য করেন।''[৩৯]

বলা বাহুল্য, এই উক্তিটিতে লালকৃষ্ণ আদবাণীর ভারতব্যাপী রথযাত্রার কথাই বলা হয়েছে। বাস্তব যে ঘটনারই অভিঘাত এই নাটক রচনার পেছনে থাকুক না কেন, এখানে মনোজ মিত্রের প্রধান লক্ষ্য পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে পর্যবেক্ষণ। এই

কাজটি করতে গিয়ে তিনি কিন্তু সাধারণ সামাজিক সত্যগুলিকেও পাশ কাটিয়ে যান না। তাই তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নতুন কালের গ্রামজীবনে রাজনৈতিক দলের একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা। এই দল যে বামপন্থী দল তাও স্পষ্টই বোঝা যায় রাজনৈতিক কর্মী উদয়ের আচার-আচরণে। বিবাদ সালিশীর নামে পার্টি ততদিনে ঢুকে পড়েছে প্রত্যেক পরিবারের অন্দরমহলে। পার্টির নেতার ইচ্ছেই প্রকৃতপক্ষে আদেশ। সবটা ঠিক করে দিয়েও আলগোছে নিজেকে সরিয়ে রাখা পার্টিকর্মীদের কৌশল। উদয়ের সংলাপে সে কৌশলেরই প্রকাশ ঃ ''না দাদা, আমার হ'ল ঘটকের কাজ। বিয়ের আসরে ঘটকের থাকতে নেই। যা করবেন নিজেরা নিজেরা।''[৪০] কিন্তু 'নিজেরা নিজেরা' 'কী' করতে হবে সেটা বড় নেতার নাম করে জানিয়ে দিয়ে যায় উদয়ই। না করলে পার্টি যে 'ভালোমন্দ'র দায়িত্ব নিতে পারবে না সেকথাও স্পষ্টই বলে। এই প্রচ্ছন্ন হুমকি যে সমকালীন গ্রামজীবনের বাস্তব সত্য তা দেখাতে ভোলেন নি মনোজ মিত্র। যে নদুকে ধনগোপালের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল উদয়, সে নদুই যখন রথ-উৎসবের ম্যানেজার হয়ে ধনগোপালের বর্গাদারের ওপর অত্যাচার করেছে তখন উদয় সম্পূর্ণ দায় ঝেড়ে ফেলে দায়ী করেছে ধনগোপালকেই। রাজনীতিকের প্রকৃত চরিত্র এটাই। কিন্তুকে বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে দিতে নিজেই ভয় পান মনোজ মিত্র। তাই নিচুতলার কর্মী উদয়ের মধ্যে যে অবক্ষয় দেখেন তা থেকে মুক্ত রাখেন নেতা প্রফুল্লবাবুকে। উদয় 'প্রফুল্লবাবুর নাম ভাঙিয়ে মোড়লি করে বেড়াচ্ছে' বা উদয়রা এমন অনেক কাজ করে 'যাতে প্রফুল্লবাবুর সায় নেই। অনেক সময় তিনি জানতেও পারেন না।' প্রভৃতি উক্তির মধ্য দিয়ে নিজেই আশ্বস্ত হতে চান যে, পচন তখনো সর্বস্তরে ধরেনি।

নাটকের শেষে মনোজ মিত্র দেখান সামাজিক বিবর্তনের স্বরূপটি। জগন্নাথের যে রথ ছিল পরিবারের সম্পত্তি, সেই রথ গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে ধনগোপাল পারিবারিক উৎসবকে সামাজিক উৎসবে রূপান্তরিত করলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষের শোভাযাত্রায় পা ফেলতে প্রস্তুত হয়েছেন ধনগোপাল।এই পরিণতিকে 'লক্ষ্যের সরণী'তে পৌঁছনো বলে চিহ্নিত করেছেন সমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ঃ

> '' 'শোভাযাত্রা' মানুষের সর্বজনীন শোভাযাত্রা হয়ে উঠেছে। জমিদার বংশের নিজস্ব রথযাত্রা সব মানুষের রথযাত্রায় পরিণত হয়। ধনগোপাল এবং তার পরিবারও বাইরে থাকতে পারেন না এই জীবনস্রোতের। তথাকথিত বংশগৌরব আর অতীতের জন্য হা-হুতাশ মুছে যায় কালের অভিঘাতে। শ্রীমিত্র এখানে অসাধারণ প্রজ্ঞায় বলে দেন, ইতিহাসের অমোঘ বিধানে কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহে একাকার হয়ে যায় সমস্ত জমিদার পরিবারের আজকের বংশধরেরা।''[৪১]

এই নাটক তাই কেবল ধর্মীয় শোভাযাত্রায় আটকে থাকে না, হয়ে ওঠে সমাজের ভাঙন ও নতুন সমাজের নির্মাণের কাহিনি।

'দর্পণে শরৎশশী'(১৯৯১) নাটকে একশ বছর আগেকার গ্রামীণ বাংলাদেশের সমাজকে মনোজ মিত্র উপস্থাপিত করলেন স্নিগ্ধ মায়াময় প্রকৃতি, থিয়েটার-চেতনা এবং সবরকম সামাজিক কলুষসহ। কপোতাক্ষ তীরে পাঁচক্ষীরের জমিদারবাড়িতে থিয়েটারের আয়োজনকে

কেন্দ্র করে সমকালীন সমাজকে দ্রুত একবার জরিপ করে নিয়েছেন নাট্যকার। সেই সমাজে দেখেছেন কুঞ্জবিহারীর মতো কেজো জগতে অচল কিন্তু দিলখোলা মানুষ, দেখেছেন থিয়েটারপ্রেমী ইন্দ্রনাথ, কামুক গুরুচরণ, থিয়েটারের অভিনেত্রী মনোরমা, নতুন অভিনয় করতে আসা হাসু, থিয়েটারে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করা তুফান প্রভৃতি অসংখ্য বাস্তব চরিত্র। তিনি দেখিয়েছেন, থিয়েটার যুগে যুগে মানুষকে শিখিয়েছে প্রতিবাদী হতে, বিদ্রোহী হতে। সমাজচ্যুত সিতিকণ্ঠকে তাই মঞ্চে উঠিয়েছে ইন্দ্রনাথ। কিন্তু সমাজ চিরকালই নিজের জোর দেখিয়েছে – সোজা পথে ব্যর্থ হলে বাঁকা পথে। তাই থিয়েটারের আসর লণ্ডভণ্ড করে কে বা কারা মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যেভাবে ধ্বস্ত হ'ত কিনু কাহারের থিয়েটার, যেভাবে একালে গায়ের জোরে বন্ধ করে দেওয়া হয় বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের অপছন্দের নাটকের অভিনয়, সেভাবেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল পাঁচক্ষীরের জমিদারবাড়িতে 'নীলদর্পণ'-এর সেই অভিনয়।

'গল্প হেকিমসাহেব'(১৯৯২-৯৩) নাটকে মনোজ মিত্র আরো পিছিয়ে গিয়ে ধরলেন দেড়শ বছর আগেকার সমাজকে – যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তালুকদার-তহশিলদারদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে হেকিমসাহেবের যে কাহিনি বয়ন করলেন, তা হয়ে উঠল সমকালীন সমাজেরই রূপক, হয়ে উঠল আর এক ব্যবহৃত মানুষের কাহিনি। ব্যবহৃত ঘন্টাকর্ণ ছিল অশিক্ষিত, বোকা। কিন্তু এই নাটকে মনোজ মিত্র দেখালেন, ব্যবহৃত হবার হাত থেকে বুদ্ধিজীবীরও নিস্তার নেই। মধ্যস্বত্বভোগী দুই তালুকদারের লড়াইয়ে দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হয় শিক্ষক-অধ্যাপক-চিকিৎসক-শিল্পী। এই ব্যবহৃত হবার চিরন্তনতার কথাই নাটকটিতে আবিষ্কার করেছেন সমালোচক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হেকিমকে 'অগ্রগতির রুদ্ধ দরজার সামনে নিষ্ফল করাঘাতরত ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিনিধি' বলে মনে করেছেন। ভগীরথ মিশ্র এই নাটকের রূপক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, হেকিমের চিকিৎসা হ'ল 'সুবিদ্যা', যা সুগন্ধী ফুলের মতো। ফুল যেমন একজনের বাগানের সার-জলে বিকশিত হলেও সুগন্ধ দেয় সবাইকে, সুবিদ্যাও তেমনি সকলকে শুশ্রূষা দেয়, কিন্তু শোষকশ্রেণি এই সুবিদ্যাকে ব্যবহার করতে চায় নিজের শোষণের প্রয়োজনে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যা শোষণের সহায়ক ততক্ষণই বিদ্যা এবং বিদ্বানের কদর। কিন্তু বিদ্যা নিজের গুণেই চেতনা সঞ্চার করে বিদ্যা-ধারকের মনে। সেই চেতনা যখনই সে সঞ্চারিত করতে যায় তখনই কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে, যেমন বেঁধেছে হেকিমের সঙ্গে। সে জানত, রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা বেশি জরুরি। তাই পলাশপুরের প্রজাদের বলেছিল খাজনা বন্ধ করে দীঘি কাটানোর কথা। গরিব মানুষের মধ্যে চেতনা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল বলেই দরিয়াগঞ্জ বা পলাশপুর কোথাও ঠাঁই হয় নি তার। কারণ ঃ ''শাসক ও মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায় চিরকালই শোষক চরিত্র বহন করে। জনগণ সচেতন হোক এটা কখনই তাদের কাম্য নয়। যিনি সেই সচেতন করায় উদ্যোগী হবেন তার কপালে কোপ পড়বে।''[৪২] অর্থাৎ এই সময় নিজের চারপাশে মনোজ মিত্র দেখছেন উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে স্থানীয় মেধার অপচয়, দেখছেন সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ-চেষ্টা এবং মানুষকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। কিন্তু নাটকে সেই কথাগুলি বলছেন রূপকের আবরণে, সময়ের ব্যবধান রচনা করে। তবে সে রূপক সহজভেদ্য। তাই ঃ

> ''দর্শক লক্ষ্য করতে থাকেন তাঁর সমকালকে। কুষ্ঠ তখন আর কোনও দেহের ব্যাধি নয়, যেন সমাজেরই ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। লাঠিয়াল আর বাঈজী – প্রতাপের দুই পদ্ধতি যে অন্যরূপে প্রকাশ পায় একালেও, এই বোধ ক্রমে বিপন্ন করে তোলে তার অস্তিত্ব। ... অন্তর্বয়নে ভেসে ওঠে অন্যতর আখ্যান।''[৪৩]

সে আখ্যান চিনিয়ে দেয় আমাদেরই পরিচিত প্রতিবেশকে। রূপকের আবরণ ঘুচে গিয়ে এক বিন্দুতে এসে দাঁড়ায় অতীত আর বর্তমান। শোষণ এবং অত্যাচারের সূত্রে বাঁধা পড়ে সেকাল থেকে একাল ঃ ''বোঝা যায়, প্রাচীন লোককাহিনির আদলে মনোজ মিত্র স্পর্শ করেছেন বর্তমানেরই এক নিষ্ঠুর বাস্তবকে, যার একদিকে আছে সামাজিক দায়বোধ ও আদর্শবোধের অঙ্গীকার, অন্যদিকে ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক রেষারেষিতে সেই অঙ্গীকারের অপমৃত্যু।''[৪৪] ব্যবহৃত মানুষের বিষণ্ন আখ্যানের শেষেও মনোজ মিত্র বললেন ছায়েম আর গঙ্গামণির কথা। দেখালেন ছায়েমরা তাদের মতো করে প্রতিবাদ করে। তালুকদারের ব্যাধির কথা শুনে লুকনো পুঁথি বের না করে দিয়ে হেকিমের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। এই প্রতিবাদ, এই প্রতিশোধ অভিজাত নয় কিন্তু চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মনোজ মিত্র ভরসা রাখেন এই মানুষের ওপরই, ইঙ্গিত দেন, এদের দ্বারাই রক্ষিত হবে 'সুবিদ্যা'।

'আত্মগোপন'(১৯৯৪) নাটকেও ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে সেই ব্যবহৃত মানুষের কথাই বললেন মনোজ মিত্র। ব্যবহারকারী এখানে বাইরের কোনো শক্তি নয়, বরং মানুষেরই ভেতরকার লোভ এবং অপরিমেয় উচ্চাশা। সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে যে সর্বব্যাপী অবক্ষয় বেদনার্ত করেছে মনোজ মিত্রকে,তারই একটি রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন খেলার মাঠকে কেন্দ্র করে। অবাক হয়ে দেখেছেন, গণিকার মতো সবাই হাপসে মরছে 'দর' পাবার জন্য। গোটা সমাজটাই এখানে নাট্যকারের দৃষ্টিতে বেশ্যালয়। কে কত অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হবে, তারই নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা চলছে। দুনিয়াজুড়ে বাজারই যেন একমাত্র সত্য – স্নেহ-মায়া-মমতা, সম্পর্ক ইত্যাদি সবই তুচ্ছ বাজারের কাছে। ভুবনায়নের এই অশুভ দিকটিকে দেখিয়েও মনোজ মিত্র শেষপর্যন্ত পতনোন্মুখ নায়কের দিকে বাড়িয়ে দেন ঘনিষ্ঠজনেদের সহযোগিতার হাত। বাজারের উর্ধ্বে স্থান দেন মানবিক সম্পর্ককে। দশ বছর পর লেখা 'রঙের হাট' (২০০৪) নাটকে বিশ্বজোড়া বাজারেরই আরো বিস্তৃত রূপ ধরা পড়েছে। বিশ্বায়নের ফলে খুচরো ব্যবসাকে যে গিলে খেতে চাইছে বৃহৎ পুঁজি, সেদিকেও আকৃষ্ট হয়েছে মনোজ মিত্রের বিচিত্রগামী দৃষ্টি ঃ ''সত্যি চাচা ! দুনিয়ায় ছোট ব্যবসায়ীর আর ঠাঁই নেই গো! রাঘব বোয়ালেরা সব গিলে খাবে। কিরকম যেন মনে হয়, কারা যেন কোথায় বসে কলকাঠি নাড়ছে , ইচ্ছেমতো তুলছে, ফেলছে, আমাদের সব বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে গো!''[৪৫] এই বৃহৎ পুঁজির দ্বারাই নির্ধারিত হয় বাজারমূল্য। কে কত দামে বিকোচ্ছে তার ওপরই তার মাহাত্ম্য। বাজারসর্বস্ব এই দুনিয়ায় সকলেই নিজের দর যাচাই করছে এবং সর্বোচ্চ দরের মুহূর্তটিকে ধরতে চেষ্টা করছে। আগ্রাসী এই বাজারের বিরুদ্ধে মনোজ মিত্র জারি রাখেন নিজের লড়াই। সে লড়াইয়ে তাঁর অস্ত্র সেই চিরন্তন স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা। যুগ যতই বদলে যাক, সময় যতই ক্ষুব্ধ হোক, মানুষের জীবনে এইসব মৌল বৃত্তিগুলির প্রভাব

কোনোদিন শেষ হয়ে যেতে পারে না বলেই বিশ্বাস করেন তিনি।

সাধারণ মানুষের যে ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে, তাকেই আবার তুলে ধরলেন 'দেবী সর্পমস্তা'(১৯৯৫) এবং 'ছায়ার প্রাসাদ'(১৯৯৭-৯৮) নাটকে। দুটি নাটকই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত। প্রথমটির অবলম্বন কাল্পনিক ইতিহাস এবং দ্বিতীয়টির আশ্রয় ইতিহাসের সম্ভাব্যতা। 'দেবী সর্পমস্তা'য় রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপের বংশ, রাজ্য এবং সিংহাসন রক্ষায় আদিম বনচারী মানুষের ভূমিকা দেখিয়ে মনোজ মিত্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসের চিরন্তন সত্য। এই বন-পাহাড়, এই আদিম মানুষ যুগে যুগে শাসকের 'শক্তির ভাণ্ডার' রূপে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ, ভারতবর্ষের কোনো শাসক কোনোদিন এই মানুষগুলিকে আপন বলে কাছে টেনে নেয় নি, তাদের দু:খ-দুর্দশা মোচনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি। সভ্যতার মূল স্রোতের সঙ্গে এদের যোগ স্থাপিত হয় নি। জমেছে বঞ্চনার পাহাড়। উন্নয়নের নামে যখন একালে আদিবাসী মানুষকে স্ব-ভূমি থেকে উৎখাত হতে হয়, বঞ্চনার কথা বললে জোটে দমন-পীড়ন, তখন মনোজ মিত্রের এই নাটকে ভর পেয়ে যায় সমকাল। নির্মোহ বিশ্লেষণে নাট্যকার দেখিয়ে দেন : ''অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে/দেনা শোধবার ভার আমাদের পরে।''[৪৬]

'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকে শূদ্রদের ওপর উচ্চবর্ণের দীর্ঘদিনের অত্যাচারের পরিচয় আছে। শূদ্রের কোনো কিছুতে কোনো অধিকার নেই :

> ''তুদের বলে কিছু নাই। জল না ভূমি না ঝর্ণা না জোছনা না ... কিছুতে শূদ্দুরের কোনো অধিকার নাই ... ঝপাং করে ঝাঁপাই দিলি ঝর্ণায়! ঘন্টা বাজে নাই কেনে? অচ্ছুৎ অনার্যদের গলায় ঘন্টাগুলো বাঁধা হৈছে কেন? চলতে ফিরতে ঢং ঢং বাজবে, আমরা ছুঁয়া বাঁচাই সরে পড়বো।''[৪৭]

যে শূদ্রাণীকে বাইরে স্পর্শ নিষেধ, সেই শূদ্রাণীকেই ভোগে কোনো নিষেধ নেই। 'শূদ্দুরের মেয়ে'দের আজ নয় তো কাল যেতেই হবে উচ্চবর্ণের প্রভুদের ভোগে। ভোগের তাড়নাতেই কুসংস্কারকে ব্যবহার করে 'অশুভ' বলে দেগে দেওয়া হয় নারীকে। এই কাহিনিকে মনোজ মিত্র স্থাপন করেছেন বিন্দুসারের রাজত্বকালের পটভূমিতে। কিন্তু আজকের 'আধুনিক' ভারতেও বিষয়গুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। এ যেন আসলে বর্তমানকেই দেখা, কিন্তু ইতিহাসের দূরত্বে স্থাপন করে। মনোজ মিত্র দেখেছেন বিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও ভারতে আবার প্রবল হচ্ছে জাত-পাতের সমস্যা, মানুষের বর্ণপরিচয়ই হচ্ছে মুখ্য। শাসকেরা নিজেই কুসংস্কারে আবদ্ধ, সুতরাং সংস্কারমুক্তি সুদূর-পরাহত। ক্ষৌণি যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় বিন্দুসারকে প্রভাবিত করেছে তা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ধর্মীয় প্রভাবকেই মনে করায়। সেই সমকালই চিত্রিত হয়েছে নাটকে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> ''নাটকে উপস্থাপিত নানা বিষয়ে আমাদের সমকালকে আমরা চিনে নিতে পারি – স্বৈরাচার, অপশাসন, গুপ্তচর ও ঘাতকসমেত পুলিশরাজ, রাজনীতির ধর্মীয় নিষ্ক্রণ, দুর্নীতি, কুসংস্কার, জাতপাতের সমস্যা, দলিত জাগরণ, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশে সরকারি বাধা, নারীর অবমাননা, ডাইনি বানিয়ে নির্যাতন ইত্যাদি।''[৪৮]

কিন্তু এখানেও মনোজ মিত্র আস্থা স্থাপন করেছেন দ্বৈপায়নের মতো সাধারণ মানুষের ওপর। তাই রাজার পরিত্যক্ত শিশুকে , প্রিয়দর্শী অশোককে গ্রহণ করতে যান দ্বৈপায়ন ঠাকুর । কিন্তু সুভদ্রাঙ্গী প্রিয়দর্শীকে নিয়ে প্রস্তুত হয় লড়াইয়ের জন্য । মানুষকে 'পিশাচ' বানিয়ে রাষ্ট্রের খেলা সে বন্ধ করবে । অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার উপশমে অশোকের মতো একজন প্রজাকল্যাণকামী শাসকের আবির্ভাব আকাঙ্ক্ষা করেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র ।

'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯) মূলত একজন অদ্ভুত ভাবনার মানুষের গল্প । কিন্তু সেখানেও ভেতরে রয়েছে নতুন সামাজিক বিন্যাসের কথা । শহরে আর জমি নেই, তাই ভানু খেমকার মতো প্রমোটারদের দৃষ্টি পড়েছে গ্রামের দিকে । সেখানে 'ন্যাচারাল বিউটি'র মাঝে পাঁচতারা হোটেল বানিয়ে বার-রেস্তোরাঁ-বোটিং-ক্যাসিনো আর সেইসঙ্গে হনুমানজীর মন্দির তৈরি করতে পারলেই দুরন্ত ব্যবসা। মনোজ মিত্র বলতে চান, ধর্ম এখন পাঁচতারা হোটেলেরও অনুষঙ্গ। যাই করা হোক না কেন, সঙ্গে চাই ধর্ম । রেলের কামরায় ডাকাতি, তাও নাঙ্গাবাবার ছদ্মবেশে । গ্রাম বাংলায় আধুনিকতার এই অশুভ প্রসার মনোজ মিত্র চান না । নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যর্থ করেছেন ভানু খেমকার প্রয়াস, গন্ধকালীকে দিয়ে রূপচাঁদ ওরফে নন্তু হালদারের ফুলবাড়ি গ্রামের বাড়িটাকে রক্ষা করেছেন প্রমোটারের গ্রাস থেকে । সমাজসচেতনতা অত্যন্ত তীব্র বলেই মনোজ মিত্রের এই নাটকে উঠে এসেছে বিশ্ব বাণিজ্যে আমেরিকার খবরদারি, অসহায় শিক্ষকের মূল্যবোধের বিনষ্টি প্রভৃতি সাধারণ সামাজিক সত্য। বেদনার্ত চিত্তে মনোজ মিত্র লক্ষ্য করেছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হয়েছেন পাঁঠা-খাসির সাপ্লায়ার। সেই অবনমনের কথা যখন তিনি নিজে মুখে বলেন তখন কৌতুক আর বিষাদ একাকার হয়ে যায় ঃ

> ''ইয়েস টিচার থেকে বুচার ! টিটকিরি দিয়ো না মা, ডেভলপিং কানট্রি ... আমাদের হ'ল উন্নয়নশীল দেশ ... রিটায়ার্ড মাস্টারের পেনশন আটকে রেখে নিশ্চয়ই দেশের অন্য অন্য উন্নয়নের খাতে লগ্নি করা হচ্ছে । সেটাও খুব জরুরি । কী আছে, এককালে গুড সিটিজেন সাপ্লাই করেছি ... এখন করছি গুড খাসি-পাঁঠা । অল দি সেম।''[৪৯]

'গুড সিটিজেন' আর খাসি-পাঁঠাকে 'অল দি সেম' বলে মনোজ মিত্র তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করেন সেই মানুষগুলির প্রতি, যারা একদা ছাত্র ছিল এবং কর্মক্ষেত্রে যারা শিক্ষকের পেনশন আটকে রাখছে। শিক্ষকদের পেনশন নিয়ে এই দীর্ঘসূত্রিতা সমকালের পশ্চিমবঙ্গের একটি জ্বলন্ত সমস্যা । সেই সমস্যাটিকে এখানে চিহ্নিত করেছেন মনোজ মিত্র। যে আধুনিকতা ক্যাবারে ডান্সের আসর আর ক্যাসিনো বসিয়ে নষ্ট করতে চায় গ্রামের সরলতা ও স্নিগ্ধতা, সেই আধুনিকতার বিরুদ্ধে মনোজ মিত্র লড়াইয়ে নামান গন্ধকালীর মতো চরিত্রদের । নাট্যিক শর্ত রক্ষা করে তাদের জয়ও দেখান । সংরক্ষণের জোরে গ্রামবাংলায় নারীর যে ক্ষমতায়ন ঘটেছে, সেই বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন এই নাটকে।

২০০০ সালে লেখা 'নাকছাবিটা' নাটকে মনোজ মিত্র ধরেছেন পঞ্চাশ বছর আগেকার অর্থাৎ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সমাজকে । একসময় যারা ছিল জমিদার-জোতদার, নতুন

কালে ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার জন্য তাদের উদগ্র বাসনা । কারণ 'পাওয়ার'-এ তারা অভ্যস্ত। নতুন যুগের 'পাওয়ার সেন্টার' মন্ত্রিসভায় ঢুকতে তারা মরিয়া । সেজন্য যে কোনো পথ নিতে প্রস্তুত। তাই মানুষের ভোট দেবার ওপর নির্ভর করে বসে না থেকে তারা 'ভোট করান' । মনোজ মিত্র অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন, জমিদারি রক্ষা করার জন্য ইংরেজ-বিরোধী যে পুত্রকে ত্যজ্য করেছিলেন, নতুন যুগে সেই পুত্রের ইংরেজ-বিরোধিতার গৌরবকে পুঁজি করেই ভোট-বৈতরণী পেরোতে চান বরদাপ্রসন্ন । এই বরদাপ্রসন্নদের স্বরূপ উন্মোচন করেছে মনোজ মিত্রের চরিত্র কাব্যতীর্থ ঃ ''পরাধীন দ্যাশে যারা আছিল স্বাধীনতার বিরোধী অহন তারাই হইছে স্বাধীন দ্যাশের গার্ডিয়ান ।''[৫০] বীরেশ্বর ছিল সহিংস বিপ্লবী । আদর্শকে সে আঁকড়ে থেকেছে । জেল থেকে যখন ছাড়া পেয়েছে তখন তার শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে । বেরিয়ে সে দেখেছে সমাজ অনেক বদলে গেছে । যেসব পুলিশ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, স্বাধীনতার পর তারাও আখের গুছিয়ে নিয়েছে । এই নতুন সমাজে বীরেশ্বরদের অদর্শবাদ অচল । এই আধুনিককালে স্বার্থই মুখ্য । নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি তমালের কাছে তাই বীরেশ্বরের জোটে ভর্ৎসনা ঃ

> ''আশ্চর্য লোক আপনি । কবেকার কোন বিবাদ আজও ধরে বসে আছেন! একটা সামান্য ব্যাপার কচলে কচলে এমন জটিলতা সৃষ্টি করেছেন ... নিজেও ভুগছেন, বাড়ির সবাইকেই ভোগাচ্ছেন ... নুকুকে নেব যদি ... রায়বাহাদুরের হাত থেকেই নেব। জীবনে যেটুকু যা পেয়েছি, ওই মানুষটির কাছ থেকেই । ওঁর স্কলারশিপের টাকায় আমার ডাক্তারি পড়া । ... আমাদের পরিবারের ছেলে কখনো বিদেশ যাবার কথা ভাবতেই পারে না । ... যদি হয়, ওঁর জন্যই হবে , কেরিয়ারটা নষ্ট করতে পারব না।''[৫১]

এই কেরিয়ারসর্বস্ব প্রজন্মের ভাবনা বুঝতে পারে না বীরেশ্বর, বুঝতে পারেন না তার স্রষ্টা মনোজ মিত্রও । আধুনিক সমাজের, আধুনিক প্রজন্মের সময় নেই পুরনোকে আঁকড়ে থাকার। প্রতি মুহূর্তে সেখানে এগিয়ে যাবার লড়াই। সেই লড়াইয়ে আদর্শ নয়, প্রয়োজনের দাবীই প্রধান । কিন্তু নতুন যুগেও মনোজ মিত্রের বীরেশ্বররা থেকে যায় আদর্শকে অবলম্বন করেই। কারণ নতুন ভাবনায় দেশকে, সমাজকে প্রতারণা করতে তারা পারে না । সব কাল এবং সমাজের প্রেক্ষাপটেই মনোজ মিত্র তাদের বাঁচিয়ে রাখেন । সেখান থেকেই নতুন সদর্থক সম্ভাবনার বিকাশ আশা করেন ।

'কুহুযামিনী' (২০০৫) নাটকে মনোজ মিত্র আবার আক্রমণ করেন ধর্মীয় ভণ্ডামিকে। গুঁইবাবা, দাড়িবাবা, মৌনীবাবা, বাঁকাশশী-দেরই উত্তর-মানুষ এলোকেশী, যে কিনা ছিল 'রুটি-তড়কাওয়ালী', আর হয়েছে 'মা বাঁকেশ্বরীর সেবিকা'। তড়কাওয়ালীকে পুলিশ লাঠি মেরে ওঠাতে পারে কিন্তু মন্দিরের পরিচালিকাকে ওঠাবে কি করে ! ধর্মস্থানে হাত দেবার সাধ্য কোনো পুলিশেরই নেই । তাই এলোকেশী নি:শঙ্ক । ব্যঙ্গনিপুণ মনোজ মিত্র এলোকেশীকে দিয়ে বলিয়ে নেন ঃ ''আমার থিয়োরিতে বলে, জাতীয় সড়কের দুধারে মঠমন্দির দরগা মাজার থাকবে থরে থরে সাজানো, তবে না জাতির অগ্রগতি !''[৫২] কেবল ধর্মীয় ভণ্ডামি নয়, রাজনীতিকরা কোনো না কোনোভাবে আলোচিত হতে চান, জনতার নজরে থাকতে চান -

– তা সে পুলিশকে ধমকে হোক বা নিজে জেলে গিয়ে হোক ! রাজনৈতিক নেতাটি কোন দলের তা স্পষ্ট করেন না নাট্যকার, তবে 'সর্বভারতীয় ছাতা'র ইঙ্গিতে কংগ্রেস বলেই মনে হয় । কিন্তু বিশেষ কোনো দল নয়, সাধারণভাবে রাজনীতির শঠতা এবং ব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধেই মনোজ মিত্রের লড়াই । তাই তিনি দেখান, পশ্চিমবঙ্গে বহু-আলোচিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষকে কোনো না কোনোভাবে কিছু পাইয়ে দেবার উপায়। নেপুর ঠাকুমার সংলাপে সেই পাইয়ে দেবার ব্যবস্থার কথাই উল্লেখিত ঃ

> ''আরে শোন না দুদু, পেত্থমে কম্বল চাইলুম, দিলে না ... মৌমাছি চাষের এককালীন চাইলুম, দিলে না ... দুনিয়ার নোককে ইংলিশ বাথনুম বানাবার টাকা দিচ্ছে ... আমার বেলায় বলে, অত মাঠ জংগল পড়ে আছে, যাও বুড়ি বাংলা বাথনুমে যাও ... এবার হাঁসের বেলা আর ছাড়ি । পঞ্চেৎ হয়েছ, টাটকা ভোটটা নিয়েছ, এট্টা কিছু তো দেবে বাছা!''[৫৩]

এই পাইয়ে দেবার ফলেই মানুষ ক্রমশ লোভী হয়েছে, সুযোগসন্ধানী হয়েছে । দেশের মানুষের এই চূড়ান্ত অবনমনকে 'রসিক লাঠিয়াল'-এর মতো আঘাত করেন মনোজ মিত্র ঃ ''ওই শোনো আলুর হিমঘরে সমবেত পল্লীবাসীর মুখে এক প্রশ্ন, হোয়াই নেপুর ঠাকুমা, হোয়াই নট আমি! ভারতবর্ষ জুড়ে আজ এক আওয়াজ হোয়াই আদারস্, হোয়াই নট আমি! সবাই খাচ্ছে, আমি কেন খাব না?''[৫৪] 'পালিয়ে বেড়ায়', 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার', 'কুহুযামিনী','অপারেশন ভোমরাগড়', 'ব্রিজের ওপর বাপি' প্রভৃতি নাটকে সাধারণভাবে সমাজ-রাজনীতির সমালোচনা বহুবার করেছেন মনোজ মিত্র । কিন্তু এসব নাটকে বাস্তব অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন থাকলেও তা থেকে উত্তরণের স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই । কোথাও ব্যক্তিমানুষের বিষাদ বা আনন্দ, কোথাও শুভবোধের জাগরণ, কোথাও বা রূপকথার ধরণে নাটক শেষ করেছেন । সামাজিক সমস্যার পরিবর্তে এসব নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তিমানুষের জীবন । যেমন 'ব্রিজের ওপর বাপি' নাটকে পুলিশ অফিসার বাপি মান্না পড়েছে এক প্রতিকূল সামাজিক অবস্থায় । রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে সে অসহায়, অর্থের কাছে সে পরাজিত । নিজের 'না-মেয়ে-না-ছেলে'র সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে ছাতিম সরকার। রাজনীতিক তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে সে কিছুই করতে পারে না । কারণ পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট শহরটাতে তারকেশ্বরই সর্বেসর্বা । অসহায় বাপিকে শুনতে হয়েছে তারকেশ্বরের সদম্ভ উক্তি ঃ ''আমি অবাক হয়ে দেখছি, আমার শহরে আমার থানার আমার অফিসার আমার কলেজের আমারই অধ্যাপিকার নামে একটা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে আমার ছেলেকে কিভাবে নির্যাতন করছে।''[৫৫] এই সর্বনাশা দলতান্ত্রিকতা সময়কে নষ্ট করে, ভ্রষ্ট করে । সেই নষ্ট সময়ে মানুষ হয়ে যায় ক্লীব – তার কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না । সেই অবস্থাতেই জাগে আত্মহত্যার বাসনা । মনোজ মিত্র শেষ পর্যন্ত বাপিকে জীবনের কাছে ফিরিয়ে আনেন ঠিকই, কিন্তু নষ্ট সময় নিয়ে তাঁর হতাশা তাতে চাপা থাকে না । আসলে এইসময় স্থবির, আত্মসুখসর্বস্ব এক সমাজে মানুষের অবস্থান । কোথাও কোনো আলোড়ন নেই, সব আপাত-শান্ত। কিন্তু যাঁরা সূক্ষ্ম চিন্তার মানুষ, sensative মানুষ – তাঁরা এই সমাজে অসহায় । সেই অসহায়তা ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র, কিন্তু তা থেকে মুক্তির

স্পষ্ট কোনো দিশা এই পর্যায়ে দেখাতে পারেন নি ।

২০০৫ সালে লেখা 'যা নেই ভারতে' নাটকে বরং মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা অনেক তীক্ষ্ন। মহান গ্রন্থ মহাভারতের অকথিত দিকগুলিতে আলো ফেলে তিনি যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যুগপ্রচলিত ধারণার বিপরীত সত্যকে। মহাভরতের মহান ভাবকে তিনি ধ্বস্ত করে দিয়েছেন। নতুন কালের নতুন দৃষ্টিতে পুরাণকে দেখতে গিয়ে ভীষ্মকে আবিষ্কার করেছেন আধুনিক যুগের যুদ্ধবাজ রাজনীতিক হিসেবে। আর চিরনিন্দিত ধৃতরাষ্ট্রকে দেখেছেন শান্তিকামী হিসেবে। ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র এই নাটকে দুই বিপরীত মতাদর্শের প্রতিনিধি — সেই দুই মতাদর্শের দ্বন্দ্বই নাটকের উপজীব্য। কঞ্চুকীর টিপ্পনীর মধ্য দিয়ে ভীষ্মের মহান গাম্ভীর্য খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সাম্রাজ্যলোভী, প্রভুত্বকামী এক মানুষ। কঞ্চুকীর দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছে ত্যাগীর ছদ্মবেশে ভীষ্মের আসল রূপ ঃ "সত্যি বলতে কি, রাজা না হয়েও তুমি যতকাল রাজত্ব করলে, এতটা কিন্তু রাজা হয়েও লোকে করে উঠতে পারত না।"[৫৬] কুরুবংশ চিরকাল হরণ এবং লুণ্ঠন করেছে। ধৃতরাষ্ট্র সেই ধারাটিকে বদলে দিতে চায়। স্বপ্ন দেখে এক শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর — যে পৃথিবীতে যুদ্ধ থাকবে না, বর্ণভেদ থাকবে না। তাই সে চায় না অশ্বমেধ, চায় না পররাজ্যে ঢুকে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যে ভীষ্ম রাজত্বও করেন না, সংসারও করেন না, তিনি অস্ত্রচালনা ছাড়া আর কী পারবেন। তাই তাঁর চাই যুদ্ধের আয়োজন, লুণ্ঠনের আয়োজন। ঐশ্বর্য রক্ষা করতে হবে, সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে — তাই ধৃতরাষ্ট্রের পরিবর্তে যুদ্ধবাজ পান্ডুকে সিংহাসনে বসান ভীষ্ম। এর ফলে রাজত্ব পরিচালনায় তার নিজের মত প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম পান্ডু সিংহাসন ত্যাগ করে স্ত্রী-দের নিয়ে বনবাসে গেলে সিংহাসনে বসতে হয় ধৃতরাষ্ট্রকে। এদিকে পিতার রাজ্য আক্রমণের প্রতিবাদে গান্ধারী নিজের জরায়ু বিনষ্ট করে কুরুবংশকে নির্বংশ করতে চায়। কিন্তু উত্তরাধিকারী তো চাই, লুণ্ঠিত সাম্রাজ্য ভোগ করার লোক চাই। বংশপরম্পরায় ভোগের আয়োজন করা চাই। তাই বনবাসে মৃত পান্ডুর পাঁচ সন্তানরূপে কুরুপুরে গৃহীত হয় পাঁচ বালক। এই বালকেরা সত্যিই পান্ডুর সন্তান কিনা সে সংশয় জাগিয়ে তোলেন মনোজ মিত্র নিপুণ যুক্তিজালে। ধৃতরাষ্ট্র কেড়ে নিচ্ছে পেশিশক্তি ও অস্ত্রশক্তির গৌরব, তাই পঞ্চ পাণ্ডবকে নিয়ে এসে সেই গৌরব পুনরর্জনের চেষ্টা। চরম দ্বন্দ্ব সমাগত। এ দ্বন্দ্ব কেবল সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে নয়, এ দ্বন্দ্ব দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দর্শনের। শকুনির সংলাপে এই দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করেছেন মনোজ মিত্র ঃ "একদিকে দেশব্যাপী অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার ফিরিয়ে আনা আর একদিকে তোমার স্বামীর প্রতিরোধের সঙ্কল্প। শ্যেনপক্ষী আর কবুতরের লড়াই।"[৫৭] ভীষ্ম হলেন যুদ্ধপ্রিয় শ্যেনপক্ষী, ধৃতরাষ্ট্র শান্তির দূত কবুতর। নাট্যকার দেখাতে চান, শান্তির জন্য, যুদ্ধবাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যও অস্ত্র ধরতে হয়। ধৃতরাষ্ট্রকেও তাই বাহিনী গড়তে হয়। সে বাহিনী গড়ে ওঠে রাজবাড়ির সেইসব পাপের ফলদের নিয়ে, যাদের মেরে না ফেলে জঙ্গলে বড় করেছে পাতকিনী, যারা সর্বস্ব হারিয়ে অর্জন করেছে পৈশাচিক শক্তি। ব্যাসের অনুমতিক্রমে গান্ধারী দত্তক নিয়েছে সেই শতপুত্র। তারাই 'সাধু আর যোদ্ধার মিলিত চক্র'কে ধ্বংস করার কাজে ধৃতরাষ্ট্রের সহায়। এই শতপুত্র কুরুবংশেরই সন্তান, কিন্তু কুরুবংশের অধিকার তারা

পায়নি। বঞ্চনাবোধ আর ক্ষোভ থেকেই তারা হয়েছে হিংস্র, বর্বর। ধৃতরাষ্ট্র তাদের আহ্বান জানিয়েছে নিজেদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে। এই নাটকে ভারতকাহিনির মধ্যে মনোজ মিত্র সন্নিবিষ্ট করেছেন আধুনিক ভারতের কাহিনি। দীর্ঘকালব্যাপী বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের জাগরণকে তিনি রূপায়িত করছেন মহাভারতীয় পটভূমিতে। 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকে বলেছিলেন, প্রান্তিক মানুষকে ভারতবর্ষের শাসক কোনদিন আপন করে নেয়নি। এই নাটকেও বললেন সেই বঞ্চনা এবং অনাদরের কথা। খোঁজ নিতে চাইলেন ক্ষোভের পেছনের কারণগুলির। ফলে 'যা নেই ভারতে' হয়ে দাঁড়াল 'যা আছে ভারতে।' সমকালীন ভারতের সেই পরিচয় প্রসঙ্গ বিশিষ্ট সমালোচক লিখেছেন ঃ

> ''আমাদের চেনা পাণ্ডব ও কৌরবদের জায়গায় আমরা দেখি একদিকে যুদ্ধবাজ রাজনীতিবিদদের সম্মিলিত শক্তি, অন্যদিকে অবহেলিত, বঞ্চিত, অপমানিত, প্রান্তিক মানুষদের ঐক্য। আমাদের চেনা মহাভারতে এসব নেই, কিন্তু আমাদের চেনা দেশ ভারতে এ সবই দেখছি আমরা। মনোজ সমকালীন চেতনার আলো ফেলেছেন নাটকের বিশেষ বিশেষ স্তরে। শুধু জাতীয় স্তরেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিও ছায়া ফেলে।''[৫৮]

একাঙ্ক নাটকগুলিতেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনার তীব্রতা প্রকাশিত। ১৯৭৬ সালে লেখা 'চোখে আঙুল দাদা' নাটকে তিনি দেখালেন সমাজের এমন এক ছিদ্রান্বেষীকে, যে কিনা কারো কাজেই ভালো কিছু দেখতে পায়না, সবক্ষেত্রেই খুঁত ধরে। যে মানুষদের কাছে নিজের দেশের কোন কিছুই ভালো নয়, যারা পরের ভুল ধরাটাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলে মনে করে — এই নাটকে তাদের পরিচয় দিয়ে নিজের মতো করে শায়েস্তা করেছেন মনোজ মিত্র। এই নাটক নিয়ে যে রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছিল তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। 'কাকচরিত্র' (১৯৮২) নাটকে সমাজ এবং সেইসঙ্গে পরিবারেও খাঁটি লোকের অভাব মনোজ মিত্রকে পীড়িত করেছে। এই সমাজে প্রত্যেকেই সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র। নায়ক হবার মতো প্রসারতা কারো মধ্যেই নেই। 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার জন্য লেখা 'পাকে বিপাকে' নাটকটিতে তিনি জোতদারের বিরুদ্ধে হাবলা জনার্দনের লড়াই দেখিয়েছেন, কিন্তু সে লড়াই তাত্ত্বিক মতে সংঘটিত হয় নি। জনার্দনের মতো মানুষের পক্ষে যেভাবে লড়াই করা সম্ভব, সেভাবেই সে বাধা দিয়েছে জোতদারকে — বাঁশের খুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে মাচার ওপর জোতদারের গুলিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। মনোজ মিত্র শোষিতের জয় দেখান, কিন্তু তা দেখান এরকম সম্ভাব্য পথে। 'মহাবিদ্যা' (১৯৮৬), 'রাজার পেটে প্রজার পিঠে' (১৯৮৮), 'টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯১), 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' (১৯৯২), 'চমচমকুমার' (২০০২), 'জয়বাবা হনুনাথ' (২০০৪) প্রভৃতি নাটকে সমাজ-রাজনীতির সাধারণ সমালোচনা আছে। 'মহাবিদ্যা' নাটকে যেমন দেখান, সমাজকে — সমাজের সাধারণ মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে উচুঁতলার মানুষরা তাদের দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নেয়। দেশে বৈদেশিক ঋণের ফাঁস চেপে বসেছে, প্রত্যক্ষ কর বসানো সম্ভব নয় প্রজার বিক্ষোভ এবং বিদেশী শক্তির কুনজরে পড়ার ভয়ে, তাই গোপনে ডাকাতি করতে হয়। তদন্ত ব্যবস্থার অসারতার দিকেও কটাক্ষ আছে এই নাটকে। 'টু-ইন-ওয়ান' নাটকে শাসকের মুখ ও মুখোসের কথা বলেছেন, শিক্ষকের বেতন না পাওয়ার কথা

বলে যেমন পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের রাজত্বকালকে কটাক্ষ করেছেন তেমনি শিক্ষকদের টিউটোরিয়াল-প্রীতির কথা বলে নাটককে সমকালের লগ্ন করে দিয়েছেন। হতাশ মনোজ মিত্র এই পর্বে তাঁর চরিত্রর মুখে বলাচ্ছেন যে, খারাপ না বেশি খারাপ — মানুষকে এখন এ দুইয়ের মধ্যে পছন্দ করতে হচ্ছে। 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' নাটকে স্থবির প্রশাসনের প্রতি কটাক্ষ করেছেন, রাষ্ট্র-পরিচালিত স্বাস্থ্য-শিক্ষা-শিল্পের অধোগতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তীব্র ক্রোধে বলিয়েছেন, মন্ত্রিসভা হ'ল চোর-দস্যু-পকেটমারের পুনর্বাসনের স্থান এবং মন্ত্রিত্ব আসলে প্রকাশ্যে চুরি-ডাকাতি-দস্যুতা। পশ্চিমবঙ্গের সব ক্ষেত্রেই যে প্রবল ইউনিয়নবাজি চলছে, তার প্রতিও কটাক্ষ আছে। লক্ষণীয় যে, এইসব নাটকে মনোজ মিত্র বলেছেন সমকালের কথা, কিন্তু তা বলেছেন রাজা-মন্ত্রি-সেনাপতির কাহিনির আড়ালে। রূপক ব্যবহার করেছেন, যদিও সেই রূপক থেকে অন্তর্নিহিত সত্যে পৌঁছতে কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না। আরো লক্ষণীয়, সমস্যার পরিচয় দিলেও তা থেকে উত্তরণের কোন ইঙ্গিত দিতে পারছেন না। কৌতুকের শর নিক্ষেপ করছেন, কিন্তু তা সাধারণীকরণের ফলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে পারছে না। বার্তা খুব স্পষ্ট হচ্ছে না। 'চমচমকুমার' (২০০২) নাটকে বরং প্রত্যক্ষতা অনেক বেশি। ২০০১-এ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্লোগান দিয়েছিলেন 'ডু ইট নাউ', কিন্তু সে স্লোগান কার্যকরী হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্কৃতি ফেরে নি, অফিসটাইমে চেয়ার ফাঁকা থাকার 'ট্র্যাডিশন' ঘোচে নি। মনোজ মিত্র তাই সৃষ্টি করেছেন বাঁদর চমচমকে। অফিস টাইমে চেয়ার ফাঁকা দেখলেই চমচম সেখানে বসে পড়ে আর যার চেয়ারে বসে, পরের বুধবারেই সে মরে যায়। রাজার চেয়ারে বসেছে চমচম, তাই মৃত্যুভয়ে রাজা সিংহাসন ছেড়ে দিতে চান। এই সিংহাসনত্যাগ জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার প্রতীক বলেই মনে হয়। নাটকের শেষে দেখা যাচ্ছে, সিংহাসনে বসছেন লেডিকেনি, তিনি খুবই কাজের লোক। তাঁর ছোঁয়ায় সিংহাসনের পাপ ঘুচে গেছে। ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তের যে প্রবল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে ছিল, এই নাটকে যেন তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'জয়বাবা হনুনাথ' (২০০৪) নাটকে লালকৃষ্ণ আদবানির রথযাত্রার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন মনোজ মিত্র। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ কেন্দ্রের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভারতীয় জনতা পার্টি। 'রামরাজ্য' স্থাপন করতে গিয়ে দেশে তারা হনুমানবাহিনী সৃষ্টি করেছেন বলে মনোজ মিত্র মনে করেছেন। হনুদের হাতেই দেশের শাসনভার। আসলে নিজের নিজের বুদ্ধি এবং মেধা অনুসারে রামায়ণে কেউ দেখে রামচন্দ্রের সত্যপালন, প্রজাপালন — আর কেউ দেখে শুধুই হনুমান। তীব্র ক্ষোভে মনোজ মিত্র পন্ডিতকে দিয়ে বলিযেছেন ঃ "রাজা কেন বনে যাবে, ছিঃ! বনই এসে দাঁড়াবে রাজার দুয়োরে। তার বেশি দেরিও নেই। অচিরেই দেখবে সোঁদরবনের জলজঙ্গল ঢুকে পড়ছে রাজবাড়িতে।"[৫৯] হাসপাতাল থেকে শুরু করে সর্বত্রই চলছে হনুদের দাপাদাপি। নাটক শেষ করেন মনোজ মিত্র অদৃষ্টবাদের কথা বলে ঃ "যা করবে আমারে ... তোলা থাকবে তোমারে।"[৬০] স্পষ্ট কোনো পথ দেখতে না পেয়েই এই অদৃষ্ট-নির্ভরতা। এর পাশাপাশি 'প্রভাত ফিরে এসো' (১৯৮৮) বা 'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩) একাঙ্কগুলিতে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের মধ্যে সরলতা, শুভবোধ, সহমর্মিতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। যে মায়া-মমতা-ভালোবাসাকে তিনি জীবনের আশ্রয় বলে জেনেছেন, চারপাশের সমাজে তার ক্রমিক অবনমন তাকে

ব্যথিত করেছে। ঘোর অন্ধকারে যেন ডুবে আছে চারপাশ, তাই প্রভাতকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এই প্রভাত মানুষের ভেতরকার কালিমাকে ধুয়ে দিয়ে তাকে শুদ্ধ করবে। 'সাহেববাগানের সুন্দরী' (১৯৮৯) নাটকে মনোজ মিত্র তারই সৃষ্ট মদনের মতো সুন্দরের সন্ধানী। চারদিকে যখন বারুদের গন্ধ, যখন বোমা-লাঠির আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে অসংখ্য সুন্দর, তখন কাকের দৃষ্টিতে সুন্দরের রক্ষণ করতে চেয়েছেন তিনি, কিন্তু সে রক্ষণ সম্ভব হয়নি। বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়েছে কাকের বকুলবাসর, মেমসাহেবের মূর্তি। কটু বাষ্পে দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে কাক। সমাজে সুন্দরের সন্ধানী, শুভবোধের সন্ধানীদের এভাবে দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে দেখা কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটকের সাধারণ লক্ষণ নয়, বরং বেশিরভাগ নাটকে সুন্দরের সন্ধান সফল হতেই দেখিয়েছেন তিনি।

সমাজ-সচেতন শিল্পীর পক্ষে কেবল সমাজচিত্র অঙ্কনেই সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয় । নিজের মতো করে তিনি সমাজ-সংকট থেকে মুক্তির পথেরও ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন । মনোজ মিত্র তাঁর প্রথম দিককার নাটকে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের যে সংগ্রাম এবং জয়ের কথা বলেছেন, তা বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ-অনুসারী সংগ্রামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । কিন্তু ক্রমে তাঁর নাটক থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আঁচ কমে আসতে থাকে। সমাজচেতনা তাঁর একইরকম তীক্ষ্ম থেকে যায়, কিন্তু সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির বিশ্লেষণে তিনি নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান গ্রহণ করেন। মানুষের ভেতরকার শক্তির উদ্বোধনের কথা বলেন । কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল বা তার সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছে দায়বদ্ধ নন বলে মনোজ মিত্রের সমাজ-সমালোচনা কাউকে তুষ্ট করা বা কারো মুখ ভার করার দিকে তাকিয়ে করা হয় নি । সাদা চোখে তিনি নিজের চারপাশের জগতে যা দেখেছেন, তাকেই তুলে এনেছেন নিজের সৃষ্টিতে। সামাজিক অসঙ্গতির দিকে নিক্ষেপ করেছেন ব্যঙ্গ বা কৌতুকের শর - সে শর কখন কাকে বিদ্ধ করবে তা ভেবে কলম সংযত করেন নি । তবে কখনো কখনো প্রত্যক্ষ আঘাতের রূঢ়তা এড়াতে তিনি ব্যবহার করেছেন রূপকের আঙ্গিক কিংবা ফ্যান্টাসির আবহ । দেব-দেবী, পশু-পাখি প্রভৃতি চরিত্রকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে কিংবা নিজের কালকে ইতিহাসের দূরত্বে স্থাপন করে দেখেছেন। রূপকের আড়াল, প্রতীকের দুরূহতা বা ইতিহাসের দূরত্বকে অতিক্রম করতে সেখানে পাঠক-দর্শককে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না, সহজেই চিনে নেওয়া যায় নিজেদের পারিপার্শ্বিককে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবেই সমাজ-বিশ্লেষণী সূত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তাঁর নাটক । আজও তিনি সমানভাবে interact করে চলেছেন নিজের চারপাশের সমাজের সঙ্গে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) অলীক সুনাট্য রঙ্গে - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - মনোজ মিত্র - সৃষ্টি প্রকাশন - কোলকাতা-০৯, বইমেলা, ২০০১, পৃ.৩২

২) ঐ, পৃ.৩৩

৩) মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগৎ - বিষ্ণু বসু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-অগ্রহায়ণ ১৪০১-এর ভূমিকা

৪) এ এক অনন্য অভিযাত্রা – অশোক মুখোপাধ্যায় – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০-এর ভূমিকা

৫) নাট্যকার মনোজ মিত্র – পবিত্র সরকার – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩-এর ভূমিকা

৬) ঐ

৭) কাল বিহঙ্গ – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪১০

৮) অশ্বত্থামা – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৬১

৯) ঐ, পৃ.৭৭

১০) শিবের অসাধ্যি – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১৯

১১) আমি মদন বলছি – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৫১

১২) Frontier - December 24, 1977

১৩) সাজানো বাগান - অশোক মুখোপাধ্যায়, বারোমাস, জুলাই ১৯৭৮

১৪) সাজানো বাগান – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১

১৫) ঐ, পৃ.৩৮

১৬) ৭৭-এর সমবেত শিল্প ঃ জগন্নাথ-দানসাগর-সাজানো বাগান – নৃপেন্দ্র সাহা – গ্রুপ থিয়েটার, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মে-জুলাই ১৯৭৮

১৭) সাজানো বাগান – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৯

১৮) মেষ ও রাক্ষস – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৬৩

১৯) ঐ, পৃ.৬৬

২০) ঐ, পৃ.৯৪

২১) সুন্দরম্ প্রযোজিত 'মেষ ও রাক্ষস' – নাটমঞ্চ – দর্পণ – ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর ১৯৮০

২২) সুন্দরম্-এর মেষ ও রাক্ষস – শ.র.চ. – আনন্দলোক, ২৫ এপ্রিল ১৯৮১

২৩) মেষ ও রাক্ষস – রানা দাস – দেশ, ২৫ এপ্রিল ১৯৮১

২৪) রাজদর্শন – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১২৮

২৫) 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটিরামায়ণ' সংকলনের মুখবন্ধ – রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় – অপেরা – ৬৫ সূর্যসেন স্ট্রীট, কোলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১২, পৃ.৮

২৬) ঐ

২৭) থিয়েটার যদি পণ্যের চেহারা নেয় তাতে ক্ষতিটা কী ঃ মনোজ মিত্র – শৈবাল বিশ্বাসকে দেওয়া মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎ কার - প্রতিদিন - ৮ অক্টোবর ১৯৯২

২৮) 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটিরামায়ণ' সংকলনের মুখবন্ধ – রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ.৭

২৯) কেনারাম বেচারাম – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.১৫১

৩০) বিপর্যয়েও মানবিকতা – নিত্যপ্রিয় ঘোষ – আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ১৯৯০

৩১) চিরন্তন মাতৃত্বের সঞ্জীবনী ঃ অলকানন্দার পুত্রকন্যা – তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – সিনে অ্যাডভান্স, ০৪.০৫.১৯৯০

৩২) বিপর্যয়েও মানবিকতা – নিত্যপ্রিয় ঘোষ – আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ১৯৯০

৩৩) কিছু লোক কিছু নাটক – মনোজ মিত্র – বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ পৃ. ১৪

৩৪) পুটিরামায়ণ – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৩০৯

৩৫) ঐ, পৃ.৩০৭

৩৬) সুন্দরম্-এর শোভাযাত্রা ঃ ব্যক্তি থেকে সমষ্টি চেতনার নাটক – রানা দাস – ওভারল্যান্ড, ২৬ মার্চ ১৯৯৩

৩৭) ঐ

৩৮) শূন্য রথে বসে আছি ঃ শোভাযাত্রা – সমরেশ মজুমদার – দেশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

৩৯) সুন্দরমের 'শোভাযাত্রা' – নৃপেন্দ্র সাহা – গণশক্তি – ১১.০২.১৯৯২

৪০) শোভাযাত্রা – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২,পৃ. পৃ.২৫

৪১) সুন্দরমের 'শোভাযাত্রা' ঃ সীমা জয়ের নাটক – রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় – পশ্চিমবঙ্গ – ২৫বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ৩১.০১.১৯৯২

৪২) তৃণমূল স্তরের নাটক 'গল্প হেকিমসাহেব' – নির্মল ধর – প্রতিদিন, ১৫.০১.১৯৯৫

৪৩) আখ্যানবয়নের বৈশিষ্ট্যে অন্য মাত্রা – স্বপন মজুমদার

৪৪) বিষয়ে অভিনব, অভিনয়েও দুর্দান্ত – দিব্যেন্দু পালিত – আনন্দবাজার, ২৭.০৫.১৯৯৪

৪৫) রঙের হাট – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.১৩০

৪৬) উটপাখি – সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৪৭) ছায়ার প্রাসাদ – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১১২

৪৮) মনোজ মিত্রের অসামান্য অভিনয় – মনসিজ মজুমদার – আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ জুলাই ১৯৯৯

৪৯) পালিয়ে বেড়ায় – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৭৫

৫০) নাকছাবিটা – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৭

৫১) ঐ, পৃ.৪২

৫২) কুহুযামিনী – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.৬৩

৫৩) ঐ, পৃ.৬৭

৫৪) ঐ, পৃ.৭৫

৫৫) ব্রিজের ওপর বাপি – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.২১৫

৫৬) যা নেই ভারতে – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.১৯

৫৭) ঐ, পৃ.৪১

৫৮) যা নেই ভারতে – দীপেন্দু চক্রবর্তী – দেশ

৫৯) জয়বাবা হনুনাথ – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.৩৭৭

৬০) ঐ, পৃ.৩৮২

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাট্যকার মনোজ মিত্রের শিল্পবোধ

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাট্যকার মনোজ মিত্রের শিল্পবোধ

নিতান্ত থিয়েটারি প্রয়োজনে এক বিনিদ্র রাতের ফসল হিসেবে 'মৃত্যুর চোখে জল' লিখে ফেলার পর মনোজ মিত্র যখন ঠিক করলেন, নাটককেই নিজের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবেন তখন তিনি আবিষ্কার করলেন, বাংলা নাটকের যেটা সবচেয়ে জোরের জায়গা, অর্থাৎ প্রতিবাদী বক্তব্য - সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে দুর্বলতার কারণ। বক্তব্যের ওপর অতিরিক্ত জোর দিতে গিয়ে শিল্পরূপ উপেক্ষিত হয়েছে। মানুষকে কেবল শ্রেণিপরিচয়ে দেখতে গিয়ে ব্যক্তিমানুষের সমস্যা-সংকট সেভাবে গুরুত্ব পায় নি। অথচ সমাজ ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছিল। দর্শকের রুচি এবং চেতনায় পরিবর্তন আসছিল। গণনাট্য আন্দোলন বা গণনাট্য সংঘ যে এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে নি, তা দু:খজনক হ'লেও সত্য। অথচ প্রাথমিকভাবে সংঘের লক্ষ্য ছিল বক্তব্যকে শিল্পিতরূপে উপস্থাপিত করে মানুষের মনোরঞ্জনের মধ্য দিয়ে চেতনার জাগরণ। মাও-সে-তুঙ তাঁর ইয়েনান বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ

> ''আমরা দাবি করি শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির ঐক্য; আমরা চাই বিষয়বস্তু ও রাজনীতির সমন্বয় – যথাসম্ভব উচ্চস্তরের শিল্পগুণের সঙ্গে বিপ্লবী রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর পূর্ণ সমন্বয়। বিষয়বস্তু রাজনীতির দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শিল্পমূল্যের বিচারে উত্তীর্ণ না হলে তা ব্যর্থ হবে।''[১]

কিন্তু প্রথম কয়েক বছরের পর থেকেই সংঘনাটকে 'রূপের দৈন্য'প্রকট হয়ে উঠল। কেবল প্রতিবাদ, আক্রমণ এবং শত্রুনাশ করতে গিয়ে কলাকৈবল্যবাদের বিপরীতে বাংলা নাটক হয়ে পড়ল 'বক্তব্যকৈবল্যবাদী'। এই অপূর্ণতার জায়গা থেকেই প্রকৃতপক্ষে নবনাট্য বা সৎনাট্যধারার উদ্ভব। বিশিষ্ট গণনাট্যকর্মী শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় এই বিষয়টির স্বীকৃতি আছে ঃ

> ''প্রথম দিকের কয়েক বছর পর থেকেই গণনাট্য সংঘে সৃজনশীল প্রতিভার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। ক্রমে গণনাট্য সংঘের অধিকাংশ অনুষ্ঠান রূপরীতিহীন বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে থাকে। গণনাট্যের এই অবনতির যুগে তথাকথিত নবনাট্য এবং সৎনাট্য কর্মীরা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারী হলেও এই সমস্ত নাট্যসংস্থার প্রযোজনাসমূহে সুগভীর চিন্তা ও পরিশ্রমের স্পষ্ট ছাপ আছে। স্বাভাবিকভাবেই উন্নততর প্রযোজনা অধিকতর দর্শক আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে।''[২]

মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন 'যথেচ্ছাচারী' হয়েছেন, তেমনি শিল্পরূপের দিকেও অত্যন্ত সচেতন থেকেছেন। তাই বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণিপরিচয় মনে রেখেও যেমন তিনি 'ব্যক্তিমানুষের অন্তর্লোকের আলোছায়া'কে অস্বীকার করেন নি, তেমনি অধিকতর দর্শকের কাছে নাটককে আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করে তুলতে উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। কারণ, যে কোনো বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সবার আগে প্রয়োজন সেই বক্তব্য প্রকাশের আধারটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা। এই কাজে মনোজ মিত্র সিদ্ধহস্ত। শিল্পরূপের দিক থেকে তাঁর প্রায় সব নাটকই সাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করেছে। এই সাফল্যকে অভিনন্দিত করেছেন ড. পবিত্র সরকার ঃ

''বক্তব্য তাঁর অন্যান্য সব নাটকেই অতিশয় জীবনধর্মী ও 'প্রগতিশীল', কিন্তু মনোজ এমন এক নাট্যকার হয়ে উঠেছেন শেষ পর্যন্ত যাঁর নাটকে বক্তব্য ভার হয়ে থাকে না। বক্তব্যের ওই ভারকে তিনি শাণিত কৌতুকময় অসামান্য সংলাপে, নাট্যঘটনার বিচিত্র বিন্যাসে, প্যারডি ও ক্যারিকেচারের প্রয়োগে, উদ্ভট সিটুয়েশন ও চরিত্র কল্পনায় সে বক্তব্য এমনই মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে যে, বক্তব্য সহজ উজ্জ্বলতায় দর্শকের মনের মধ্যে ঢুকে যায়, দর্শক তাতে আদৌ কোনো পীড়া বা শিক্ষাদানের বা অভিভাবকত্বের চাপ অনুভব করে না।''[৩]

লক্ষণীয় যে , নাট্যকারের এই শিল্পবোধ কিন্তু কোনোভাবেই বক্তব্যকে তরল করে না। যে লক্ষ্যে আঘাত করার, তা করে অভ্রান্তভাবেই।

এই অধ্যায়ে আমরা নাট্যকার মনোজ মিত্রের নাটকগুলি অবলম্বনে তাঁর শিল্পবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আলোচনাকে সুসংহত করতে আমরা অধ্যায়টিকে নিম্নোক্তরূপ উপ-শিরোনামে বিভক্ত করেছি ঃ

ক) প্লট নির্মাণ

খ) চরিত্র সৃজন

গ) সংলাপ রচনা

ঘ) সংগীত ব্যবহার

ঙ) রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) ইয়েনান বক্তৃতা - মাও-সে-তুঙ - 'প্রসঙ্গ গণনাট্য ঃ শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে উৎকলিত - গণমন প্রকাশন - কলকাতা-৫০ - তৃতীয় সংস্করণ -ডিসেম্বর ২০০০,পৃ.২৪

২) নবপর্যায়ে গণনাট্য আন্দোলন ঃ একটি সমীক্ষা - শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় - ঐ, পৃ.২৩-২৪

৩) নাট্যকার মনোজ মিত্র -পবিত্র সরকার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩ - এর ভূমিকা, পৃ.[৪]

প্লট নির্মাণ

কার্যকারণ সূত্রে অন্বিত ঘটনাবলীকে যথাযথারূপে বিন্যস্ত করাই হ'ল প্লট।Theodore Hatlen বলেছেন ঃ "It is the ordered arrangement of the parts, which are causally and logically related." [১] অ্যারিস্টটল প্লটকেই নাটকের (ট্রাজেডির) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন। ট্রাজেডিকে তিনি ক্রিয়ার অনুকরণ বলেছেন এবং সেই ক্রিয়ার বিন্যাসকেই প্লট বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ঃ

> "সেই ক্রিয়াটি হবে একক এবং সমগ্র, তার অন্যান্য অংশগুলি এমনভাবে সাজানো হবে যে, তাদের একটিকেও যদি পরিবর্তিত করা হয়, বা পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে সমস্ত কাহিনীটিই হবে বিচ্যুত ও বিধ্বস্ত, কারণ যদি কোন ঘটনার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করে, তাহলে বুঝতে হবে তা কাহিনীর সমগ্রতার যথার্থ অঙ্গ নয়।"[২]

অ্যারিস্টটল সরল ও জটিল - দু'ধরণের প্লটের কথা বলেছিলেন। তবে উভয়ক্ষেত্রেই ক্রিয়াকে হতে হবে একক এবং অবিচ্ছিন্ন। উপকাহিনিযুক্ত প্লটে যদি উপকাহিনিগুলির মধ্যে কোনো সম্ভাব্য বা অনিবার্য যোগসূত্র না থাকে, তবে সেই প্লটকে নিকৃষ্ট বলে মনে করেছিলেন তিনি। আদি-মধ্য -অন্ত্যযুক্ত একটি সমগ্র কাহিনিই তাঁর বিবেচনায় সার্থক প্লট। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে মূল প্লটকে বলা হয়েছে 'আধিকারিক' এবং মূল ঘটনাপ্রবাহের বাইরে অথচ কোনো-না-কোনোভবে সম্পর্কিত কাহিনিবিন্যাসকে বলা হয়েছে 'প্রাসঙ্গিক'। আধুনিক নাটকে প্লট গড়ে তোলা হয় নায়ক চরিত্রের সঙ্গে খলনায়ক বা পরিবেশ, প্রকৃতি, নিয়তি প্রভৃতি দুর্জ্ঞেয় শক্তির দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করে, কিংবা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ঘিরে। সমালোচকের মতে, আধুনিক নাটকের বিষয় আসলে ক্ষমতা, সম্পদ, নিরাপত্তা, স্বীকৃতি প্রভৃতি লাভের জন্য নায়কের লড়াই। যেসব ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়া এই লড়াইকে মূর্ত করে তোলে, তাদের যথাযথ বিন্যাসই তাই এযুগের নাটকের প্লট। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

> "The playwright selects and arranges a series of events showing the protagonist's stirvings, and the effects upon him and the other characters in a series of actions and reactions. Such a series of related events constitute the plot."[৩]

অ্যারিস্টটল প্লটকে ট্রাজেডির 'আত্মা' বলেছিলেন। আধুনিককালে প্লটের চেয়ে চরিত্র বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলেও তিনি কিন্তু প্লটকেই কেবল চরিত্র বিকাশের অবলম্বন হিসেবে দেখতে চাননি। প্লটের গুরুত্ব সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ভাবনাকে প্রাঞ্জল করেছেন অনুবাদক শিশিরকুমার দাস ঃ

> "কাহিনী পূর্ণতা পাচ্ছে চরিত্র, অভিপ্রায় এবং ভাষার মধ্যে দিয়ে, সব মিলিয়ে যা গড়ে উঠেছে তাই কাহিনী, কাহিনীই একটা বিশেষ ক্রিয়ার অনুকরণ, কাহিনীর মধ্যেই সেই ক্রিয়াকে দেখছি, চরিত্র সেই ক্রিয়ার সংঘটক, গ্রাহক, আর চরিত্র সেই ক্রিয়ার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, বিবর্তিত — আর সেই সমস্ত সংঘটন, সমস্ত বিবর্তনকে ধরে আছে কাহিনী। তাই কাহিনী এত গুরুত্বপূর্ণ।"[৪]

অ্যারিস্টটল মনে করেছিলেন, মানুষের ক্রিয়ার জন্যই মানুষ সুখী অথবা অসুখী। অভিনেতারা

সেই ক্রিয়াকে ব্যক্ত করার জন্যই চরিত্র ব্যবহার করেন। তাঁর বিবেচনায় তাই, ট্রাজেডির লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত ক্রিয়া এবং যে কোনো জিনিসের শেষটাই হ'ল চরম গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিককালেও যে প্লটের গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় একালের সমালোচকের উক্তিতে ঃ

> "The plot is devised to produce a cumulative effect; it is plot which gives the play its tension and emotional momentum. In addition, the plot provides the explanation and meaning of the sum total of the parts." [৫]

অতি-আধুকিকালে নাটকের বিভিন্ন ফর্ম-এ প্লটকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা গেলেও এর মূল গুরুত্ব আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কারণ আজও যে কোনো নাটকে আমরা প্রধানত একটি সুসজ্জিত কাহিনী-কাঠামোরই সন্ধান করি।

প্রাচীন গ্রীক নাটকে একটিই দৃঢ়পিনদ্ধ সরলগঠন প্লট থাকতো। সাব-প্লটকে অ্যারিস্টটল স্বীকার করেন নি। মেডিয়াভেল নাটকের প্লট ছিল একাধিক এপিসোডের সমন্বয়ে গঠিত, যে এপিসোডগুলি কোনো একটি সাধারণ থিমের সূত্রে একত্র আবদ্ধ থাকত। এলিজাবেথীয় যুগে প্লট ক্রমশ জটিল হয়েছে। শেক্সপীয়র ও তাঁর অনুগামীদের নাটকে মূল প্লটের পাশাপাশি একাধিক সাব-প্লট বা আন্ডার-প্লট স্থান পেয়েছে। আধুনিক কালের নাটকের প্লটে একই সঙ্গে এসেছ জটিলতা এবং বৈচিত্র্য। একালের নাট্যকারদের প্লট সংগ্রহ সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত ঃ

> "The modern dramatist generally tries to take a plot from his own head or from some not very well-known episode in history; or, as an alternative, he may show his originality by taking a very old well- known plot, such as a Greek myth or a well-known historical episode and so handling it as to throw a new light upon it." [৬]

অনেকে বলতে চান যে, পৃথিবীতে সম্ভাব্য প্লট কয়েকটিই মাত্র, এবং নাট্যকারেরা সেগুলিকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করে থাকেন। এরকম কিছু প্লট হল ঃ "mistaken jealousy, rivalry in love, love versus duty, rivalry for power, honour versus profit, love surmounting family opposition, mistaken identity, lost heirs and so on." [৭] সাধারণভাবে প্লটের এই স্বল্পতা সত্য হলেও এরই মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভব, কারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং জীবন যাপনে মানুষ পৃথক। এই সম্ভাবনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে সমালোচকের ব্যাখ্যায় ঃ

> "fortunately for the dramatist, though the mumber of basic human conflicts is rather small, all human beings are different and live in different ways, so that the possible variety of the details of situation is infinite." [৮]

বিশ শতকে বের্টোল্ট ব্রেখট যে এপিক থিয়েটারের কথা বললেন, সেখানে প্লট-সম্পর্কিত নতুন ধারণার কথা পাওয়া গেল। এপিক থিয়েটারের মূল কথা হল অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি করা। অ্যারিস্টটলীয় নাটকে প্লটের লক্ষ্য ছিল পাঠক দর্শকের সঙ্গে একাত্মতা বা 'এমপ্যাথি' সৃষ্টি। কিন্তু এপিক থিয়েটারে প্লট দর্শকের বোধবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করে তাকে বিচারে প্রবৃত্ত করতে চাইল। ফলে অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের দূরত্ব তৈরির কথা বলা হ'ল। এই দূরত্ব সৃষ্টির জন্য

মহাকাব্য, উপকথা, পুরাণ, পাঁচালি প্রভৃতির ধরণ গৃহীত হ'ল। কারণ এগুলিতে ঘটনা থেকে উপভোক্তার একটা দূরত্ব থাকে। সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> "এপিকে কখনই কবি বলেন না আমি অর্জুন বা রাম, তিনি বলেন অর্জুন মহাত্মা। ... শ্রোতা বা দর্শক অর্জুন বা রামকে দেখেন এক বিরাট পটভূমিকায়। তাঁরা কখনই অর্জুন বা রামের সঙ্গে একাত্ম হন না। কিন্তু অর্জুনের বীরত্বে রোমাঞ্চিত বা শোকে মুহ্যমান হন।"[৯]

ব্রেখট এও বিশ্বাস করতেন যে, "শিল্পকে বিশেষভাবে থিয়েটারকে অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে, কিন্তু সে থিয়েটারের মূল লক্ষ্য হবে এনটারটেইনমেন্ট বা প্রমোদ।"[১০] মার্কসবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী ব্রেখট নাটক লিখেছেন প্রধানত শ্রমজীবী মানুষের জন্য । এই শ্রেণির মানুষের শিক্ষা এবং মনোরঞ্জন — দুয়ের জন্যই উপকথা, রূপকথা, প্যারাবল বা এপিকের সরল ভঙ্গির ব্যবহার বিশেষ কার্যকরী হতে পারে বলে তিনি এই ভঙ্গিগুলি প্লট নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির আরেকটি উপায় হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছেন আঙ্গিকগত চমক সৃষ্টিকে। গানের ব্যবহার, হাসি-মজা-হুল্লোড় প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি নাটকে চমক সৃষ্টি করেছেন। পাঠক-দর্শককে সচতন করে তুলে তাঁদের যুক্তিবোধের কাছে আবেদন রাখতে চেয়েছেন, তাঁদের অন্যায়ের প্রতিকারে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এই কাজে প্লটে কোরাস ও ভাষ্যকারের ব্যবহার, স্থির চিত্র, বিভিন্ন দৃশ্যের শিরোনাম, পরিসংখ্যান প্রভৃতির ব্যবহার তাঁর সহায়ক।

অতি-আধুনিক কালে নাট্যকারেরা প্লট গ্রন্থনে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন। দৃঢ়পিনদ্ধ বা শিথিল, সরল বা জটিল, এপিসোডিক বা কোনো একটি চরিত্রকে ধরে গল্প সাজানো — প্রভৃতি নানা রকমের প্লট একালের নাটকে লক্ষণীয়। প্রকৃতিবাদী নাট্যকারেরা যেমন জীবনের খন্ডচিত্র আঁকতে গিয়ে প্লটের সৌষম্য বর্জন করতে চেয়েছেন, তেমনি আবার 'উদ্ভট নাটক' বা 'মহা কাব্যিক' নাটকের মতো কোন কোন ফর্মে প্রথাবদ্ধ প্লটকে সামান্যই মান্যতা দেওযা হয়েছে। নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছে একালের নাটকের প্লট। প্লটে ত্রয়ী ঐক্যের উপস্থিতির কথা অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই চলে আসছে — ক্রিয়াগত ঐক্য, কালগত ঐক্য এবং স্থানগত ঐক্য। এর মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঐক্যের ধারণা আধুনিক নাটকে সেভাবে আর রক্ষিত না হলেও ক্রিয়াগত ঐক্য আজও সমান প্রাসঙ্গিক। ক্রিয়ার মধ্যে যে ঐক্যের সমগ্রতার কথা বলেছিলেন তিনি, একালের নাটকে তা রক্ষিত না হ'লে আমরা প্লটকে শিথিল বলে চিহ্নিত করি। কালগত ঐক্যের ক্ষেত্রে যে এক সূর্যাবর্তন-এর কথা বলা হয়েছিল, একালে তা অক্ষরে অক্ষরে মান্য না করা হ'লেও নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য অবশ্যই রক্ষা করতে হয়। কারণ, অভিনয়ের সময়সীমা নাট্যকারকে মনে রাখতে হয়। তাছাড়া নাট্যবর্ণিত কালসীমা নির্দিষ্ট না হলে অভিনেতাদের বয়ঃক্রম রক্ষা করাও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। স্থানগত ঐক্যের কথা অ্যারিস্টটল নিজে না বললেও পবর্তীকালে কাব্যতত্ত্ব-এর ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গটি এসেছে। এর অর্থ হ'ল, নাটকে এমন কোনো স্থানের বর্ণনা থাকবে না, যেখানে নাট্য-বর্ণিত ঘটনাকালের মধ্যে একবার গিয়ে আবার ফেরৎ আসা যাবে না। আধুনিককালে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে যাবার ফলে এই বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেও অতিরিক্ত এবং অপ্রাসঙ্গিক স্থানিক বিস্তৃতি যে প্লটের সৌষম্যে ব্যাঘাত ঘটায় তা অনস্বীকার্য।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় নাট্যশাস্ত্রেই নাটকের প্লটের পাঁচটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। প্রাচ্য নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা আচার্য ভরত পূর্ণাঙ্গ নাটকের দৈর্ঘ্য পাঁচ থেকে দশ অঙ্কের মধ্যে হবে বললেও প্লটের যে পঞ্চসন্ধি তিনি পরিকল্পনা করেছেন তা পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্যের পঞ্চাঙ্ক বিভাগের মতোই। এই পঞ্চসন্ধি হল – মুখ (উন্মেষ), প্রতিমুখ (উন্নয়ন), গর্ভ (সর্বোন্নয়ন), বিমর্শ (অবনয়ন) ও নির্বহণ (উপসংহার)। প্রায় একইভাবে প্লটের পর্যায় বিভাজন করেছেন উনিশ শতকের জার্মান সমালোচক গুস্তাভ ফ্রেতাগ। নাটকের গঠনকে পিরামিডের সঙ্গে উপমিত করেছেন তিনি। তাঁর পরিকল্পিত বিভাগগুলি হল – Exposition বা Introduction (সূচনা), Complication and Development (জটিলতা ও প্রবাহ), Climax (চরম বিন্দু), Falling Action (অবরোহণ) এবং Resolution বা Catastrophe (সমাপ্তি)। 'সূচনা' বা 'উন্মেষ' অংশে মূল চরিত্রসমূহ, আখ্যান, সংঘাতের ক্ষেত্র প্রভৃতির সঙ্গে পাঠক-দর্শকের পরিচয় করান নাট্যকার। 'জটিলতা' বা 'উন্নয়ন' অংশে প্রথম পর্বের ইঙ্গিত বা সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হ'তে হ'তে নাট্যঘটনা চরম বিন্দুর দিকে যাত্রা করে। 'চরম বিন্দু' বা 'সর্বোন্নয়ন'-এ নাট্যঘটনা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে। এখানে নাট্যোৎকণ্ঠা সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করে, নাট্যচমক লক্ষিত হয়। এরপর 'অবনয়ন' বা 'অবরোহণ'-এ কাহিনির নিম্নগতি অর্থাৎ জটিলতা মোচন। 'উপসংহার' বা 'সমাপ্তি' অংশে পূর্ববর্তী চারটি ধাপের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে নাট্যকারের ঈপ্সিত সমাপ্তিতে পৌঁছনো। আধুনিক কালে সব নাটক যে এই পঞ্চাঙ্ক বিভাগ বা পিরামিড গঠন হুবহু মেনে চলে এমন নয়। নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী নাট্যকারেরা প্লটে বহু বৈচিত্র্য এনে থাকেন। অঙ্ক-দৃশ্য বিভাজনেও একালে অনেক স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন নাট্যকারেরা। একালের নাটকের চরম বিন্দু যে সবসময় নাটকের মাঝামাঝি সময়েই আসে এমন নয়। বলা যেতে পারে যে, আধুনিক নাটক ক্রমশ প্রথাগত প্লট-ধারণার অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্তি নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্লটের যে মৌলিক ধারণা, অর্থাৎ পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত ঘটনাবলীর কার্যকারণ সূত্রে গ্রন্থন – তা আজও যে কোনো নাটকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

মনোজ মিত্র তাঁর অনেক নাটকের প্লট নির্মাণে যেমন দৃঢ়ভাবে ঐতিহ্যানুসারী, তেমনি তাঁর অনেক নাটকের প্লট ছাঁচ-ভাঙা। আদি-মধ্য-অন্ত্য-সমন্বিত অ্যারিস্টটলীয় প্লট যেমন তিনি ব্যবহার করেছেন, তেমনি দেশীয় কথকতার ভঙ্গিটিও তাঁর একাধিক নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রেখটীয় প্লটের ধরণে তাঁর নাটকে অনেক সময় নাচ-গান-মজা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ব্রেখটের অ্যালিয়েনেশন তিনি মাত্র দু'একটি নাটকেই ব্যবহার করেছেন। এপিক নাটকের ভঙ্গিগত চমক রক্ষিত হয়েছে অনেকগুলি নাটকে। কোরাসের পরিবর্তে সূত্রধরের উপস্থিতি, খন্ডদৃশ্যের শিরোনাম প্রভৃতিও ব্রেখটীয় ধরণকেই মনে করায়। তবে এই ধরণ যে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যেও ছিল, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন মনোজ মিত্র তাঁর নাটকের প্লট রচনার বিশিষ্টতায়। ঐতিহ্যকে তিনি চেনেন বলেই প্লট রচনায় ব্যবহার করেন সংস্কৃত নাটকের মতো 'প্রস্তাবনা' বা 'উপসংহার'। অর্থাৎ বিষয়ের মতো প্লট নির্মাণেও মনোজ মিত্রের লেখনী বৈচিত্রগামী। তাঁর নাটকের প্লট নির্মাণকে কয়েকটি সাধারণ ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

ক. দেশীয় ঐতিহ্য-অনুসারী কথকতার ভঙ্গি

খ. সরাসরি উপস্থাপনা (অ্যারিস্টটলীয় প্লট)

গ. এপিক, রূপক, প্যারাবলের ধরণ

ঘ. প্যারালাল প্লট/ সাব-প্লট

ঙ. জীবনকে ছড়িয়ে দেখা

চ. একটি চরিত্রকে ঘিরে গল্প সাজানো

ছ. প্লটে মনুষ্যেতর চরিত্রের ব্যবহার

'মেষ ও রাক্ষস', 'কিনু কাহারের থেটার','পুঁটি রামায়ণ','দর্পণে শরৎশশী','গল্প হেকিমসাহেব' 'দেবী সর্পমস্তা', 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' প্রভৃতি নাটকে মনোজ মিত্র ব্যবহার করেছেন দেশীয় গল্পকথনের ভঙ্গি।সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে 'প্রস্তাবনা' ও 'উপসংহার' রয়েছে 'মেষ ও রাক্ষস' এবং 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে। প্রথমটিতে প্রস্তাবনায় নটী এবং মঞ্চাধ্যক্ষ মূল নাট্য বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে।গান ও নাচের মাধ্যমে যেভাবে নটী নাটকের মধ্যে প্রবেশে পাঠক-দর্শককে সাহায্য করেছে তা দেশজ লোকাভিনয়ের আঙ্গিককেই স্মরণ করায়। রূপকের যে আবরণ আছে নাটকটিতে তা যে রূপকই — ভেতরের অভিপ্রায়টি যে ভিন্ন, তা স্পষ্ট হয়েছে নটী ও মঞ্চাধ্যক্ষের কথোপকথনে। নাট্যকারের ঈপ্সিত শ্লেষ ব্যক্ত হয়েছে নটীর গানে ঃ

"মানুষ কত ভেড়া হয়, চেয়ে দ্যাখো না।
লোভে ভেড়া, ভয়ে ভেড়া, ভেড়া অভাবে
ঘরে সিংহ বাইরে ভেড়া, ভেড়া স্বভাবে
লোকে তাদের ধরতে পারে না।
বুদ্ধি লোপে হয় ভেড়া, ভেড়া থাকে বশে
ওপরআলা চাপ দিয়ে কত ভেড়া পোষে
লোকে তাদের ভেড়া বলে না!"[১১]

'উপসংহার' অংশে আবার মঞ্চাধ্যক্ষ ও নটীর মাধ্যমে মানুষের জয়ের বার্তা দিয়েছেন নাট্যকার। এই ভঙ্গি ব্রেখটীয় বিচ্ছিন্নতার সদৃশ, কিন্তু মনোজ মিত্র দেখাতে চান, আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যেই এই ভঙ্গি ছিল, বাইরে থেকে আমদানির অনেক আগে থেকেই ছিল। 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকেও 'প্রস্তাবনা' অংশে মনোরমা, সিতিকণ্ঠ এবং ঘোষকের মাধ্যমে নাটকের মূল সূত্রটিকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে সেই সূত্রেরই বিস্তার। নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টিতেও এই অংশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার নাটকের শেষে যে 'উপসংহার' অংশ, সেখানে নাট্যকারেরই ব্যাখ্যা প্রকাশ

পেয়েছে মনোরমার মাধ্যমে। একই গানের প্রথম অংশ প্রস্তাবনায় এবং শেষাংশ উপসংহারে গীত হয়ে নাট্যসংহতি সৃষ্টি করেছে। এই নাটকে প্রতিটি দৃশ্যের একটি করে শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে, যা দৃশ্যবর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে পাঠককে আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে।

'কিনু কাহারের থেটার' নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে দেশজ লোকনাট্যের আঙ্গিক। একজন সূত্রধর শুনিয়েছেন ইংরেজ শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত টিঁকে থাকা দেশীয় লোকনাট্য ধারার ইতিহাস। এই লোকনাট্যে যেমন থাকতো, সেভাবেই বাস্তব আর নাটক মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে নাটকে। নাটকের মধ্যে নাটক গড়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র। চরিত্রগুলি জীবন থেকে নাটকে, আর নাটক থেকে জীবনে অনায়াসে যাতায়াত করেছে। লোকনাট্যের মতোই ভাঁড় সরাসরি দর্শককে সম্বোধন করে কথা বলেছে। এই যে চরিত্রের বাইরে এসে প্রতিক্রিয়া জানানো এবং পরক্ষণেই চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যাওয়া — ব্রেখটীয় এই বিচ্ছিন্নতা যে আমাদের দেশজ নাট্য-ঐতিহ্যে অনেক আগে থেকেই ছিল,' কিনু কাহারের থেটার' তার উজ্জ্বল প্রমাণ। 'পুঁটি রামায়ণ'-এ সূত্রধরের ভূমিকা পালন করেছে বক্কেশ্বর ও টেঁপা। বাংলাদেশে যে রামায়ণী গান বহুল প্রচলিত, তারই আদলে নাটকটি পরিকল্পিত, তবে সেই গানে মিশে গেছে আধুনিক সমস্যা। কারণ এই রামায়ণ 'পুঁটি রামায়ণ', এর রচয়িতা হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচী। এই নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকারের উক্তি ঃ ''ভেবেছিলুম নাটকটি নিজেই প্রযোজনা করবো। যদি করতুম, কোন দৃশ্যপট রাখতুম না। একটা ঢালাও আসর শুধু সাজিয়ে দিতুম মঞ্চের ওপর, রামায়ণ গানে যেমনটা দেখা যায়।''[১২] রামায়ণের মতো কান্ডবিভাজন করেছেন নাট্যকার, তবে যেহেতু এই রামায়ণ 'সবিশেষ পাতলা', তাই এর কান্ড সংখ্যা দুই। রামায়ণে যেমন প্রতিটি বিষয় শিরোনামচিহ্নিত, এই নাটকেও তেমনি প্রতিটি দৃশ্যে শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে। 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকেও দেশজ লোকনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন মনোজ মিত্র। কথক এবং কোরাস এই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কথকই শুনিয়েছে কাল্পনিক ইতিহাসের কাল্পনিক রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপ এবং তার বংশের দেবী সর্পমস্তার কথা। কোরাসের মধ্যে যারা রয়েছে, তারাই কখনো রাজা, কখনো দেবী, কখনো বা অন্যান্য চরিত্রের অভিনেতা। উপকথা-রূপকথা মিলিয়ে দেশজ গল্পবয়নের যে প্রচলিত আঙ্গিক, এখানে তারই সার্থক ব্যবহার। গায়েনরা একসময় গ্রামবাংলায় যেভাবে পালাগান গাইতেন কিংবা দেশীয় যাত্রায় যে ভঙ্গিতে কাহিনি উপস্থাপিত হত, 'কিনু কাহারের থেটার' বা 'দেবী সর্পমস্তা'য় সেই ভঙ্গিটিই ব্যবহৃত হয়েছে।' নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' নাটকে হবু-গোবুর চিরপরিচিত দেশীয় আর্কেটাইপ ব্যবহার করেছেন মনোজ মিত্র। এখানেও গল্প শুনিয়েছে ঘোষক এবং কোরাস গানের মধ্য দিয়ে নাটক শুরু হয়েছে।

এই গুচ্ছের যে নাটকটিতে প্লট একেবারে হুবহু তত্ত্বকে মান্য করে গড়ে উঠেছে সেটি হলো 'গল্প হেকিমসাহেব'। হেকিমসাহেবের 'গল্প' শুনিয়েছে একজন ফকির। সরাসরি দর্শককে সম্বোধন করে ফকির বলেছে, সে এখন যেখানে যায় তখন সেখানকার একজন ভালো মানুষের সন্ধান করে তাঁর নামে একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যায়। দরিয়াগঞ্জে সে খোঁজ পেয়েছে এমন একজন ফকিরের, দেড়শো বছর আগে যে গৃহস্থের কাছে হেঁকে বেড়াত — ' দাওয়াই চাই গো দাওয়াই'! এই হেকিমের কবরে আজ প্রদীপ জ্বালাবে ফকির। কবরের চারপাশে এক একটি পাকের মধ্য

দিয়ে উঠে এসেছে হেকিমের জীবনের এক একটি অধ্যায়। নাটকের দুই অঙ্কের দশটি দৃশ্য গাঁথা হয়েছে ফকিরের দশ পাকের অদৃশ্য সুতোয়। আমরা শুনেছি একজন ভালোমানুষের জীবনের প্রতিকূলতার কাহিনি, সে কাহিনিতে খুঁজে পেয়েছি নিজেকে, নিজের সমকালকে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যই উপ্ত হয়েছে নাট্যদ্বন্দ্ব – ব্যক্তির প্রমোদ নাকি বিশ্বহিত – কোন্ কাজে ব্যবহৃত হবে সুবিদ্যা – কে পাবে রক্তগোলাপ, হেকিম না মোহর বাঈ? এই অঙ্কের বাকি চারটি দৃশ্যে সেই দ্বন্দ্বেরই বিস্তার – হেকিম ওষুধ আবিষ্কারে নিরলস – আর মোহর বাঈ সেই পথে ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিকূলতা। এই অঙ্কের শেষ দৃশ্যে হেকিমের পিঠে ওয়ালীর পাদুকাঘাত নাটকের চরম বিন্দু। দ্বিতীয় অঙ্কে ক্রমশ গ্রন্থিমোচন। মোহর বাঈ এবং পলাশপুরের তালুকদারের ষড়যন্ত্র ফাঁস, হেকিমের ওষুধ আবিষ্কার, পলাশপুরেও তার লাঞ্ছনা প্রভৃতি ক্রমিক অবরোহণের দিকে নিয়েছে নাটককে। শেষ দৃশ্যে শান্ত Catastrophe. ওয়ালী খাঁর দেহে ভয়ঙ্কর রোগের প্রাদুর্ভাব তাকে এনে দাঁড় করিয়েছে হেকিমের দরজায়। কিন্তু হেকিম হারিয়ে ফেলেছে পুঁথি। হতাশ ওয়ালীর ফিরে যাওয়া এবং ছায়েমের পুঁথি লুকিয়ে রাখা Poetic justice এর দৃষ্টান্ত। গঙ্গামণি এবং ছায়েমের সুবিদ্যাকে রক্ষা করার শপথে নাট্যকারের ঈপ্সিত সমাপ্তি। এই গুচ্ছের নাটকগুলিতে মনোজ মিত্র সূত্রধর শ্রেণির যে চরিত্রগুলি ব্যবহার করেছেন, তারা যেন প্রাচীন গ্রীসের Ion চরিত্র, যে চরিত্র ঘটনার ব্যাখ্যাতা।

আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত অ্যারিস্টটলীয় প্লট মনোজ মিত্র যেসব নাটকে ব্যবহার করেছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অশ্বত্থামা', 'নেকড়ে', 'চাক ভাঙা মধু', 'সাজানো বাগান', 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার', 'ব্রিজের ওপর বাপি', 'পাখি', 'তেঁতুল গাছ', 'আকাশ চুম্বন', 'রূপের আড়ালে' প্রভৃতি। ক্রমিক আরোহণের মধ্য দিয়ে এসব নাটকের প্লট সর্বোচ্চ বিন্দু স্পর্শ করেছে। গোধূলি পর্ব এবং নিশীথ পর্বে বিভক্ত 'অশ্বত্থামা' নাটকে যেমন তিনটি মাত্র চরিত্র এবং কাহিনির উপযোগী গাম্ভীর্যপূর্ণ সংলাপের সহায়তায় ঘটনা দ্রুতগতিতে পরিণতির দিকে এগিয়েছে। অশ্বত্থামার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র হয়েছে – কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা তাকে আকর্ষণ করেছে দুই বিপরীতমুখী পথে। ধ্বংস আর সৃজনের দ্বন্দ্বে অশ্বত্থামার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ তাই হয়ে উঠেছে প্লটের কেন্দ্রবিন্দু। পাণ্ডব বলে ভুল করে পাঁচ শিশুকে হত্যা করা প্লটের চরম বিন্দু। তারপর অবসাদ, বিষাদে অবরোহণ এবং সৃজন বাসনায় শান্ত সমাপ্তি। এমন নির্ভার, মেদহীন, টানটান, নাট্যদ্বন্দ্বে পূর্ণ প্লটের নাটক মনোজ মিত্রের রচনা সম্ভারে খুব বেশি নেই। 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে শোষক কংসারি এবং অঘোর ঘোষের হত্যা প্লটের সর্বোচ্চ বিন্দু। সেই বিন্দুর দিকে লক্ষ্য রেখেই কাহিনির সজ্জা। একটা ভয়ের আবহ সৃষ্টি করে, একে একে অবলম্বনগুলি সরিয়ে নিয়ে নীহারি ঘনিয়ে তুলেছে কংসারি ঠাকুরের চরম মুহূর্ত। আর 'চাক ভাঙা মধু' নাটক প্রাণের পক্ষে (বাদামী) ও বিপক্ষে (জটা-মাতলা)-র দ্বন্দ্ব দিয়ে শুরু হলেও ক্রমে বিস্তৃতি পেয়েছে শোষক-শোষিতের বৃহত্তর দ্বন্দ্বে। মা বাদামী মধু রূপে অঘোর ঘোষের প্রাণ দিয়েছে, আবার সেই মা-ই সন্তানের অনিষ্টের আশঙ্কায় সড়কি চালিয়ে অঘোর ঘোষের বক্ষ ফাটিয়ে দিয়েছে। এই অংশে প্লটে আকস্মিক মোচড় সৃষ্টি করেছেন মনোজ মিত্র, যা বাদামীর ক্ষোভ, অসহায়তা, এবং তা থেকে 'জেগে ওঠা নিরুপায় আক্রোশে'র প্রকাশে যথাযথ হয়েছে। অঘোরকে হত্যার পর টলমল পায়ে বাদামীর দোলনার

দিকে এগিয়ে যাওয়া চরম বিন্দুর পর নির্ভার প্রশান্তি। জটার জীবনপিপাসা, মাতলার দ্বিধা-সংশয়, বাদামীর অপত্যস্নেহ, ওঝার বাড়ির সংস্কার, 'পোয়াতি' মেয়ে মানুষের খাবার লোভ, বেহারাদের কাঁধের ঘায়ের প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়কে নাটকের কেন্দ্রীয় সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে 'চাক ভাঙা মধু'কে দৃঢ়বদ্ধ প্লটের নাটক হিসেবেই গড়েছেন মনোজ মিত্র।

'সাজানো বাগান' নাটকের প্লট গ্রন্থিত হয়েছে একজন মাটি ঘষটে চলা মানুষের ক্রমশ 'ধনুকের মতো বাঁকা' হওয়া এবং 'তীরের মতো সোজা' হয়ে ওঠাকে কেন্দ্রে রেখে। একজন প্রান্তিক মানুষ কেবল নিজের জীবনী শক্তির জোরে একের পর এক প্রতিকূলতাকে জয় করে যাচ্ছে — এই বিন্দুটিকে মাঝখানে রেখে প্লট দু'দিকে বিস্তৃতি পেয়েছে। একদিকে রয়েছে গুপি-পদ্ম-চোর — যারা নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই বাঁচিয়ে রাখতে চায় বাঞ্ছাকে, আর অন্য দিকে রয়েছে ছকড়ি-নকড়ি — তারাও নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই বাঞ্ছার মৃত্যু চায়। জীবন এবং মৃত্যুর এই দ্বন্দ্বই নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়। মোক্তার, গনৎকার, ডাক্তার, পুরোহিত — প্রভৃতি সেই নাটকের প্লটে এক একটি এপিসোড, যেগুলি প্রকাশ করেছে নকড়ির নিষ্ঠুরতাকে। বাঞ্ছার বেঁচে থাকার পথে এগুলি এক একটি প্রতিকূলতা। এই সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে প্লট ঝুঁকেছে জীবনের দিকে — বাঞ্ছার জন্য আনা খাটিয়ায় শুয়ে মরে গেছে নকড়ি আর বাঞ্ছা বেঁচে থেকে স্বাগত জানিয়েছে নতুন জীবনকে। হোঁৎকা-কোঁৎকার যুব সংগঠন এবং সিনেমার নেশার প্রসঙ্গ মূল প্লটে যে কিছুটা বাহুল্য তা অস্বীকার করা যায় না। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে স্ত্রীর জন্য সৌরভের একের পর এক পাহারাদার নিয়োগের মধ্যে প্লটের সুতো ছেড়ে গিয়েছেন নাট্যকার। দ্বিতীয়ার্ধে সেই সুতো যখন গুটিয়েছেন তখন প্লটে এসেছে গাম্ভীর্য। নারী হিসেবে নিজে মর্যাদা উপলব্ধি করেছে মুন্নি, আপাতশিথিল, লোলুপ ধৃতিকান্তর অন্তরের রিক্ততার প্রকাশ তাঁকে অন্যতর মাত্রা দিয়েছে। এই নাটকের প্লট সরলরৈখিক। মুন্নি এবং ধৃতিকান্তকে কেন্দ্রে রেখে এক একটি চরিত্রের কৌতুককর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়েছে। 'ব্রিজের ওপর বাপি' নাটকে ষাঁড়াষাঁড়ির বানের চরম মুহূর্তটিকে ঘিরে নাট্যকাহিনি সাজানো হয়েছে। প্রথম দৃশ্যেই একের পর এক নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করা হয়েছে — ভরা জোছনায় সুইসাইডের ঝোঁক চাপে কেন এ. এস. আই বাপি মান্নার, কেন বিয়ে করা 'বৌ' তার সঙ্গে থাকে না, চুমকির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক — প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যে ঢোকে নাটক। সেখানে কিছু প্রশ্নের উত্তর মেলে, কিছু নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। অসংখ্য ঘটনা এবং স্মৃতি পর পর উঠে আসতে থাকে নাটকে — রাজনৈতিক নেতার আধিপত্য, নাশকতামূলক কাজের প্রয়াস, পুলিশের একাংশের অনৈতিকতা, চুমকি-বাপির অনুচ্চারিত সম্পর্ক- প্রভৃতি সব কিছুকে ছাপিয়ে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে বাপির আত্মহত্যার বাসনা। বোম ফেটে ব্রিজ উড়ে যাবার সম্ভাবনায় প্লটে যে Tension সৃষ্টি হয়, তা নাট্যকার আরও বাড়িয়ে তোলেন বাপিকে বোম নিষ্ক্রিয় করতে নামিয়ে দিয়ে। ষাঁড়াষাঁড়ির প্রচন্ড বানে চুমকির হাতের দড়ি ছুটে গেলে সবাই যখন বাপির আশা ছেড়ে দিয়েছে তখন চুমকিকে এবং সেই সঙ্গে পাঠক-দর্শককে চমকে দিয়ে বাপিকে ফিরিয়ে আনেন নাট্যকার। মৃত্যুর ঝোঁক কাটিয়ে তখন তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে জীবনপিপাসা। এই নাটকের প্লট বিস্তৃতির ফলে শিথিল হয়নি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যোৎকণ্ঠা সমানভাবে বজায় থেকেছে।

একাঙ্ক নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্লটের দৃঢ়বদ্ধতা আরও স্পষ্ট হয়েছে। 'পাখি' একাঙ্কটিতে অসংখ্য প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে এক মধ্যবিত্তের স্বপ্নের আকাশে উড়াল দেবার বাসনাকে প্লটের কেন্দ্রে রেখেছেন নাট্যকার। সে আকাশ ছোট, স্বপ্নও ছোট – কিন্তু তবু স্বপ্ন পূরণে অজস্র বাধা। নিদারুণ চেষ্টায় প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে উঠতে নাটক পৌঁছে যায় ক্লাইম্যাক্সে। যাদের জন্য বিবাহবার্ষিকীর আয়োজন নীতিশ-শ্যামার, তারা কেউ আসছে না। কারণ তারা নীতিশকে খরচের হাত থেকে বাঁচাতে চায়। নীতিশ সব আয়োজন নিজের হাতে ধ্বস্ত করে দেবার পর প্লট Catastrophe-এ পৌঁছয়। নাট্যকার সেখানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহমর্মিতায় উজ্জ্বল করে তোলেন তাদের 'সাতুই ফাল্গুন'কে। 'তেঁতুলগাছ' নাটকের প্লটও দৃঢ়বদ্ধ। স্থানিক ঐক্য এই প্লটে নেই, কিন্তু তাতে দৃঢ়বদ্ধতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কাঠের ব্যবসায়ী ক্ষীরোদের থেকে টাকা নিয়ে তার শালা ভবতোষ গিয়েছিল গাছ কিনতে। দীর্ঘদিন পর ফিরেছে এক তেঁতুলগাছ কেনার সংবাদ নিয়ে। প্রথমে সেই গাছের দাম বলেছে তিনশো টাকা। গাছের কাছে যাবার পথে ধাপে ধাপে সেই দাম যেভাবে চার হাজার পর্যন্ত তুলে দিয়েছে তাতে প্লটের ক্রম আরোহণ সৃষ্টি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই গাছও ক্ষীরোদ পায়নি। গ্রামের মানুষের বাধায় গাছ কাটা যায়নি। একই রকম ক্রম আরোহণ লক্ষ্য করা যায় 'আকাশ চুম্বন' নাটকে। রূপা-সুপ্রিয়র সাততলা ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশের রাতে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির প্রেরিত ফুলের তোড়া থেকে নাট্য সংকট ঘনীভূত হয়েছে। কে হতে পারে এই ব্যক্তি – যে কিনা রূপাকে 'রূপা ... রুপু ... সোনা রুপো' লেখে এবং 'আমাকে ভুলে যেয়োনা' বলে। এই ব্যক্তির পরিচয় শেষ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় না, কিন্তু বিভিন্ন অনুমানের সূত্রে উঠে আসে এই ফ্ল্যাট জোগাড় করতে গিয়ে রূপার পাঁকে নামার এক একটি অধ্যায়। ধাপে ধাপে নাট্যকার দেখান, মানুষের অবনমনের স্তরগুলি। শেষে জানা যায় সুপ্রিয়র জোগাড় করা দু'লাখ টাকাও এসেছে প্রশ্ন ফাঁস করার মতো অনৈতিক কাজের মাধ্যমে। প্লটে ব্যঞ্জিত হয় এই সত্য – বহুতলের মতো মানুষের ভিতেও থেকে যাচ্ছে গলদ। প্লটে একেবারে শেষে সামান্য মোচড় দিয়ে রূপা-সুপ্রিয়কে আর একটা সুযোগ দিতে চেয়েছেন নাট্যকার। 'রূপের আড়ালে' নাটকটিতে সোহিনী যেভাবে একটা গল্প বলার ছলে ইলার মনে বিতান সম্পর্কে সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে তা সমান ভাবে আক্রান্ত করে পাঠক-দর্শককেও। কিন্তু শেষে প্লটে চমক দেন নাট্যকার। সোহিনী জানায়, তার পোড়ামুখ নিয়ে অন্যের 'আহা উহু' সহ্য করতে না পেরেই সে এরকম গল্প বানায় – অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা মেটায়।

শেক্সপীয়র তাঁর একাধিক নাটকে মূল প্লটের পাশাপাশি গড়েছেন আন্ডার প্লট – যা মূল প্লটকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে বা বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। মনোজ মিত্র তাঁর বেশ কয়েকটি নাটকে গড়েছেন প্যারালাল প্লট। এধরণের প্লটেরও লক্ষ্য নাট্যবিষয়ে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা। এই ধারায় উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'মৃত্যুর চোখে জল', 'দম্পতি', 'বৃষ্টির ছায়াছবি' এবং 'নাকছাবিটা'। জীবনের প্রথম নাট্যরচনা 'মৃত্যুর চোখে জল'-এ প্লট গঠনে নাট্যকারের পরিণতি বোধের পরিচয় স্পষ্ট। সিঁড়ির নিচের প্রায়ান্ধকার ঘরে পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্য, আর ওপরতলায় সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। শিশুটি জীবন-মৃত্যুর বোধহীন, আর বৃদ্ধ বঙ্কিম মৃত্যুভয়ে ভীত, প্রবল জীবনপিয়াসী। অসুস্থ শিশুটিকে নিয়ে সকলে বিব্রত। যার বেঁচে থাকা ছিল কাঙ্ক্ষিত, সেই শিশুটি শেষে মারা যায় আর অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও বেঁচে থাকে বৃদ্ধ। নাতির মৃত্যু শোকে সাহস করে সে কাঁদতেও পারে না – পাছে হৃদ্‌যন্ত্র

বিকল হয়ে যায়। 'দম্পতি' নাটকে প্যারালাল প্লট সৃষ্টি করা হয়েছে একই বাড়ির ওপরতলা-নিচতলায় দু'জোড়া দম্পতির মধ্য দিয়ে। নাট্যকার দেখতে চেয়েছেন, দুই প্রজন্মের মূল্যবোধের বৈপরীত্যকে। দুই দম্পতি-ই কলহমুখর,কিন্তু কর্তা-গিন্নির কলহ অনেকটাই ছদ্ম, যা বাঞ্জিত হয়েছে শুক-সারীর গানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শ্যামল-বকুলের দ্বন্দ্ব অনেক তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং নগ্ন । অসহিষ্ণুতাকে আধুনিক প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন নাট্যকার । সেই অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়েছে নিচের তলার দম্পতির বৈপরীত্যে। তুমুল কলহ সত্ত্বেও তারা কিন্তু বিচ্ছেদের কথা ভাবেনি, বরং বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় কাতর হয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রজন্মের কাছে বিচ্ছেদেই সব সমস্যার 'সমাধান'। মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, কর্তা গিন্নির সহাবস্থান ভাঙতে চেয়েছে বাইরের শক্তি অর্থাৎ তাদের ছেলেরা, শ্যামল-বকুলের সহাবস্থান ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তাদেরই অন্তরের সন্দেহ-বিষের কারণে। শেষে প্লটে আকস্মিক মোচড় সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। পারিবারিক বন্ধু জিতেনবাবু বেনামীতে বাড়ি কিনে নিয়ে সকলকে রক্ষা করেছেন উৎখাত হওয়া থেকে। জিতেনবাবুর এই আচরণ যে প্লটে বিসদৃশ মনে হতে পারে তা নাট্যকারের জানা ছিল। তাই প্রথম থেকে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করা, পারিবারিক যে কোনো প্রয়োজনে এগিয়ে আসা, গিন্নির সঙ্গে সম্পর্কের ছদ্ম সন্দেহে কর্তার ক্ষেপে ওঠা – প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জিতেনবাবু চরিত্রটির এই আচরণের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট প্লটে প্রস্তুত করে রেখেছেন।

'বৃষ্টির ছায়াছবি' নাটকে প্যারালাল প্লট সৃষ্টি হয়েছে বৈপরীত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, পরিপূরক হিসেবে। এক অঝোর বর্ষণের সন্ধ্যায় অভিনেত্রী চন্দনার সল্টলেকের ফ্ল্যাট এই নাটকের পটভূমি। 'অয়দিপাউস' নাটকের যে সংলাপ মুখস্থ করেছে চন্দনা, তাতেই আছে প্লটের মূল সূত্রটি ঃ

> "আমাদের জীবন তো কেবল কতগুলি আকস্মিকের খেলা; কতো বিভিন্ন রকমের আকস্মিক ঘটনা যেন হাতের পুতুল। ... এ পৃথিবীতে যে ভুলতে পারে সেই বাঁচতে পারে। ভুলে যাও অয়দিপাউস।"[১৩]

একদিকে চন্দনার জীবন, অন্যদিকে আগন্তুক ছেলেটির জীবন – অয়দিপাউস-এর কাহিনি এই দুই জীবনকে যেন এক সূত্রে গেঁথেছে। অভিনয় করতে করতেই চন্দনা কখন যেন হয়ে গেছে আগন্তুকের স্ত্রী নন্দিতা, উপলব্ধি করেছে যে, প্রত্যেকের জীবনের গল্পই ঘুরে ফিরে একই রকম। বাসবের প্রেমিকাকে অধিকার করেছে তারই জন্মদাতা পিতা, আর চন্দনাও যে অন্যকে বঞ্চনা বা প্রতারণা করে অধিকৃত হয়েছে রাহুলের দ্বারা – তার ইঙ্গিতও আছে নাটকে। 'নাকছাবিটা' নাটকে প্যারালাল প্লট তৈরি হয়েছে একদিকে বীরেশ্বর, অন্যদিকে তারই পিতা বরদাপ্রসন্নকে কেন্দ্র করে। বীরেশ্বর লড়াই করেছে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য, আর বরদাপ্রসন্ন জমিদারি টেঁকাতে বীরেশ্বরকে ত্যজ্য পুত্র করে 'রায়বাহাদুর' খেতাব পেয়েছে। এই নাটকের প্লটে একদিকে আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, অন্য দিকে সম্পত্তির জন্য আদর্শ এবং সন্তান ত্যাগ। বীরেশ্বরের ত্যাগ, নুকুর বিয়েকে কেন্দ্র করে নতুন প্রজন্মের ভাবনা, চিত্রার পরিকল্পনা প্রভৃতিকে সার্থক রূপ দিতে বরদাপ্রসন্নর প্যারালাল প্লট সহায়তা করেছে। এই নাটকের প্লট নির্মাণে নতুন একটি কৌশল নিয়েছেন নাট্যকার। প্রথমেই বৃদ্ধা জানকীকে দেখিয়ে নাটকের পরিণতি পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর জানকীর ছোটবেলা নুকু থেকে নাট্যঘটনা শুরু এবং পূর্বজ্ঞাত পরিণতিতে পৌঁছনোর

বিভিন্ন ধাপগুলি তুলে ধরা। প্লটের দৃঢ়বদ্ধতার কারণে পরিণতি পূর্বজ্ঞাত হলেও নাট্যঘটনায় শিথিলতা আসেনি। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' এবং 'শোভাযাত্রা' নাটকেও সাব-প্লট বা প্যারালাল প্লটের আভাস আছে। প্রথমটিতে বাদল-পার্থর সাব-প্লট রয়েছে, যা অলকানন্দার পুত্রকন্যার বিপরীতে তুলে ধরেছে দুই প্রজন্মের সম্পর্কের স্বাভাবিকতাকে। কিন্তু এই সাব-প্লট খুব দৃঢ়ভাবে মূল প্লটের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। 'শোভাযাত্রা' নাটকের মূল প্লটে রয়েছে জগন্নাথের বিগ্রহ এবং রথকে নিয়ে দ্বন্দ্ব। এর পাশাপাশি প্যারালাল প্লটে চলেছে শঙ্খর অধিকার নিয়ে স্বামীর সঙ্গে অতসীর মামলা। জগন্নাথের অধিকার এবং রথযাত্রা উৎসব যেমন পূর্বপুরুষের অসংখ্য পাপকর্মের ওপর অন্তত সাময়িক প্রলেপ দেবার উপায়, শঙ্খকে নিজের অধিকারে রাখাও তেমনি অতসীর অস্তিত্বের দ্যোতক। জড়বুদ্ধি শঙ্খ ঠুঁটো জগন্নাথেরই প্রতীক। জগন্নাথ রক্ষা করতে পারেনি রায়বাড়ির সম্মান, শঙ্খও মাকে ধর্ষিতা হতে দেখেও কিছুই করতে পারে নি। ধনগোপাল যেমন রথ এবং জগন্নাথ ছেড়ে দিয়েছেন, অতসীও তেমনি ছেড়ে দিয়েছে শঙ্খকে। মূল প্লট আর প্যারালাল প্লট এখানে এক বিন্দুতে এসে মিলে গেছে।

মনোজ মিত্র তাঁর একাধিক নাটকের প্লট নির্মাণে এপিক, রূপক বা নীতিকথার আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। এসব নাটকে নাট্যবর্ণিত চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে পাঠক-দর্শক একাত্ম হয়ে যান না, দূরত্ব রক্ষা করে বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। এপিক নাটকের বৈশিষ্ট্য মেনেই এগুলিতে নাচ-গানের ব্যবহার আছে, দেবতাদের নিয়ে রসিকতার ভারতীয় ঐতিহ্য আছে। 'শিবের অসাধ্যি', 'নরক গুলজার', 'রাজদর্শন', 'পুঁটি রামায়ণ', 'রাজার পেটে প্রজার পিঠে', 'টু-ইন- ওয়ান', 'যা নেই ভারতে', প্রভৃতি এই ধরণের প্লটের দৃষ্টান্ত। 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে জোতদার দমনে নেমেছেন শিব। নাচ এবং গান ব্যবহারের মাধ্যমে এখানে প্লটে ভঙ্গিগত চমক সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে শিব একদিকে যেমন মহারুদ্র, অন্যদিকে তিনি তেমনি ভোলা মহেশ্বর। সেই ভোলা মহেশ্বরকে নিয়ে রঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়ে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা আছে 'নরক গুলজার' নাটকেও। এই নাটকের প্লট স্বর্গ, মর্ত্য, নরকে প্রসারিত। এপিসোডিক প্লটের লক্ষণও এখানে আছে। গুঁইবাবা, পান্নালাল, ঘোড়ুই, নেংটি খচো প্রভৃতি চরিত্রের কার্যকলাপের পরিচয়কে এক একটি এপিসোড বলা যেতে পারে। এই এপিসোডগুলি সমন্বিত হয়েছে শোষিত মানিকচাঁদের ওপর অত্যাচারের সূত্রে। সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গকে তুলে ধরতে নাট্যকার এখানে এপিক নাটকের দূরত্ব সৃষ্টিকে ব্যবহার করেছেন। গান এই নাটকেরও অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। হাসি মজার মধ্য দিয়ে সমসময়কে দেখা হয়েছে রূপকের দূরত্বে, পৌরাণিক আবহে। 'রাজদর্শন' নাটকে ঘটনা দেখা হয়েছে দেবতা শনির দৃষ্টিতে। একদিকে রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ কলহ এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ভিক্ষে করে অবস্থা ফেরানোর প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসের ব্যর্থতা এই নাটকের প্লট গড়ে তুলেছে। এখানেও প্লট গ্রন্থনের লক্ষ্য দূরত্ব সৃষ্টি, সমকালকে কিছুটা ব্যবধানে রেখে প্রত্যক্ষ করা। 'পুঁটি রামায়ণ'-এ রামায়ণ গানের আদলটি রক্ষিত হয়েছে বক্কেশ্বর-টেঁপার গানে। এই গানগুলি কৌতুক এবং বিদ্রূপে পূর্ণ, যা ঝাঁকুনি দিয়ে সচতন করে পাঠক-দর্শককে। 'কিনুকাহারের থেটার' এপিক ধরণের সার্থক দৃষ্টান্ত। লোকনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহার করে এখানে বাস্তব এবং অভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়া

হয়েছে। গান এরকম প্লটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এখানেও ভাঁড় তার কৌতুককর গানের মধ্য দিয়ে একাধিকবার প্লটের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে।'রাজার পেটে প্রজার পিঠে' বা 'টু-ইন-ওয়ান'-এ রাজা-মন্ত্রি-পারিষদদের নিয়ে প্লট সাজানো হয়েছে। এই রাজা-মন্ত্রিরা প্রত্যেকেই প্রতীকী।'যা নেই ভারতে' নাটকের প্লট দৃঢ়বদ্ধ। ছায়ামূর্তির সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের সূচনা। এই ছায়ামূর্তি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র । তারই দৃষ্টিতে ভারতকাহিনির নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। মহাভারতকে ভীষ্ম-পান্ডবাদির দৃষ্টিতে বিশ্লেষণই ভারতীয় ঐতিহ্য। নাটকের প্লট গ্রন্থন তার বিপরীত লক্ষ্যে। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র ছিল নিন্দিত খলনায়ক, নাটকে তাকেই নায়কত্বে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন নাট্যকার। পক্ষান্তরে ভীষ্ম হয়েছেন খলনায়ক। এই পরিবর্তন কিন্তু ঘটানো হয়েছে যুক্তির আশ্রয়ে। প্রথম পর্বে যে সূত্রগুলি উল্লেখিত হয়েছে দ্বিতীয় পর্বে সেগুলিরই বিস্তার। পুরাণ কাহিনির যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং ভিন্নতর সত্য নিষ্কাশন এই প্লটের কেন্দ্রবিন্দু। শেষে দু'চোখের আবরণ খুলে ফেলে'ধৃতরাষ্ট্র' এবং 'গান্ধারী' দুই সাধারণ নারী-পুরুষ হিসেবে যেভাবে দর্শকদের মুখোমুখি হয় তা ব্রেখটীয় থিয়েটারের অ্যালিয়েনেশনকেই মনে পড়ায়। ব্রেখটীয় থিয়েটারে যেমন অভিনেতা চরিত্র থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দর্শককে সম্বোধন করে, অন্যায়ের প্রতিকারে উদ্বুদ্ধ করে, এখানেও তেমনি মহাভারতের মহান রূপটিকে চূর্ণ করে তার স্বরূপ উন্মোচনে সহায়তা করেছে প্লটের এই বাঁক। 'এমপ্যাথি 'কে নষ্ট করে বিচার-বুদ্ধিকে সক্রিয় করে তোলার এই পদ্ধতি একান্তই ব্রেখটীয়।

এই গুচ্ছের নাটকগুলিতে লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠক-দর্শকের সঙ্গে নাট্যঘটনা বা চরিত্রের 'এমপ্যাথি' গড়ে ওঠে না। যথোচিত দূরত্ব রক্ষা করে চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন অসঙ্গতিকে। এপিক, রূপক বা প্যারাবলের ভঙ্গিটিই এই দূরত্ব সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। কারণ পাঠক-দর্শকের কখনোই মনে হয় না যে, আমি শিব, ব্রহ্মা, রাবণ, ভীষ্ম বা ধৃতরাষ্ট্র বা কিনু কাহার। বরং এই চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণের দিকেই দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হয়। কিনু কাহার বা ধৃতরাষ্ট্রের ওপর অনুষ্ঠিত অবিচার আমাদের প্রতিরোধে উজ্জীবিত করে, লঙ্কাপুরীতে বিশ শতকের পুঁটিতন্ত্রের প্রয়োগে আমাদের কৌতুকবোধ হয়, ব্রহ্মার গো-জন্ম লাভে আমরা উচ্ছ্বসিত হই।

বেশ কয়েকটি নাটকের প্লটে মনোজ মিত্র পশু-পাখি, ভূত-প্রেত প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন।'কাকচরিত্র' এবং 'সাহেববাগানের সুন্দরী' একাঙ্ক দুটিতে কাক এসেছে চরিত্র হিসেবে। ভারতীয় ঐতিহ্যে কাক ভূয়োদর্শী হিসেবে স্বীকৃত। সেই ভূয়োদর্শিতার গুণটি ব্যবহৃত হয়েছে সমাজের বাহ্য সত্যের অন্তরালস্থিত স্বরূপ উন্মোচনে। সুউচ্চ অবস্থান থেকে দেখে বলে কাকের চোখেই ধরা পড়ে প্রকৃত সত্য। কাকই জানে, সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, তার মুখোমুখি দাঁড়ানোই জীবন। 'সাজানো বাগান' নাটকে ছকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা এসেছে চরিত্র হিসাবে। এই প্রেতাত্মাকে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে কৌতুক সৃষ্টিতে, তেমনি শোষণ যে বংশপরম্পরায় চলছে তারও ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। বাঞ্ছার একটি সংলাপে নাট্যকার এই প্রেতাত্মাকে পৃথিবীর সর্বত্র ফসলের ওপর শোষকের আগ্রাসী থাবার প্রতীকরূপে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। 'নৈশভোজ' নাটকে একজোড়া শেয়ালকে উপস্থিত করেছেন মনোজ মিত্র ধূর্ত মানুষের সাদৃশ্যে। মানুষও যে শেয়ালের মতোই

ধূর্ত এবং লোভী – তা দেখাতেই এই উপস্থাপনা। কিন্তু শেয়ালের লোভ জৈব বৃত্তি চরিতার্থতার, আর মানুষের লোভ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার। সে আকাঙ্ক্ষা অর্থ, সম্পদ বা প্রভুত্ববাসনার। শুরুতে যে শেয়ালেরা ছিল লুব্ধ, নাটকের শেষে তারা হতাশ – মানুষেরই মতো। তাই মানুষ এবং শেয়ালের গলা জড়াজড়ি করে কান্নায় সেই হতাশার উদ্‌যাপন। এই নাটকের প্লটেও আছে এপিসোডিক লক্ষণ। তিন ভাই চক্রধর-ধ্বজাধর-গদাধর, তান্ত্রিক, মস্তান, বাবলা, ছকু-নয়নতারা – প্রত্যেকেই এক একটা এপিসোড, যেগুলি সমন্বিত হয়েছে কাঁঠালগাছে ঝুলতে থাকা তুষ্টুর 'লাশ'কে কেন্দ্র করে। 'রঙের হাট' নাটকেও চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে বাজারে বিক্রির জন্য আসা খাসি-পাঁঠা। মনোজ মিত্র এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন, বিশ্বব্যাপী বাজারে মানুষ বা মনুষ্যেতর প্রাণীর কোন পার্থক্য নেই। দরটাই সবক্ষেত্রে মুখ্য। নিজের দর বাড়িয়ে অন্যের দর কমানোটাই একালের দস্তুর। জীবনের মূল্য হ্রাসের এই কাহিনি মনোজ মিত্র গেঁথেছেন একপাল খাসি-পাঁঠাকে নিয়ে – অন্যের খাদ্য হওয়াই যাদের নিয়তি। এই নিয়তির সূত্রেই এক হয়ে যায় মানুষ এবং পশু। এই নাটকেও প্রতিটি দৃশ্যে শিরোনাম এবং শুরু, শেষ ও মাঝখানে হাটখোলার উপযোগী মাদারি মাস্টারের গান ব্যবহৃত হয়েছে।

খুলনা অঞ্চলের সহজ-সরল মানুষ এবং উদার প্রকৃতির সাহচর্য মনোজ মিত্রকে অভ্যস্ত করেছে জীবন-উপভোগে। এই উপভোগ রয়ে-বসে। অনাবশ্যক দ্রুততা এতে নেই। তাঁর বেশ কিছু নাটকের প্লটও এই জীবন-উপভোগের মতো শিথিল এবং ধীরগতি। দ্রুতগতি একমুখীনতায় পরিণতিতে পৌঁছনো নয়, বরং চারপাশটা দেখতে দেখতে ধীরে সুস্থে যাওয়া এরণের প্লটের বৈশিষ্ট্য। 'কেনারাম বেচারাম', 'দর্পণে শরৎশশী' , 'স্মৃতিসুধা', 'আত্মগোপন', 'কুহুযামিনী', 'রঙের হাট' প্রভৃতি নাটককে এজাতীয় প্লটের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বেচারামবাবুর গৃহত্যাগ এবং কেনারামের জীবনপিপাসাকে কেন্দ্রে রেখে যে নাটক গড়েছেন মনোজ মিত্র, তার প্লটে জায়গা করে নিয়েছে ভণ্ড রাজনীতিক, ধূর্ত আইনজ্ঞ, বিপ্লবী ছোটোছেলে বা বসিরহাটের ভাগ্নে ভৈরব। পরিবারের উপার্জনহীন বৃদ্ধের অবস্থানটি বুঝে নিতে গিয়ে নাট্যকার যেন একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়েছেন চারপাশের সমাজের দিকে। পরিবারের অবক্ষয়কেই বিস্তৃত হতে দেখেছেন সমাজেও। 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে একশ বছর আগেকার বাংলাদেশের থিয়েটারচর্চার কাহিনি উপস্থিত করতে গিয়ে জমিদারি শাসনাধীন গ্রামবাংলার একটি সামগ্রিক রূপ এঁকেছেন। এতে প্লটের দৃঢ়বদ্ধতা হয়তো রক্ষিত হয়নি,কিন্তু জীবন ও পরিবেশের সমগ্রতার আভাসটি ফুটেছে।'স্মৃতিসুধা' নাটকের প্লটেও এসেছে জীবনের বিস্তৃত রূপ।সুধাময়ীর স্মরণসভায় ধাপে ধাপে উন্মোচিত হয়েছে তার জীবনের অনেক না-জানা তথ্য। মাঝে মাঝে সকলের অলক্ষ্যে স্বয়ং সুধাময়ী উপস্থিত হয়ে অংশ নিয়েছে নিজের জীবনের 'মধুর রূপকথায়' এই নাটকের প্লটে অনেক অপ্রত্যাশিত বাঁক আছে, যেগুলি সুধাময়ীকে নতুন করে চিনিয়েছে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি,কাছাকাছি থেকেও মানুষ মানুষকে কত কম জানে – সেই বিষয়টি প্রকাশ করতেই এই নাটকের প্লট পরিকল্পনা।সুধাময়ীর জীবনের এক একটি অধ্যায়ের সূত্রে সেই প্লটে যুক্ত হয়েছে মোহনবাঁশি, কিরীটি ঘোষাল, ভেলটু ভট্ট। বারবার অপ্রত্যাশিত বাঁকে বদলে গেছে সুধাময়ীর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচকের নাম। এই প্লটে টুম্পা-ছানার অম্লমধুর সম্পর্ককে ঘিরে গড়ে ওঠা সাব-প্লট

নাটককে অধিকতর আকর্ষণীয় করেছে। 'আত্মগোপন' নাটকের প্লটে খেলার মাঠের দুর্নীতির সঙ্গে মিশে গেছে শেয়ার বাজারের ওঠাপড়া, গণিকালয়ের ব্যবসা প্রভৃতি । পাঞ্চালীর প্রথম বিয়ের দিকে এবং অর্পণের বেহালার বাড়ির দিকে প্লট পার্শ্বিক বিস্তৃতি পেয়েছে। বেশ্যালয়ে লুকিয়ে থাকতে আসা বিভূতিবাবুর এপিসোডটি প্লটকে আরেক দিকে বিস্তৃত করেছে। এই সবগুলি মিলিয়ে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন আধুনিক যুগের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও বাজারসর্বস্বতাকে। 'রঙের হাট' নাটকেও সাতরঙ গ্রামের হাটখোলাকে কেন্দ্রে রেখে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন বাজারের সর্বগ্রাসিতা। এই হাটখোলার বিস্তৃত পটে যেমন ক্রেতা-বিক্রেতারা আছে, তেমনি আছে মাদারি মাস্টার, গার্ড, পুরোহিত, খালপাড়ের মেয়েরা, এমনকি একটি পাগলও। এদের সকলকে নিয়ে হাটের সম্পূর্ণতা। 'কুহুযামিনী নাটকের পটভূমি একটি ধাবা এবং ধাবার সামনের হাইওয়ে। সেখানে এসে জুটেছে বহু বিচিত্র চরিত্র। পথ-দুর্ঘটনায় একটি হাঁসের মৃত্যুর কারণে পথ অবরোধ এবং সেই অবরোধের পটচিত্রে জোনাকি-আবির ছাড়াও চা-ওয়ালা বুলবুল, দেবী বাঁকেশ্বরীর থানের পরিচালিকা এলোকেশী এবং তার সহযোগী দুধকুমার, হৃতগৌরব রাজনৈতিক নেতা বাঘা, নেপুর ঠাকুমা, বর-বৌ, যাত্রাদলের অভিনেতা, পুলিশ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত। এই প্লট একরৈখিক। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একের পর এক চরিত্রের উপস্থিতি। তবে শেষে জোনাকির স্বামী চণ্ডীকে হাজির করে এবং চণ্ডীর গাড়িতে জোনাকিকে তুলে দিয়ে প্লটে বৃত্তের আভাস সৃষ্টি করা হয়েছে। মনোজ মিত্রের একেবারে প্রথম দিককার নাটকে বা পরের দিকেরও কিছু কিছু নাটকের প্লটে যে দৃঢ়বদ্ধতা দেখা যায়, এই গুচ্ছের নাটকগুলিতে তা অনুপস্থিত।

কোনো কোনো নাটকে মনোজ মিত্র প্লট সাজিয়েছেন কোনো একটি চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে। সেই চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রেই নাটকে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র এসেছে। যেমন, 'পরবাস' নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে গজমাধব ও তার আশ্রয়ের সমস্যা। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই বাড়িওয়ালা করালী দত্ত থেকে শুরু করে অন্যান্য ভাড়াটে ভুতু, পরাগ, দাদু বা রতন-মন্দিরার উপস্থিতি । করালীর কারণে আশ্রয় হারাচ্ছে গজমাধব, পরাগ-ভুতু-দাদু গজমাধবের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও নিরুপায়, মন্দিরা প্রথমে গজমাধবের আশ্রয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু পরে সহমর্মী এবং নতুন আশ্রয়দাত্রী। শেষপর্যন্ত ছত্রিশ বছরের আশ্রয় স্বেচ্ছায় ছেড়ে যায় গজমাধব, যায় মন্দিরার সাজনো সংসারে নিজেকে বাহুল্য বোধ করে । বাস্তবের আশ্রয় হারালেও সে আশ্রয় পেয়েছে মন্দিরার হৃদয়ে, পাঠক-দর্শকের সহানুভূতিতে । 'নৈশভোজ' নাটকে প্লটের কেন্দ্রে রয়েছে তুষ্টু চামার । তার 'লাশ' ব্যবহারের লোভ থেকেই কাঁঠাল গাছের তলায় উপস্থিত হয়েছে তিন লোভী ভাই, তান্ত্রিক, মস্তান বাবলা এবং একজোড়া শেয়াল । স্বার্থ প্রত্যেকের ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য এক – তুষ্টুর লাশ। সেই লক্ষ্য পূর্ণ হতে দেবেন না বলে নাট্যকার প্লটে মোচড় সৃষ্টি করে গাছ থেকে নামিয়ে আনেন 'জ্যান্ত' তুষ্টুকে। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য় অলকানন্দাকে কেন্দ্রে কাহিনি সাজানো হয়েছে। প্লট একাধিক দিকে বিস্তৃত হওয়ার ফলে সমসাময়িক সমাজের একটা সামগ্রিক ছবি হয়তো ফুটেছে কিন্তু তার ফলে প্লটে এসেছে শিথিলতা । প্রথম থেকেই দৃঢ়পিনদ্ধ প্লট এই নাটকে গড়ে ওঠে নি। বাদল বা পার্থর ভূমিকা কিছুটা আলগা হয়েই থেকে গেছে, মূল নাট্যবিষয়ে সেভাবে লগ্ন হতে পারে নি। লালার উপস্থিতি অলকানন্দার মাতৃসত্তাকে আরেকটু বিস্তৃত করা ছাড়া তেমন কিছু

করতে পারে নি। দেবাহুতি বিপরীত বিন্দুতে উপস্থিত থেকে অলকানন্দার মাতৃসত্তাকে মহিমান্বিত করেছে। ভুবনবাবু কিংবা যদুপতির উপস্থিতি নাটকে বাড়তি কোনো মাত্রা যোগ করে না, বরং এই উপস্থিতি কিছুটা অপ্রয়োজনীয়ই মনে হয়। 'শোভাযাত্রা' নাটকের কেন্দ্রে রয়েছেন জমিদারবংশের উত্তরপুরুষ ধনগোপাল। পূর্বপুরুষের রথ এবং উৎসব রক্ষা করতে না পারার যন্ত্রণা, শরিকদের ক্রমশ সম্পত্তি বিক্রি করে শহরে চলে যাওয়া, নদুর মতো সুযোগসন্ধানীদের প্রতিশোধবাসনা, স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়ে অতসী ও তার জড়বুদ্ধি ছেলে শঙ্খকে নিয়ে জটিলতা, সরসীর বিয়ের চিন্তা – প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাই ধনগোপালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এবং তার দুর্ভাগ্যের মেঘকে গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণে লেপিত করতেই পরিকল্পিত। ঝড়েশ্বর-এন্তাজ-উদয়ের উপস্থিতি নাটককে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিস্তৃতি দিয়েছে। এই বিস্তৃতি ধনগোপালের পরিপার্শ্বকে, তার সামাজিক অবস্থানকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে একজন অদ্ভুত মানুষ রূপচাঁদ। সিনেমার সঙ্গে তুলনায় নাটকের পটভূমি নির্মাণের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন সমালোচক Marjorie Boulton ঃ "Ordinary human events, however, may be difficult to show on the stage . Travel, a common theme on the films, cannot easily be represented on the stage."[১৪] মনোজ মিত্র কিন্তু এই নাটকের প্লট শুরু করলেন ট্রেনের কামরায় রূপচাঁদের ভ্রমণের মধ্য দিয়েই। প্রথমে একের পর এক সুতো ছেড়ে গেছেন নাট্যকার। ট্রেনের কামরায় ক্রমে উপস্থিত হয়েছে নাটকের চরিত্রগুলি, ঘটনাচক্রে যাদের প্রত্যেকেরই গন্তব্য ফুলবাড়ি গ্রাম। প্রথম পর্বে প্রতিটি চরিত্রকে পরিচিত করেছেন নাট্যকার, আর দ্বিতীয় পর্বে ফুলবাড়ি গ্রামে সেই চরিত্রগুলির উপস্থিতিতে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে সমস্যার সমাধান দেখিয়েছেন। একজন ব্যক্তিমানুষের সমাজ-সংসারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রে রেখে নাট্যকার এই নাটকে দেখিয়েছেন গ্রামের পরিবর্তিত সমাজ-কাঠামো, মানুষের অর্থলোলুপতা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা তথা শিক্ষকের অবনমন, ধর্মকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যবহার ইত্যাদি বহুতর বিষয়কে। কিন্তু প্লট রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব এইখানে যে, বিষয়ের ভিড়ে নাটকের মূল থিম বিষণ্ণতা-নি:সঙ্গতার সুরটি হারিয়ে যায় নি।

মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে প্রধানত সমকালের কাহিনিই বলতে চেয়েছেন। তা বলতে গিয়ে কখনো যেমন সরাসরি বলেছেন, কখনো মহাকাব্য-পুরাণের আশ্রয়ে বলেছেন, তেমনি আবার কখনো কাহিনি গেঁথেছেন ইতিহাসের পটভূমিকায়। মুখ্যত দুটি নাটকে তিনি ইতিহাসকে অবলম্বন করেছেন – 'দেবী সর্পমস্তা' এবং 'ছায়ার প্রাসাদ'। প্রথমটিতে ব্যবহৃত হয়েছে কাল্পনিক ইতিহাস। এর প্লটে একদিকে রয়েছে দেবীর মানবজীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে রয়েছে চরম প্রয়োজনের সময় ভারতবর্ষের শাসকের অন্ত্যজ মানুষের কাছে আশ্রয় এবং সাহায্য পাবার চিরন্তন ইতিহাস। এই দুই অংশকে নিপুণভাবে মিলিয়েছেন নাট্যকার রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপ এবং অরণ্যচারী যুবক উদাসের প্রতি 'দেবী' গৌরীর মানসিক টানাপোড়েন, অরণ্যরমণী ইচ্ছের মাধ্যমে রাজার লুপ্তযৌবন ফিরে পাওয়া ও ইচ্ছেকে বিয়ে করা, সিংহগড়ের সিংহাসন ও রাজত্ব রক্ষায় আরণ্যক মানুষের প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে। রাজার বিরুদ্ধে সেনাপতির ষড়যন্ত্র, বিদূষকের কৌতুক, অরণ্যের শুশ্রূষা প্রভৃতি প্রসঙ্গও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ খেয়ে গেছে। 'ছায়ার

প্রাসাদ' নাটকে প্লটের কেন্দ্রবিন্দু সময়। বিন্দুসারের স্বল্প সময়ের রাজত্বকালের প্রেক্ষাপটে তিনি দেখেছেন সাধারণ মানুষের জীবনের দুর্বিষহ অবস্থা। অনৈতিহাসিক চরিত্র এখানে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। প্লটের গঠন এমন যে, ইতিহাসের কাল অনায়াসে লগ্ন হয়ে গেছে সমকালের। এই নাটকের মূল থিম হ'ল — শাসক যখন সব কিছু ধ্বংস করেন, নষ্ট করেন, তখন সভ্যতার দীপবর্তিকা রক্ষিত হয় প্রান্তিক মানুষের হাতে। সেইসঙ্গে আছে শাসকের ভেতরকার শুভচেতনা উদ্বোধনের প্রয়াস। এই থিমের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্লট গ্রন্থিত হয়েছে। প্লটে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে চাণক্যের অপ্রতিহত প্রভাবে, শাসক এবং ধর্মের যোগসাজসে, মহারাণির হাহাকারে, পুত্রকাম্য সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি বিন্দুসারের লালসার হাত বাড়ানোয়, শূদ্র বিদ্রোহের সম্ভাবনায়। ইতিহাসের উপযোগী বিস্তৃতি যেমন সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার, তেমনি আবার শেষে সেই প্লটকে গুছিয়ে সংহতও করেছেন।

সামগ্রিকভাবে মনোজ মিত্রের নাটকের প্লট গ্রন্থন বিচার করে দেখা যাচ্ছে, সবসময় তাঁর নাটকের প্লট খুব দৃঢ়বদ্ধ না হ'লেও মোটের ওপর প্লটের সংহতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়েছে। অ্যারিস্টটল যে ত্রয়ী ঐক্যের কথা বলেছিলেন, একালের নাটকে তা যান্ত্রিকভাবে অবশ্যমান্য নয়। তবে এও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঘটনাগত ঐক্য যেন খণ্ডিত না হয়, কাল ও স্থানগত বিস্তৃতি যেন অত্যধিক না হয়। যে কোনো নাটকের ক্ষেত্রেই মনোজ মিত্রের লক্ষ্য জীবনকে একটু ছড়িয়ে দেখা। ফলে প্রায়ই তাঁর নাটকের প্লট কিছুটা বিস্তৃতি পেয়ে যায়, সেখানে অনেক চরিত্র এসে ভিড় করে। এই বিস্তৃতিকে নাটকের মূল থিমের সঙ্গে অন্বিত করে দেওয়াতেই নাট্যকারের কৃতিত্ব। অধিকাংশ নাটকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সবগুলি অংশই নাট্যলগ্ন হয়ে গেছে, কোনো অংশই বাড়তি পড়ে নেই। ঘটনাগত ঐক্য কোনো কোনো নাটকে অবশ্য কিছুটা যে বিঘ্নিত হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন, 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে 'বেনারসী-তোতাপুরী' অংশ বা 'রাজদর্শন' নাটকে 'ভাঁড়ুদাসের জলসত্র' অংশটি মূল প্লটের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অন্বিত হতে পারে নি। 'আত্মগোপন' নাটকেও বহু বিচিত্র বিষয় উপস্থাপিত হবার ফলে ক্রিয়াগত ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে। 'আঁখিপল্লব' একাঙ্কটিতেও ঘটনার সংহতি গড়ে উঠতে পারে নি। খুরশিদদের দিকে প্লটের বিস্তৃতি আবশ্যকতার সূত্রে বাঁধা পড়ে নি। শকুন্তলাদেবী ও তাঁর সহযোগীও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন নি। প্লটের স্থানিক বিস্তৃতি ঘটেছে যেসব নাটকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দম্পতি' নাটকটি। এই নাটকের একটি দৃশ্যের স্থান বকখালি টুরিস্ট লজ। এই বিস্তৃতি স্থানগত ঐক্য কিছুটা হ'লেও বিঘ্নিত করেছে। তবে শ্যামল ও বকুলের মধ্যে দ্বন্দ্ব যে সন্দেহ নিয়ে ঘনিয়ে উঠেছে তার বীজ উপ্ত হয়েছে বকখালিতেই। চোখের সামনেই দুজনে দুজনকে দেখেছে অন্য নারী ও পুরুষের সঙ্গে। এই দেখা পরিচিত প্রতিবেশে হলে সন্দেহ সেভাবে ঘনীভূত হবার সুযোগ হ'ত না। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে একটি দৃশ্যের পটভূমি হিমপাহাড় — যেখান থেকে রাক্ষসবধের উপায় জেনে আসতে গেছে নীলকমল। প্রথাগত বিচারে দুস্তর পথের শেষে অবস্থিত এই হিমপাহাড়ে নাট্যকাহিনির স্থানান্তর স্থানগত ঐক্য বিনষ্ট করেছে। 'রাজদর্শন'-এ কাহিনির সূচনা অযোধ্যা রাজ্যের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখান থেকে কাহিনি সরাসরি গেছে রাজধানী অযোধ্যায়। শেষে আবার সেই গ্রামের গাছতলায় মৃতদেহের মধ্যে লম্বোদর ভট্টের বেঁচে ওঠা প্লটে বৃত্তের আভাস এনেছে। 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে পাশাপাশি দুই তালুক দরিয়াগঞ্জ ও পলাশপুরের মধ্যেই কাহিনি ঘোরাফেরা

করেছে। 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকে রাজধানী সিংহগড় থেকে কাহিনি স্থানান্তরিত হয়েছে রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমানার অরণ্যভূমিতে। মূল নাটক গড়ে উঠেছে সেখানেই, কিন্তু তার সূত্র এসেছে সিংহগড় থেকে। 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটক শুরু হয়েছে পথের ধারে এক রুক্ষ প্রান্তরে, যা রাজধানী থেকে বহুদূরবর্তী। তার পেছনে আবার রয়েছে আরো দূরের চন্দনা গ্রামের পূর্বসূত্র। এরপর কাহিনি দ্বৈপায়ন-সুভদ্রাঙ্গীর সঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছে রাজধানী পাটলিপুত্রে। একে স্থানগত ঐক্যের বিনষ্টি বলা যাবে না। কারণ তাড়া খেয়ে সেই চন্দনা গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে দ্বৈপায়ন-সুভদ্রাঙ্গীর। পথে পড়েছে শূদ্র বসতি এবং তারপর এসেছে রাজধানীতে। 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটক শুরু হয়েছে ট্রেনের কামরায়, সেখান থেকে ফুলবাড়ি গ্রামে নন্তু হালদারদের পড়োবাড়িতে এবং একটি দৃশ্য অঞ্চলপ্রধান শিখারাণীর বাড়িতে। ট্রেনের কামরার সঙ্গে পড়োবাড়িকে সুন্দর মিলিয়েছেন নাট্যকার এই নাটকের প্লটে। ট্রেনে নাঙ্গাবাবা ও তার চেলার 'হেড কোয়ার্টার' সেই পড়োবাড়ি, নাঙ্গাবাবাই আসলে গন্ধকালীর বাবা হুলোডাকাত, যাকে ধরতে ট্রেনে চেপেছে গন্ধ। রূপচাঁদ ওরফে নন্তু সেই বাড়ির মালিক। ট্রেনের কামরার ভানু খেমকাই সেই প্রমোটার, যে সেই পড়োবাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানাতে চায়। এদের উপস্থিতির মাধ্যমেই প্লটের স্থানিক সংহতি রক্ষিত হয়েছে। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে ত্রিপুরার একটি টেলিফোন বুথের যে দৃশ্য আছে তা স্থানগত সংহতির পরিপন্থী। নিছক কৌতুক সৃষ্টির বাইরে এই দৃশ্যের কোনো মূল্য নেই। কালগত সংহতির দিক থেকে অবশ্য তেমন কোনো ত্রুটি মনোজ মিত্রের নাটকের প্লটে নেই। 'বৃষ্টির ছায়াছবি'তে তিনি যেমন বলেছেন এক সন্ধ্যার কাহিনি, তেমনি আবার 'সাজানো বাগান', 'শোভাযাত্রা' বা 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'র মতো নাটকের ঘটনাকাল কয়েক মাস পর্যন্ত বিস্তৃত। 'পরবাস'-এর ঘটনাকাল একটি দিন। একাঙ্ক নাটকগুলিতে কালগত সংহতি আরো দৃঢ়। অধিকাংশ একাঙ্কই একটি দিন বা দিনের খণ্ডাংশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'মৃত্যুর চোখে জল', 'পাখি', 'প্রভাত ফিরে এসো' প্রভৃতি নাটকের ঘটনাকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা। 'টাপুর টুপুর', 'মহাবিদ্যা', 'দন্তরঙ্গ', 'আকাশচুম্বন', 'রূপের আড়ালে' প্রভৃতি নাটকে ঘটনাকালের আরো সংক্ষিপ্তি প্লটকে দৃঢ়বদ্ধ করেছে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) The Eliments of Drama - Theodore Hatlen - Orientation to the Theatre - Peter Owen - London - First British Commonwealth, p.29

২) কাব্যতত্ত্ব - অ্যারিস্টটল - অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ - প্যাপিরাস - গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-০৪ - তৃতীয় মুদ্রণ - অগ্রহায়ণ ১৪০১,পৃ..৬৮-৬৯

৩) The Eliments of Drama - Theodore Hatlen - Orientation to the Theatre, p.31

৪) ভূমিকা - কাব্যতত্ত্ব - অ্যারিস্টটল - অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, পৃ.২৬

৫) The Eliments of Drama - Theodore Hatlen - Orientation to the Theatre, p.30

৬) Adaptation of Plots - Marjorie Boulton The Anatomy of Drama - Kalyani Publishers - New Delhi-Ludhiana - First Indian Reprint - 1979, p.64

৭) ঐ,পৃ..৬৬

৮) ঐ,পৃ.৬৬

৯) বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার - সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় - পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি - কোলকাতা - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ.২১

১০) বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার - সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় - নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ।৩ - পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি - কোলকাতা - জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ.১২৯

১১) মেষ ও রাক্ষস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড,পৃ. ৫৪

১২) মনোজ মিত্র - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটিরামায়ণ' গ্রন্থে উৎকলিত - অপেরা - ৬৫ সূর্য সেন স্ট্রীট - কলকাতা-০৯ - শ্রাবণ ১৪১২, পৃ.. ১৪

১৩) বৃষ্টির ছায়াছবি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ..৩৯১

১৪) Literature that Walks - Marjorie Boulton - The Anatomy of Drama, p.7

চরিত্র সৃজন

অ্যারিস্টটল চরিত্রকে নাটকের (ট্রাজেডির) দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালের সমালোচকেরা অবশ্য গুরুত্বের ক্রম অনুসারে সাজানোর পরিবর্তে প্লট ও চরিত্রকে পরস্পরের পরিপূরক বলতে চেয়েছেন। ভালো নাটক একই সঙ্গে ভালো প্লট এবং ভালো চরিত্রায়ন দাবী করে। এইজন্যই Elwood বলেছেন ঃ "Plot is character in action" [১]

মনে রাখতে হবে, নাটকের পাত্রপাত্রী মাত্রই কিন্তু চরিত্র নয়। নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং নাট্যকাহিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেসব পাত্রপাত্রী তারাই 'চরিত্র' হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেকার আন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কোনো কোনো চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব নাট্যক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

নাটকের মূল বিষয় হ'ল দ্বন্দ্ব বা contlict. এই শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ 'agon'. এই 'agon'-কে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে দু'টি শব্দ – 'Protagonist' এবং 'Antagonist'. বাংলায় বলা যেতে পারে, নায়ক এবং প্রতিনায়ক বা খলনায়ক। নাটকের মূল দ্বন্দ্ব হ'ল নায়ক ও প্রতিনায়কের সংঘাত, কখনো বা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব। তবে নাটকীয় চরিত্র বলতে কেবল এদেরই বোঝানো হয় না। বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্র, এমনকি সামান্য সময়ের জন্য উপস্থিত কোনো ব্যক্তিকেও সার্থক নাট্যকার নাট্যকাহিনির পক্ষে প্রাসঙ্গিক করে তুলে 'চরিত্র'-এর মর্যাদা দিতে পারেন। নাট্যকার কখনো সৃষ্টি করেন কোরাসধর্মী চরিত্র, কখনো বা সূত্রধর – যাঁরা মূল নাট্যকাহিনির বাইরে অবস্থান করে গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন, অভিমত দেন, দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে সহায়তা করেন।

নাটকের চরিত্র কেমন হবে সে সম্পর্কে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আলংকারিকেরা আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অনুসারে দৃশ্যকাব্য বা নাটকের নায়ককে হতে হবে সুদর্শন, উদার, বিনয়ী, কলারসিক, বাক্‌পটু, বীর প্রভৃতি অসংখ্য গুণের অধিকারী। অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির নায়কের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন সেগুলি হ'ল – অতি ভালো বা অতি মন্দ নয়, যথাযথ, বাস্তব এবং সংগতিপূর্ণ। মাঝারি মানুষকে নায়কত্বের সম্মান দিলেও অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে, নায়ককে হতে হবে বিত্তবান, প্রতিপত্তিশালী ও বিখ্যাত – above the common level. আধুনিককালে অবশ্য অতি সাধারণ মানুষও নায়কত্বের মর্যাদা পেয়েছে। কখনও কখনও কোনো বিশেষ সময়পর্ব বা জনগোষ্ঠীও নায়কপদে অধিষ্ঠিত হতে পারে। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বে নায়িকা চরিত্র সম্পর্কে তেমন কিছু বলা না হলেও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অনুসারে নায়িকা তিন প্রকার – অনূঢ়া, স্বকীয়া এবং পরকীয়া। প্রত্যেক প্রকার নায়িকাকেই হতে হবে রমণীয় এবং নৃত্যগীতে পারদর্শিনী। বলা বাহুল্য, আধুনিককালে এসব বৈশিষ্ট্য অবশ্যমান্য নয়। নায়ক-নায়িকার পাশাপাশি নাটকে খল চরিত্রও গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক নাটকে অধিকাংশ সময়ই খলনায়ককে পুরোপুরি খল হিসেবে না দেখিয়ে ভালো ও মন্দ প্রবৃত্তির মিশ্রণ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। পুরনো ধ্রুপদী নাটকের তুলনায় আধুনিক নাটকের চরিত্রের মৌল পার্থক্য, সুতরাং, উচ্চবংশজাত, ধনী, শক্তিমান চরিত্রের পরিবর্তে সাধারণ নারী-পুরষের উত্থান। আধুনিক নাটকের চরিত্র প্রসঙ্গে ব্রেখট-এর নাট্যতত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চরিত্রকে দেখতে চেয়েছেন বিশেষ

শ্রেণি ও যুগের অংশ হিসেবে। ব্রেখট-এর নায়ক-ধারণা প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন ঃ

> ''মার্কসবাদী চিন্তার আলোয় ব্রেখট বুর্জোয়া মহৎ গুণাবলি মন্ডিত মহানায়কদের বৈপরীত্যে হাজির করেন প্রজাতির প্রতিনিধি – ছোটো মাপের মানুষ – যারা পুঁজিবাদী সমাজে কোনোমতে নানা আপসপন্থা ও কৌশলে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।''[২]

মার্কসবাদী ভাবনার ধারাতেই ব্রেখট বিশ্বাস করেছেন যে, মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব রয়েছে, কিন্তু পুঁজিবাদী শ্রমব্যবস্থার চাপে পড়ে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই তার মধ্যেকার এই মহত্তম উপাদানগুলি প্রকাশ পায় না। ব্রেখট নাটকীয় চরিত্রকে একাধিক অংশে ভেঙে নেবার কথা বলেছেন। এই টুকরোগুলো জুড়েই পাওয়া যাবে গোটা চরিত্রকে। কোনো চরিত্রের একটি অংশ হয়তো বীর, একটি অংশ প্রেমিক, একটি অংশ ধূর্ত, একটি অংশ বিশ্বাসঘাতক। এই সবগুলো অংশের যোগফলই সম্পূর্ণ মানুষটি।

আধুনিক নাটকের চরিত্রশালায় বহু বৈচিত্র্যের সমাহার। চরিত্র একালে যেমন কোনো বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধি হতে পারে, তেমনি আবার একক ব্যক্তি হিসেবেও উজ্জ্বল হতে পারে। কোথাও তারা অতি বাস্তব, কোথাও বা কিছুটা অস্পষ্ট, রহস্যময় বা প্রতীকী। আবার একাধিক নাটকে দেখা গেছে কোনো পশু বা ভূতপ্রেতও চরিত্র হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট সমালোচক নাটকের চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

> ''নাটকের চরিত্রেরা হতে পারে বাস্তবসম্মত কিংবা প্রতীকী, অতিমাত্রায় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট; কিংবা ছকে বাঁধা, সামাজিক শ্রেণী, পেশা, প্রতিষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির প্রতিনিধি। কোথাও তারা একেবারে সজীব রক্তমাংসের মানুষ যাদের সাজ-পোশাক, চলন-বলনে প্রকট হয় সমকালীন জীবন ও পরিবেশের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। আবার কোথাও তারা নাট্যকারের ধ্যান-ধারণার প্রতিভূ, কখনো বা কিছুটা বিস্তৃত।''[৩]

গঠনের দিক থেকে, উপন্যাসের মতই, নাটকীয় চরিত্র দু'ধরণের হতে পারে Flat ও Round. Flat character হ'ল সরল ও একমুখী, কোনো বিবর্তন এই ধরণের চরিত্রে থাকে না। বিশেষ ভাষাভঙ্গি বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে অস্পষ্টভাবে গড়ে তোলা Flat চরিত্রকে নাটকে Type চরিত্রও বলা হয়ে থাকে। Round Character হ'ল বহুমুখী, জটিল চরিত্র, যা নাট্যক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমবিকশিত ও বিবর্তিত হয়।

ঔপন্যাসিকের চরিত্রচিত্রণের সঙ্গে নাট্যকারের চরিত্রচিত্রণের পার্থক্য আছে। ঔপন্যাসিক চরিত্রকে গড়ে তোলার জন্য বিস্তৃত পরিসর পেয়ে থাকেন, চরিত্রকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশও তাঁর থাকে। কিন্তু নাট্যকারকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পরিসরে চরিত্রের অবয়ব নির্মাণ করতে হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁর একমাত্র অবলম্বন চরিত্রই। নিজের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি যোগ করতে পারেন না। চরিত্রের আচরণ এবং সংলাপের ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকার যা পারেন তা হ'ল উপযুক্ত আচরণ, সংলাপ, শারীরিক গঠনসহ একজনকে উপস্থাপিত করা – তারপর সেই চরিত্রকে বুঝে নেবার কাজটি পাঠকের – বুঝিয়ে দেবার দায় বা উপায় নাট্যকারের নেই।

চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকারের চারটি উপায়ের কথা বলেছেন Theodore Hatelen তাঁর 'Orientation to the Theatre' গ্রন্থে ঃ

১. চরিত্রের উপস্থিতি

২. সংলাপ

৩. নাট্যক্রিয়া

৪. অন্য চরিত্রের উক্তি

চরিত্রকে উপস্থাপিত করার বিশেষ মুহূর্তটির ওপর অনেকসময়ই সেই চরিত্র সম্পর্কে পাঠক-দর্শকের ধারণা গড়ে ওঠে, চরিত্রের শারীরিক গঠনের বর্ণনা, বিশেষ কোনো ম্যানারিজম্-এর উল্লেখ প্রভৃতিও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সংলাপ চরিত্র বিকাশের প্রধানতম উপায়। সংলাপের মাধ্যমেই চরিত্রের অবস্থান, তার মানস বৈশিষ্ট্য, ঘটনার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বোঝা যায়। অনেকসময় চরিত্রের অন্তর্লোক প্রকাশে নাট্যকার স্বগতোক্তির ব্যবহার করে থাকেন। তবে আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তি প্রায় বর্জিত হয়েছে। নাট্যক্রিয়াও চরিত্র বিকাশের অন্যতম উপায়। এই ক্রিয়াই নাটকে চরিত্রের ভূমিকা এবং বিবর্তন নির্দেশ করে। কোন্ চরিত্রের ক্রিয়া নাট্যকাহিনিকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাও এ প্রসঙ্গে বিচার্য। অনেকসময় চরিত্র নীরবেও এমন কিছু ক্রিয়া করে, যা নাট্যকাহিনির পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। নাট্যকার নিজে যেহেতু চরিত্রকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ পান না, সেহেতু সেই কাজটি অনেকটাই সাধিত হয় অন্য চরিত্রের উক্তির মাধ্যমে। উপস্থিতি, সংলাপ বা নাট্যক্রিয়া চরিত্রের যেসব জায়গায় আলো ফেলতে পারে না, অন্য চরিত্রের উক্তি সেই অনালোকিত জায়গাগুলিকে স্পষ্ট করে। চরিত্রের অনেক গোপন গুণ বা দোষ, মহত্ত্ব বা দুর্বলতা উন্মোচিত হয় অন্য চরিত্রের উক্তির মাধ্যমে — যার আলোকে পাঠক-দর্শক উদ্দিষ্ট চরিত্রটিকে আরো ভালো বুঝতে পারেন।

মনোজ মিত্রের নাটকের চরিত্ররা প্রায় প্রত্যেকেই আমাদের অতিপরিচিত মানুষ। প্রাত্যহিক জীবনের অতীত কোনো আদর্শলোকে তাদের অবস্থান নয়। ভাঙাচোরা এই পৃথিবীতে ছোটো ছোটো স্বপ্নস্বর্গ তারা রচনা করতে চায়, কিন্তু সেখানেও অজস্র প্রতিকূলতা। এই চরিত্রগুলি ভালোবাসা পেতে চায়, ভালোবাসতে চায়, মানুষের কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকতে চায়। জীবনে খুব সফল মানুষ হয়তো এরা নয়, কিন্তু এদের জীবনেও একটা লড়াই আছে। সে লড়াই হয়তো শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াইয়ের মতো উচ্চস্তরের আদর্শবাদী লড়াই নয়, কিন্তু তাই বলে তাকে তুচ্ছ করাও চলে না। এ লড়াই টিঁকে থাকার লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই। সমাজ-সংসার-পরিজনের সব অনাদর-উপেক্ষা-অবহেলা অতিক্রম করে তাঁর চরিত্ররা বেঁচে থাকে — তিনি তাদের জিতিয়ে দেন — বেঁচে থাকার উপযোগী পরিবেশে উত্তীর্ণ করে দেন। বাংলা নাটক বক্তব্যপ্রধান হতে হতে যখন চরিত্র হয়ে উঠেছে বক্তব্য প্রকাশের 'মাউথপীস' মাত্র, তখন মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে উপস্থিত করলেন পরিপূর্ণ মানুষকে। তাঁর ভাষায়, সে মানুষ হ'ল ঃ ''আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ''[৪] এই মানুষেরা সাদা-কালোর স্পষ্ট বিভাজনরেখায় বিভাজিত নয়। বরং অনেক সময়ই জটিল এবং বহুমাত্রিক। এরা কখন সরল, আর কখন ধূর্ত তাই যেন বুঝে ওঠা যায় না।

চরিত্র চিত্রণে মনোজ মিত্রের অন্যতম প্রিয় বৃদ্ধ চরিত্র। এই বার্ধক্য-প্রীতির দুটি কারণের কথা বলেছেন তিনি ঃ

ক. ''লেখায় বা অভিনয়ে এমন মানুষই আমাকে টানে যার একটা বড়সড় অতীত আছে। অতীতে বারুদ ঠাসা আছে। যে কোনো সময় জ্বলে উঠতে পারে। ক্রিয়ার চেয়ে প্রতিক্রিয়া যার বেশি। তাই বার্ধক্যের বেসাতি আমার লেখায় এবং অভিনয়ে।''[৫]

খ. ''শৈশবে আমার এক বড় ভয় ছিল,... যখন সত্যি সত্যি জরাগ্রস্ত হব, অকেজো অথর্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ব, সে দুরবস্থার সামাল দেব কীভাবে? ... এই ভয় ভাঙাতেই আমার বুড়োদের নিয়ে লেখা।''[৬]

এই বৃদ্ধরা কেউই সমাজের খুব গণ্যমান্য বা কৃতী পুরুষ নয়। তারা সবাই সংসারে বাতিল অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বোঝামাত্র। সংসার তাদের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়, কিন্তু তারা চায় সংসারলগ্ন হয়ে থাকতে। এ বড় বালাই। এরা যেন ভালোবাসার ছিপ ফেলে অপেক্ষা করে, কিন্তু কেউ সেই ছিপে ধরা দেয় না — বঁড়শি ছিঁড়ে পালাতে চায়। এ এক অসম লড়াই। জোর করে ভালোবাসা অর্জনের, জোর করে সংসারে প্রাসঙ্গিক থাকার লড়াই। মনোজ মিত্রের বৃদ্ধরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ে হারে না, প্রবলভাবে বেঁচে থাকে সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে।

মনোজ মিত্রের প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯)-এর কেন্দ্রে আছেন এরকম এক বৃদ্ধ — বঙ্কিম। নিজেরই ঠাকুরদাকে দেখে তিনি এই চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। সংসারে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এই বৃদ্ধ সিঁড়ির পাশের ঘুপচি কুঠুরিতে থাকেন। বাঁচার জন্য তার তীব্র আর্তি। সংসারে সকলে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুন — এই তার আকাঙ্ক্ষা। অথচ সংসার তার থাকা-না-থাকা নিয়ে মাথাই ঘামায় না। এমন একটি দিনের ঘটনায় নাটক গেঁথেছেন নাট্যকার, যেদিন বৃদ্ধের নাতির জীবন নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। কিন্তু বৃদ্ধ মনে করেন, তার বাঁচা-মরাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের শেষে শিশুটি মারা যায়। নিজের স্ত্রী-র মুখে সে সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ সাহস করে কাঁদতেও পারেন না — পাছে তার হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যায়। এই বৃদ্ধের প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত না সহানুভূতি বোধ করা উচিত — তাই যেন বুঝে ওঠা যায় না। পরিবারের অন্য সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বৃদ্ধ আত্মসুখবাদী, কিন্তু তার নিজের দিক থেকে সে জীবনপিয়াসী। পাঠক হিসেবে আমরা যেন এক দ্বিধার মাঝে দাঁড়াই — যেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয় বঙ্কিমের স্ত্রী নীহার।

এরপর ক্রমে আমরা দেখেছি জটা ('চাক ভাঙা মধু'), কেনারাম ('কেনারাম বেচারাম'), গজমাধব ('পরবাস'), বাঞ্ছারাম ('সাজানো বাগান) কর্তা ('দম্পতি'), লম্বোদর ভট্ট ('রাজদর্শন'), ধনগোপাল ('শোভাযাত্রা') রূপচাঁদ ('পালিয়ে বেড়ায়'), ধৃতিকান্ত ('মুন্নি ও সাত চৌকিদার') প্রভৃতি অসংখ্য বৃদ্ধ চরিত্র। এই বৃদ্ধরা সকলেই যে খুব সরল তা নয়, বরং অনেকেই যথেষ্ট জটিল। জটা মাতলাকে শেখায়, কীভাবে মহাজনের বিষ না ঝেড়ে সময় নষ্ট করে মহাজনকে মেরে ফেলতে হবে; গজমাধব কোর্টের নির্দেশে উৎখাত হয়েও নানা কৌশলে 'টাইম কিল' করে; বাঞ্ছারাম জমিদারকে যেসব কথা বলে তার কতটা সহজ-সরল আর কতটা ধূর্ততা-প্রসূত তা বুঝে ওঠা যায় না। 'দম্পতি'র কর্তা বন্ধু জিতেনের সঙ্গে নিজের স্ত্রী-র সম্পর্ক অনুমান করে যে কুরুক্ষেত্র বাধায় তা আসলে অবলম্বনহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কায়। কিন্তু প্রিয় সন্তানেরা যখন নিজেদের সুবিধার জন্য বাড়ি বিক্রি করে মা আর বাবাকে ভাগ করে নেয় দিল্লি আর আসামের মধ্যে — তখন অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রতি যেমন

সহমর্মিতা জাগে, তেমনি ক্রোধ সৃষ্টি হয় আত্মকেন্দ্রিক আধুনিক প্রজন্মের প্রতি। লম্বোদর ভট্ট এক লোভী ব্রাহ্মণ, রাজার শরীরে প্রবেশ করে সেও ক্রমে শিখে নিতে থাকে শাসকের সব ধূর্তামি। জমিদার বংশের উত্তরপুরুষ ধনগোপাল নিজের পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের দায়ে অভিযুক্ত। তিনি এক অসহায় অভিজাত। নিজেকে ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছেন অভিমানে – নতুন কালের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছেন গৃহকোণে। রূপচাঁদ ভালোবাসার কাঙাল। সংসারে নিজের গুরুত্ব যাচাইয়ে তার পদ্ধতিটি অদ্ভুত। সে কেবল পালিয়ে যায় – লুকিয়ে থেকে দেখে, কে তাকে কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে ডাকছে। এই ডাকই শুনতে চায় মনোজ মিত্রের বৃদ্ধরা – সংসারে কিছুটা গুরুত্ব পেতে চায়, ভালোবাসার বন্ধন উপলব্ধি করতে চায়। ধৃতিকান্তও এই ভালোবাসার সন্ধানী। বাহ্যত তাকে কামুক, লম্পট মনে হলেও এক রিক্ত হৃদয় নিয়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সংসারসুখ। নিজের স্ত্রী রাজনীতিতে ব্যস্ত, সন্তানেরা বিদেশে – পারিবারিক শান্তি তিনি পান নি। তাই মুন্নির কাছে চেয়েছেন স্বস্তির আশ্রয়।

মনোজ মিত্রের নাটক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তিনি একটু পুরনো ধরণের মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আধুনিক জীবনে সেই মূল্যবোধ নষ্ট হতে দেখে তিনি বেদনার্ত হয়েছেন। মূল্যবোধের অবক্ষয় যখন দেখা গেছে পরিবারে, তখন সবার আগে তার আঁচ লেগেছে প্রবীণ সদস্যদের ওপর। কারণ তারাই সংসারে অপ্রয়োজনীয়। তারাই অনর্থক জায়গা জুড়ে থাকেন। মনোজ মিত্রের নাটকে বৃদ্ধরা যে শেষ পর্যন্ত হেরে যান না, তার কারণ তিনি পরিবার তথা সমাজে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান। তাঁর নাটকে বৃদ্ধ চরিত্রের সংখ্যাধিক্যের এও অন্যতম কারণ। অবক্ষয়ের চূড়ান্ত ক্ষেত্রটিকেই তিনি বেছেছেন অবক্ষয় রোধ করার জন্য।

অনেকটা একই কারণে তাঁর নাটকে একাধিক শারীরিক প্রতিবন্ধী চরিত্র দেখা যায়। রজনীনাথ ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা') এবং শঙ্খ ('শোভাযাত্রা') এই ধরণের চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পরিবার বা সমাজে যারা প্রান্তিক চরিত্র, যারা ঠিক স্বাভাবিক নয়, কেজো জগতের বিচারে যারা নিতান্ত অকেজো – তাদের অবস্থানটি মনোজ মিত্র যেন বুঝে নিতে চেয়েছেন এইসব চরিত্রের মাধ্যমে। এই চাওয়া সহানুভূতি-সঞ্জাত। পঙ্গুতাকে আবার প্রতীকায়িতও করেছেন তিনি। আধুনিক সময়ের প্রধান অসুখই যেন পঙ্গুতা, স্থবিরতা। Abnormality যেন এই সময়েরই বৈশিষ্ট্য। রজনীনাথের পঙ্গুতা তাই হয়ে ওঠে স্থবির সময়ের প্রতীক। অন্যদিকে জমিদার বংশের উত্তরপুরুষ শঙ্খ জড়বুদ্ধি, জগন্নাথের মতোই ঠুঁটো। তাই নিজের মাকে ধর্ষিতা হতে দেখেও সে কিছুই করতে পারে না – রথের মাথায় বসে শুধু গোঙায়। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে কঙ্কের অন্ধতাও প্রতীকায়িত। কঙ্ক শিক্ষক। শিক্ষাকে অন্ধ করে দিতে পারলে যে কোনো শাসকেরই সুবিধে। রাক্ষস তাই দুটি তপ্ত শলাকা বিঁধিয়ে অন্ধ করে দিয়েছে কঙ্কের দুই চোখ। কিন্তু বাহ্যত অন্ধ হলেও অন্তরের দীপ্তিতে কঙ্ক জ্বালিয়েছে সত্য ও জ্ঞানের প্রদীপ। মনোজ মিত্রের নাটকের অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রগুলি সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ঃ ''প্রতিদিনকার যুক্তিসর্বস্ব হিসেবিপনায় ধূলিপরা চোখ যা দেখতে পায় না, ধরতে পায় না, এমন অনেক কিছু এই বুদ্ধিভ্রংশদের অধিগত। সেই অজানা শক্তির ইঙ্গিত এই চরিত্রগুলির সঙ্গে লেগে থাকে।''[৭] যেমন-'আত্মগোপন' নাটকের 'দাদা' চরিত্রটি। রাস্তার খুনে গুণ্ডাদের শায়েস্তা করতে গিয়েছিল এই দাদা। সাতদিন পর একটা ভাঙা বাড়ির ঘুপচি ঘর থেকে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ, ভয়ে তখন সে শুকিয়ে গেছে। সেই

ভয়ের অভিঘাতেই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে সে। দাদার প্রতিবাদ, অর্পণের ডিপ্রেশন, ঘুষ নিয়ে খারাপ খেলা, বেশ্যার মতো নিজের দর বাড়াবার চেষ্টা – সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক রসায়ন সৃষ্টি করেন মনোজ মিত্র। অর্পণ যখন খাদের একেবারে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন যেসব শুভানুধ্যায়ীর হাত এগিয়ে এসেছে তাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে, তাদের অন্যতম দাদা। দাদাই ভয়ে ভয়ে রূপোর পরীটা বাড়িয়ে ধরে অর্পণের দিকে – 'অসুস্থ' দাদা অর্পণকে আহ্বান জানায় 'সুস্থ' জীবনের দিকে। 'ছায়ার প্রাসাদ'-এর দ্বৈপায়ন প্রতিবন্ধী নয় ঠিকই, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষও তাকে বলা যাবে না। সেও প্রান্তিক। পুরুষের দেহে নারীর প্রাণ লালন করে শ্মশানঠাকুর দ্বৈপায়ন। শ্মশানের ফেলে দেওয়া জিনিস সে বুক দিয়ে আগলে রাখে। নাটকের শেষে দ্বৈপায়ন যখন প্রাসাদে অনাদৃত সুভদ্রাঙ্গী-সন্তান প্রিয়দর্শী অশোককে বুকে তুলে নেয়, তখন এই সত্যই ব্যঞ্জিত হয় যে, সভ্যতাকে রক্ষা করে দ্বৈপায়নের মতো প্রান্তিক মানুষেরাই, তারাই ইতিহাসের প্রকৃত চালিকাশক্তি।

একথা মনোজ মিত্র নিজেই বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন যে, তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা কেউ কৃতী পুরুষ নন। তারা অতি তুচ্ছ, অসহায়, নিঃসঙ্গ। খুব বড়ো বড়ো কোনো তত্ত্বের কথা বলে না তারা, কিন্তু তাই বলে তাদের লড়াইটাও তুচ্ছ নয়। অ্যারিস্টটল নায়ক বলেছিলেন সেইসব চরিত্রকে, যারা above the common level. কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে নায়ক-ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। মঞ্চে মানুষ দেখতে চেয়েছে 'নিজেদের মতো'চরিত্র। ফলে নায়ক ক্রমে 'সাধারণ' হয়েছেন। মনোজ মিত্রের নায়ক কিন্তু এই 'সাধারণ' থেকেও আরো একধাপ নিচে। এদের বলা যেতে পারে 'প্রান্তিক'। ব্রেখটীয় ধারণা অনুসারে এরা সেই 'ছোটোমাপের মানুষ', যারা অস্তিত্বের প্রয়োজনে নানারকম আপস ও কৌশল করে। মহত্ত্বের সম্ভাবনা এদের মধ্যেও আছে কিন্তু তা বিকাশের উপযুক্ত অবসর এদের জীবনে কমই আসে। মাতলা ('চাক ভাঙা মধু'), তুষ্টু ('নৈশভোজ'), ঘন্টাকর্ণ ('কিনু কাহারের থেটার'), পুঁটিরাম ('পুঁটিরামায়ণ'), গজমাধব ('পরবাস'), রূপচাঁদ ('পালিয়ে বেড়ায়') প্রভৃতি সব চরিত্রই সাধারণের চেয়ে একটু নীচুস্তরের। অর্থাৎ এরা কমেডির উপযুক্ত চরিত্র। নায়ক হলেও এরা কিন্তু শুধুই ভালো নয়, বরং ধূর্ততা জটিলতা মিলেমিশে অনেকসময়ই বহুমাত্রিক। মনোজ মিত্র আসলে মানুষকে দেখেছেন সমগ্রভাবে, তাই দোষ-গুণ, ত্রুটি-দুর্বলতাসহ সম্পূর্ণ মানুষ ধরা পড়েছে তাঁর দৃষ্টিতে। মানুষের প্রতিটি অংশকে তিনি পৃথক করে দেখিয়েছেন। মাতলা দরিদ্র, সাপে-কাটা মহাজন অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে তোলার বিনিময়ে সে ঘোচাতে চায় নিজের দারিদ্র্য, আবার মহাজনের অত্যাচারের কথা ভেবে কৌশলে সময় নষ্ট করে তাকে মেরে ফেলতেও চায়। টাকা খেলে রুগী বাঁচাতেই হবে – এই সহজাত ধর্মবোধ তার আছে, আবার জটার কূটবুদ্ধিও সে ফেলে দিতে পারে না। বাদামীকে যখন সে 'কত্তা'কে ঝাড়াবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় – তখনও বুঝে ওঠা যায় না, সে সত্যি বলছে না মিথ্যে! যখন রুগীকে বাঁচাতে তার দায়বদ্ধতা প্রকাশিত, তখন সে মানবধর্মে অনুপ্রাণিত, যখন রুগী বাঁচিয়ে নিজের দারিদ্র্য ঘোচানোর ভাবনায় মগ্ন, তখন সে লোভী, যখন অত্যাচারী মহাজনকে মেরে ফেলার বাসনায় সময় নষ্ট করে, তখন সে ধূর্ত। একই বিশিষ্টতা বাঞ্ছারাম চরিত্রেও। জীবনপিয়াসী বাঞ্ছারামের একটি অংশ নিতান্ত সরল, একটি অংশ চূড়ান্ত ধূর্ত, একটি অংশ প্রতিবাদী, একটি অংশ রসিক এবং একটি অংশ লোভী। সরল বাঞ্ছারাম বাগানের বিনিময়ে নকড়ির সঙ্গে কিস্তিবন্দী হয়েছে, ধূর্ত বাঞ্ছারাম পদ্মর প্রতি নকড়ি এবং তার ছেলের লোভকে কৌশলে কাজে

লাগিয়েছে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায়, প্রতিবাদী বাঞ্ছারাম নিতান্ত ভালমানুষের মতো উচ্চারণ করেছে পরিবর্তিত দিনের কথা, উচ্চারণ করেছে শোষকের পরাজয় এবং শোষিতের উত্থানের কথা, রসিক বাঞ্ছা নাতবৌ-এর সঙ্গে রসিকতা করেছে, লোভী বাঞ্ছা জীবনকে 'ভোগ' করতে চেয়েছে, জীবনের 'ছেনচুরি' করতে চেয়েছে। 'পরবাস'-এর গজমাধবও কখনো অসহায় কখনো ধূর্ত, কখনো বিষণ্ণ, কখনো সহমর্মী। গলু ওস্তাগর লেনের ছত্রিশ বছরের আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে 'অসহায়' গজমাধবকে, কৌশলে 'টাইম কিল' করছে এবং নতুন ভাড়াটেকে ভাংচি দিচ্ছে 'ধূর্ত' গজমাধব, নিজের ছেড়ে আসা প্রেমিকাকে স্ত্রী-রূপে কল্পনা করে মন্দিরার কাছে কাল্পনিক সাজানো সংসারের বর্ণনা দিচ্ছে 'বিষণ্ণ' গজমাধব, আবার শেষে আর এক অনিকেত মন্দিরার জন্য নিজের 'ঘর' ছেড়ে দিচ্ছে 'সহমর্মী' গজমাধব। কেনারাম যখন বেচারামের ছেড়ে যাওয়া সংসারে তাকে 'ফিট করে' দেবার জন্য কাতর অনুনয় করে নগেনের কাছে, তখন সে সংসার-বঞ্চিত অথচ সংসার-লুব্ধ একজন রিক্ত, অসহায় মানুষ, কিন্তু এই কেনারামই যখন বেচারামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধকে 'ব্যবহার' করে, তখন সে ধূর্ত। চরিত্রের মধ্যেকার এরকম একাধিক অংশের উল্লেখ করে ব্রেখট বলেছেন, চরিত্রকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে, যাতে বিভিন্ন অংশের জোড়ের গ্রন্থিগুলি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। এখানেই ব্রেখটের সঙ্গে মনোজ মিত্রের পার্থক্য। মনোজ মিত্র চরিত্রের অংশগুলিকে দেখান, কিন্তু অংশের মধ্যেকার জোড়গুলিকে স্পষ্ট করেন না। তাই তাঁর চরিত্রগুলি কখন অসহায়, কখন ধূর্ত আর কখন লোভী – তা যেন ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। চরিত্রের মধ্যে এই ধোঁয়াশা, এই রহস্যময়তা তিনি ইচ্ছে করেই রক্ষা করেন। এই রহস্যময়তাই মনোজ মিত্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

তুষ্টু একজন চামার, কিন্তু ধর্মবোধ তার প্রবল। জীবনে কোনোদিন কোনো অন্যায় সে করেনি। কিন্তু সামাজিক শকুনেরা তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। যে তুষ্টুর লাশ নিয়ে ষড়যন্ত্রীরা নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিল, নাটকের শেষে সেই তুষ্টুকে জীবিত দেখিয়ে মনোজ মিত্র ঝামা ঘষেছেন স্বার্থপর, লোভীদের মুখে। তুষ্টুও উপলব্ধি করেছে – জীবনের ধর্ম কেবল ঈশ্বর সাধনায় নয়, বরং সন্তান ও সংসার প্রতিপালনে। ঘন্টাকর্ণ ব্যবহৃত মানুষের প্রতিনিধি। সমাজে প্রতিনিয়ত অসহায় মানুষ যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্ষমতাশালীদের দ্বারা, ঘন্টাকর্ণের মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাসই বিবৃত করেছেন মনোজ মিত্র। 'পাখি' নাটকের নায়ক নীতিশ একজন 'হ্যারিকেনের সেলস্‌ম্যান', 'টাপুর টুপুর'-এর কেষ্টদুলাল বোকা-বোকা গ্রাম্য যুবক, 'আকাশচুম্বন'-এ সুপ্রিয় কোচিং সেন্টারের শিক্ষক। মনোজ মিত্র দেখান, এই আপাত-তুচ্ছদের মধ্যেও আছে জ্বলে ওঠার উপাদান। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও তারা জ্বলে ওঠে। একাঙ্ক নাটকের স্বল্প পরিসরেও এই চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ।

নায়কের সন্ধান মনোজ মিত্র কখনো পেয়েছেন পুরাণ, ইতিহাস বা অতীত কাহিনিতে। সৃষ্টি করেছেন অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ('অশ্বত্থামা'), শমীক, শৃঙ্গী ('তক্ষক'), হেকিম ('গল্প হেকিমসাহেব'), লোকেন্দ্রপ্রতাপ ('দেবী সর্পমস্তা'), বিন্দুসার, চাণক্য, সুমন ('ছায়ার প্রাসাদ'), ধৃতরাষ্ট্র ('যা নেই ভারতে') প্রভৃতি চরিত্র। বলাবাহুল্য, প্রতিটি চরিত্রকেই যুক্ত করে দিয়েছেন বর্তমানের অনুষঙ্গে। অশ্বত্থামা হয়ে উঠেছে সাতের দশকের দ্বন্দ্বদীর্ণ যৌবন, কৃপাচার্য হয়েছেন রাষ্ট্রশক্তির হননেচ্ছার কাছে সৃজনস্বপ্নের ব্যর্থ রচয়িতা, কৃতবর্মা হয়েছেন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। শমীক ও শৃঙ্গীকে মনোজ মিত্র গড়েছেন জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে। শেষপর্যন্ত মৃত্যুর ওপর জয়ী হয়েছে

জীবন। শৃঙ্গী বুঝতে পেরেছে নিজের অজ্ঞানতা, মৃত্যুর সীমাবদ্ধতা। দেড়-দুশো বছরের পুরনো দিনের প্রেক্ষাপটে তিনি গড়েছেন ভালোমানুষ হেকিমকে – যে ব্যথা সারাবার জন্য নিজেই যায় রোগীর কাছে। লোকেন্দ্রপ্রতাপের সৃষ্টি কাল্পনিক ইতিহাসের গর্ভে, কিন্তু বিন্দুসার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। নাট্যকাহিনি উভয় ক্ষেত্রেই বিন্যস্ত হয়েছে ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতাকে আশ্রয় করে। বিন্দুসার-পুত্র সুমন হয়ে উঠেছে শাসকের ভিতরকার সেই বিপরীত সত্তা, যে বাঁধ কেটেছিল রুদ্ধ ধারার কিংবা ছিন্ন করেছিল নিজের জাল। ধৃতরাষ্ট্রকে মনোজ মিত্র দেখেছেন নতুন রূপে। ভীষ্ম চান দেশব্যাপী অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার ফিরিয়ে আনতে, আর ধৃতরাষ্ট্র চান হিংসা প্রতিরোধ করতে। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও প্রয়োজন যুদ্ধ। তাই ধৃতরাষ্ট্র বাহিনী গড়েন রাজবাড়ির সেইসব পরিত্যক্তদের নিয়ে – যারা জঙ্গলে মানুষ হয়েছে পাতকিনীর কাছে। তারাই ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর শতপুত্র, যারা সর্বস্ব হারিয়ে পৈশাচিক শক্তি অর্জন করেছে, যারা বংশের সন্তান হয়েও বংশের গৌরব পায় নি।

নায়িকা, বা সাধারণভাবে নারী চরিত্র সৃষ্টিতেও মনোজ মিত্রের লেখনী বৈচিত্র্য-সন্ধানী। নাট্যরচনার প্রথম পর্বে তিনি সৃষ্টি করেছেন নীহারির ('নেকড়ে') মতো চরিত্র, যার প্রতিশোধ বাসনা তীব্র। কিন্তু এরপর থেকেই তার নারী ভাবনায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নীহারিও ছিল মা, কিন্তু নিজের সন্তানের প্রতি অবিচারকে সে নিয়ে গেছে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, শোষিত মানুষকে সংঘবদ্ধ করে শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু বাদামী ('চাক ভাঙা মধু') বাঁচাতে চায় নিজের গর্ভের সন্তানকে। অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে তোলার প্রয়াস যেমন সন্তানের কল্যাণ কামনায়, তেমনি তা শঙ্করের দেখানো সন্তানের বৈধ আশ্রয়ের লোভেও। শেষে কিন্তু এই বাদামী-ই সড়কির আঘাতে হত্যা করেছে অঘোরকে। কারণ অঘোর লালসার থাবা বাড়িয়েছিল তার দিকে। নিজেকে সে অক্ষত রাখতে চেয়েছে সন্তানের জন্যই। অঘোরকে হত্যা করে টলতে টলতে সে এগোয় দোলনার দিকে – ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে। মা-রূপে বাদামী মধুর আধার, আর লাঞ্ছিতা নারীরূপে বিষের। মধুরূপে সে অঘোর ঘোষের প্রাণ বাঁচিয়েছে, আর বিষরূপে প্রাণ নিয়েছে। পদ্ম-ও ('সাজানো বাগান') সন্তানের জন্য লড়াই করেছে, তবে তা বাদামীর তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র। নিজের অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সে বাঞ্ছাবুড়োকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। যতক্ষণ বাঞ্ছা আছে, ততক্ষণই তার সন্তান সুরক্ষিত। জীবনের জন্য এ হ'ল জীবন বাঁচাবার লড়াই। সে লড়াইয়ে জিতেছে পদ্ম। ফুল্লরা ('নরক গুলজার') তার স্বামী মানিকের সঙ্গে পুনর্জন্ম নিয়েছে মর্ত্যে, জ্যান্ত শয়তানের থাবা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে। ক্রোধী মনোজ মিত্র বাঁটুল, ঘোড়ুইদের শায়েস্তা করার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন মানিক-ফুল্লরাকে।

ক্রমে মনোজ মিত্রের নাটকে আমরা পেয়েছি মন্দিরা ('পরবাস'), গিন্নি, দোলন ('দম্পতি'), অলকানন্দা ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা'), গৌরী ('দেবী সর্পমস্তা'), গন্ধকালী, শিখারাণী ('পালিয়ে বেড়ায়'), নুকু, চিত্রা ('নাকছাবিটা'), মুন্নি ('মুন্নি ও সাত চৌকিদার'), অম্বিকা ('যা নেই ভারতে') প্রভৃতি অসংখ্য নারী চরিত্র। মন্দিরা নিজে অনাথ, তাই সে বুঝতে পারে অনিকেত গজমাধবের সংসার-আকাঙ্ক্ষা। গজমাধবকে সে আশ্রয় দিতে চায় নিজের ঘরে, কারণ সে জানে নিরাশ্রয়তার যন্ত্রণা। পার্থিব সব সম্পর্কের অতীত এক মানবিক সম্পর্ক রচিত হয় নাটকের শেষে গজমাধব-মন্দিরার মধ্যে। গিন্নি এবং দোলন দুই প্রজন্মের দুই স্ত্রী। মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, ওপরতলা এবং নিচতলার

দুই পরিবারেই স্বামী-স্ত্রীর কলহ, অথচ সেই কলহের মধ্যে কত প্রভেদ। নিচতলার কলহ শুক-সারীর কলহের মতোই আপাত-রূঢ় কিন্তু গভীরে মধুক্ষরা, আর ওপরতলার কলহে পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস ঘৃণায় পর্যবসিত। অলকানন্দা মাতৃরূপের সার্থক প্রকাশ। নিজের গর্ভজাত না হলেও শুভ বা মানসীকে মায়ের মমতা দিয়েই লালন করেছেন তিনি। অসুস্থ সময়ে চারপাশে যখন বিপর্যয় আর অন্ধকারের সমারোহ, তখন মনোজ মিত্র সৃষ্টি করেছেন এই সর্বংসহা নারীকে, যিনি সময়ের অসুস্থতা অপনোদন করতে চান মমতার আঁচল বিছিয়ে। বহু ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করার পরও আবার কোলে তুলে নেন দেবাহুতির ফেলে যাওয়া সন্তানকে। গৌরীর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে দেবীরূপী মানবীর যন্ত্রণা। দেবী সর্পমন্তারূপে গৌরী সকলের সমস্যার নিদান দেয়, কিন্তু তার হৃদয়যন্ত্রণা নিরসন করবে কে ? তারও তো ইচ্ছে করে, স্বামী-সন্তান নিয়ে গৃহসুখ উপভোগ করতে। কিন্তু দেবীত্ব তার সেই সাধে পরিয়েছে শিকল। গন্ধকালী এক দেহাতী নারী, কিন্তু তারও আছে সহজাত ধর্মবোধ। পরিশ্রম করে সে খায়, 'ডাকাতের মেয়ে' বদনাম তার অসহ্য। তাই ডাকাত-বাপকে ধরতে সে পথে নেমেছে। সেই সূত্রেই পেয়ে গেছে রূপচাঁদকে, বউ সেজে রূপচাঁদের সম্পত্তি আগলেছে। রূপচাঁদের আরেক 'না-হওয়া বৌ' শিখারাণী, যে বর্তমানে পঞ্চায়েত-প্রধান।

নুকু (জানকী) মনোজ মিত্রের আর একটি বিশিষ্ট সৃজন। একই চরিত্রের ছোটোবেলা ও বড়োবেলা নুকু ও জানকী। এ যেন বিচিত্রভাবে জীবনকে দেখা। পরিণতি প্রথমেই পাঠক-দর্শকের কাছে উপস্থাপিত করে দিয়ে তারপর ধীরে ধীরে সেই পরিণতিতে পৌঁছবার ধাপগুলি উন্মোচন। নিছক ভুলের ওপর এক নারীর জীবনের বেদনাদায়ক আখ্যান। চিত্রা এই নাটকে আপাতদৃষ্টিতে স্টান্টবাজ, প্রতাপশালী শ্বশুরবাড়ির সুবিধে-প্রত্যাশী। নুকু মনে করে, দিদির (নুকুর মা) মৃত্যুর পর চিত্রা বীরেশ্বরকে বিয়ে করেছে স্টান্ট দিতেই। প্রাক্তন বিপ্লবী বীরেশ্বর স্বাধীনতার পর জেল থেকে ছাড়া পেলে তাকে এবং নুকুকে নিয়ে চিত্রা হাওয়া বদলাতে এসেছে সেই মোহনপুরে, যেখানে তার শ্বশুরবাড়ি, যে শ্বশুরবাড়ি থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অপরাধে পরিত্যক্ত হয়েছিল বীরেশ্বর। নাটকের শেষে স্টান্টবাজ চিত্রার অন্যরূপ আবিষ্কৃত হয়। বীরেশ্বর মারা গেছে, কিন্তু চিত্রা ফিরে যায়নি দ্বারভাঙাতে বা শ্বশুরবাড়িতে, রয়ে গেছে সেই ভাড়া বাড়িতে, যেখানে উঠেছিল বীরেশ্বরকে নিয়ে। যে কাব্যতীর্থকে আশ্রয় দিয়েছিল বীরেশ্বর, তাকেও রেখে দিয়েছে। এসব যেন বীরেশ্বরের স্মৃতিকেই আঁকড়ে থাকা। এও কি স্টান্ট ? সুদীর্ঘকাল ধরে এরকম স্টান্ট দিয়ে বেঁচে থাকা কি সম্ভব ? মনোজ মিত্র যেন ঘুলিয়ে দেন আমাদের ভাবনা — তার মধ্য থেকেই উঁকি মারে চিত্রার আত্মত্যাগ, তার পতিনিষ্ঠতা। মুন্নি 'নারী' এবং সেই কারণেই তার চারপাশে 'পাহারা' বসাতে হয়। উচ্ছল কৌতুকের মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র দেখান, আধুনিক সমাজেও নারী এক সম্পদ মাত্র, সে সম্পদ রক্ষা করতে পাহারাদার প্রয়োজন হয়। নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই সেখানে স্বীকার করা হয় না। মুন্নি যথার্থ বুঝেছে সংসারে মেয়েদের অবস্থান ঃ

> ''আমি যেন একটা হাতব্যাগের মধ্যেই বসে আছি ... কারো না কারো হাতে ঝুলছি ... কখনও মায়ের হাতে, কখনও সৌরভের হাতে ... কখনও ... হাতে হাতে ঝুলছি। সব মেয়েই বোধহয় তাই, না স্যার ?''[১৮]

কিন্তু মেয়েদের ওপর নির্ভর করলে, তাদের বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখলে তারা যে নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে তা দেখিয়েছে মুন্নি। ভারতকাহিনির অম্বিকাকে মনোজ মিত্র করে তুলেছেন একালের এক নারী – নিজের ওপর, নারীর ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের যে প্রতিশোধ নিয়েছে নিজের জরায়ু বিনষ্ট করে – কুরুবংশের উত্তরাধিকারের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে। কিন্তু সেও তো নারী। নিজের সন্তান-সম্ভাবনা নষ্ট করার পর তাই তার অতৃপ্ত মাতৃত্ব হাহাকার করে। পান্ডুর সন্তান বলে কথিত শিশুদের সে বক্ষে আঁকড়ে ধরতে চায়।

নায়ক-নায়িকার মতোই মনোজ মিত্রের ভিলেনও বহুমাত্রিক। নিছক ক্রূর তারা নয়, তাদের ক্ষোভ, অসহায়তা প্রভৃতিও তিনি দেখান নিপুণ সহমর্মিতায়। কখনও বা কৌতুকের মিশেলে তাদের করে তোলেন সহনীয়। সমালোচকের ভাষায় ঃ ''তাঁর ভিলেইন কখনোই পুরোদস্তুর ভিলেইন নয় – সে তার শ্রেণী অবস্থানে থেকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অভ্যাস ও ব্যবহারের আধার, কিন্তু সেই সঙ্গে সে মানুষও বটে।''[৯] কংসারি ('নেকড়ে') ছিল পুরোদস্তুর ভিলেন। নাট্যকথনের সিরিয়স ভঙ্গির সঙ্গে সেখানে ভিলেনের সিরিয়স টাইপ মিলে গেছে। 'চাক ভাঙা মধু'র অঘোর ঘোষও শোষক। তার শোষণ মানুষকে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে, মানুষ তেড়ে উঠে প্রতিবাদও করতে পারে না। এক বিকৃত লালসার প্রতীক অঘোর, যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভোগ। মরণের পার থেকে ফিরে এসেও তার লালসা কমেনি। সে সমাজের সেই শ্রেণির লোক, যারা সব নিয়ে যায়, এমনকি নারীকেও। মনোজের তীব্র ক্রোধ এই নাটকে বাদামীর সড়কির আঘাতে অঘোরের বক্ষ ফাটিয়ে দিয়েছে। অঘোরেরই শিক্ষিত মার্জিত রূপ শঙ্কর। তার লোভ-লালসার সঙ্গে মিশেছে ধূর্ততা। বাদামীকে আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে সে কার্যসিদ্ধি করেছে। 'শিবের অসাধ্যি'র জোতদার হাঁদু সিংগি শ্রেণি চরিত্র। সমকালের ভারতবর্ষে জোতদার শ্রেণি কীভাবে রাষ্ট্রের নির্ভর ও সহায়ক হয়ে উঠেছিল এবং রাষ্ট্র কীভাবে এই জোতদারদের প্রশ্রয় দিয়েছিল তা দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র এই নাটকে। শোষক এখানে ভুল রেখায় অঙ্কিত। সেই দারুণ দুঃসময়ে শোষকের পরাজয়ের চিত্রও আঁকতে পারেন নি তিনি। তাঁর মনে হয়েছে, জোতদারের সঙ্গে পেরে ওঠা 'শিবেরও অসাধ্যি'। 'নরক গুলজার'-এর বাঁটুল বিশ্বাস, দাড়িবাবা, খচো, রঘুবীর চোংদার প্রভৃতিও শ্রেণিগত খলচরিত্র। মনোজ মিত্র তাঁর বহু নাটকেই এরকম শ্রেণিচরিত্রের স্বরূপ ও ভণ্ডামি উন্মোচন করেছেন।

এরপর থেকে কিন্তু তাঁর ভিলেন অনেকটাই সিরিওকমিক। করালী দত্ত ('পরবাস'), নকড়ি ('সাজোনো বাগান'), রাক্ষস, সেনাপতি-ধনপতি-বিচারপতি ('মেষ ও রাক্ষস'), চক্রধর-গদাধর-ধ্বজাধর ('নৈশভোজ'), ওয়ালী খাঁ, পশুপতি ('গল্প হেকিমসাহেব') এই ধরণের ভিলেনের দৃষ্টান্ত। বাড়িওয়ালা করালী দীর্ঘদিনের ভাড়াটে গজমাধবকে উচ্ছেদ করছেন, কিন্তু তবু যে তার প্রতি যথেষ্ট বিরূপতা জাগে না তার কারণ, মনোজ মিত্র বাড়িওয়ালার অসহায়তাকেও প্রকাশ করেন কৌতুকের মিশেলে। জমিদার নকড়ি দত্ত বাঞ্ছার বাগান গ্রাস করে পিতার অতৃপ্ত আত্মা এবং নিজের লোভকে তৃপ্ত করতে চায়। শোষকের নৃশংসতা মাঝে মাঝেই ফুটেছে নকড়ি চরিত্রে। তৃষ্ণার্ত বাঞ্ছাকে এক ফোঁটা জল দেয়নি সে, বাঞ্ছার আয়ু জানতে ডাক্তার গণৎকার কাউকে সে বাদ রাখে নি, যজ্ঞও করেছে বাঞ্ছার মৃত্যু কামনায়। কিন্তু এইসব নৃশংসতা কৌতুকের মিশেলে প্রকাশ পেয়েছে বলে যথেষ্ট ক্রোধ জাগে না নকড়ির প্রতি। বরং বাঞ্ছার কাছে, জীবনের কাছে, ধাপে ধাপে তার পরাজয় দেখে একধরণের

অনুকম্পা জাগে। রূপকথাধর্মী 'মেষ ও রাক্ষস'-এ রাক্ষস এক সামাজিক শত্রু — যাকে বলা যেতে পারে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক বা পুঁজিবাদের প্রতীক। যৌবনকে ভুল পথে চালিত করে সে স্বার্থসিদ্ধি করে। সেনাপতি-ধনপতি-বিচারপতি রাক্ষসের সাহায্যকারী আমলা, রাক্ষস বন্দী হওয়ায় যারা বেদনার্ত। প্রেতের মতো তারা দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে তোলে যৌবনের সমষ্টি চেতনায়। স্বর্গীয় নারায়ণ কুন্ডুর তিন পক্ষের তিন ছেলে চক্রধর-গদাধর-ধ্বজাধরকে মনোজ মিত্র উপস্থাপিত করেছেন তিনটি মন্দ প্রবৃত্তির প্রতীক হিসেবে। তাঁর নিজেরই কথায় ঃ "The three Characters, Chakradhar, Godadhar and Dhwajadhar, depict three evil motives in man."[১০] গাঢ় কৃষ্ণবর্ণেই এই তিনটি চরিত্র অঙ্কিত। ওয়ালী খাঁ এবং পশুপতি দু'জনেই শোষক চরিত্র। তবে তাদের চরিত্রে, বিশেষত ওয়ালী খাঁর চরিত্রে মনোজ মিত্র ভিন্ন মাত্রা আবিষ্কার করেছেন। হেকিমকে তিনি ভালোবাসেন কিন্তু নিজের মাথা ছাড়িয়ে তার উঠে যাওয়া সহ্য করতে পারেন না। সবসময়ই তিনি নিজের ক্ষমতা এবং অধিকার সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় ভোগেন। সমূহের কল্যাণচিন্তা তিনিও করেন, তবে কখনোই তা নিজের প্রাধান্যের বিনিময়ে নয়। হেকিমের জয়ধ্বনি শুনে তার পায়ের তলার মাটি দুলে ওঠে, হেকিমকে জুতোপেটা করে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেন জনতাকে — হয়তো বা নিজেকেও। কিন্তু হেকিমকে পাদুকাঘাত করার পরই যেভাবে তীক্ষ্ণ স্বরে মোহর বাঈকে বলেছেন ঃ "খুশি তো বাঈ, এবার খুশি তো ?"[১১], তাতে তার চরিত্রের ভিন্নতর এক মাত্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

নায়ক বা প্রতিনায়ক চরিত্রের মতোই মনোজ মিত্র সমান মনোযোগী পার্শ্বচরিত্রগুলির প্রতিও। নাটকগুলিতে প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই বিচিত্র রূপ দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন তিনি। তাই তাঁর চরিত্রসৃজন এত বৈচিত্র্যময়। পার্শ্বচরিত্রগুলি কখনো শ্রেণি হিসেবে উঠে এসেছে, কখনো বা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ফুকনা ('চাক ভাঙা মধু'), ভৈরব ('কেনারাম বেচারাম'), ছিদেম, হাঁদু সিংগি ('শিবের অসাধ্যি'), গুঁইবাবা-পান্নালাল-ঘোড়ুই-নেংটি-খচো-মানিক-ফুল্লরা ('নরক গুলজার'), ভুবন ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা'), রাজা-উজির-লাটসাহেব-মৌনীবাবা ('কিনু কাহারের থেটার'), নাটুলাল-চুড়োমামা ('দর্পণে শরৎশশী'), নরসুন্দর-কুম্ভ-ক্ষৌণি ('ছায়ার প্রাসাদ'), রায়বাহাদুর-রিন্টু-হেমন্ত ('নাকছাবিটা') মাদারি মাস্টার-পুরুত-গার্ড-দালাল-কসাই ('রঙের হাট') কঞ্চুকী ('যা নেই ভারতে'), চুমকি ('ব্রিজের ওপর বাপি') প্রভৃতি শ্রেণিচরিত্রের টাইপ। মনোজ মিত্র এঁদের মধ্য দিয়ে শ্রেণির বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়ে তুলেছেন। কেউ শোষিত শ্রেণি, কেউ বা শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। শোষিতের প্রতি তিনি যেমন সহানুভূতিশীল, শোষকের প্রতি তেমন নির্মম। এই শ্রেণি চরিত্রগুলির পাশাপাশি তাঁর নাটকে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল অসংখ্য পার্শ্বচরিত্রও বর্তমান। যেমন নগেন পাঁজা ('কেনারাম বেচারাম'), জিতেন ('দম্পতি'), দেবাহুতি ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা'), বিভীষণ-রাবণ-মেঘনাদ-কুম্ভকর্ণ-পুরোহিত ('পুঁটিরামায়ণ'), মোহর বাঈ-ছায়েম-গঙ্গামণি ('গল্প হেকিমসাহেব'), উদাস-ইচ্ছে ('দেবী সর্পমন্তা'), কাব্যতীর্থ ('নাকছাবিটা'), সিতিকন্ঠ ('দর্পণে শরৎশশী'), বিভূতি ('আত্মগোপন') প্রভৃতি। নগেন পাঁজা হারিয়ে যাওয়া মানুষ খুঁজে নিয়ে এসে সংসারে 'ফিট' করে দেয়। সবসময় যে ঠিক লোকটিকেই আনে তা নয়, তবে নিজের বক্তৃতার গুণে সেই লোককেই ঠিক বলে প্রমাণ করে ছাড়ে। বাক্যবয়নে তুখোড়, প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন এই লোকটির ভেতরকার অসহায়তা যখন নাট্যকার দেখিয়ে দেন একটিমাত্র সংলাপে, তখন তার ভেতরকার অন্যতর সত্তাটি প্রকাশ পেয়ে যায়, যা তাকে উত্তীর্ণ করে দেয় পাঠক-

দর্শকের সহমর্মিতায়। 'দম্পতি' নাটকে দুই প্রজন্মের বৈপরীত্য দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র। সন্তানেরা যখন নিজেদের প্রয়োজনে বাড়ি বিক্রি করে বাবা-মা-কে বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত, তখন বন্ধু জিতেন রুখে দিয়েছে সেই বিচ্ছেদ। স্বার্থপর আধুনিক প্রজন্মের বিপ্রতীপে নাট্যকার প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন জিতেনের ঔদার্যকে। দেবাহুতি চরিত্রটিও সেই আধুনিক প্রজন্মের প্রতিনিধি — সন্তান যাদের কাছে বিলাসের প্রতিবন্ধক। অলকানন্দা যখন অন্যের ছেলে-মেয়েকে আঁকড়ে রাখে নিজ পক্ষপুটে, দেবাহুতি তখন নিজের সন্তানকে ফেলে চলে যায়। সেই সন্তানকেও পরম মমতায় বুকে তুলে নেয় অলকানন্দা। দেবাহুতি চরিত্রটি একদিকে যেমন অলকানন্দার মহনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিফলিত করেছে তথাকথিত আধুনিকতার উন্মার্গগামিতা।

বিভীষণ-রাবণ-মেঘনাদ-কুম্ভকর্ণ নামে মহাকাব্যিক চরিত্র, কিন্তু আসলে তারা এযুগের শাসন-কাঠামোর এক-একটি অংশ। আধুনিক রাজনীতিক তথা শাসককুলের স্বার্থপরতা, ইমেজপ্রিয়তা, ষড়যন্ত্র, সমাজকে নেশাগ্রস্ত করে রাখা প্রভৃতি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে। ছায়েম এবং গঙ্গামণি শ্রেণিচরিত্র হয়েও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মনোজ মিত্র এরকম চরিত্র তাঁর একাধিক নাটকে সৃষ্টি করেছেন। একই ধরণের চরিত্র ভিন্ন প্রেক্ষাপটে তিনি দেখেছেন উদাস-ইচ্ছে-ডাহুক-কুন্ডলা-র মধ্যে। উদাস দেবী সর্পমস্তার মানবী রূপ স্পষ্ট করেছে, ইচ্ছে ফিরিয়ে দিয়েছে রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপের পৌরুষ, ডাহুক-কুন্ডলা রক্ষা করেছে গৌরীকে — দেবী সর্পমস্তাকে। ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের 'কাইব্যতীর্থ' মশাই বা সংক্ষেপে 'মশা' ওপার বাংলার এক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু, যার উপার্জনের ওপর পদ্মাপারের একাধিক 'প্যাট' নির্ভর করে আছে। কাব্যতীর্থ নুকুকে দিয়েছিল শঙ্খ-মুক্তার নাকছাবি, যা ছিনিয়ে নিয়েছে তান্ত্রিক। জীবনের শেষ পর্বে আবার এক শঙ্খমুক্তার নাকছাবি উপহার পেয়েছে নুকু (জানকী) কাব্যতীর্থের কাছ থেকে। এই শঙ্খমুক্তা ঝুটা কিন্তু কাব্যতীর্থের সংলাপের মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র পৌঁছে গেছেন এক দার্শনিক অনুভবে। কাব্যতীর্থই নুকুকে আহ্বান জানিয়েছে নতুন জীবনের দিকে। তার মধ্যে প্রোথিত করতে চেয়েছে নতুন প্রত্যয় ঃ " হ, লাইফ ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজ। আসো না, নতুন কইর‍্যা বাঁচি। সবাই মিলা। ছোট মাসির এই বাড়িখানায় ..."[১২] সিতিকন্ঠ আবার সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী চরিত্র। মঞ্চের কাছাকাছি, মঞ্চের সঙ্গে থাকার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা। বিভূতি আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে লুকিয়ে থাকতে চায়। তার লুকিয়ে থাকার জায়গাটাও অদ্ভুত — গণিকালয়। মনোজ মিত্র এইসব চরিত্রের মাধ্যমে দেখান, জীবনের বিচিত্রতা। নির্দিষ্ট একটি জায়গায় কেবল নির্দিষ্ট প্রয়োজনেই মানুষ যায় না। আরো বহুতর কারণ থাকে। এভাবেই বিচিত্রধর্মী অসংখ্য চরিত্রের সমবায়ে তার চিত্রশালা সাজিয়েছেন মনোজ মিত্র।

নিতান্ত ছোটো চরিত্রগুলির প্রতিও তিনি সমান মনোযোগী। ফলে এই চরিত্রগুলিও একদিকে যেমন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, অন্যদিকে তেমনি নাট্য-প্রয়োজনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভৈরব ('কেনারাম বেচারাম'), গুপী, চোর, ডাক্তার, মোক্তার, গণৎকার, পুরোহিত ('সাজানো বাগান'), দুই ডাকাত বেনারসী ও তোতাপুরী ('মেষ ও রাক্ষস'), ভাঁড়ুদাস, কুব্জা, পরিচারক ('রাজদর্শন'), ঢ্যাঙা, তান্ত্রিক, নেতা, মস্তান ('নৈশভোজ'), ভুবন, বাদল, পার্থ ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা'), মৌনীবাবা ('কিনু কাহারের থেটার'), পন্ডিত, বৈদ্য, রক্ষী, মাছরাঙা ('পুঁটি রামায়ণ'), মুকুল, মন্মথ, নদু, এন্তাজ, বসাক ('শোভাযাত্রা'), নাটুলাল, ইন্দ্র, চুড়োমামা, তুফান ('দর্পণে শরৎশশী'),

বক্কর, তাকিয়া, ভন্ডুল ('গল্প হেকিমসাহেব'), পরাগ, ভুতু, দাদু ('পরবাস'), নরসুন্দর, কুম্ভ, ক্ষৌণি ('ছায়ার প্রাসাদ'), হুলো, নেপাল, আতাউল্লা খান ('পালিয়ে বেড়ায়'), লতিকা, পমমামা, গোগোল, হরিশ্চন্দ্র ('মুন্নি ও সাত চৌকিদার'), সারেঙ্গি, নেপুর ঠাকুমা, পূজারিণী ('কুহুযামিনী'), মাদারি মাস্টার, পুরুত, গার্ড, পাগল, দালাল ('রঙের হাট'), পাতকিনী ('যা নেই ভারতে'), চুমকি ('ব্রিজের ওপর বাপি'), পদো ('মৃত্যুর চোখে জল'), গোপাল ('পাখি'), হাবলা জনার্দন ('পাকে বিপাকে'), তুলসীদাস ('মহাবিদ্যা'), প্রভাত ('প্রভাত ফিরে এসো'), খুরশিদ ('আঁখিপল্লব'), বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রিক্সাওয়ালা, ব্রহ্মচারী, কনস্টেবল, হাজতের আসামী ('দন্তরঙ্গ') প্রভৃতি অসংখ্য ছোটো ছোটো চরিত্রর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি। জীবনের বিচিত্র অঙ্গন থেকে আহৃত এইসব চরিত্র তাঁর জীবনদৃষ্টির প্রসারতাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এইসব চরিত্রের মধ্যে অনেকগুলি, যেমন – তান্ত্রিক, নেতা, মস্তান, পুরোহিত, মৌনীবাবা প্রভৃতি শ্রেণিচরিত্র। সাধারণভাবে এদের ভন্ডামির স্বরূপ উন্মোচনই নাট্যকারের লক্ষ্য। সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রতিটি চরিত্রকেই যথাসম্ভব সম্পূর্ণতা দিয়েছেন বলে চরিত্রগুলি আরোপিত মনে হয় না কখনোই, দৃঢ়ভাবে তারা নাট্যলগ্ন হয়ে থাকে। যেমন – 'কেনারাম বেচারাম' নাটকে ভৈরবের আকস্মিক উপস্থিতিকে মনোজ মিত্র যুক্তিসহ করে দেন, বসিরহাটে তার ইলেকট্রিকের তার চুরি করে বহিষ্কৃত হবার ঘটনা উল্লেখ করে। 'সাজানো বাগান'-এর ডাক্তার-মোক্তার-গণৎকার-পুরোহিত সেই সেই পেশার ক্যারিকেচার। নাটকে নকড়ি দত্তের উদ্বেগ-উৎকন্ঠার বিপ্রতীপে তাদের আচরণ কৌতুকরসের আমদানি করেছে। বাঞ্ছার বেঁচে থাকাকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে গুপী এবং চোর। 'রাজদর্শন'-এর কুব্জা বা 'যা নেই ভারতে'-এর পাতকিনীর মতো চরিত্র ইতিহাসের সম্ভাবনা-প্রসূত, যাদের দিয়ে মনোজ মিত্র গুরুত্বপূর্ণ নাট্যপ্রয়োজন সাধন করেছেন। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য় ভুবনবাবু বাড়িওয়ালার টাইপ, বাদল-পার্থ-র পারিবারিক বন্ধন অলকানন্দার পরিবারের ধ্বস্ত অবস্থাকে বৈপরীত্যে উজ্জ্বল করেছে। 'পুঁটি রামায়ণ'-এ পন্ডিত, রক্ষী প্রভৃতি সকলেই যখন সুযোগ নিতে ব্যস্ত, তখন বৈদ্য-র মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন মানুষের অধঃপতনের বেদনা, শুভচেতনার অস্তিত্ব। শোভাযাত্রায় মুকুল সেই প্রজন্মের প্রতিনিধি, যারা গ্রামের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে শহরমুখী হয়েছে; মন্মথ সেই বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, যারা দেবতাকেও ব্যবসার উপায় বলে মনে করে। এন্তাজ বা ঝড়েশ্বরের মতো চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে ছড়িয়ে দেখেন। বাংলার গ্রামের উৎসবের যে সহজ স্বাভাবিক সুর একসময় জাগত সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে, তারই রেশটুকু যেন চারিয়ে দিয়েছেন এই চরিত্রগুলির উপস্থিতির মাধ্যমে। তবে ছোটো চরিত্রের সার্থকতার চূড়ান্ত রূপ যেন এই নাটকের 'বসাক' চরিত্রটি। জগন্নাথের ভোগ রান্নার জন্য কেটারিং এর লোক ঠিক করেছে নদু। সেই লোকই বসাক। চরিত্রটি পোশাক, দাঁড়াবার ভঙ্গি নিয়ে যেন জগন্নাথের ভোগের সঙ্গে মূর্তিমান অসঙ্গতি ঃ ''প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেঁকে দাঁড়ায়। গলায় টাই বাঁধা।''[১৩] উপস্থিতির গোটা সময়টাতে বসাক নির্বাক। কিন্তু নদুকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তার একমাত্র সংলাপ থেকে যখন বোঝা যায় যে সে তোতলা, তখন দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকার কারণ উপলব্ধি করে হাসি উপ্‌চে ওঠে।

'গল্প হেকিমসাহেব'-এ বক্কর বা তাকিয়া নিজেদের উপস্থিতি দ্বারাই হাস্যরস সৃষ্টি করে। 'পরবাস'-এ পরাগ-ভুতু-দাদু একই মেসের বাসিন্দা। বিচিত্র তাদের পেশা। কেউ আবহাওয়া অফিসে

চাকরি করে, কেউ বা রেফারি। চরিত্রায়নে মনোজ মিত্রের দৃষ্টির সর্বত্রগামিতা এর মধ্য দিয়ে প্রকট। আবার 'পালিয়ে বেড়ায়'-এ আতাউল্লা খান আতা বাংলাদেশি নাগরিক, যে কিনা ভারতবর্ষের ট্রেনে ছিনতাইবাজের খপ্পরে পড়েছে। দেশ দেখতে এসে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার'-এ লতিকা, পমমামা, গোগোল, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মুন্নির সব চৌকিদারই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। আর ধৃতিকান্তের চৌকিদার খাসনবীশও দেহরক্ষীর টাইপ অতিক্রম করে সার্থক ব্যক্তিচরিত্র হয়ে উঠেছে। একাঙ্ক নাটকগুলির ক্ষেত্রেও এরকম স্বল্প উপস্থিতি অথচ নাট্যলগ্ন চরিত্রের পরিচয় যথেষ্ট রয়েছে। যেমন – 'পাখি' নাটকে গোপাল পাড়ার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অতি প্রয়োজনীয়। নাট্যকার এইসব পরোপকারী বেকার ছেলেদের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছেন একটি মাত্র সংলাপে ঃ ''আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এলেই পাড়ায় সে কী কান্নার রোল ওঠে – গোপলা বুঝি চাকরিতে ফেঁসে গেল রে ...''[১৪] গোপালের মতো মানুষ এযুগে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষদেরও মনোজ মিত্র সযত্নে স্থান দেন নিজের নাটকে। 'আঁখিপল্লব'-এর খুরশিদ নিজে অশিক্ষিত, কিন্তু শিক্ষাকে সম্মান দিতে সে জানে। তাই নিজেদের বস্তিতে পল্লবকে রেখে দিতে তার আত্যন্তিক আগ্রহ। এভাবেই জীবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আহৃত অসংখ্য চরিত্রের সমাহার ঘটেছে মনোজ মিত্রের নাটকে। তিনি আসলে জীবনের ছবি এঁকেছেন বৃহৎ ক্যানভাসে। সেখানে তাই ধরা পড়েছে বহু বিচিত্র মানুষের ছবি। কেবল উপস্থিতি নয়, নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা সার্থক 'চরিত্র' হয়ে উঠেছে।

শারীরিক গঠন বা বিশেষ কোনো ম্যানারিজম প্রভৃতির সাহায্যে চরিত্র সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার বিষয়টিও মনোজ মিত্রের নাটকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন -'সাজানো বাগান'-এ নকড়ি দত্তের মুখে 'লুজ ক্যারেক্টার' কথাটি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে; কোঁৎকার কথা বলার বিশেষ ধরণটিও লক্ষণীয়; 'সন্ধ্যাতারা'য় পুত্রবধূ সুরমা চোখের পাতা না ফেলে অনেকক্ষণ একদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে; 'চাক ভাঙা মধু'র দাক্ষায়ণীর 'মুখখানা দেখলে সারাক্ষণ একটা গোপন কেলেঙ্কারির কথা মনে পড়ে'; 'নেকড়ে'র হাবা কথা বলতে পারে না, যা তার হিংস্রতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে; 'স্মৃতিসুধা'র ছানা কথা বলে বাঙাল ভাষায় কিন্তু গানের ক্ষেত্রে তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ; 'নৈশভোজ'এ চক্রধর এক পা দিয়ে আরেক পা চুলকায়, ধ্বজাধরের কণ্ঠস্বর ভাঙা ফ্যাসফেসে; 'রাজদর্শন'-এ মহামাত্য সবসময় নাক দিয়ে ফিঁৎ ফিঁৎ শব্দ করে, পরিচারক মহিলা স্বভাবের; 'দর্পণে শরৎশশী'তে তুফান ছেলে হয়েও নাটকে মেয়েদের পার্ট করে বলে আচরণে মেয়েলি; 'গল্প হেকিমসাহেব'-এ ছায়েম 'কল্পনা করা' কথাটি বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করে; 'পুঁটি রামায়ণ'-এ টেঁপা অবিকল টেঁপা মাছের মতো দেখতে। এইসব শারীরিক বর্ণনা এবং চারিত্রিক বিশিষ্টতা একদিকে যেমন নাট্যকারের মনোযোগ প্রমাণ করে, অন্যদিকে তেমনি চরিত্রের ভূমিকা এবং আচরণকেও নির্দিষ্ট করে দেয়।

কেবল বিচিত্র ধরণের মানুষই নয়, তাঁর নাটকে চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে ভূত-প্রেত-পিশাচ-দেবতা থেকে শুরু করে কাক, শেয়াল, মেষ, এমনকি খাসি-পাঁঠা পর্যন্ত। নাটকে অপ্রাকৃত জগতের উপাদান ব্যবহার কতটা যুক্তিযুক্ত সে প্রশ্ন সমালোচক মহলে বারবার উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিমের সেই পরিচিত মতটিরই স্মরণ নিতে পারি ঃ ''যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের

অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।''[১৫] এই নিয়মের অধীন হওয়ার ফলেই অতিপ্রাকৃতও চরিত্র হয়ে ওঠে। দিল্লির এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'সাজানো বাগান' নাটকে প্রেতাত্মার উপস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে মনোজ মিত্র যা বলেছিলেন, প্রকারান্তরে তা বঙ্কিমের কথাকেই সমর্থন করে ঃ

''প্রঃ বাস্তববাদী নাটকে মরা মানুষ কেন চরিত্র হলো ?

মনোজ ঃ নাটকের চরিত্র বাঁচা মরার ঊর্ধ্বে নয় কি ?...

প্রঃ আপনি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন ?

মনোজ ঃ ব্যাপারটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসেরও ঊর্ধ্বে।''[১৬]

অর্থাৎ নাট্যকারের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল অতিপ্রাকৃত উপাদান নাট্যিক শর্ত পূরণ করে চরিত্র হয়ে উঠতে পারছে কিনা। 'সাজানো বাগান'-এ ছকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা সেই শর্ত পূরণ করতে পেরেছে, কখনো অতিপ্রাকৃত ব্যবধান তাকে স্বতন্ত্র করে রাখে নি। এই ভূতের উপস্থিতি খুব স্বাভাবিকভাবেই 'ওথেলো', 'টেমপেস্ট', 'হ্যামলেট' বা 'ম্যাকবেথ' নাটকের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু ঃ ''সে ভূতের রসিকতাও ভারতীয়। তার চাবুক চালান, তার রসস্থ গান, তার তামাক খাওয়ার পার্থিব অভ্যাস বুদ্ধিদীপ্ত পঞ্চতন্ত্র বা ঈশপের আমল স্মরণে এনে দেবে।''[১৭]

মনোজ মিত্র মনে করেছেন, বস্তুনিষ্ঠ নাটকে অলৌকিক বা অপ্রাকৃত বিষয় থাকলে শুরুতেই তা উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। কারণ ঃ ''অলৌকিক থেকে লোকায়তে অবতরণ যত মসৃণভাবে ঘটে, উল্টোদিকে লোক থেকে অতিলোকে আরোহণ কিন্তু ততই মুশকিলের, জার্ক লাগে, যাকে বলে ঝাঁকুনি।''[১৮] এই কারণে প্রথম অভিনয়ে ছকড়ি দত্ত নাটক কিছুক্ষণ চলার পরে ঢুকলেও তারপর থেকে শুরুতেই তার আবির্ভাব। একই ঘটনা ঘটেছে 'নৈশভোজ' নাটকের ক্ষেত্রেও। একজোড়া শেয়াল সেখানে নাটকের চরিত্র, যাদের প্রথমে তিনি এনেছিলেন নাটকের মাঝপথে। ফলে বাস্তবের সঙ্গে তাদের জোড়া লাগানো যায় নি। পরে নাটকের শুরুতেই তাদের নিয়ে আসেন। মনোজ নিজে এই দুই ক্ষুধার্ত শিয়ালের উপস্থাপনা প্রসঙ্গে নাটকের 'folk character'-এর কথা বলেছেন। লোভী স্বার্থপর মানুষ এবং শেয়ালে যে কোনো পার্থক্য নেই তা প্রকাশ পেয়েছে এই দুই চরিত্রের মাধ্যমে। গাছে কাঁঠাল এবং তুষ্টুর লাশ দেখে সকলেই গোঁফে তেল দিচ্ছে। শেয়াল চায় জৈবিক ক্ষুধার নিবৃত্তি, আর কুণ্ডু ভাইরা চায় আগ্রাসী লোভের নিবৃত্তি। নাটকের শেষে শেয়াল এবং কুণ্ডু ভাইদের গলা জড়াজড়ি করে গাওয়া হতাশার গান তাদের সাধর্ম্য স্পষ্ট করেছে। 'নরক গুলজার'-এ একসঙ্গে স্বর্গ-নরক-মর্ত্যকে ধরেছেন মনোজ মিত্র। স্বর্গের দেবতা এবং নরকের পিশাচরা সেখানে চরিত্র হয়ে উঠেছে। তবে দেবতা ও পিশাচ দুয়েরই মানবায়ন ঘটেছে। পরিস্থিতি সৃজন, সংলাপ রচনা এবং অনুষঙ্গ ব্যবহারের দ্বারা নাট্যকার সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের দুর্বিষহ পরিস্থিতিকেই তুলে ধরেছেন। ব্রহ্মা হয়েছেন দিল্লির শাসক, গুঁইবাবা-পান্নালাল-ঘোড়ুই-নেংটি -খচো হয়েছে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গকে নরকে পরিণত করার কুশীলব, যারা মৃত্যুর পরও রিবার্থ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে চায় লুটেপুটে খাবার জন্য। সমকালীন প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথা বলার জন্য মনোজ মিত্র আড়াল নিয়েছেন দেবতা-পিশাচের। প্রত্যক্ষ শরসন্ধানে যে কিছুটা অসুবিধে ছিল তা দূর করতে স্বর্গ-নরকের প্রেক্ষাপটে

আড়াল থেকে শরনিক্ষেপ করেছেন। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে মানুষ মেষে রূপান্তরিত হয়েছে রূপকথার আঙ্গিক মেনে। এই রূপান্তর প্রতীকী। শেষপর্যন্ত আবার মেষের মানুষে উত্তরণ দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র। কাক-কে চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন তিনি দুটি একাঙ্ক নাটকে – 'কাকচরিত্র' এবং 'সাহেববাগানের সুন্দরী'। প্রথমটিতে কাক ভূয়োদর্শিতা নিয়ে উপস্থিত। উঁচু থেকে এই জগতের দিকে তাকায় বলে কাক দেখতে পায় সাধারণ মানুষের দৃষ্টি-অতীত অনেক কিছুই। এই কাক নাটকে হয়ে উঠেছে ভুখা মানুষের প্রতিনিধি। তার মুখে মনোজ মিত্র দিয়েছেন অমোঘ সংলাপ ঃ ''রাষ্ট্রপতি তোমায় পুরস্কার না দিয়ে আমায় যদি একখানা রুটি দিত গা।''[১৯] দ্বিজুবাবু, ডাক্তার দাশ,সাধু, এমনকি নাট্যকার ব্যোমকেশের সত্যদর্শন ঘটেছে কাকেরই মাধ্যমে – সে সত্য কুৎসিত, বীভৎস। এই কাকই শেষে ব্যোমকেশকে সাহস জুগিয়েছে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে। 'রঙের হাট'-এ মনোজ মিত্র এনেছেন ব্ল্যাকি, ফুটু, করুণা প্রভৃতি খাসি-পাঁঠাকে। দুনিয়াজোড়া বাজারে সবকিছুই পণ্য, সবেরই মূল্য নির্ধারিত হয় বাজারদরের ওপর। এই বাজারে স্নেহ-মায়া-মমতা সব তুচ্ছ, সত্য কেবল মূল্য। ফার্ম হাউসে সৃষ্ট খাসি ব্ল্যাকি তাই নিজের সর্বোচ্চ দামের সময়ই বলি হতে চায়। সে দর নিয়ে মরবে, সস্তা দামে কারো খাদ্য হবে না। আধুনিক জীবনের এই হ'ল দর্শন – বাঁচাও দর নিয়ে, মরাও তাই। ঘরের জীব ফুটুকে হাটে এনেছে খালপাড়ের মেয়ে শান্তা। শুষ্ক চোখে ফুটুকে কসাইখানায় বিক্রি করে সে বাবুর সঙ্গে বাজি জিততে চায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফুটুকে ঘিরেই শান্তা ফিরে পায় মায়া-মমতা-ভালোবাসার আশ্রয়।

চরিত্রের চেয়ে মনোজ মিত্র নিজের নাটকে 'মানুষ'কেই প্রধানত উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। চরিত্রের চেয়ে মানুষের ব্যাপ্তি বেশি। তিনি নিজে বিষয়টিকে দেখেছেন এভাবে ঃ ''খণ্ড বা অংশ জুড়ে জুড়ে 'পূর্ণ' বা সমগ্রকে পাওয়া যায় না। বিবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর যোগফলে একটা মানুষ নয় — গোটা মানুষটা যোগফলের অতিরিক্ত কিছু।''[২০] এই অখন্ড মানুষকেই চিনতে এবং চেনাতে চেয়েছেন তিনি। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য যেসব চিত্র পরিচালকের অধীনে কাজ করেছেন মনোজ মিত্র, তাঁরাও তাঁকে চরিত্রে অভিনয়ের পরিবর্তে অভিনেয় মানুষটিকেই ধরবার পরামর্শ দিয়েছেন। চরিত্রের অখণ্ডতা বা সম্পূর্ণতা সৃজনে তাঁর প্রধান অবলম্বন চরিত্রের গায়ে এক পোঁচ অন্ধকার জমানো, পাঠক-দর্শকের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত একটা মাত্রা সংযোজন।অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন যে, প্রতিটি মানুষের উচিত অন্তরে খানিকটা অন্ধকার পোষা। এই কথাটিই একটু ঘুরিয়ে মনোজ মিত্র বলেছেন নাটকের চরিত্র সম্পর্কে ঃ ''অভিনেয় চরিত্রটির গায়ে এক পোঁচ অন্ধকার জমাতে পারলে – ক্ষণকালের জন্যেও তাকে দুর্জ্ঞেয় করে তুলতে পারলে ... সেই চরিত্রটি সম্পর্কে দর্শকের কৌতূহল কখনো ফুরোয় না।''[২১] এই অন্ধকার জমানোর অবকাশ রয়ে গেছে মনোজ মিত্র সৃষ্ট একাধিক চরিত্রে। যেমন – 'মৃত্যুর চোখে জল', 'পরবাস' বা 'সাজানো বাগান' নাটকগুলির শেষে প্রধান চরিত্র বঙ্কিম, গজমাধব বা বাঞ্ছারাম পাঠক এবং দর্শকের প্রত্যাশিত বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। এই অন্ধকার জমিয়ে তোলার ফলেই তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিকে আর শুধু সরল বা ধূর্ত, ভাল বা মন্দ, কমিক বা ট্রাজিক – এরকম কোনো একরৈখিকতায় বাঁধা যায় না। সবকিছু মিলিয়ে যে রূপ তারা ধারণ করে তা প্রচলিত বোধের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। যেমন, বাঞ্ছারাম যখন বলে ঃ '' ভালো লাগে না কত্তা, তোমার টাকা খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকতি ভালো

লাগে না আমার।''[২২] তখন বুঝে ওঠা যায় না, সে সরল না ধূর্ত। বাঞ্ছা যেন খেলিয়েছে নকড়িকে। প্রবল জীবনপিপাসা দিয়েই নকড়ির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। অথচ কোথাও সে প্রতিরোধ উচ্চকিত নয়। সহজ ভঙ্গিতে বলেছে দিনবদলের কথা। এসব জায়গায় বাঞ্ছা হয়ে ওঠে আমাদের বোধ-বুদ্ধির অতীত। 'পরবাস'-এর গজমাধব সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আশ্রয়হীনতার অসহায়তায় সঙ্গে কখন যে মিশে যায় ধূর্ততা তা বুঝে ওঠাই কঠিন। আবার যখন মন্দিরা তাকে আশ্রয় দিতে চায় তখন আর একজন নিরাশ্রয়ের সাজানো ঘরের স্বপ্ন ভেঙে দিতে চায় না বলেই পথে নামে গজমাধব – নামে নিজের কোনো নিশ্চিত আশ্রয়ের আশ্বাস না পেয়েই। এই আত্মত্যাগও তো মিশে ছিল সেই ধূর্ততার মধ্যেই। হাসি আর অশ্রু, কৌতুক আর বিষাদ একাকার করে দিয়েছেন মনোজ মিত্র গজমাধব চরিত্রে। শেষের দিকে মন্দিরার সহমর্মিতা এবং আহ্বানে অনুক্ত যে সম্পর্কের ক্ষীণ আভাস রচিত হতে যায় তারও ইঙ্গিত মাত্র দিয়েই থেমে যান তিনি – মন্দিরা আর গজমাধব দু'জনকেই নিয়ে যান অন্যতর উচ্চতায়। সম্পর্ক নিয়ে এই আলো-আঁধারি খেলা লক্ষ্য করা যায় 'শোভাযাত্রা' এবং 'নাকছাবিটা' নাটকেও। 'শোভাযাত্রা'য় বাড়ির পুরোহিত যামিনী এবং অতসীর মধ্যে একটা অনুক্ত সম্পর্কের আভাসমাত্র আছে। মনোজের মিত্রের কৌশল এখানেই। স্পষ্ট না বলেও সংলাপে এমন সুর সংযোজিত করে দেন, যা চরিত্রে প্রত্যক্ষ অতীত ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। অতসী যখন বলে ঃ ''হয়ত অনেক আগেই যেতে তুমি। বিনি মাইনেতে একটা ভাঙা মন্দির আঁকড়ে এতকাল কেন যে রয়ে গেলে...''[২৩] তখন 'ভাঙা মন্দির' ব্যাঞ্জনায় হয়ে ওঠে অতসী নিজেই। যামিনী চলে যাবার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অতসীর কান্নার যে মঞ্চনির্দেশ তা ইঙ্গিতকে স্পষ্টতর করেছে। 'নাকছাবিটা' নাটকে এই অস্পষ্ট সম্পর্কের আভাস আছে কাব্যতীর্থ-নুকুর মধ্যে। ঠাকুমার কাছ থেকে পাওয়া শঙ্খমুক্তার নাকছাবি যখন কাব্যতীর্থ উপহার দেয় নুকুকে তখন হৃদয়ের বেদনাভরা এক দীর্ঘশ্বাসও কি বেরিয়ে আসে না ঃ ''সুন্দরী কইন্যা শুন, জীবন পইড়া আছে, হাটে হাটে কেনাবেচাও পইড়া আছে। কিছু তো থাকে, যা কেনাও যায় না, বেচাও যায় না...''[২৪] চিত্রা যখন নুকুর মাথাটা কোলে নিয়ে নাকছাবিটা পড়াচ্ছে তখনকার মঞ্চনির্দেশেও মনোজ চারিয়ে দেন অস্পষ্টতা ঃ ''নুকু চিৎকার করে - নাকছাবি পরার যন্ত্রণায়, নাকি অন্য কারণে বোঝা যায় না।''[২৫] এই অস্পষ্টতা, এই রহস্যময়তাতেই মনোজ মিত্রের চরিত্রের 'মানুষ' হিসেবে সম্পূর্ণতা। 'নৈশভোজে'র ঢ্যাঙা বা 'শোভাযাত্রা'র নদুর মধ্যেও আমরা দেখি এই রহস্যময়তা। ঢ্যাঙা যেভাবে তুষ্টুর মৃত্যুর শোকের অজুহাতে চক্রধরকে 'খিস্তি' করেছে তা মনোজ মিত্রের একটি বিশেষ কৌশল। একই কৌশল তিনি ব্যবহার করেছেন 'মহাবিদ্যা' একাঙ্কটিতে তুলসীদাস চরিত্রটিতে। 'শোভাযাত্রা'র নদু ধনগোপালকে ব্ল্যাকমেল করে, না বৃহৎ ক্ষতিসাধনের অবসর খোঁজে, না সত্যি সত্যিই কাজ চায় তা নিয়েই যেন ধন্দ পাকিয়ে ওঠে। এরকম বহুমাত্রিকতার দৃষ্টান্ত তাঁর সৃষ্ট প্রায় প্রতিটি চরিত্রেই লভ্য।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) Orientation to the Theatre - Elements of Drama - Theodore Hatlen - Peter Owen - London - First British Commonwealth, p.43

২) বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার – সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় – পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি – ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ.

৩) সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ – কুন্তল চট্টোপাধ্যায় – চতুর্থ সংস্করণ – অক্টোবর ২০০৪ – রত্নাবলী – কোলকাতা-০৯, পৃ.১০৮

৪) অলীক সুনাট্য রঙ্গে - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন, কোলকাতা - ০৯, পৃ. ৩২

৫) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০৬, পৃ . ২০

৬) ঐ, পৃ. ২১

৭) মনোজ মিত্রের কমেডির ভাষা ভাষ্য - শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড-এর ভূমিকা

৮) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কার্তিক ১৪১০, পৃ.১৮৫

৯) নাট্যকার মনোজ মিত্র - পবিত্র সরকার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড-এর ভূমিকা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৩

১০) The tree haunted me - Manoj Mitra - PCP - 25.10.1986

১১) গল্প হেকিমসাহেব - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, মাঘ ১৪০২, পৃ.১৪২

১২) ঐ, পৃ.৫৩

১৩) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩১

১৪) পাখি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৪৩০

১৫) প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত - বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - বিবিধ প্রবন্ধ - বঙ্কিম রচনাবলী - দ্বিতীয় খন্ড - কামিনী প্রকাশালয়, কলি - ০৯, পৃ.১৮৮

১৬) বাঞ্ছারাম - থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র, পৃ.১২৮

১৭) ঐ, পৃ.১২৮

১৮) ঐ, পৃ.১২৭

১৯) কাকচরিত্র - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৩৫৯

২০) বাঞ্ছারাম - থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র, পৃ.২৪

২১) ঐ, পৃ.

২২) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলি-৭৩, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ.৪৯

২৩) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৪৭

২৪) নাকছবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২৯

২৫) ঐ, পৃ. ২৯

সংলাপ

অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির চতুর্থ উপাদান হিসেবে যাকে বলেছিলেন Diction বা ভাষা, পরবর্তীকালে তাকেই বলা হয়েছে Dialogue বা সংলাপ। নাম থেকেই স্পষ্ট যে, এ হ'ল একাধিক চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথন। অনেক সময় চরিত্র নিজের মনে যে কথা বলে তাও সংলাপ। প্রকৃতপক্ষে সংলাপই নাটকের প্রধানতম অবলম্বন। কারণ নাট্যকার নিজের ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করার জন্য যে চরিত্রগুলি নির্বাচন করেন, তাঁরা সংলাপের মাধ্যমেই সেই ধারণা ও বিশ্বাসকে ব্যক্ত করে থাকে। মনে রাখতে হবে, শব্দ দ্বারা নির্মিত বাক্যই কেবল সংলাপ নয়, অনেক নীরব ক্রিয়াও অনেকসময় ব্যঞ্জনায় এতটা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে যে, তা সংলাপের মর্যাদা পেয়ে যায়। সংলাপ আসলে নাট্যক্রিয়ারই একটি রূপ, যা আরোপিত নয়, উদ্ভূত হয় নাট্যদেহ থেকে। এখানেই প্রশ্ন আসে স্বাভাবিকতার। এই স্বাভাবিকতা কাঙ্ক্ষিত চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী। গল্প বা উপন্যাসে যেমন ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনা-বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে, নাটকে তা নেই। এখানে চরিত্রের বিকাশ, নাট্যকাহিনির ক্রমপরিণতি প্রভৃতি সবই একান্তভাবে সংলাপ নির্ভর।

Theodore Hatlen তাঁর 'Orientation to the Theatre' গ্রন্থের 'The Elements of Drama' অধ্যায়ে নাটকের ভাষা (Diction) সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, সেখানে সংলাপের ভূমিকাকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে ঃ

ক) সংলাপ চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরে।

খ) নাট্যক্রিয়ার গতিশীলতাকে প্রতিফলিত করে।

গ) চরিত্রের অন্তরে কী ঘটছে তার ইঙ্গিত দেয়, অন্তরের আনন্দ-দুঃখ-বিষাদ উন্মোচিত করে।

ঘ) আবেগ, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বকে বাচিক রূপ দেয়।

সংলাপ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়েও তিনি উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ঃ

ক) সংলাপ হবে সাধারণ এবং ঘরোয়া, শ্রোতা যেন শোনামাত্র তা বুঝতে পারেন।

খ) কৌতূহলোদ্দীপক বা আকর্ষক (Interesting)।

গ) তা হবে জীবন ও চরিত্রের Spirit ধারণে সক্ষম

ঘ) চরিত্র এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ

ঙ) গতিশীল (Dynamic)

চ) তা সাধারণ কথোপকথনের প্রতীতি জাগাবে।

মনে রাখতে হবে, এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সংলাপ রচনার ক্ষমতা। নাটক ও নাট্যচরিত্রের বিষয়, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি মাথায় রেখে নাট্যকারকে সংলাপ রচনা করতে হয়। গাম্ভীর্যপূর্ণ ট্রাজেডির সংলাপ এবং লঘু রসাত্মক কমেডির সংলাপ নিশ্চয়ই একরকম হবে না, আবার রূপক-সাংকেতিক নাটকের সংলাপকে হতে হবে ব্যঞ্জনাগর্ভ।

এইসব বিষয় বিবেচনায় রেখে Theodore Hatlen বলেছেন, উপযুক্ত সংলাপ রচনায় নাট্যকারের থাকা উচিত ঃ

ক) কবিজনোচিত অনুভূতি

খ) সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি

গ) প্রকাশসৌষ্ঠব

ঘ) বিষয় সম্পর্কিত সচেতনতা

ঙ) শব্দবিন্যাসের কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান।

সংলাপ রচনার পদ্ধতিগুলিও তিনি নির্দিষ্ট করেছেন ঃ

ক) সংলাপ—শৃঙ্খল রচনা

খ) স্বগতোক্তি

গ) ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা

ঘ) অতি সংক্ষিপ্ত, কখনো বা একক শব্দের সংলাপ। যেমন দেখা যায় Absurd নাটকের ক্ষেত্রে।

ঙ) বাচিক ঐকতান (Chord speeches)

চ) প্রত্যেক ধ্বনিতে পৃথক জোর দিয়ে উচ্চারণ।

ছ) সঙ্কেতময় বাক্যাংশ ব্যবহার।

জ) একোক্তি, প্রস্তাবনা, উপসংহার প্রভৃতির ব্যবহার।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যাপক মনোজ মিত্র তত্ত্বগত এইসব দিকের কথা নিঃসন্দেহে অবগত ছিলেন কিন্তু যে কোনো সার্থক প্রতিভার মতোই তিনি তত্ত্বকে স্বীকার করেও অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর লেখার বিষয় সবসময়ই 'আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ'। সেই মানুষের সহজ সাধারণ কথাবার্তাকেই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর নাট্যসংলাপে। স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর সৃষ্ট সংলাপের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। পরিস্থিতি এবং চরিত্র-উপযোগী সংলাপ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সংলাপের স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর নাটককে দিয়েছে স্বচ্ছন্দগতি। তাঁর নাট্যসংলাপ কখনো ব্যঙ্গে নিপুণ, কখনো উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, কখনো হাস্যরস-সৃজক, কখনো বিষাদে বিধুর, কখনো চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচক, কখনো বা পরিস্থিতিগত কৌতুক সৃজনে অনায়াস। তাঁর নাট্য সংলাপের এই বহুমাত্রিকতা প্রসঙ্গে ড. পবিত্র সরকার বলেছেন ঃ

> '' তাঁর (মনোজের) নানা চরিত্রের সংলাপে ইংরেজি শব্দগুচ্ছের ব্যবহার, কখনও 'পান্'-বিলাস ও মিলের উচ্ছলতা, কখনও সাধু ভাষায় সংলাপ, ভুয়ো সংস্কৃত শব্দ এবং সংলাপে উদ্ভট কল্পনা ও non-sequitur-এর প্রয়োগ (অর্থাৎ যা যুক্তিসংগত উত্তর নয় তাকেই উত্তর হিসেবে চালানোর চেষ্টা), মজাদার গান ও ছড়ার ছড়াছড়ি, নাটকে একেবারে মহামারী কান্ড তৈরী করে।''[১]

মনোজের মিত্রের নাটক পাঠকালে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই মঞ্চনির্দেশ সংলাপের মতো গুরুত্ব পেয়েছে। নাট্যকারের ভেতরে নিহিত গল্পকার সত্তাটি যেন এসব ক্ষেত্রে প্রকাশিত। নাটকীয় তাৎপর্যের দিক থেকেও এইসব মঞ্চনির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ। নাটক পাঠের সময় এইসব নির্দেশ পরিস্থিতিগত তাৎপর্য যেমন ফুটিয়ে তোলে, তেমনি চরিত্রবৈশিষ্ট্য উন্মোচনেও সহায়তা করে। প্লটকে গতি দানের ক্ষেত্রেও এইসব মঞ্চনির্দেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'অশ্বত্থামা' নাটকের দুটি পর্বের নামকরণ করেছেন — 'গোধূলি পর্ব' এবং 'নিশীথ পর্ব'। 'গোধূলি পর্ব'-এর সূচনায় মঞ্চনির্দেশ ঃ

> ''তখন গোধূলিবেলা। দিগন্তে উজ্জ্বল হলুদ আলো। প্রান্তরের মাঝখানে একটি যুদ্ধরথ দাঁড়িয়ে ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। রথচূড়ার ধ্বজাটি ছিল ভাঙা এবং অবনত। প্রান্তরে রথটিকে আগলে শিলাখন্ডের উপর বসেছিল দুই রাজপুরুষ। ... চরাচর নিঃশব্দ''[২]

এই বর্ণনা পাঠকের কল্পনাদৃষ্টিতে ফুটিয়ে তোলে যুদ্ধধ্বস্ত এক পটভূমির রিক্ততা ও বিষণ্ণতা। রথচূড়ার ভাঙা ধ্বজা নির্দেশ করছে এই রথের আরোহীর পরাজয়ের বার্তা। আর ভাঙা রথ 'আগলে' দুই রাজপুরুষের বসে থাকা যেন চরম দুঃসময়েও আনুগত্যের প্রতীক। পুরাণ বা ইতিহাস-আশ্রিত প্রায় সবগুলি নাটকেই মঞ্চনির্দেশের এই সংলাপের ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ হওয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন - 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকে প্রতিটি দৃশ্যের শিরোনাম দৃশ্যস্থিত বিষয়ের ব্যঞ্জনা করে। 'ধূলির ঝড়ে ... পথে প্রান্তরে', 'ইতিহাসের ইন্দ্রজাল / পাটলিপুত্র টালমাটাল', 'আঁচলখানি ধূলায় ভরা / লুকিয়ে রাখে সন্ধ্যাতারা', 'মধ্যযামের ঐশ্বর্য/ কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্য' 'ক্রান্তিকালের কবি / একটি নির্বাক ছবি' প্রভৃতি শিরোনামের যে ব্যঞ্জনা তা উপলব্ধি করতে পারেন কেবল নাটকের পাঠক, নাট্যদর্শক এই আস্বাদন থেকে বঞ্চিত। 'দর্পণে শরৎশশী' বা 'রঙের হাট' নাটকওে এরকম দৃশ্য-শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে। মহাভারতীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত ছোটো নাটক 'তক্ষক'-এর মঞ্চনির্দেশের কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ ক) ''গহন অরণ্য। মেঘলা, ছায়াঘন। দীর্ঘকায় বৃক্ষের সারি দূরে নিশ্চল। স্থানে স্থানে লতাগুল্মে ঢাকা প্রস্তর স্তূপ।''[৩] খ) ''শৃঙ্গী ও ঋষি। তাদের থমথমে মুখচোখে বুকের মাঝে

উথাল পাথাল ঝড়ের ইংগিত। তাদের নিঃশব্দ দ্রুত পদচারণায় তীব্র উত্তেজনা। সমগ্র পরিবেশ দুর্বোধ্য রহস্যজালে ঘেরা।'' [৪]

পটভূমি নির্মাণে এইসব মঞ্চনির্দেশের ভূমিকা সংলাপের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্রের অন্তর্জগৎ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরাসরি ইতিহাস না হ'লেও অতীত দিনের কাহিনি-আশ্রিত 'শোভাযাত্রা', 'দর্পণে শরৎশশী' বা 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে মঞ্চনির্দেশের এই গুরুত্ব লক্ষিত হয়। যেমন - 'শোভাযাত্রা' নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য শুরু হচ্ছে এই মঞ্চনির্দেশের মধ্য দিয়ে ঃ ''রথটা নেই। রায়বাড়ির উঠোনটা আজ খাঁ খাঁ। শেষ বিকেল। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো আকাশ মেঘলা। চারপাশ ভিজে ভিজে। বাড়িটা নীরব, নিঃসাড়।''[৫] 'কিছু আগে বৃষ্টি হয়ে যাওয়া', 'আকাশের মেঘলা ভাব' বা 'চারপাশের ভিজে ভিজে অবস্থা' মঞ্চে কীভাবে দেখানো হবে না ভেবেই মনোজ মিত্র যেন এক ঘোরের মধ্যে লিখে চলেন, যা নাটকের পাঠ্যমূল্য বাড়িয়ে তোলে। 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে মঞ্চনির্দেশে সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি, সম্ভবত অতীত অনুষঙ্গ ফুটিয়ে তুলতেই। 'প্রস্তাবনা' এবং 'উপসংহার' অংশে মনোরমার যে বর্ণনা দিয়েছেন নাট্যকার তা প্রায় এক। কেবল সামান্য অংশের ভিন্নতাতেই পরিস্থিতিগত বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে। 'প্রস্তাবনা' অংশে ঃ

> ''তাহার পরিধানে সাধারণ কালোপাড় শাড়ি, গোলমুখে ফাঁদিনথ।... পাতাকাটা ঘনকালো কেশরাশি তাহার লোলচর্ম মুখে আনিয়াছে এক বেয়াড়া সৌন্দর্য। দৃশ্যচিত্রহীন বৃত্তাকার আলোকপটে দর্শকের মুখোমুখি সে, গান গাহিতেছে।''[৬]

'উপসংহার' অংশের বর্ণনা ঃ ''প্রস্তাবনা দৃশ্যের মতো তাহার পরিধানে সাধারণ কালোপাড় শাড়ি, গোলমুখে ফাঁদিনথ। ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি তাহার লোলচর্ম মুখে আনিয়াছে এক বেয়াড়া সৌন্দর্য। চন্দ্রালোকিত দগ্ধ মঞ্চে সে...''[৭]

কেবল শেষ বাক্যাংশটি ভিন্ন হয়ে পরিস্থিতিগত ভিন্নতা ফুটিয়ে তুলেছে। উভয়ক্ষেত্রেই মনোরমা একই গান গেয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতির ভিন্নতায় সেই গান ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে। এই নাটকেও প্রত্যেক দৃশ্যের সূচনায় শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে। 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে 'সবুজ মাথাওয়ালা বুড়ো তালগাছ' প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। নাট্যকার লিখেছেন ঃ''সমগ্র নাট্যের পশ্চাৎপট একটাই – মুক্ত আকাশ, প্রাচীন তালগাছ এবং শতাধিক বছরের পুরনো কবর।''[৮] মুক্ত আকাশ এখানে মানুষের স্বাধীন চিন্তার প্রতীক। প্রাচীন তালগাছ ব্যঞ্জিত করেছে অতীত কালকে। লক্ষণীয়, তালগাছ 'বুড়ো' হলেও তার মাথা 'সবুজ', যা প্রাণময়তার প্রতীক। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সূচনায় মঞ্চনির্দেশ ঃ ''সূর্য ডুবছে। তালগাছের মাথায় ঝিকমিকে রোদ্দুর, হালকা বাতাস । মাঝে মাঝে স্তব্ধতা ভেঙে ঝুমঝুমির মতো বেজে উঠছে টানটান শক্ত পাতাগুলো। চামর দুলিয়ে মুশকিল আসান গাইতে গাইতে ফকির এলো নির্জন কবরের কাছে।''[৯] ডুবন্ত সূর্য, প্রাচীন তালগাছ, স্তব্ধতা, নির্জনতা, মুশকিল আসান গান – সব মিলিয়ে অতীতের গন্ধমাখা এক রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

'রাজদর্শন' নাটকের সূচনায় যে মঞ্চনির্দেশ দিয়েছেন নাট্যকার তা নাটক পাঠের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সার্থক। মঞ্চে অভিনয় দর্শনের মতোই আস্বাদন যেন পাওয়া যায় এই বর্ণনায় ঃ

"ঘোর অন্ধকার। ধীরে ধীরে সেই অন্ধকারে একটি ঘোরতর দেবমূর্তি ভেসে উঠল, সাক্ষাৎ মহাশনি। ... ক্রুদ্ধ শনি ওপর পাটির ধবলশুভ্র দন্তপংক্তি দিয়ে কালিবর্ণ ওষ্ঠ কামড়ে, অগ্নিগোলক লোচনদুটিকে বন্‌বন্‌ পাকাচ্ছে।" [১০] 'নৈশভোজ' নাটকে প্রথম অঙ্কের শেষে যে মঞ্চনির্দেশ তা যেন মনোজীয় ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। ভণ্ড নেতা ধ্বজাধরের মাথার ওপর 'হদ্দ গরিব' তুষ্টু চামারের নিরলম্ব পা ঝুলিয়ে দিয়ে মঞ্চে নাট্যকার যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন, তা যেন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে মঞ্চনির্দেশের অক্ষরগুলির মধ্য দিয়েও। কথিত সংলাপের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয় এই ইঙ্গিতময় মঞ্চনির্দেশ। দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনায় মঞ্চনির্দেশ দৃষ্টিগ্রাহ্যতার অতিরিক্ত এক তাৎপর্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ "আরো গভীর রাত। কুন্ডুদের কাঁঠালগাছ ... বুকে একটা লাশ নিয়ে মা কালীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।"[১১] রাতের অন্ধকার, লাশ এবং মা কালীর অনুষঙ্গ আসন্ন পরিস্থিতিগত জটিলতা ও ভয়াবহতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। 'নাকছাবিটা' নাটকে সমুদ্রের আওয়াজকে নাট্যকার নাট্যবিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে সমুদ্রের বিভিন্ন রূপ কীভাবে নাট্যবিষয়ের সঙ্গত করেছে তা ব্যক্ত হয়েছে মঞ্চনির্দেশের মাধ্যমে। নাটকের সূচনায় 'নির্জন নিঃস্তব্ধ বাংলো বাড়ি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল' সমুদ্রতরঙ্গের গুঞ্জনে, দ্বিতীয় অর্ধের দ্বিতীয় খন্ডে জানকীর গানের সঙ্গে বাজনা বাজায় সমুদ্র, সেই খন্ডেরই শেষে নুকুর হাহাকার বয়ে বেড়ায় সমুদ্রের গর্জন, আবার নাটকের শেষে সমুদ্রের কাছে চলে আসা জীবনের দার্শনিকতার বিস্তৃতির ইঙ্গিত দেয়। এই নাটকেই চরিত্রের বহুমাত্রিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় একটি মঞ্চনির্দেশে ঃ "নুকুর মাথাটা কোলে নিয়ে নাকছাবি পরাচ্ছে চিত্রা। নুকু চিৎকার করে — নাকছাবি পরার যন্ত্রণায়, নাকি অন্য কারণে বোঝা যায় না। তবে সে মাত্রাতিরিক্ত ছটফট করছে।"[১২] মঞ্চনির্দেশ কীভাবে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক হয়ে উঠতে পারে, তারও দৃষ্টান্ত আছে এই নাটকে। রায়বাহাদুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে নাট্যকার লিখেছেন ঃ "বিশাল পেটের ওপর প্যান্টের গ্যালিস, থুতনিতে মোচার ল্যাজের মতো একমুঠো দাড়ি, প্রতিপদের চাঁদের মতো একফালি গোঁফ।"[১৩] সুনির্বাচিত উপমাগুলির ব্যবহার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

কেবল মঞ্চনির্দেশ নয়, অনেকসময় মনোজ মিত্রের নাটকে ছোটো ছোটো নাট্যক্রিয়াও সংলাপের ব্যঞ্জনা পেয়েছে। বিশেষত মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে এইসব নাট্যক্রিয়া বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যেমন 'সাজানো বাগান' নাটকে। এই নাটক মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের জেগে ওঠার লড়াই। চারপাশের বহু প্রতিকূলতা এবং ষড়যন্ত্র বাঞ্ছাকে মেরে ফেলতে চায়। এরমধ্যে প্রধান নকড়ি দত্তের প্রবল লোভ। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নকড়ি, ডাক্তার গোবিন্দকে দিয়ে বাঞ্ছার নাড়ি দেখায় এবং মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে না। বিরক্ত নকড়ি বেরিয়ে যায় এবং তারপর ঃ "গোবিন্দ ওষুধ দেবে বলে ব্যাগ খুলছে। মোক্তার টুক করে ডাক্তারের ওষুধের ব্যাগ তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল।"[১৪] মুমূর্ষু বাঞ্ছার ওষুধের প্রয়োজন জীবনের জন্য, কিন্তু তার জীবনের চেয়ে মৃত্যু যাদের বেশি প্রয়োজনীয় তারা বাঞ্ছাকে বাঁচতে দিতে চায় না। তাই জীবনের রসদ সরিয়ে নিয়ে যায়। আপাতভাবে পূর্ব সংলাপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সরিয়ে নেওয়া কৌতুককর মনে হলেও এর গভীরে নিহিত বিষাদ পাঠক-দর্শকচিত্তকে সহজেই নাড়া দেয়, বাঞ্ছার প্রতি জাগে সহমর্মিতা এবং নকড়ির প্রতি ঘৃণা। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকেও একটি নাট্যক্রিয়া বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার ঠিক আগে অলকানন্দা যখন মানসীর কাছে আজ আর যাওয়া হবে না বলে দু'হাত ছড়িয়ে গায়ের চাদর খুলে

ফেলছে ঠিক সেই মুহূর্তে লালা তাকে ডেকে দেখিয়েছে শুভকে। নাট্যকারের বর্ণনা ঃ

> "পাখির ডানার মতো অলকানন্দার প্রসারিত দুই হাতে চাদরের দুটো প্রান্ত ঝুলছে। অভিমানী নিঃশ্বাসের ঘাতে প্রতিঘাতে ভারি বুক ওঠানামা করছে। শুভ তার দিকে এগিয়ে আসছে। অলকানন্দা মুখ ঘুরিয়ে নিল। শুভ তার পায়ের কাছে বসে চাদরের প্রান্তটা মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। দূরে মন্দিরে ঘন্টা বাজছে, পাখিরা ডাকছে।"[১৫]

অলকানন্দার প্রসারিত দুই হাতে মায়ের আশ্রয়ের আশ্বাস, কিন্তু পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে সেই মা অভিমানী। শুভ আশ্রয় পেতে চায় মায়ের কাছে, তাই চাদরের প্রান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া। মন্দিরের ঘন্টা মঙ্গলের বার্তাবহ, আর পাখির কাকলি অন্ধকার রাত্রি শেষে নতুন দিনের সূচনার ইঙ্গিতবাহী। সংলাপের মতোই প্লট ও চরিত্রের বিকাশে সমান গুরুত্বপূর্ণ এই নাট্যক্রিয়া। 'আত্মগোপন' নাটকে একেবারে শেষে বিভূতিদার আত্মহত্যার পর অর্পণ যখন উন্মাদপ্রায় তখন তার দিকে এগিয়ে আসে অনেকগুলি সহানুভূতির হাত। সেইসময় নাটকে পূর্বে ব্যবহৃত একটি 'প্রপ্'-কে ঘিরে অর্পণের জড় বাক্‌শক্তিহীন দাদার নীরব নাট্যক্রিয়া অসামান্য হয়ে উঠেছে। ঝুলি থেকে রূপোর পরীটা বের করে তার ওপর বলটা বসিয়েছে দাদা। এর আগে দীর্ঘসময় পরীটি ছিল বল ছাড়া — ছিল অসম্পূর্ণ, দাদা তাকে পূর্ণতা দিয়েছেন। রূপোর পরীটা নিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন অর্পণের দিকে, ভয়ে ভয়ে তার দিকে মূর্তিটা বাড়িয়ে ধরেছেন। অর্পণের চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে। এই নাট্যক্রিয়াটিকে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

> "ফুটবল হাতে রূপোর এই পরী একটা উপকরণমাত্র যা এক একটা চরিত্রের কাছে এক একটা সময়ে তারই কোনো আর্তি বা আকাঙ্ক্ষা বা আবেশের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তার চরিত্রেরই কোনো মাত্রার অবলম্বন হয়ে উঠে এই নাটকের মধ্যেই একটা রূপকার্থ পেয়ে গেছে।"[১৬]

একইরকমভাবে 'শোভাযাত্রা' নাটকে উঠোনের মাঝখানের রথটিকে ঘিরে এরকম নাট্যক্রিয়া সৃজন করেছেন মনোজ। রথের মাথায় চড়ে ফুলের মালা গলায় চারপাশে জ্বলন্ত প্রদীপে শোভিত জড় শঙ্খ যখন নিজের মাকে ধর্ষিতা হতে দেখে বিস্ফারিত চোখে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে থাকে তখন ব্যঞ্জনায় শঙ্খ আর জগন্নাথ এক হয়ে যায় — দুজনেই ঠুঁটো, দুজনেই অনাচারে বাধা দিতে অপারগ। তাই অতসীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়, আর ধনগোপালেরও।

চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন অর্থাৎ চরিত্রের অন্তরে কী ঘটছে তার ইঙ্গিত দেওয়া, চরিত্রের আবেগ-ইচ্ছা-প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বকে বাচিক রূপ দেওয়া সংলাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মনোজ মিত্রের নাটকের সংলাপ চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনে সার্থক। চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতি নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি যে সংলাপ তাদের মুখে তুলে দিয়েছেন তা হয়েছে চরিত্রোপযোগী, স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাতন্ত্র্যসূচক। যেমন 'অশ্বত্থামা' নাটকে একদিকে কৃপাচার্য অন্যদিকে কৃতবর্মার মাঝে পড়ে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দ্বন্দ্ব-বিক্ষত। কৃপাচার্য তাকে আহ্বান জানিয়েছেন শান্তির দিকে, সৃজনের দিকে আর কৃতবর্মা আহ্বান জানিয়েছেন ধ্বংসের দিকে, হত্যার দিকে। বারংবার ব্যর্থ অশ্বত্থামা অন্তত একবার সাফল্যের জন্য লালায়িত হয়ে হত্যার পথই বেছে নিয়েছে। কিন্তু হত্যার পর তার চিত্তে জেগেছে অনুতাপ। সেই অনুতাপের উচ্চারণ একদিকে যেমন মহাভারতীয় গাম্ভীর্য রক্ষা করেছে, অন্যদিকে তেমনি অশ্বত্থামার অন্তরটিকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছে ঃ

" কে, কে বলে রে হত্যা ... কে বলে রে গুপ্তঘাতক আমি ... নীতিহীন অবিবেচক? ওরে মূর্খ, মানুষেরই দেখিস নীতি নেই ... দেখিস না এই ধরণীর গাছে একটি পাতা নেই ... তড়াগে নেই জলকণা! কাতারে কাতারে মৃতদেহ শ্মশান শকুনি! এমন রিক্ত নিঃস্ব বিধবা ধরিত্রী! ওরে কোথা হতে আসে নীতি ... কোথায় বাস করে পুণ্য! (থেমে) মহারাজ, বলো মহারাজ, এই শেষ রক্ত! বলো মহারাজ, আর হিংসা নয়, ধ্বংস নয় – এবার সৃজন! এই মুহূর্তে একটা বৃহৎ সৃজনের বাসনা আমায় অস্থির করে তুলেছে! বলো মহারাজ, যত প্রাণ নাশ করেছি আমরা, তত প্রাণ সৃজন করব আমরা! বলো মহারাজ, এই ধরিত্রীর তৃণমূলে জল দেব! তাকে লালন করব! অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে ..."[১৭]

অশ্বত্থামার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর চরিত্র কেনারাম ('কেনারাম বেচারাম'), গজমাধব ('পরবাস') বা বাঞ্ছারাম ('সাজানো বাগান')। বৃদ্ধ চরিত্র মনোজ মিত্রের অতি প্রিয়। এই বৃদ্ধরা সমাজের উল্লেখযোগ্য কেউ নয়। সমাজ তাদের মেরে ফেলতেই চায়, কিন্তু তারা চায় পরিবার সমাজের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকতে, জীবনকে আঁকড়ে ধরতে। তাদের সেই জীবনাকাঙ্ক্ষা এবং জীবনার্তি রূপ পেয়েছে সংলাপে। নিঃসঙ্গ কেনারাম করুণ আবেদন জানিয়েছে নগেন পাঁজার কাছে, তাকে সংসারলগ্ন করে দেবার জন্য ঃ

" পারবে, পারবে নগেন, এইসব আমার করে দিতে পারবে ? নগেন, আমি নিঃস্ব, পথে পথে ভিক্ষে করে খাই। তুমি তো জানো, কেউ নেই আমার ! এর ওর দোকানে শুয়ে রাত কাটাই। ... পারবে, সব আমার করে দিতে পারবে ? ..."[১৮]

এই সংলাপে হাসি আর অশ্রু মিলেমিশে একাকার, চরিত্রের অসহায়তা মূর্ত। তুমুল হাসির নাটক 'পরবাস' নাটকেও বহমান অন্তর্লীন এক বিষাদধারা। গজমাধব আশ্রয়চ্যুত হচ্ছে ছত্রিশ বছরের ভাড়াবাড়ি থেকে আর সেই ঘরে আসছে অনাথ আশ্রমে মানুষ হওয়া মন্দিরা, নিজের হবু স্বামী রতনকে নিয়ে। গজমাধবের কেউ নেই, কিন্তু এক সাজানো সংসারের গল্প করে সে মন্দিরার কাছে। শেষে যখন মন্দিরা সব জেনে যায় তখন গজমাধবের স্বীকারোক্তিতে তার এতক্ষণের পরিচয় খসে গিয়ে এক অন্যতর সত্তা ফুটে ওঠে। নানা কৌশলে ঘর আগলে রাখা, 'টাইম কিল' করা প্রভৃতি সবই ভিন্নতর এক ব্যঞ্জনা পেয়ে যায় নাটকের শেষে গজমাধবের সংলাপে ঃ

"গজ || হ্যাঁ, আমি মিথ্যেবাদী ! আমি তোমাদের ঠকিয়েছি।

মন্দিরা || কিন্তু কেন ?

গজ || (মোমবাতিটা নিয়ে গজমাধব ধীরপায়ে মন্দিরার সামনে আসে – মুখের ওপর বাতিটা তুলে ধরে) একটু ভোগ করব বলে ! (মন্দিরা চমকে ওঠে। গজমাধব তার পাশে বসে।) যা আমি পাইনি ... সাজানো ঘরের চেহারাটা একবার দেখব বলে ! লোভীর মতো ... চোরের মতো ... বার বার যেতে গিয়েও ফিরে এসেছি ! ... ছত্রিশটা বছর ... জীবনের অমূল্য সময়টা বয়ে গেছে আমার এই ঘরে ! - কাঁকড়াপোতায় তোমার মতো ... ঠিক তোমার মতো একজন বসে বসে অপেক্ষা করে, কী যে হলো তার ... (মন্দিরার দুটো হাত করতলে তুলে নিয়ে) সংসার কাউকে দু'হাত ভরে দেয়, কাউকে দেয় না ! কেউ পায়, কেউ নিতেও জানে না ! আমি ঐ দলে !"[১৯]

কত সহজ সাধারণ কথা, কিন্তু অন্তরটি একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্য কিছু নয়, শুধুই নিজে যা পাইনি, অন্যের জীবনে তা দেখে পূর্ণতার আস্বাদ পাওয়া। এরপর গজমাধব নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছে, মন্দিরার আবেদন সত্ত্বেও থেকে যায় নি। একটা সুন্দর জীবনের সম্ভাবনার মাঝে নিজেকে অবান্তর ভেবে গুটিয়ে নিয়েছে। গজমাধবের যেমন সাজানো ঘরের লোভ, বাঞ্ছারামের তেমনি বাগান সাজানোর লোভ। মাটির সঙ্গেই তার সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক নিষ্কাম ঃ " আজ্ঞে ফলের আশায় কেউ কি সাজায় বাগান ! মাটি মাটি ! মাটি বলে আমারে সাজাও ... নিষ্কাম সাজাও ! "[২০] এই সংলাপে কোনো ভারী শব্দ নেই, কিন্তু ব্যঞ্জনায় এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশে তা অসাধারণ। বাগানের মতোই জীবনের প্রতিও বাঞ্ছার প্রবল লোভ। তাই আত্মহত্যার শর্ত করে নিয়েছে সে নকড়ি দত্তের সঙ্গে ঃ "এ বড়ি কাটাছেঁড়া মোট্টে সইতে পারবে না ! এ বড়ির পরে বড্ড মায়া আমার। "[২১] জীবনাসক্তির এ এক আশ্চর্য নিদর্শন। বাঞ্ছারামেরই দূর আত্মীয় হেকিমসাহেব ('গল্প হেকিমসাহেব')। বাঞ্ছারাম ভালোবাসে মাটিকে, আর হেকিম ভালোবাসে মাটির কাছাকাছি মানুষকে। কিন্তু মানুষের প্রতি তার দায়বদ্ধতা সার্থক হতে পারে না দুই তালুকদারের রেষারেষিতে। ওয়ালী খাঁ এই দুই তালুকদারের অন্যতম। অস্থিরচিত্ত, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা, পরমত নির্ভরশীল ওয়ালীর চরিত্রটি তাঁর সংলাপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ঃ

" ওয়ালী ।। এতকাল তো পেয়েছ বেটা। বাগিচা আমার খোলাই ছিল তোমার জন্য। কিন্তু এটিও দ্যাখো, তালুকে একটি বাঈ-টাই না পুষলে তালুকদারের জমক থাকে না। এখন বাঈ যদি গুলাব চায়, আমাকে তো দিতেই হবে। গুলাবটি তুমি ওরে ছেড়ে দাও বেটা।

হেকিম ।। তা হলে চিকিৎসার কী হবে হুজুর ... ?

ওয়ালী ।। সেটি তোমার ব্যাপার। ভাবো, চিন্তা করো, মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বার করো ...

হর্তুকি ।। আরে গোলাপ গোলাপ করছ কেন ? গাঁদাফুল দিয়ে কাজটা চালিয়ে নাও গে ...

ওয়ালী ।। হ্যাঁ, তাই নাও।

হেকিম ।। (বিরক্ত গলায়) এটি কি কাজ চালানোর ব্যাপার ?

ওয়ালী ।। (সঙ্গে সঙ্গে মত বদল করে) না, না, এটি কাজ চালানোর ব্যাপার নয়।

হেকিম ।। সারাতে হবে মানুষের ব্যাধি! গাঁদাফুলে হবে না।

ওয়ালী ।। আরে না, হবে না

হেকিম ।। ছাগলের পায়ে ধান মাড়াই হয় না, তার জন্যে গরুর পা-ই চাই।

ওয়ালী ।। (হর্তুকিকে) হ্যাঁ, গরুর পা-ই চাই।

হর্তুকি ।। আর যে দেশে গরু নেই ?

ওয়ালী ।। (মত বদল করে) হ্যাঁ, যে দেশে গরুই নাই ?"[২২]

কাল্পনিক ইতিহাস-আশ্রিত নাটক 'দেবী সর্পমস্তা'য় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বালিকা গৌরীকে দেবী সাজানো হয়েছিল। তারপর থেকে অন্ত্যজ বনচারী মানুষদের কাছে সে পেয়ে আসছে

দেবীর সম্মান। কিন্তু ভরা যৌবনে দেবীত্ব তার কাছে হয়ে উঠেছে বোঝা। অন্য নারীর মতো সেও চায় স্বামী-সন্তান, কিন্তু রীতি অনুসারে দেবী সর্পমস্তার বিয়ে হয় গাছের সঙ্গে। দীর্ঘ অভ্যাসে গৌরীও নিজেকে ভাবতে শিখেছে 'দেবী' হিসেবে। সংস্কার ঘিরেছে তাকে। তবু যখন মহারাজ লোকেন্দ্রপ্রতাপ এসে তাকে বিয়ে করতে চান তখন অদ্ভুত দোটানায় পড়ে গৌরী। যে ব্যাধ উদাস একদিন তাকে বলপূর্বক অধিকার করতে চেয়েছিল, মনস্তত্ত্বের অদ্ভুত রসায়নে তার প্রতিও আকর্ষণ বোধ করে ঃ

> ''শোন্ দূরের ওই পাহাড়টায় আছেন রাজা ... যা চলে যা ! বিষমাখা তীর ছুঁড়ে তাঁকে মেরে আয়। উনি না থাকলে আমায় আর সিংহগড়ে যেতে হবে না। আমাকে আর দোটানায় পড়তে হবে না - - ওরে উচ্চনীচ হিসেব কষে আমি যে আর পারিনে ! ''[২৩]

'ছায়ার প্রাসাদ'-এ মনোজ মিত্র এঁকেছেন এমন এক মানুষের ছবি, যে পুরুষের দেহে লালন করে নারীর মন। সংসারের ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে বাড়িয়ে গুছিয়ে রাখে। সংলাপে সেই মানুষ দ্বৈপায়ন ঠাকুরের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ঃ ''আমি অক্ষম পুরুষ ! সংসার করি নাই। শ্মশান কুড়িয়ে কুড়িয়ে একটি খেলাঘর গড়েছি।''[২৪] 'পালিয়ে বেড়ায়' এর রূপচাঁদও কেনারাম-গজমাধবের মতো মানুষের সঙ্গ চায়, কিন্তু অদ্ভুত তার স্বভাব। আড়ালে থেকে সে নিজের গুরুত্ব বুঝতে চায়, বুঝে আনন্দ পেতে চায়। অন্যে তাকে কতটা ডাকাডাকি করছে তাই দেখে সে তৃপ্তি পায়। একই নাটকের আর একটি চরিত্র গন্ধকালী। গাঙডাকাত আর তেলেভাজাওয়ালীর যোগ্য সন্তান সে। হুলো ডাকাত তাকে নিজের মেয়ে বলে প্রচার করেছে, তাই সে বেরিয়েছে হুলোকে ধরিয়ে দিয়ে নিজের মান রক্ষা করতে। দোখনে অঞ্চলের গন্ধকালী তার সংলাপের মধ্য দিয়ে জীবন্ত ঃ

> ''হারামির বাচ্চারা ... এখনো লোক চেনেনি ... এলো আমার গায় গা ঘষতে ! (রূপচাঁদকে) আরে লেডিজ কামরায় বসে আছি ... দুপাশে দুই মদ্দ ... ঘুমের ভান করে কোলের ওপর ঢলে পড়ছে। তুলে তুলে দিচ্ছি ... ঢলে ঢলে পড়ছে ! মেরেছি জোড়া পায়ে নাথি ... যা বাড়ি গে চুনহলুদ লাগাগে যা ... ''[২৫]

'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' জমাট হাসির নাটক, কিন্তু সেখানেও দু -একটি গভীর সংলাপে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা জীবনদর্শন অনায়াসে প্রকাশিত। যেমন, মুন্নির সংলাপ ঃ

> ''তুমি তো ভাব আমি একটা খেলনা। খেলনাটা যাতে ভেঙে না যায় তাই চারপাশে পাহারা বসিয়েছিলে। স্যার কিন্তু তা ভাবেন নি — ভেবেছিলেন আমি একটা মানুষ, আস্ত মানুষ। আমার শক্তি আছে! ... বারবার বলেছিলেন বাঁচাও, বাঁচাও! ... বাঁচাবো না, বল!''[২৬]

একটিও কঠিন শব্দ ব্যবহার না করে মনোজ মিত্র কত সহজে বলে দেন নারীর মর্যাদার কথা। এই নাটকেই আবার পমমামার একটি সাধারণ সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে চরিত্র তথা নাট্যকারের জীবনদর্শনঃ ''রোজ যার কাছ থেকে তেলাপিয়া নিই, পাবদাটা আজ তার কাছ থেকে নেব না।''[২৭] গন্ধকালীর মতোই আর এক নারী এলোকেশী (কুহুযামিনী), নিজেকে যে বলে 'হাইওয়ের মেয়ে'। একসময় হাইওয়েতে রুটি তড়কা বেচত, অধিক এবং নিশ্চিত লাভের আশায় হাইওয়ের বাঁকে মা বাঁকেশ্বরীর থান গড়ে সেবিকা হয়েছে, ভেতরে কিন্তু রয়ে গেছে সেই উগ্রচন্ডা রুটি-তড়কাওয়ালী ঃ

> ''ভাঙো না, ভেঙে দ্যাখো, একটা একটা ইঁট বইয়ে তোমায় দিয়ে গাঁথিয়ে ছাড়ব পুলিশ ! (কোমরে কাপড় জড়ায়) আমি হাইওয়ের মেয়ে! হোটেল করি, মন্দির করি — জন্ম থেকে পড়ে আছি হাইওয়ে বুকে নিয়ে। ভেবেছ বড় একা, অনাথিনী ! থোঁতা মুখ ভোঁতা করছি তোমার সারেঙ্গি ... (থেমে) ওগো তোমাদের বাঁকেশ্বরী মায়ের গায়ে হাত তুলতে এসেছো গো ... ও ঠাকুরপোরা।''[২৮]

'যা নেই ভারতে' নাটকে মনোজ মিত্র কাহিনি বয়ন করেছেন পুরাণের সম্ভাব্যতার সূত্র ধরে। লুণ্ঠিতা গান্ধারী এখানে কুরুবংশের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণা। মরুদেশের তীব্র, পার্বত্য পানীয় পান করিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে আচ্ছন্ন করে নিজের বদলে সে শয্যায় পাঠায় দাসী ইরাকে। কৌরবের অন্যায়ের প্রতিশোধ সে নেবে কুরুবংশ নির্বংশ করে ঃ

> "ছোট্টদেশের ছোট্ট রাজাটিকে ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে আমার ভুবন চির আঁধার করে দেয় নি কৌরব ! ঘৃণা হয় পৃথিবীর মুখ দেখতে। ... পান্ডুর ওই অবস্থা ... আমিও জরায়ু বিনষ্ট করব। দেখি কে বাঁচায় কুরুবংশ ?"[২৯]

কত বিচিত্র চরিত্রই না এঁকেছেন মনোজ মিত্র, আর কত বিচিত্র তাদের সংলাপ। যেমন, 'ব্রিজের ওপর বাপি' নাটকে ব্রিজের মুখে দোকানের রুটি-তড়কাওয়ালী চুমকি বা এ-এস-আই বাপি মান্নার সহকর্মী কনস্টেবল অনিলদা বা বাপি মান্না নিজেই। চুমকি এবং অনিলদা কথায় তুখোড়, আর ষাঁড়াষাড়ির বানের দিন বাপির ঝোঁক চেপেছে সুইসাইডের। চুমকির একটি সাধারণ কথা 'কাছে আসতে ইচ্ছে করে না'-বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করে অদ্ভুত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। অনিলদার সংলাপে টিপিক্যাল পুলিশকর্মীর পরিচয়টি স্পষ্ট ঃ "নিজের হাতে ভাত খাও ... কাঁকড়-মাকড় লঙ্কা-মঙ্কা কাঁটা-মাটা বেছেবুছে নিশ্চিন্তে খেতে পারবে ... কিন্তু রূপিয়ার বেলা পরের হাত ... হবে কি, এনকোয়ারিতে ধরা পড়বে অন্যলোক !"[৩০]

ছোটো নাটকের সংলাপেও চরিত্রের এই উদ্ভাসন লক্ষণীয়। যেমন — 'টাপুর-টুপুর'-এ কেষ্টদুলাল-মরালী এক গ্রাম্য দম্পতি, যারা শহর দেখতে এসে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে পড়েছে। তাদের সংলাপে সেই গ্রাম্যতাটুকু ধরে রেখেছেন মনোজ। যেমন — মরালীর কাছে যে কোনো খাবারের দোকানই 'মেঠাই-এর দোকান' কিংবা কেষ্টদুলালের সহজ ভাবনা ঃ "শহরে বৃষ্টির কি দরকার বলুন দাদু ? এখানে তো ফসলের কোনো আশা নেই।"[৩১]। তাদের দ্বৈত সংলাপেও সেই গ্রাম্য সরলতা বর্তমান। যেমন ঃ

> "কেষ্ট ।। চলো, তোমার যখন সাধ হয়েছে ... চলো, হাওড়া পুল দেখে ... পাতাল রেল দেখে ...
>
> মরালী ।। ওই সাথে চিড়েখানার সাদা বাঘটাও এক নজরে দেখে নেবো।
>
> কেষ্ট ।। মন্দ বলোনি। কিন্তু দুটো যে দু-পথে !
>
> মরালী ।। তা হোক, আমি এক পথে দুটো দেখবো, বেশি হাঁটতে পারবো না !
>
> কেষ্ট ।। সে তুমি যা বলবে তাই ..."[৩২]

কিংবা ঃ

> "কেষ্ট ।। আঃ আজ যেন বর্ষায় তুমি পেখম মেলেছো।
>
> মরালী ।। পেখম কী গো ?
>
> কেষ্ট ।। চিড়েখানায় চলো, দেখাবো। সব হরিণের মাথায় দেখো — পেখমের বাহার "[৩৩]

এই সংলাপ মনে পড়িয়ে দেয় 'নীলদর্পণ' নাটকের সেই রায়তের গোলোক বসু সম্পর্কে বলা 'বসে আছেন যেন গজেন্দ্র-গামিনী' সংলাপকে। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার যখন কেষ্ট-মরালীকে নানারকম

খাবারের লোভ দেখিয়ে প্যাঁচে ফেলতে চায় আর কেষ্টদুলাল তা বুঝতে পেরে অপমানিত হয়েও পালিয়ে বাঁচতে চায়, তখন কিন্তু সেই গ্রাম্য মরালীরই অন্যতর রূপ প্রকাশ পায় সংলাপে। আঁচল খুলে চারখানা ভিজে দশ টাকার নোট বের করে সে ফুঁসে ওঠে ঃ

" মরালী ।। (বেণীকে) ফুলশয্যের ছাতা দেখেছো, ছেঁড়া জুতো দেখেছো, এবার টাকা দ্যাখো! টাকা ! হাত দিয়ে দ্যাখো গরম।

কেষ্ট ।। মরালী !

মরালী ।। নাও নাও টাকা ! আনো খাবার ! ফাস্টকেলাস হয় যেন ! (হতভম্ব বেণীর নাকের ডগায় টাকা ছুঁড়ে দেয়)"[৩৪]

এখানেই মনোজ মিত্রের চরিত্রের জোর, এখানেই তাদের জিতে যাওয়া। এই একই ভালোবাসার পরিচয় শেষপর্যন্ত ফুটেছে 'সন্ধ্যাতারা'য় কুমুদ-আশা বা 'আখিঁপল্লব'-এর পল্লব-আঁখির মধ্যে।

মনোজ মিত্রের রয়েছে একটি কৌতুকপ্রবণ মন। সেই মনই তার দৃষ্টি ফিরিয়েছে সমাজ-পরিবারের নানা হাস্যকরতার দিকে। তাঁর নাট্যসংলাপে তাই হাস্যরসের অবাধ উৎসার। কখনো তা নিছক কৌতুক, কখনো সূচীমুখ ব্যঙ্গ, আবার কখনো বা পরিস্থিতির আনুকূল্যে উতরোল। 'কেনারাম বেচারাম' নাটকে নগেন হারিয়ে যাওয়া বেচারামের জায়গায় 'ফিট' করতে নিয়ে এসেছে সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধা কেনারামকে। কীভাবে বেচারাম বাবুকে পাওয়া গেল তার বর্ণনা দিচ্ছে তুখোড় নগেনঃ

" চারু ।। সে সময় কী করছিলেন আমার বেয়াই ?

নগেন ।। সে সময় ... আমাদের সেই প্রথম সাক্ষাতের শুভ মুহূর্তে আপনার আদরের বেয়াই কলা খাচ্ছিলেন—

চারু ।। কলা খাচ্ছিলেন ?

নগেন ।। আজ্ঞে হ্যাঁ, বর্ধমান ইস্টিশনে প্ল্যাটফর্মের ধারে বসে — লাইনের ওপর পা ঝুলিয়ে — কলা খাচ্ছিলেন! দিশি মর্তমান কলা। আর পাশে একটা কাঁচকলা রেখে দিয়েছিলেন ... পাকলে খাবেন বলে।"[৩৫]

প্রথম সাক্ষাতের শুভ মুহূর্তের গাম্ভীর্যের সঙ্গে কলা খাওয়ার লঘুতাজনিত অসঙ্গতি এখানে হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। এরকম সরল কৌতুকের দৃষ্টান্ত মনোজ মিত্রের প্রায় প্রতিটি নাটকেই লভ্য। এ যেন তাঁর সহজাত জীবনবোধ-সঞ্জাত। যেমন, 'নৈশভোজ' নাটকে চক্রধর গদাধরের কথোপকথন ঃ

" চক্র ।। (ভেংচি কেটে) ডেফিনিটলি ! মাইরি ! আমি বলে সাত বচ্ছর ধরে এই গাছের গোড়ায় ফসফেট ঢালছি ... ইউরিয়া ঢালছি ... রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ঐ চৌকিদার পুষছি ... আর গাছ হয়ে গেল তোমার?

গদা ।। ফসফেট ! আগ বাড়িয়ে কে লাগাতে বলেছিল ফসফেট ?

চক্র ।। লাগাবো না ? আমার গাছের আগা শুকুয়ে যাচ্ছে, তলা দিয়ে আমি তারে একটু ফসফেট দেব না? " [৩৬]

মঞ্চে অভিনয়ের সময় এসব সংলাপ মনোজ মিত্রের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে হয়ে ওঠে হাস্যরসের উৎস। বাচনভঙ্গি-নির্ভর এরকম হাস্যরসাত্মক সংলাপের আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' নাটক থেকে ঃ "(হাতের দিকে তাকিয়ে, অভিমান ভরে) দুষ্টু রেখা! আর জায়গা পাস নি ! মরতে আমার হাতে জুটেছিস! আমি নেবেল পাই, এটা যখন কেউ চাস না ... যাঃ তোর দিকে আর তাকাবই না।"[৩৭] (হবু) 'সাজানো বাগান' নাটকে হাস্যরসের অবাধ উৎসার। যে কোনো পৃষ্ঠা থেকেই এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। যেমন, নকড়ড় ও তার গিন্নির সংলাপ ঃ

" গিন্নি ।। বুড়োটা কবে মরবে গো ?

নকড়ি ।। সামনের পুণ্যিমেতে।

গিন্নি ।। (কপালে হাত ঠেকিয়ে) তা'লে তো আর বেশি দেরি নেই গো ...

নকড়ি ।। হ্যাঁ, ভেতরে রেজিসট্যান্স পাওয়ার বলতে তো কিচ্ছু নেই !

গিন্নি ।। রেটিসজ্যানস পাওয়ার ... রেটিসজ্যানস পাওয়ার ! ... সেটা কী গো ?

নকড়ি ।। ওই তোমার যে জিনিসটা বেশি আছে !

গিন্নি ।। ওমা ! আমার আবার কী বেশি গো ! (গিন্নি নকড়ির গায়ে ইঙ্গিতপূর্ণ ঠেলা দেয়।)

নকড়ি ।। গায়ে পড়ো না ... আমার আবার কম আছে।"[৩৮]

'সন্ধ্যাতারা'য় কুমুদশংকরের ছোটো ছেলে মেকি বিপ্লবী ছোট্টুর সংলাপে কৌতুকের আবহ রচিত হয়েছে এভাবে ঃ

"রেখা ।। ওমা ছোড়দা ! তবু যাক্ দেখা হ'লো।

ছোট্টু ।। সাক্ষাৎকার ... একটি অনৈতিহাসিক অদ্বান্দ্বিক সাক্ষাৎকার।

রেখা ।। (একটু থতিয়ে) কেমন আছিস?

ছোট্টু ।। পৃথিবীর বুকে টিউবারকিউলোসিস ... কে ভাল থাকতে পারে ? পাবলো নেরুদা কি পারলেন ...

রেখা ।। তুই সেই একইরকম রয়েছিস ... হ্যাঁরে ছোড়দা - তুই কি বিয়ে টিয়ে করবি না!

ছোট্টু ।। বিয়ে ! ললিপপ ! পোষমাসের বাঁধাকপি ! জষ্টিমাসের আম আঁটির ভেঁপু ! ... ও মায়াকভস্‌কি !"[৩৯]

এরকম সংলাপের দৃষ্টান্ত মনোজে প্রায় প্রত্যেক নাটকের প্রতি পাতা থেকে দেওয়া সম্ভব। 'দন্তরঙ্গ' একাঙ্কটিতে যেমন দাঁত তোলাতে নিয়ে আসা আসামী নিতাইকে সাহস দিতে তার বীরত্বকাহিনী স্মরণ করাচ্ছে কনস্টেবল ঃ

"কনস্টেবল ।। "নিতাই তোর মুখে এসব শোভা পায় ? দূরপাল্লার ট্রেনে এক-কামরা যাত্রীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তুই একা বীর অভিমন্যুর মতো লাশের পর লাশ ফেলে ঘড়ি আংটি সুটকেশ ঝেঁপেছিস ... সেই তুই আজ কিনা ...

ডাক্তার ।। কী আনছান বকছেন ! অভিমুন্য ঘড়ি আংটি ঝেঁপেছিল নাকি ?

কনস্টেবল ।। ওটা উপমা । কিন্তু সাহসটা ... বীরত্বটা ! সেটাতো রীতিমত মাইথোলজিক্যাল। আপনি পারবেন ? ''[৪০]

হাস্যরস এখানেও অসঙ্গতিজনিত। অভিমুন্যর সঙ্গে ঘড়ি অংটি সুটকেশ ঝেঁপে দেবার অসঙ্গতি।

সংলাপ রচনার আর একটি প্রচলিত পদ্ধতি হ'ল একই বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মুখে আরোপ করে সামগ্রিকতা গড়ে তোলা। তত্ত্বের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়ে থাকে Stichomythia. মনোজের নাটকে, বিশেষত পুরাণাশ্রিত নাটকে এরকম সংলাপ-শৃঙ্খল রচনা সার্থক নাট্যচলন সৃষ্টি করেছে। 'অশ্বত্থামা' নাটকে যেমন দুই আলোকবৃত্তে মহাকালের দুই পুতুলের মতো সংলাপ উচ্চারণ করে কৌরবের কৌশল এবং পান্ডবের সেই কৌশল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার পাশাপাশি যুদ্ধের ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুলেছে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। অশ্বত্থামার মধ্যে পরস্পর বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এই সংলাপ ঃ

''কৃপ ।। আমরা কুরুক্ষেত্রের হতাবশেষ যোদ্ধা ...

কৃত ।। মৃতদেহের পাহাড় ঠেলে ঘোড়া ছুটিয়েছি আমরা

কৃপ ।। জনারণ্য ধ্বংস করেছি আমরা ...

কৃত ।। মরুভূমি করেছি আমরা ...

...

কৃপ ।। কৌশলে জতুগৃহে আগুন লাগিয়েছি আমরা ...

কৃত ।। জীবন্ত দাহন হবে পান্ডব ...

কৃপ ।। কিন্তু হয়নি । লেলিহান অগ্নিকুন্ড মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা । পরিত্রাতা পাঁচটি চন্ডাল ! ওদের হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা ... ওরা জীবিত।

কৃত ।। (ক্ষণেক বিরতি) এবার পাঠিয়েছি বনে ...

কৃপ ।। কৌশলে অজ্ঞাতবাসে বাধ্য করে ...

কৃত ।। জনপদ থেকে বিতাড়িত করে ...

কৃপ ।। প্রজাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ... কিন্তু হয়নি ! বন থেকেও বেরিয়ে এসেছে ওরা ... চতুর্গুণ শক্তি নিয়ে !

কৃত ।। (দ্বিগুণ জোরে) আমরাও থামিনি ! ডেকেছি যুদ্ধ!

কৃপ ।। ভারত সংগ্রাম !

কৃত ।। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত করেছি কুরুক্ষেত্রে ...

কৃপ ।। রচনা করেছি ব্যূহ ...

কৃত ।। দুর্ভেদ্য সব বেষ্টনী ...

কৃপ ।। তথাপি প্রতিরোধ করা যায়নি ! সব বেষ্টনী ভেদ করেছে ওরা !

কৃত ।। (কণ্ঠে শেষ শক্তি ঢেলে) কিন্তু আমরা ছাড়ব কেন ? আমরা দুর্যোধনের যোদ্ধা

...

কৃপ ।। আমরা মৃতদেহের পাহাড় মাড়িয়ে ...

কৃত ।। ঘোড়া ছুটিয়েছি আমরা ...

কৃপ ।। ষট্‌বিংশতি সহস্র মানুষ ...

কৃত ।। নিধন করেছি আমরা ...

কৃপ ।। কৃপাণে ভল্লে তূণে তোমরে ...

কৃত ।। ভারতবর্ষ ছত্রখান করেছি আমরা ...''[৪১]

মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটে রচিত আর একটি নাটক 'তক্ষক'-এও এই পদ্ধতির ব্যবহার সার্থক। পিতা-পুত্র শমীক-শৃঙ্গী এখানে জীবন এবং মৃত্যুর প্রতীক। দার্শনিক মনোজ মিত্র এখানে জীবন-মৃত্যুর বৈপরীত্যকে তুলে নিয়ে গেছেন দার্শনিকতার স্তরে ঃ

''ঋষি ।। শ্যামল সরোবরে আমি যখন তাঁকে আহ্বান করেছি ...

শৃঙ্গী ।। তৃণের মাঝে সহস্র ফণায় আমি সহসা গর্জে উঠেছি ...

ঋষি ।। স্ফটিক ঝর্ণার কলরোলে আমি বয়ে এসেছি তার পথে ...

শৃঙ্গী ।। আঁকাবাঁকা সে ঝর্ণার কলরোলে আমি ভুজঙ্গ ... কাল ... ভুজঙ্গ !

ঋষি ।। তাকে লুব্ধ করেছি আমি, জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেছি... ফল হয়ে তার দৃষ্টিসীমায় ধরা দিয়েছি !

শৃঙ্গী ।। সন্দেহ বিষের ছদ্মবেশে আমি তখন অপেক্ষা করেছি ... (হা হা করে হেসে ওঠে) শুধু অপেক্ষা করেছি ...

ঋষি ।। তক্ষক ! মায়া সরোবরের তক্ষক !

শৃঙ্গী ।। আমি সেই তক্ষক ! (হা হা করে হাসে) তুমি জীবন ... তুমি স্থিতি ! আমি তক্ষক ... আমি মরণ ! ... এ অরণ্য যে বিরাট রহস্যময় বিশ্বের প্রতীক পিতা ! (কাতর স্বরে) পিতা, পিতা, পরীক্ষিৎ এসব দেখেছে ?

ঋষি ।। (চমকে) কী সব ?

শৃঙ্গী ।। জীবন-মৃত্যুর এই রূপ ?

ঋষি ।। শৃঙ্গী !

শৃঙ্গী ।। তাদের এক রূপ ? তারা যে আলাদা কিছু নয় ... তারা অভিন্ন এক দেহে লীন ...

ঋষি ।। শৃঙ্গী !

শৃঙ্গী ।। পিতাপুত্র আমরা জীবন-মৃত্যু ! সে কি দেখেছে, মৃত্যু জীবনেরই সন্তান ! সেকি পেরেছে জীবন-মৃত্যুর এই রহস্য উন্মোচন করতে !''[৪২]

এই পদ্ধতিই শ্লেষমিশ্রিত কৌতুক সৃষ্টি করেছে 'নৈশভোজ' নাটকে হুক্কা এবং হুয়ার সংলাপে ঃ

"হুক্কা ।। আরেঃ ত্তেরি !

হুয়া ।। গলায় দড়ি ।

হুক্কা ।। অক্কা ফক্কা ।

হুয়া ।। ভোঁ ভক্কা ! তুষ্টু মরে কুমড়োর ছক্কা !

হুক্কা ।। নিজের গলায় নিজেই দড়ি ?

হুয়া ।। হৃদয়জ্বালা ! হৃদয়জ্বালা !

হুক্কা ।। হৃদয়জ্বালা ! ক্যায়সা জ্বালা !

হুয়া ।। বহোৎ জ্বালা, ঝালাপালা !

হুক্কা ।। জ্বালা তো বুড়ো আমাদেরও আছে ... কই আমরা তো কেউ এমন করে মরছি না !

হুয়া ।। ওরে মানুষের আছে হৃদয়জ্বালা, শ্যালের হৃদয় পেটেই শালা !

হুক্কা ।। পেটেই শালা !

হুয়া ।। মানুষের আছে স্বেচ্ছামরণ, কখনো বা কেচ্ছামরণ।

হুক্কা ।। স্বেচ্ছামরণ ... কেচ্ছামরণ ... মানুষের বটে ধয্যি নেই!"[৪৩]

ধ্বন্যাত্মক শব্দের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে এখানে ছন্দস্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে। ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ এবং তীব্র হয়েছে 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' নাটকে। গোবুচন্দ্রের মন্ত্রিত্বে রাজ্যের সর্বত্র কীভাবে শান্তি বিরাজমান তা প্রকাশ করতে গিয়ে মনোজ মিত্র স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঠুকেছেন সমকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রের ফাঁক এবং ফাঁকিগুলিকে ঃ

"চন্দ্রপুলি ।। যদিও লেখাপড়া চুলোর দোরে ... ছাত্তররা মদ গাঁজা পেঁদিয়ে ঝিমোচ্ছে ... যদিও মাস্টাররা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ক্যাজুয়াল নিয়ে পি. টি. মানে প্রাইভেট টিউশনি করছে ...

গোবু ।। যদিও এগজামিনার পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বান্ডিলকে বান্ডিল পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে ঝেড়ে দিচ্ছে ...

চন্দ্রপুলি ।। তবুও রেজাল্ট বেরুচ্ছে ... নিয়মিত ঠিক সময়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ...

গোবু ।। এবং প্রতিটি ছেলে লেটার পাচ্ছে, স্টার পাচ্ছে। তাহলে কে পাবে বলো, বলো পুরস্কার আসলে কার প্রাপ্য ?

হবু ।। ছাড় ছাড় ! এইটুকুর জন্যে তুমি নোবেল পুরস্কারের ভাগ চাইতে পারো না গোবু!

গোবু ।। এইটুকু ! এসো দেহরক্ষা দপ্তরে। হাসপাতাল আছে, ডাক্তার নেই ... রোগী যাচ্ছে, বেড নেই ...

চন্দ্রপুলি ।। চলো কলকারখানায় ...

গোবু ।। চলছে লকআউট ... চালু হলো বিদায়নীতি ...

চন্দ্রপুলি ।। দলে দলে ছাঁটাই ... গোল্ডেন গুডবাই ...

গোবু ।। তবু কে বলবে শান্তি নাই ? শান্তি মাঠে ময়দানে... শান্তি হাটে বাজারে ... শান্তি রেলগাড়ির কামরায়। কোথাও ক্ষোভ নেই ... বিক্ষোভ নেই ... অটল শান্তি ...

চন্দ্রপুলি ।। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ..."[৪৪]

মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপ গতিময়। পরিস্থিতি অনুযায়ী এমন কিছু কিছু শব্দ তিনি সংলাপে যোজনা করেন, যার ফলে পরিবেশ হয়ে ওঠে জীবন্ত এবং নাট্যচলন হয় স্বচ্ছন্দগতি। যেমন, 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে প্রাণ ফিরে পাওয়ার পর অঘোরের যে প্রবল জৈব লালসা বাদামীর প্রতি, সেই পরিস্থিতির বীভৎসতা প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ কিছু নির্বাচিত শব্দের ব্যবহারে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অঘোরের কিছু শারীরবিকৃতি ঃ

"অঘোর ।। (বিকট স্বরে) না। (দু'হাত দিয়ে সকলকে ঠেলে) বাদাম ... ভালো !

দাক্ষা ।। মরণ ! ওর পেট হয়েছে ! বাড়ি চলো ...

অঘোর ।। না ... (দাঁত বার করে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে) কলাগাছ!

দাক্ষা ।। ভাতারের ঘর করে এসেছে ... হ্যাঁ, মাজ ছাড়ানো কলাগাছ !

অঘোর ।। (দু' হাতে দাক্ষাকে খিমচে ধরে) মাজ-ছাড়ানো ! ভালো বলেছিস ...ভালো বলেছিস দাক্ষি... "[৪৫]

এখানে 'পেট হয়েছে', 'ভাতার', 'মাজ-ছাড়ানো কলাগাছ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে রুচির বিকৃতি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি পরিবেশগত বীভৎসতাও ফুটে উঠেছে। চরিত্রের স্বভাব অনুযায়ী মনোজ মিত্রের এই শব্দচয়নের বিশিষ্টতা অনেক সময়ই প্রকাশ পেয়েছে কমেডির আধারে। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে এভাবেই কমেডির আবহ তৈরি হয়েছে পম এবং লতিকা দুই ভাইবোনের সংলাপে ঃ

"পম ।। তোর কেলে ছলোটা আমার বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে।

লতিকা ।। বুড়ো বয়সে মিথ্যে দোষারোপ করে আর পাপ কুড়িয়ো না দাদা। জোজোর মত সভ্য বোধহয় তুমিও না। বাথরুম পাওয়ার অনেক আগেই সে টয়লেটে চলে যায়।

পম ।। তবে জল এল কোত্থেকে?

লতিকা ।। নিজেকে জিজ্ঞেস করো। যেমন অগোছালো মানুষ তুমি।"[৪৬]

'কুহুযামিনী' নাটকে হাইওয়েতে ট্যাক্সি চাপা দিয়েছে হাঁস — তাই নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড। রাস্তা আটকে গিয়ে যাত্রাপালার কুশীলব, টোপর মাথায় বর, রাজনৈতিক নেতা সব জড়িয়ে মড়িয়ে একাকার। সেই ভিড়ে উপস্থিত চা-ওয়ালা বুলবুল তার চায়ের পসরা নিয়ে। চায়ের বিজ্ঞাপনে বুলবুল অনায়াসে মিশিয়ে দেয় স্থানীয় পরিবেশ ও ঘটনাকে ঃ " আরে চা ... হাতে গরম পেটে গরম ... এপিঠ ওপিঠ দুপিঠে গরম ... বুলবুলের চা ... অ্যাক্সি-স্পেশাল ম্যাক্সি-চা! এক চুমুক টেনে যান দাদারা ... "[৪৭] বলাবাহুল্য, 'অ্যাক্সি-স্পেশাল' মানে অ্যাকসিডেন্ট-স্পেশাল। পুরাণকে ভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যবহার করে কৌতুক সৃষ্টি মনোজ মিত্রের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা'য় প্রেমশশী-বাঁকাশশীর সংলাপে সেই প্রবণতারই প্রকাশ ঃ

"প্রেমশশী ।। তুমি মায়াবলে সবার ক্ষমতা হাওয়া করে দাও বাবা বাঁকাশশী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যকে বগলে চেপে দিনকে রাত বানিয়ে দিয়েছিল ...

বাঁকাশশী ।। ওরে সূর্য একটা ছিল, শ্রীকৃষ্ণের বগলে চাপায় সুবিধে হয়েছিল। দেশের এতো মানুষের মুখ আমি এক বগলে চাপবো কি করে ... ? মায়ারও তো একটা লিমিটেশন আছে।"[৪৮]

পৌরাণিক অনুষঙ্গে ইংরেজি শব্দের মিশ্রণে পরিস্থিতিগত লঘুতা স্পষ্ট হয়েছে। কখনো বা শব্দকে ভেঙে তার নতুনতর অর্থ নিষ্কাশন করেছেন নাট্যকার। এই বিষয়ে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত একেবারে গুলিয়ে ঘেঁটে দিতে তাঁর জুড়ি নেই। যেমন, 'বাবুদের ডালকুকুরে' নাটকে ঃ

"হোসেন ।। দ্যাটস এ জেসচার স্যার !

সজ্জিমন্ত্রী ।। ইয়েস জেসচার। যস্মিন দেশে যদাচার ... তারই নাম জেসচার।"[৪৯]

এইসব সংলাপ নাটকে বাড়তি গতিবেগ সঞ্চারিত করে। 'মদনের পঞ্চকান্ড'-এর এক কান্ডে যেমন মদন শুনিয়েছে কুঁদোবাবু-কৃত 'মস্তান' শব্দের ব্যাখ্যা ঃ

" জানিসরে মদনা, মস্তান শব্দের মানে কী ?

- কী বাবু ...

- ম্যাস ট্যান ...

- ম্যাস ট্যান !

- হুঁ, ম্যাস মানে জনসাধারণ -- ট্যান মানে ট্যান করা ! গোরু ছাগলের চামড়া ছাড়িয়ে ট্যান করে দেখেছিস তো --আমিও তেমনি ম্যাসের চামড়া ছাড়িয়ে ট্যান করি !" [৫০]

কত বিচিত্র অনুষঙ্গের শব্দ ব্যবহার করে সংলাপকে বহুমাত্রিক করে তোলেন মনোজ মিত্র, এগুলি তারই দৃষ্টান্ত। শব্দ ভাঙার এই খেলা আছে 'চোখে আঙুল দাদা' নাটকেও। তবে খেলা সেখানে শ্লেষে তীক্ষ্ণ ঃ

" চিত্র ।। আমি কোথায় যোগাড় করছি ! ওরাই তো যোগাড় করে পরলোকে বয়ে নিয়ে আসছে ! ধরুন নাগাড়ে চেল্লাচ্ছে ... আমি স্বর্গে যাবো ... আমি আঁতেল ! ... আঁতেল মানে ইনটেলেকচুয়াল !

বিধাতা ।। চোয়াল !

চিত্র ।। ধরেছেন ঠিক প্রভো ... যাদের ইনটেলেক্ট মানে বুদ্ধি ... ধরুন চোয়ালে এসে বাসা বেঁধেছে, তারাই ইনটেলেকচুয়াল !"[৫১]

নাট্যসংলাপে অনেকসময় প্রচলিত লজিকের বিপরীত লজিক সৃষ্টি করেছেন মনোজ মিত্র এবং তা করেছেন এমনভাবে যে, সাময়িকভাবে যথার্থ লজিকের ভ্রান্তি জন্মে। সমালোচক একেই বলতে চেয়েছেন, non-sequitur-এর প্রয়োগ। যেমন, 'কেনারাম বেচারাম' নাটকে কেনারামের সংলাপে গীতার বাণীকে কী অদ্ভুত অনুষঙ্গে ব্যবহার করেন তিনি ঃ "খাবেই তো খাবেই তো ! আমারই চোষা আঁটি থেকে আম গাছের জন্ম ! সেই গাছে আম হয়েছে ... সেই অমৃত ফল দিয়ে তোমার বৃক্ষের ফলেরা ফলাহার করবে ... একেই তো বলে মা ফলেষু কদাচন !"[৫২] এই ভ্রান্তিপূর্ণ ব্যবহার চরিত্রের অশিক্ষা এবং সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে অদ্ভুত লজিক সৃষ্টি করেছে গণেশ ঃ

"গনেশ ।। জগিং করলে পেট কমবে কার্তিক ?

কার্তিক ।। আলবাৎ টাইট হয়ে যাবে !

গণেশ ।। তা'লে তুই আমাকে কোলে নে –

কার্তিক ।। কোলে নেব !

গণেশ ।। আমাকে কোলে নিয়ে তুই জগিং কর, তোরও হবে আমারো হবে।"[৫৩]

এই লজিক নিয়ে ভাবতে গেলে হতাশ হতে হবে। কিন্তু সাময়িকভাবে যৌক্তিকতার ভ্রান্তি সৃষ্টিতে এর জুড়ি নেই। 'সাজানো বাগান' নাটকেও অদ্ভুতুড়ে এই যুক্তির ব্যবহার ঃ

"মোক্তার ।। ছাগলের দুধ ! আয়ু বাড়ে !

নকড়ি ।। চোপ্ ! ছাগলের দুধ তো ছাগলের পেটে থাকে ... ছাগল বাঁচে কদিন !"[৫৪]

ছোটো নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ ধরণের যুক্তিগুলি আরো শাণিত হয়ে উঠেছে। যেমন, 'তেঁতুলগাছ' নাটকে ঃ

" ক্ষীরোদ ।। কেন, ফলের দাম এক্সট্রা কেন দেবো রে, আমি তো গোটা গাছটাই কিনেছি !

ভবতোষ ।। তাতে কি ? ফল আর গাছ এক হলো ? তেঁতুল দিয়ে চাটনি হয়, তেঁতুলগাছ দিয়ে হয় চাটনি ? এমন মাথা মোটা কথা বলো না –

ক্ষীরোদ ।। আরে বাবা, ফল তো গাছেই থাকে, না কি ?

ভবতোষ ।। তাতে কী হলো ? কাঁচ তো আলমারির গায়েই লটকে থাকে, তা কাঁচ লাগানো আলমারি যখন বিক্রি করো, নিজে কাঁচের দাম আলাদা ধরো না –"[৫৫]

এরকম যুক্তি প্রয়োগে মনোজ মিত্র সার্থকতার শীর্ষ স্পর্শ করেছেন 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' নাটকে ঃ

" বাঁকাশশী ।। তোমার বয়েস কতো প্রেমশশী ?

প্রেমশশী ।। সাড়ে একান্ন।

বাঁকাশশী ।। জীবনে কতো জুতা পরেছ এ পর্যন্ত ?

প্রেমশশী ।। তা কুড়ি একুশ জোড়া হবে।

বাঁকাশশী ।। এতো জুতা লাগল কেন ?

প্রেমশশী ।। বাঃ একজোড়ার গোড়ালি ক্ষয়ে ফুরিয়ে গেলে আরেক জোড়া লাগবে না ?

বাঁকাশশী ।। জুতার গোড়ালির উচ্চতা কতো ?

প্রেমশশী ।। গড়ে আড়াই ইঞ্চি ...

বাঁকাশশী ।। তাহলে কুড়ি জোড়ায় ?

প্রেমশশী ।। পঞ্চাশ ইঞ্চি ! মানে চার ফুট দুইঞ্চি !

বাঁকাশশী ।। তোমার নিজের হাইট ?

প্রেমশশী ।। চার ফুট চার !

বাঁকাশশী ।। মাইনাস করে বুঝে দ্যাখো জুতা না পরলে তোমার আজ কতটুকু অবশিষ্ট থাকতো ? ক্ষয়ে ক্ষয়ে থাকতো মাত্তর দু ইঞ্চি।

প্রেমশশী ।। বাবা, জুতাই বড় ! জুতাই বড় ।"[৫৬]

এই যুক্তি শুনে পাঠক-দর্শক মাথা চুলকে ভাবতে বসেন – তাই তো, এভাবে তো দেখিনি। পাঠক-দর্শকের সেই হতভম্ব অবস্থায় মুখ টিপে হাসেন রসিক নাট্যকার।

নাটকীয়তা সৃষ্টি সংলাপের অন্যতম প্রধান কাজ। মনোজ মিত্র তাঁর নাট্যসংলাপের সাহায্যে এই নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সার্থক। কখনো নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে, কখনো বা পূর্বে কথিত কোনো শব্দকে ভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যবহার করে এই নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন তিনি। 'কেনারাম বেচারাম' নাটকে তুখোড় নগেন বেচারাম চাটুয্যেকে খুঁজে পাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে নাটকীয় ভঙ্গিতে ঃ

" নগেন ।। ওফ্ বেচারামবাবু ছুটলেন, ... তারপর আমিও পিছুপিছু ছুটলাম ... হঠাৎ দেখি সেই লাইনে একখানা গাড়ি! স্পীড - এর মাথায় ছুটে আসছে! বেচারামবাবুর সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। গাড়িটা আসছে ... আসছে ... আসছে ... চাপা দেয় দেয় ...

সকলে ।। তারপর ... তারপর ...

নগেন ।। দৌড়ে গিয়ে বেচারামবাবুকে জাপটে ধরে লাইনের ধারে ফেলে দিলুম... (নগেনের ভয়ঙ্কর বর্ণনায় চারু ঝপ করে চেয়ারে বসে শঙ্কায় আর্তনাদ করে উঠল) — ঐ হুইসিল দিয়ে ট্রেন বেরিয়ে গেল। "[৫৭]

'নৈশভোজ' নাটকে মস্তান বাবলার সাকরেদ নেত্য, পলাশ ও রফি। ধ্বজাধরের থেকে টাকা আদায়ের লক্ষ্যে রফি বাবলার সঙ্গে মিথ্যে ঝগড়ার অভিনয় করে। কিন্তু সেই অভিনয়ের মধ্যে এই সত্যটাও বেরিয়ে আসে যে, বাপকে কবর দেবার সময় পঞ্চাশটা টাকা রফি চাইলেও বাবলা দেয় নি। ধ্বজাধর চলে যাবার পর বাবলা কথাটা তোলে ঃ " কথাটা যখন বলেই ফেলেছিস, আমাকেও তো একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শোন্, এখন থেকে যা আমদানি হবে, তার ফিফটিন পার্সেন্ট তোরা পাবি।"[৫৮] খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, বাবলা সহকর্মীদের অর্জিত অর্থের ভাগ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে। কিন্তু পরের সংলাপেই স্পষ্ট হয় ভেতরকার রহস্য, নাটকীয় মোচড় লক্ষিত হয় পলাশের সংলাপে ঃ "সেকি! অ্যাদ্দিন তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাচ্ছিলাম।"[৫৯] আসলে পাঁচ পার্সেন্ট কম দিয়ে বাবলা তার সঙ্গীদের লয়ালটি টেস্ট করে নিতে চায়। 'শোভাযাত্রা' নাটকে মন্মথ পাল জগন্নাথের রথ নিতে এসে সঙ্গীদের কাছে মাধবকাটির জমিদার বাড়িতে জগন্নাথের আবির্ভাবের যে গল্প শুনিয়েছে তা রীতিমত নাটকীয় ঃ

"মন্মথ ।। রোজ সন্ধেবেলা মায়াসুন্দরী শ্যামসায়রে যায় গা ধুতে। গা ধুতে ধুতে একদিন দেখে শ্যামসায়রের মধ্যিখানে ... ভুস্ ...

তৃতীয় সঙ্গী ।। মাছ ?

মন্মথ ।। ছেলে ! ভুস্ করে একটা ছেলে ভেসে উঠল।

কাকা ।। ভুস্ করে ছেলে !

মন্মথ ।। মাথায় তার পদ্মফুল। সাঁতার কাটতে কাটতে ছেলেটা ঘাটের কাছে এলো। শ্যামসায়রের জলে তখন সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। মায়াসুন্দরী গা ধুচ্ছে ... (মন্মথ হাতটা মুঠি করে ধরে)

কাকা ।। কী ?

তৃতীয় সঙ্গী ।। ঘুষি !

মন্মথ ।। নুলো! ছেলেটার হাতখানা নুলো ছিলো। নুলো হাতখানা বাড়িয়ে ছেলেটা মায়াসুন্দরীকে বললে - মাসি, আমায় ক্ষীরের মুড়কি খেতে দিবি?

কাকা ।। (বিস্ময়ে ডুকরে ওঠে) জগন্নাথ !

মন্মথ ।। সেই এলো জগন্নাথ। যাও, বাঁধো। ... গপ্পোটা কীরকম কাকা ?''[৬০]

সঙ্গীদের ভ্রান্ত অনুমান এবং মন্মথর উত্তরের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে নাটকীয়তা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, পাঠক-দর্শকও স্তম্ভিত হয়ে জগন্নাথের আবির্ভাব কাহিনি শোনে, একেবারে শেষ বাক্যে বিস্ময়ের শীর্ষ থেকে আকস্মিক অবরোহণ। 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকে গন্ধকালী রূপচাঁদের কাছে শুনেছে যাত্রাপালার নাম 'জুলিয়েট ধান ভানছে।' টিকিটচেকার-রূপী নেপাল যখন ছিনতাইয়ে উদ্যত তখন দোখনে অঞ্চলের গন্ধকালী ঝেড়েছে তার বিখ্যাত লাথি। হুমড়ি খেয়ে পড়া নেপালের ওপর দমাদ্দম পা চলছে আর মুখে সংলাপ ঃ ''জুলিয়েট ... জুলিয়েট ধান ভানছে ! ধান ভানছে ! ধান ভানছে ...!'' [৬১] এই সংলাপ পূর্বসূত্র সংযোগে কৌতুকময় নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। 'কুহুযামিনী' নাটকেও এলোকেশীর এরকম সংক্ষিপ্ত সংলাপে কেবল সামান্য পজ্-এর ব্যবহারে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন মনোজ মিত্র ঃ

''মাগো, যৌবন তো কোনও কালে আমাদেরও ছিল গো ... কত সংযম ছিল বলো দুদুঠাকুরপো ...
কতো বাধো-বাধো ছিল আমাদের, বলো ... (বলতে বলতে গা ঝাড়া দেয়) বাজাও বাজাও ...
ভাল করে পাউডার ঘষে নিয়ে বাজাও দুদু ... (থেমে) ঠাকুরপো ! ''[৬২]

এই সংলাপ এবং তার সঙ্গে শরীরী বিভঙ্গ চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত করেছে। 'দুদু' এবং 'ঠাকুরপো'র মাঝখানে ক্ষণিক বিরতি সংলাপে নাটকীয় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

সংলাপে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলে। পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার মানুষ মনোজ নিজের চোখে দেখা মানুষের মুখে যে ভাষা শুনেছেন, তাকেই তুলে ধরেছেন নাটকে। সুন্দরবন অঞ্চলের কথ্য ভাষা যেমন স্থান পেয়েছে 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে ঃ

''বাদামী ।। বাপ ! (বাদামীর গলার স্বরে সবাই মুহূর্তের জন্য থেমে গেল) এট্টা মানুষ মরে যায়, আর তোমরা নাচতি লেগেছো !

ফুকনা ।। এবার যে লেচে লেচে বেঁচে থাকবো রে ! আহা মুশকিল আসান করে পীর গাজী গো ... আহা মুশকিল আসান করে ... ''[৬৩]

শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতা থেকে আঞ্চলিক সংস্কার পর্যন্ত এই সংলাপে স্পষ্ট। আবার বাদামী-মাতলা-জটার কথোপকথনে আঞ্চলিকতা স্পষ্ট তার শব্দ, বাক্‌বৈশিষ্ট্য, কৌতুক, এমনকি অশ্লীলতাসহ ঃ

''বাদামী ।। কি হলো, ও দাদা !

মাতলা ।। হেই কাকা, আরে তুর, কাঁদতি লাগলি কেনে ?

বাদামী ।। ওরে এ জল-দেয়া ভাতে তুমি আর জল বাড়ায়ো না গো —

মাতলা ।। খাও !

জটা ।। তোর কাকীর কথা মনে পড়ছে রে মাতলা।

মাতলা ।। খেয়েছে !

জটা ।। সে মাগী, ভাত-ভাত করে জলে ডুবে মরেছে, অথচ আজ বেঁচে থাকলি তার কতো না আরাম ! গ্যাঁটে লগদ দুটো ট্যাকা আমার !

মাতলা ।। হয়েছে, ল্যাও ল্যাও হাত চালাও !

জটা ।। মাগী কতো না খাতি-পরতি পেতো রে !"[৬৪]

এসব সংলাপ মনোজ মিত্র ব্যবহার করেছেন নিজের স্বাভাবিক বাক্-ব্যবহারের মতোই। কোথাও সামান্যও আরোপিত মনে হয় না। ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক পরিচয়ই এর কারণ। প্রায় একইরকম আঞ্চলিক বিশিষ্টতা ফুটেছে বাঞ্ছারামের সংলাপে ঃ

"দূর শালা, তোমার পোষ মাস আমার যে সাড়ে সব্বোনাশ ... ঝাড়ে আছোলো বাঁশ ! বেইজ্জতের শেষ হয়ে যাচ্ছি — এই মরি এই মরি — আজ মরি না কাল মরি — বারবার নোকটার কাছে আমার কথার খেলাপ হচ্ছে — আর নোকটা এইরকম নোগা হয়ে যাচ্ছে ! নজ্জায় তার দিকে আমি চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত পারিনে ! হারামজাদা ছেলে, মানুষের মিত্যু নিয়ে তুমি ছেলেখেলা পেয়েছো !"[৬৫]

এই সংলাপে খুলনা অঞ্চলেরই মানুষের স্বাভাবিক রহস্য ও কৌতুকপ্রিয়তা, তথাকথিত অশ্লীল শব্দের সহজ ব্যবহার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকে মনোজ মিত্র কাল্পনিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখেছেন এক আদিম জনগোষ্ঠীকে। তাদের ভাষায় সৃষ্টি করেছেন যে কৃত্রিম আঞ্চলিকতা, তা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে রচনাকৌশলের গুণেই ঃ

"কুন্ডলা ।। আই আই আই। হে মা ডর নাই, ডর নাই। মোয় তুহির কন্যে ! হেয়ে বুড়া, মায়ের হিয়া তাতল ঠেকে, অধরদুটি থরথর ! নিদান দে ... নিদান দে ...

ডাহুক ।। হুঁ হুঁ ! (ডাহুক তাড়াতাড়ি কুন্ডে নেমে যায়। কুন্ডলা কোলের ওপর গৌরীকে নাচায়।)

কুন্ডলা ।। খাই লাগে ? কী খাবি মা ? ছেলেরা শিকার হতে ফিরুক ! হরিণ দিব, হরিয়াল দিব, মোষ দিব ! মোর গোটা চার ভেড়া আছে মা, দুধ নিঙাড়ি দিব সবটুকু। ও মোর সোনার পুতলি, পাহাড়ের ওধার হতে সওদাগর মৃগনাভি আর চামড়া সওদায় আসে, বিনিময়ে তোহর তরে গড়ন নিব ! পায়ের নিকন ... হাতের কাঁকন ... মাথার মুকুটি ..."[৬৬]

কল্পনা-সৃজিত এই আঞ্চলিকতা কখনোই কৃত্রিম বলে মনে হয় না। পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে এই সংলাপ সহজলগ্ন। 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে কেবল ক্রিয়া পদের সামান্য বদলে এবং দু-একটি বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহারে মনোজ মিত্র যে কৃত্রিম আঞ্চলিক ভাষা সৃষ্টি করেছেন তা অতীতের পটভূমি নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। যেমন ফকিরের সংলাপ ঃ

"কি করি কহ তুমি ? মানুষ মরে আমি রব আস্তাবলে ? গেছি আমি ঝিকরগাছি, কাঁঠালিয়া বকচরা — তালুকদারের পাইক মোর হাত ভেঙেছে তবু গেছি — মাথা ভেঙেছে ফের গেছি — পা ভেঙেছে, হিঁচড়ে পিঁচড়ে গেছি ! শেষে পলাশপুরের রোগীরাই আমারে নৌকায় তুলে দরিয়াগঞ্জের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেল।"[৬৭]

পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে প্রচলিত এবং পরিচিত যে উপভাষা অর্থাৎ বঙ্গালী উপভাষা, মনোজ মিত্র তাঁর বহু নাটকের চরিত্রের মুখে ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য খাসনবীশ ('মুন্নি ও সাত চৌকিদার'), ছানা ('স্মৃতিসুধা') কাব্যতীর্থ ('নাকছাবিটা'), আতাউল্লা ('পালিয়ে বেড়ায়'), ফৈজী ('টু-ইন-ওয়ান', প্রভৃতি চরিত্রের কথা। এই ধরণের সংলাপের দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধার করা গেল 'বনজোছনা' নাটকের অংশবিশেষ ঃ

"জলপাই ।। দাদুরী বোঝেন না ! আপনে তো হতাশ করলেন দেহি আপা ... মত্ত দাদুরী - ডাকে ডাহুকী ... ফোক কবি বিদ্যাপতি পড়েন নাই ?

কালোছায়া ।। না পড়িনি ! নিজের লাইনে লেখাপড়া করে কুলিয়ে উঠতে পারছিনে ...

রোশনি ।। সত্যি কালোছায়া, ভূতের বই ছাড়া আরো যে কিছু পড়ার আছে ...

জলপাই ।। দাদুরী হইল ভ্যাক !

কালোছায়া ।। ভ্যাক ! ভ্যাক কী ?

জলপাই ।। ভ্যাক ! ভ্যাক জানেন না ? আপনে হইছেন বাংলা বই-এর পাবলিশার। ভ্যাক ! ভ্যাক !

কালোছায়া ।। কী ? কী সেটা ?

জলপাই ।। বেঙ ! সাদা বাংলায় যারে কয় বেঙ ! বোঝলেন ? বেঙ ফোক-লেংগু।

কালোছায়া ।। বেঙ ! বেঙটা কী !

জলপাই ।। বেঙ জানেন না ? (চিৎকার করে) ইংরাজি বুঝেন ? ইংরাজিতে যারে কয় ফ্রুগ। কন ফ্রুগ কী ?

কালোছায়া ।। না, পরিষ্কার হয়ে গেছে ! ফ্রুগ সব ক্লিয়ার করে দিয়েছে।"[৬৮]

উচ্চারণ- বিশিষ্টতার কারণে সৃষ্ট ভ্রান্তি বোঝানোর জন্য নাট্যকার এখানে চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন এবং দেখিয়েছেন, নিজের ভাষার শব্দ চিনতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজি শব্দের আশ্রয় নিতে হয়, যদিও সেই শব্দের উচ্চারণও আঞ্চলিক গুণে বিশিষ্ট।

প্রবাদের মধ্যে নিহিত থাকে যে কোনো ভাষার প্রাণশক্তি। অঞ্চলের ভাষাগত বিশিষ্টতাও প্রকাশ পায় প্রবাদ ব্যবহারের মাধ্যমে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রবাদ চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশেও সহায়তা করে। ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল থাকলেই কেবল কোনো স্রষ্টার পক্ষে প্রবাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব। নাট্যকার মনোজ মিত্রের সেই দখল রয়েছে – ভাষা এবং ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদের ওপর। তাই প্রবাদকে তিনি মিলিয়ে দিতে পেরেছেন ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গির সঙ্গে বা চরিত্রের স্বাভাবিকতার সঙ্গে। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে যেমন জটা এবং দাক্ষায়ণীয় প্রবাদ ব্যবহার তাদের চারিত্রিক ভিন্নতা স্পষ্ট করেছে। অঘোর ঘোষের ডুলি বনবাদাড় ভেঙে ছুটে আসছে জটা-মাতলার বাড়ির দিকে। উঠোনের ওপর নিয়ে এসে ফেললে বুঝি বাঁচাতেই হয় অঘোরকে। এই অবস্থাকে জটা ব্যাখ্যা করেছে প্রবাদের সাহায্যে ঃ 'বাঁশ তুমি ঝাড়ে কেনে, এসো মোর গত্তে।'[৬৯] যে অশ্লীলতার ছোঁয়াচ আছে এই প্রবাদে তা জটার মতো মানুষদের জীবনচর্যার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। অন্যদিকে দাক্ষায়ণীর ব্যবহৃত প্রবাদ অনেক শিষ্ট ও সংযমপূর্ণ, কারণ শ্রেণিগত অবস্থানে দাক্ষায়ণী জটার চেয়ে উন্নততর। জটা-মাতলা অঘোরের চিকিৎসা শুরু না করে ক্রমাগত প্রস্তুতির নামে সময় নষ্ট করতে

থাকলে দাক্ষায়ণী বলেছে ঃ 'এদিকে যে পাগড়ি বাঁধতে কাছারি শেষ হয়ে যায় ।'[৭০] 'বৃষ্টির ছায়াছবি' নাটকে কোলকাতার ঘাড়ের ওপর সল্টলেককে আগন্তুক ছেলেটি বলেছে ঃ 'কেলেপেঁচির নাকের ওপর মুক্তোর নাকছাবি'[৭১]। নিঃসন্দেহে বলা চলে, এই উপমা যদি সাধিত হ'ত চন্দনার দ্বারা, তবে শব্দ ব্যবহার আরো পরিশীলিত হ'ত। 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকে তিনটি প্রবাদই ব্যবহৃত হয়েছে গন্ধকালীর সংলাপে। নিজের 'গাঙডাকাতের মেয়ে' অপবাদ ঘোচাতে পথে বের হয়েছে গন্ধকালী। রূপ না থাকলেও আছে তার বিপুল স্বাস্থ্য। লাস্ট ট্রেনের কামরায় সে সঙ্গী পেয়েছে রূপচাঁদকে — তার আগে লেডিজ কামরায় ওঠা দুই খচ্চরকে জোড়া পায়ের লাথি কষিয়ে এসেছে। রূপচাঁদ কতটা ভরসাযোগ্য তা যাচাই করতে গিয়ে গন্ধকালী যখন বলেছে যে, সেই খচ্চর দুটো এদিকেই আসছে, তখন রূপচাঁদ বেডিং বগলদাবা করে সরে পড়তে চেয়েছে। গন্ধকালী তখন রূপচাঁদের ক্ষণিক পূর্বের পৌরুষ-গর্বকে ব্যঙ্গ করে বলেছে ঃ 'খোকা বড় তেজি ... তাড়িয়ে ধরে বেজি'[৭২]। আবার ফুলবাড়ির পড়োবাড়িতে গন্ধকালী রূপচাঁদকে ভেলিগুড় দিয়ে চা করে দিলে রূপচাঁদ যখন থুঃ থুঃ করেছে তখনও গন্ধকালীর স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে প্রবাদের আধারে ঃ 'বাঁশিআলার ট্যাঁকে নেই ফুটো সিকে ... এনে দাও নবঙ্গ-নতিকে'[৭৩]। পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে মাধুবীর যথার্থ বয়সের হিসেবটি ধরিয়ে দিয়ে গন্ধকালী প্রবাদের মাধ্যমে হেনেছে শাণিত ব্যঙ্গের তীর ঃ 'জামাইবাবু কমলালেবু একা খেও না ... ননদিনী কচিখুকি কিছু বোঝে না ...'[৭৪]। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে সারাজীবন বোনের 'চরিত্র' পাহারা দিয়ে বেড়ানো পমমামা নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে প্রবাদের মাধ্যমে ঃ 'মুখে যার ফিকফিকে হাসি ... সে নারী কভু না হয় বিশ্বাসী'[৭৫]। পঞ্চকাণ্ডের এক কাণ্ডে চাকর মদন প্রবাদের মাধ্যমে সেই শ্রেণির মানুষের চরিত্র উন্মোচন করেছে, যারা সংসারের প্রবল অনটন সত্ত্বেও বাইরের বাবুয়ানা দেখিয়ে চলে ঃ 'ঘরেতে শাক জোটে না, বৈঠকখানায় লাল বিছানা'[৭৬]। 'ব্রিজের ওপর বাপি' নাটকে চায়ের দোকানি চুমকির বাস্তবজ্ঞান প্রখর। সে জানে, ঝামেলা কীভাবে কাঁধে এসে চাপে। তাই তার স্পষ্ট কথা, বাপিমামার 'বডি'ও যদি সে দেখে তাহলে সেই বডি আবার ঠেলা মেরে গাঙে ফেলে দেবে। কারণ প্রথম সন্দেহের তালিকায় তো সে। তার চেয়ে ঃ 'যা ঝামেলা ভেসে ভেসে ... যা চলে যা দূর দেশে'[৭৭]। 'বনজোছনা' নাটকে বনজোছনার গড়ের মাঠে রোদ পোহাবার সাধকে কালোছায়া উপমিত করেছে একটি প্রবাদের সাহায্যে ঃ 'রোদ পোহাতে গড়ের মাঠ ! অ্যাঁ, গামছা ধুতে সাগর '[৭৮]। মনোজ মিত্রের নাটকে প্রবাদ ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মূলধারার চরিত্রের চেয়ে প্রান্তবর্তী চরিত্রের সংলাপেই প্রবাদের ব্যবহার বেশি। সাধারণ জীবনেও জটা, গন্ধকালী, পমমামা, মদন বা চুমকির মতো মাটির কাছাকাছি মানুষেরাই প্রবাদের ব্যবহার বেশি করে থাকেন। জীবনের নিপুণ পর্যবেক্ষক মনোজ মিত্র এই শ্রেণির চরিত্রদের মুখেই প্রবাদ ব্যবহার করায় সেগুলি তাদের কথনভঙ্গির স্বাভাবিককতায় মিশে গেছে, কোথাও আরোপিত বা কৃত্রিম মনে হয় নি।

ছোটোগল্পের মতোই ইঙ্গিতময়তা নাট্য সংলাপের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মনোজ মিত্রের নাটকে এরকম ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনাগর্ভ সংলাপের দৃষ্টান্ত প্রচুর। এই ইঙ্গিতময়তা নাট্যসংলাপকে দিয়েছে গভীরতা। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে ক্রমাগত দারিদ্র্য আর শোষণের দ্বারা পিষ্ট হতে হতে মাতলা বিশ্বসংসারের প্রতি তীব্র ক্ষোভ আর ঘৃণা পোষণ করে। তার বুকের ভেতর গজরায় যেন সাপ। প্রবল প্রতিশোধস্পৃহায় যে উচ্চারণ করে ঃ ''আরো এত্তোখানি তোলাবো। তারপর মরার কালে উয়ারে

আমি ছুঁড়ে মেরে যাবো পিথিবীর বুকি! যতো বজ্জাতে মিলে আমার যে সব্বোনাশ করেছে ''[৭৯] 'কেনারাম বেচারাম'-এর নগেন সব শূন্যস্থানে মানুষ 'ফিট' করে বেড়ায় তুখোড় বুদ্ধি আর কথার জোরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও জাগে গভীরতর উপলব্ধি ঃ ''জানেন বেচারামবাবু, সব শূন্যস্থানই ফাঁকিতে পূরণ করা যায়, কিন্তু এই (বুক দেখিয়ে) ... এই এখানে যদি কোন স্থান ফাঁকা থেকে যায়, সে ফাঁক কোনদিনই ফাঁকিতে ভরাট করা যায় না ''[৮০] 'শোভাযাত্রা' নাটকে অতসী-যামিনীর সম্পর্কে অদ্ভুত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন মনোজ মিত্র। স্পষ্ট করে বলা হয় নি কিছু, কিন্তু ব্যঞ্জনায় অনেক কিছুই প্রকাশ পেয়েছে। জগন্নাথের রথ বিক্রি হয়ে যাবার পর চলে যাচ্ছে যামিনী, সেই বিদায় দৃশ্যটি ব্যঞ্জনায় মুখর হয়ে উঠেছে ঃ

''অতসী ।। যাচ্ছো ? (যামিনী থমকে দাঁড়ায়) কিছু বলবে না?

যামিনী ।। আমি ... আমি এবার দেশে চলে যাবো অতসী।

অতসী ।। জানি, জানি আর থাকবে না তুমি। আমাদের হাতের জলও তো ছোঁবে না তুমি । বাবা বলে, যামিনী বড় শুদ্ধাচারী।

যামিনী ।। না না, অতসী ... আমি ...

অতসী ।। হয়ত অনেক আগেই যেতে তুমি। বিনি মাইনেতে একটা ভাঙা মন্দির আঁকড়ে এতকাল কেন যে রয়ে গেলে ...''[৮১]

'ভাঙা মন্দির' এখানে ব্যঞ্জিত করেছে শ্বশুরবাড়ি-পরিত্যক্তা অতসীকে। যামিনী 'শুদ্ধাচারী' আর অতসী নদুর দ্বারা 'অশুদ্ধ', তাই সে 'মন্দিরে'র 'পূজারী' হতে পারে না যামিনী। যামিনী চলে যাবার পর উঠোনে লুটিয়ে অতসীর ডুকরে কান্না ইঙ্গিতকে আরো স্পষ্ট করেছে। 'দম্পতি' নাটকে এই ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে ছেলেদের স্বার্থপরতায় বিচ্ছিন্ন হতে চলা কর্তা-গিন্নির সংলাপে ঃ

''কর্তা ।। ... পত্তর লিখো !

গিন্নি ।। ওমা ! আমি কি লিখতে জানি ? পাড়ার লোক ধরে লিখিয়েছি এতোকাল !

কর্তা ।। বর্ণপরিচয় না চেনার কী দুর্গতি !

গিন্নি ।। বুঝবো কী করে, বেঁচে থেকেও আমাদের আলাদা থাকতে হবে ? শেষকালে যে মানুষের এমন বর্ণের পরিচয় পাবো ! ''[৮২]

এই ব্যঞ্জনায় একইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকারের ক্রোধ। মনোজ মিত্র দেখেছেন, বিশ্বব্যাপী বাজার ক্রমশ গ্রাস করছে বিবেক, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে। সকলেই বেশ্যাবাড়ির মেয়ের মতো দরের জন্য হাপ্‌সে মরছে। নিজের দাম কতদূর উঠতে পারে — সেটাই ঠিক বুঝতে পারছে না, তাই অনেকসময় ঠকেও যাচ্ছে। এই দাম বুঝতে পারাটাই আসল। 'আত্মগোপন' নাটকে বিভূতির সংলাপে মানুষের সেই পণ্যায়নের ব্যঞ্জনা ঃ

''সেইটাই, সেইটাই সমস্যা। কোন্ পর্যন্ত ? জাস্ট পয়েন্টটা ধরা, ধরতে পারা নিয়েই আমারো এ খেলা ভাই। ধরতে পারলে আছি, নাহলে গেছি। ঠিক সময়টি ধরতে না পারলে দাম পড়তে থাকবে। তখন হাত কামড়াতে হবে ! বাজার, বাজারের হাওয়াটা চিনতে না পারলে, বুঝতে না পারলে —''[৮৩]

এই সর্বনিয়ন্তা বাজারের মধ্যেও মনোজের আস্থা এবং বিশ্বাস কিন্তু টলে যায় নি। খাদের কিনার

থেকে তাই মানুষকে ফিরিয়ে আনেন তিনি। বিভূতি মরে গেলেও অর্পণের দিকে এগিয়ে আসে অনেকগুলি শুভানুধ্যায়ীর হাত, আর 'রঙের হাট' নাটকে শান্তা যখন স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা বিসর্জন দিতে উদ্যত টাকার জন্য, তখন ফজলু পালন করে বিবেকের ভূমিকা ঃ ''জেতার দিন ছিল সেই দিন রে বহিন, যেদিন হাটের পাখিরে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে ! আজ ঘরের জীবটারে হাটে এনেছ – আজ তো যাবার পালা !''[৮৪] প্রায় একইরকমের কথা, মানুষের ওপর আস্থা-বিশ্বাস আর ভালোবাসার কথা মনোজ মিত্র বলেছেন 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকে। পুরনোর প্রতি নাট্যকারের মমতাই যেন ফুটে উঠেছে ছোড়দার সংলাপে ঃ ''আমি সাফ বলে দিয়েছি, বাঁশি বাজাবে জ্যান্ত মানুষ ... এক বুক দরদ নিয়ে গাল ফুলিয়ে বাজাবে ... ও শালা সিনথেসাইজারের না আছে দরদ, না আছে ফুসফুস !''[৮৫] একই ভাবের প্রকাশ আবার 'নাকছাবিটা' নাটকে কাব্যতীর্থের সংলাপে ঃ ''সুন্দরী কইন্যা শুন, জীবন পইড়া আছে, হাটে হাটে কেনাবেচাও পইড়া আছে। কিছু তো থাকে, যা কেনাও যায় না, বেচাও যায় না ...''[৮৬] মনোজ মিত্র এসব সংলাপে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই কথা বলতে চান — বাজার যতই সর্বগ্রাসী হোক, মনুষ্যত্ব, স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা অবিনশ্বর। শেষ পর্যন্ত এদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই জয়েই মানুষের মুক্তি, মানুষের স্থিতি। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে তুমুল হাসির মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সমাজে নারীর অবস্থানটিকে। সেই অবস্থানটি ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে মুন্নির সংলাপে ঃ

> '' আমার জন্মের এক মাসের মধ্যেই মা আর বাবার ডিভোর্সের মামলা শুরু। ছাড়াছাড়ির পর কে আমায় দখলে রাখবে, তাই নিয়ে তুমুল দড়ি টানাটানি। বাবা আমায় তার কাছে আটকে রেখেছিল। একদিন মা করল কি, বাবা যখন ঘুমোচ্ছে, একটা র‍্যাশনব্যাগ নিয়ে বাড়িতে ঢুকে, আমায় তার মধ্যে বসিয়ে নিয়ে দে ছুট ... পড়িমরি ট্রামরাস্তা ধরে ছুট ... ছুট ... ছুট ... (হাসতে শুরু করে) সেই থেকে মনে হয়, আমি যেন একটা হাতব্যাগের মধ্যেই বসে আছি ... কারো না কারো হাতে ঝুলছি ... কখনও মায়ের হাতে, কখনও সৌরভের হাতে ... কখনও ... হাতে হাতে ঝুলছি। সব মেয়েই বোধহয় তাই, না স্যার ?''[৮৭]

ছোটো নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংলাপের ইঙ্গিতময়তা আরো বেশি। যেমন 'পাখি' নাটকের অধিকাংশ সংলাপই ব্যঞ্জনাগর্ভ। হ্যারিকেনের সেলস্‌ম্যান নীতিশের সাধ হয়েছিল অন্তত একদিন সে আরশোলা থেকে পাখি হবে — উড়াল দেবে দীর্ঘদিনের কল্পনার আকাশে। বিয়ের পর নীতিশ-শ্যামা ছিল সুখী দুই পাখির মতোই — কিন্তু দারুণ অভাবের পেষণ তাদের শেষ করে দিয়েছে। বিছানার চাদরে সুতো দিয়ে তোলা একটা পাখি কেটে দিয়েছে পোকায় ঃ

''শ্যামা ।। তোমার ঘরে ক'পয়সার ন্যাপথলও কি জুটল ... একটা পাখি পোকায় কেটে দিল।

নীতিশ ।। (হুমড়ি খেয়ে পড়ে) আরে আরে তাই তো ! ইস্, একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

শ্যামা ।। একটা পাখি আমার শেষ করে দিয়েছে, কুরেকুরে কেটে কেটে ...

নীতিশ ।। শ্যামা !

শ্যামা ।। (আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) ছোড়দি বলছিল না, একটা পাখি তুমি আর একটা আমি। এই শেষ হয়ে যাওয়াটা আমি ...''[৮৮]

হাসির নাটক 'দন্তরঙ্গ', কিন্তু শেষে বৃদ্ধের একটি সংলাপে যে গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে সেখানেই এই নাটকের মূল ব্যঞ্জনা ঃ ''না। নকল দাঁত আমি পছন্দ করি না। যে দাঁত জীবনে টাটাবে না ... কষ্ট দেবে না ... যার কখনও ব্যথা চাগাবে না ... সেই নিষ্ঠুর নির্দয় বাঁধানো দাঁতের কোন স্থান নেই আমার চোয়ালে।''[৮৯] 'আকাশচুম্বন' নাটকে মনোজ মিত্র অবলম্বন করেছেন তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। অসংখ্য ইঙ্গিতময় সংলাপে সেই বিষয়টি ব্যঞ্জিত হয়েছে। সুপ্রিয়-রূপার নতুন ফ্ল্যাটে চিড় ধরেছে সামান্য। এই চিড় ধরেছে জীবনেও। তাই সুপ্রিয় প্রশ্ন ফাঁস করে উপার্জিত টাকায় ফ্ল্যাট কিনেছে আর রূপা অসংখ্য পুরুষকে 'ম্যানেজ' করেছে এই ফ্ল্যাট পেতে। সব মসৃণতার মাঝে তাই থেকে যায় দাগ ঃ

''রূপা ।। ... একটা চুলচেরা দাগ পড়তে পারে না?

সুপ্রিয় ।। নিশ্চয়ই পারে। দাগটা না বাড়লেই হলো!''[৯০]

কিন্তু দাগটা ক্রমশ বেড়েছে। সন্দেহ তীব্র হয়েছে। মধ্যবিত্তের দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব সুপ্রিয়কে দীর্ণ করেছে, আর রূপা উচ্চারণ করেছে নির্মম সত্য ঃ ''আকাশে চুমু দেবে সুপ্রিয়, ঠোঁটে একটু ছ্যাঁকা লাগাবে না?'' [৯১] সুপ্রিয়র মধ্যবিত্ততাকে তীব্র আক্রমণ করেছে রূপা। এই আক্রমণ আসলে সুপ্রিয়কে উত্তেজিত করার কৌশল, দ্বিধা-উত্তীর্ণ করার প্রয়াস ঃ ''বেচারী সুপ্রিয় ! (থেমে, কর্কশ গলায়) তোমার অবস্থাটা ঐরকম ! সব চাই, কিন্তু মাপের মধ্যে চাই ! চান করব, হাঁটুজলে চান করব — মাথার ওপরে না ওঠে জল !''[৯২] এরকম ব্যঞ্জনাময় সংলাপই মনোজ মিত্রের নাটকের সম্পদ। সহজ শব্দ ব্যবহারে, পরিস্থিতির উপযুক্ত আনুকূল্যে তিনি সংলাপের এইসব মণিখন্ড নির্মাণ করেছেন।

কমেডির স্রষ্টা হিসেবেই মনোজ মিত্রের প্রধান পরিচয়। সার্থক কমেডি তখনই সৃষ্টি হ'তে পারে যখন হাসির সঙ্গে মিশে যায় অশ্রু, হাস্যকরতার সঙ্গে মিশে যায় নোনা বিষাদ। তাঁর কমেডির চরিত্ররা তত্ত্ব মেনেই সাধারণের চেয়ে হীন। নিজেদের নিয়ে তারা কৌতুকে মাতে, অন্যের কাছেও যথেষ্ট সম্মান তারা পায় না। এইসব চরিত্রর সংলাপ অথবা তাদের সম্পর্কে অন্যের সংলাপে অনেকসময়ই হাসির রামধনু ঢেকে গেছে কান্নার মেঘে। 'কেনারাম বেচারাম' নাটকে যেমন নগেন পাঁজা বেচারামের জায়গায় কেনারামকে 'ফিট' করতে এসে কেনারাম সম্পর্কে বলেছে ঃ

> ''তা বেচারামবাবুর চেয়ে সব দিকেই বেটার। বেচারামবাবু দুবেলা ভাত খেতেন ... ইনি একবেলা খাবেন, দরকার হলে এঁটো কাঁটা খাবেন ... (কেনারাম ঘাড় নাড়ে) বেচারামবাবুকে কাপড় দিতে হত ... ইনি শ্রীধরের ছেঁড়া গামছা পরে লজ্জা নিবারণ করবেন ! বেচারামবাবুকে বিছানা বালিশ দিতে হত, ইনি রোয়াকে থান ইঁট মাথায় দিয়ে শোবেন — (কেনারাম ঘাড় নাড়ে) মাঝে মধ্যে ঠ্যাঙাতেও পারেন! বেস্ট বাবা মশাই ... আদর্শ হেড অব্ দি ফ্যামিলি !''[৯৩]

এই সংলাপ তুমুল হাসির মাঝে বিষাদের একখন্ড কালো মেঘ। 'সাজানো বাগান' নাটকে বাঞ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখা গুপী-পদ্ম কিংবা চোরের বিশেষ প্রয়োজন নিজেদের বাঁচার জন্য। চোরের সামান্য সংলাপও এখানে অসামান্য হয়ে ওঠে হাসির সঙ্গে অশ্রুর মিশেলে। বাঞ্ছারাম নিজের মৃত্যুর পর বাগান নকড়ির হাতে তুলে দেবার শর্তবন্দী হয়েছে, আর অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে চোর এবং তার পরিবারের। কারণ দীর্ঘদিন থেকে চুরি করে এই বাগানের ওপর চোরেরও 'নাইট' প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। সেই অধিকার বাঞ্ছা কেড়ে নেয় কোন অধিকারে ঃ

> "কেন কেড় নেচ্ছ ? আর কদিনই বা গ্যাঁড়াতে পারবো ! ছেড়ে দ্যাও, (পুঁটুলিটি কেড়ে নিয়ে) ছেলেমেয়েরা হাঁ করে বসে রয়েছে — কখন তাদের বাপ মাল গেঁড়িয়ে ফিরবে ! ... কী লাভ হ'লো, অ্যাঁ, আমাদের সবার ভাত মেরে কী লাভ হ'লো ?"[৯৪]

এই অসহায়তায় চোরও উত্তীর্ণ হয়ে যায় পাঠক-দর্শকের সহমর্মিতায়। আশ্রয়চ্যুত হবার, শিকড় ছিন্ন হবার যে সমস্যা দেখা দিয়েছে 'কেনারাম বেচারাম' বা 'সাজানো বাগান' নাটকে, সেই একই থিম ব্যবহৃত হয়েছে 'দম্পতি' নাটকে। বাহ্য হাসি-মজা-কৌতুকের আড়ালে আধুনিক সময়ের মূল্যবোধহীনতা আর তারই ফলে শিকড় ছেঁড়ার বিষাদ ছড়িয়ে আছে এই নাটকের দেহে। সন্তানের স্বার্থে বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, ভাগ হয়ে যাচ্ছে বাবা-মা। নাটকের শুরু থেকে কর্তা-গিন্নির বিরোধকে ঘিরে যে কৌতুকের আবহ তা বিষাদকরুণ হয়ে ওঠে নাটকের শেষে ঃ

> "কর্তা ।। জিতুরে আমরা ভাগ হয়ে গেলামরে ! (গিন্নি এসে, দাঁড়ায় দরজায়)
>
> জিতেন ।। সে তো হতেই পারে। লাউ, কাঁঠাল, কুমড়ো ভাগ হয় ... জমিজমা ভাগ হয় ... দেশ ভাগ হয় ... দেশে দেশে গঙ্গার জল ভাগ হয় ... মা বাপ ভাগ হবে, এতে আর কি আছে রে ?
>
> কর্তা ।। বলিসনে জিতু ... আর বলিস নে ...
>
> জিতেন ।। কাঁদিস নে ... কাঁদিস নে, বুড়োবয়েসে কাঁদতে দেখলে ছেলেরা হাসবে। কাঁদিস নে ... কাঁদিস নে।
>
> গিন্নি ।। (দপ করে জ্বলে উঠে জিতেনকে) ঠাট্টা করছেন! ঠাট্টা ! জীবনে অনেক ঠাট্টা করেছেন ঠাকুরপো ! কিন্তু আজকেরটা ... তার বুঝি তুলনা হয় না ... তুলনা হয় না ... (গিন্নি কর্তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে গুমরে গুমরে কাঁদে)।"[৯৫]

এখানেও সেই অসহায়তা, সেই অস্তিত্বের সংকট। অসহায় তো বোকা ঘন্টকর্ণও। সকলের অপরাধ নিজের কাঁধে নিয়ে সে শাস্তি ভোগ করে — এটাই তার চাকরি। গণিকা উদাসিনীর মতো সেও ব্যবহৃত। গণিকার মতোই প্রতিদিন সে সেজেগুজে দুয়ার ধরে দাঁড়ায় — খরিদ্দারের আশায়। ঘন্টাকর্ণের বোকামি নাটকে অনেক হাসির উপাদান জুগিয়েছে, কিন্তু উদাসিনীর কাছে যখন সে ব্যক্ত করে নিজের দুর্বহ জীবনের যন্ত্রণা, তখন সংলাপের গভীরতায় পাঠক-দর্শকের চিত্তে সে পেয়ে যায় অশ্রুসজল স্বীকৃতি ঃ

> "তাই ... তাই রে উদাসিনী দেহটা মোর ভারি ভারি ঠেকে। হাজার পাপ ... হাজার জোঁকের মতো ধরে গায়ে ঝুলছে। মন্দিরের ঐ ডালিম গাছটা দেখেছিস ... মানুষ তার গায়ে কতো না মানত করে ইঁট পাথর ঝুলিয়ে রেখেছে ... আমি গাছটার মতো ... মানুষের পাপের মানত ঝুলছে আমার সর্বাঙ্গে ! ... উদাসিনীরে, আমি নড়তে পারিনে, চলতে পারিনে ... আমার কী হবে ! বলে দে রে উদাসিনী ... বলে দে ... "[৯৬]

কৈলাস অপেরা থেকে বারংবার পালাতে অভ্যস্ত রূপচাঁদ পনেরো বারের বার পড়েছে মহা গেরোয়। ফুলবাড়িতে নিজেদের ভিটেয় সে অবাঞ্ছিত, কারণ তার 'ডেথ সার্টিফিকেট' তৈরী করে নিয়ে বোন-ভগ্নিপতি সেই বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে প্রমোটারের কাছে। এদিকে অন্যান্য কলাকুশলীদের দাবিতে কৈলাসের মালিক টেলিফোনে রূপচাঁদকে চিনতে চাইছেন না। রূপচাঁদেরও তো অস্তিত্বেরই সংকট -

সে যে কে তাই বোঝাতে পারছে না। দূরভাষণে একদিকে রূপচাঁদ, অন্যদিকে ছোড়দা দুজনেই অসহায়। সেই অসহায়তা রূপচাঁদের সংলাপে সৃষ্টি করেছে কারুণ্য ঃ

> "(করুণ গলায়) ডাকো ছোড়দা, এখানে আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমি যে কে, সেটাই বোঝাতে পারছি না। সবাই ঘাড়ধাক্কা দেবে বলে ওয়েট করছে ! কোথায় যাবো ? কৈলাস ছাড়া আমার আর কোনো ঠাঁই নেই। ডাকো ছোড়দা ... "[৯৭]

রূপচাঁদও চাইছে আশ্রয় -- চাইছে একটা আন্তরিক আবাহন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও ডাকতে পারছেন না মালিক, চোখে জল নিয়েও অস্বীকার করছেন রূপচাঁদকে। এই অস্বীকৃতির পর ভানু খেমকা যখন রূপচাঁদকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে উঠোনে ফেলে দেয়, তখন নন্তু হালদার ওরফে রূপচাঁদ হয়ে ওঠে করুণ। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে লতুমাসি-পমমামার কথোপকথনে হাসি থেকে বিষাদে উত্তরণের বিষয়টি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ। লতুর পোষা বিড়ালদের নিয়ে পমের খিঁচুনির মধ্য দিয়ে কৌতুকের যে আবহে কথোপকথনের সূচনা, অচিরেই কথাবার্তার সহজ প্রবাহের মধ্য দিয়ে তা হয়ে উঠেছে অশ্রুসজল। হাসি থেকে বিষাদে বিবর্তনের মুহূর্তটিকে যে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না, সেখানেই নাট্যকারের কৃতিত্ব ঃ

> "লতু || তবে বুঝে দেখো ... কেউ তো ভুলেও বলে না পমবাবুর বাড়ি ... কি পমবাবুর ঠাকুর্দার বাড়ি ! শেষ জোজোদের নামেই বিখ্যাত হল বাড়িটা। (বাইরে তাকিয়ে) ও জোজো ... ও বাবা চলো, ঘুমু করবে।
>
> পম || (চেঁচায়) বিখ্যাত না কুখ্যাত ? বেড়ালের ঘেন্নায় একটা আত্মীয় স্বজন বাড়ির ছায়া মাড়ায় না ... পাড়ার লোক দিনরাত গাল পাড়ছে, কারও কাছে মুখ দেখাতে পারিনে। সেদিন দাবার আসরে একঘর লোকের সামনে হারাধনবাবু কী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ভাগ্নেদের খেতে দেন না কেন, রোজ সোফার গদি ছিঁড়ে খাচ্ছে ! ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছিল ! (লতিকা ফিরে এলো।)
>
> লতিকা || তা সময় মতো বিয়ে-থা দাওনি কেন ছোট বোনটার ! একঘর মানুষ-ভাগ্নে পেতে।
>
> পম || চুক্কর !
>
> লতিকা || কেন চুপ করব ? বাপ মা এমন ক্ষ্যামতাবান দাদার হাতে রেখে গেল, সারা জীবন বোনটাকে আইবুড়ি করে রাখল গো।
>
> পম || হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি না হয় অক্ষম, বোনের পাত্তর জোটাতে পারিনি। তা নিজেও তো একটা দেখেশুনে নিতে পারতিস।
>
> লতিকা || সে কথা আজ বলছ ! বয়েসকালে কোনদিন বাড়ির বাইরে বেরুতে দিয়েছ যে খুঁজে নেব। উত্তম- সুচিত্রার সিনেমা দেখতে গেছি ... তাও পাশের সিটে সেই দাদা ! দাদা না টিকটিকি ? কম জ্বালান জ্বালিয়েছ দাদা ! (দুঃখে আঁচলে চোখ ঢাকে লতিকা) সাধে কি জোজোদের নিয়ে আছি দাদা ?
>
> পম || (নরম হয়ে) কী হচ্ছে কী ? কান্নার কী হল ? অ্যাই লতু ... আরে বাবা, তোর বিয়ে দিতে পারিনি বলে নিজেও যে করেছি, তা তো নয় ... থাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন তো কিছু করারও নেই। আর দুজনের জীবন তো কেটেই গেল। (লতিকার মাথায় হাত বোলায়) ভাইবোন খারাপ যে কাটল তাও তো না। "[৯৮]

শেষ বাক্যের যে সহমর্মিতা তাতেই সৃষ্টি হয়েছে হিউমার। উদ্ধৃত সংলাপগুলি মনোজ মিত্র রচিত এ জাতীয় সংলাপের প্রতিনিধি-স্থানীয় বলা যেতে পারে। প্রায় প্রতিটি নাটকেই এরকম গভীর সংলাপ লক্ষণীয়, যা কৌতুক আর বিষাদের মিশ্রণে উজ্জ্বল।

মূলত দর্শনের ছাত্র এবং অধ্যাপক মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপে প্রায়ই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দার্শনিক সত্তা। ভাবজগতে ডুব দিয়ে তুলে আনা সেসব সংলাপ কখনো কাব্যময়, কখনো গভীর অনুভবে ঋদ্ধ। এসব সংলাপ প্রমাণ করে তাঁর অনুভূতির গভীরতা এবং ভাব প্রকাশের সামর্থ্যকে। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে রূপকের আধারে তিনি ফুটিয়েছেন সমকালীন সমাজবাস্তবতা। রাক্ষসনিধনের উপায়ও বলেছেন তাঁর মতো করেই। হিমপাহাড়ের তপস্বীর কাছে গিয়ে নীলকমল জেনেছে, মানুষই রাক্ষসনিধনের ব্রহ্মাস্ত্র। এই তপস্বীর সংলাপ প্রতিষ্ঠিত করে দার্শনিক সত্যকে ঃ

> "তপস্বী ।। জগতে কেউ কি মহান পবিত্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় ? ... সব কিছু তাকে অর্জন করতে হয় ... বারংবার অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে।
>
> নীলকমল ।। প্রভু !
>
> তপস্বী ।। মানুষ ভুল করে ... অজ্ঞানতায় পাপ করে ... আবার মানুষই অনুতাপে পোড়ে, নিজের পাপ নিজেই খন্ডন করে মুক্ত হয়। চৈতন্যে অভিষিক্ত হয়।"[৯৯]

জীবনের সহজ ও সাধারণ এই সত্যগুলিকে মনোজ মিত্র নাটকীয় বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্য দিয়ে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যে, সেগুলি অসাধারণত্ব পেয়ে যায়। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকে তিনি সৃষ্টি করেছেন রজনীনাথ চরিত্র, যে পঙ্গু। তাঁর অনেক নাটকেই দেখা যায়, এধরণের চরিত্রগুলি এক বিশেষ দৃষ্টির অধিকারী। জড় রজনীনাথও একাসনে বসে থাকেন, কিন্তু আকস্মিকভাবেই কিছু বিখ্যাত উক্তি উচ্চারণ করেন, যেগুলি বিষয়লগ্ন হয়ে নাটককে ভিন্নতর মাত্রা দেয়। যেমন - 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্', 'ওয়ার্লড ইজ এ মিউজিক্যাল ব্যান্ডবক্স' কিংবা 'ইফ ডেথ ইজ এ থিংগ দ্যাট মানি কুড বাই ... দ্য পুওর দে উড্ লিভ, দ্যা রিচ দে উড্ ডাই ! এই নাটকের শেষে অলকানন্দা নতুন করে আবার নিজের মাতৃত্বের আঁচল বিছিয়ে দেবার কথা যেভাবে বলেছে তাও ব্যঞ্জনায় হয়েছে প্রাত্যহিকতার অতীত ঃ

> 'আমার কেয়াপাতার নৌকোদুটো নোঙর ছিঁড়ে ছুটে গেছে ভরা গাঙের মধ্যিখানে ... উথাল পাথাল ঢেউ ... হয়ত ভাসবে ... হয়ত ডুববে ... আমি কূলে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখব ! তার চেয়ে আর একটা নৌকো গাড়ি না কেন ... গড়ার চেষ্টা করি না কেন ..."[১০০]

এই প্রত্যয়েই সার্থক নিঃসন্তান অলকানন্দার মাতৃত্ব। নিঃস্বার্থ, প্রত্যাশাহীন এই মাতৃত্বের কথাই ভিন্নতর প্রেক্ষিতে ব্যক্ত হয়েছে 'কাকচরিত্র' নাটকে কাকের সংলাপে, যা অন্যত্র উদ্ধৃত হয়েছে। সত্য যতই কেন রূঢ় হোক, তাকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করাই জীবন — সেই বার্তাই মনোজ মিত্র দিয়েছেন কাকের সংলাপে। শিকড়ের প্রতি ভালোবাসা এবং টান মনোজ মিত্রের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। শিকড়ে জল সিঞ্চন করে মূল্যবোধকে লালন করার কথা তিনি বলেছেন একাধিক নাটকে। 'রাজদর্শন' নাটকের শেষে কামার অভিরাম সেই বোধ সঞ্চারিত করেছে পরজীবী লম্বোদরের মধ্যে। ভিক্ষার দ্বারা মানুষের ঐশ্বর্যলাভ হয় না, হাতদুটি চালনা করে নিজের ঐশ্বর্য নিজে গড়তে হয় ঃ

"আনা যায় না, যা তোমার না, তা কোনোদিন ধরা যায় না ! কেন মিছে হাত বাড়াও ! যা তোমার, তারে তুমি চিনে নাও ! - ও ঠাকুরবাবা, চেয়ে দ্যাখো তোমার ন্যাড়া গাছেও কেমন পাতা বেঁধেছে ... কেমন ঝুপসি হয়েছে ... ফল আসছে গো ... শিগগিরিই ফল আসছে ...

লম্বোদর ।। শেকড় ... শেকড়ের মাহাত্মিরে বাপ, শেকড় থাকলে সব হয় ... "[১০১]

লম্বোদরের মতো পরজীবীও মনোজ মিত্রের নাটকে শিকড়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে। তাই শেষপর্যন্ত অভিরামের কাঁধ থেকে নেমে পড়ে, হেঁটেই যায়।

জীবনের সবচেয়ে অনিবার্য সত্য বোধহয় মৃত্যু। দার্শনিক মনোজ মিত্র জীবন-মৃত্যুর পরিপূরকতা নিয়ে লিখেছেন 'তক্ষক' এর মতো নাটক, আবার ' দম্পতি'র মতো নিতান্ত সামাজিক নাটকেও কতো সহজে চরিত্রের মুখে উচ্চারণ করিয়েছেন সেই সত্য -- 'মৃত্যুকে খেয়ালের মধ্যে না রাখলে সংসার করা যায় না'। একই সত্য ব্যক্ত করেছে 'তক্ষক' নাটকের পরীক্ষিৎ ঃ "মৃত্যুকে ভয় করে বাঁচা যায় না ... প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, আঘাত করে তাকে পরাজিত করে তবেই না জীবনকে ভোগ করা যায় ... "[১০২] মৃত্যু তো অনিবার্য, কিন্তু জীবন তার চেয়ে অনেক বড়ো। তাই পরীক্ষিৎ যখন মৃত্যুভয় জয় করে তখন মৃত্যুরূপী শৃঙ্গী তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে নিজের বিষে জর্জরিত হয় আর পরীক্ষিৎ ঘোষণা করে জীবনের জয় ঃ "হ্যাঁ, সপ্তম দিনে আমি মরব । সপ্তম দিন ! সপ্ত সমুদ্র দূরে ! তার পূর্বে ছয় দিন আমি বাঁচব, বিরাট হয়ে বাঁচব !"[১০৩] পৌরাণিক উপাদান নিয়ে রচিত মনোজ মিত্রের আরেকটি বিখ্যাত নাটক 'অশ্বত্থামা'তেও একাধিক কাব্যময় সংলাপে উঠে এসেছে দার্শনিক সত্য। যুদ্ধোন্মত্ততার বিপরীতে এই নাটকে কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে আহ্বান জানিয়েছেন জ্ঞানের রাজ্যে, সৃজনের রাজ্যে। অশ্বত্থামার আকাঙ্ক্ষা আর কৃপাচার্যের আশ্বাস নির্মাণ করেছে এক কাব্যময় আবহ ঃ

অশ্ব ।। ... ঐ নীল শৈলপারে চাঁদ উঠলে, আমার কুটীরের দ্বারে ... তোমার পায়ের কাছে বসে শুনব পিতা, ভূলোকে দ্যুলোক নভোমন্ডল আর জীবনের অগাধ সব রহস্যকথা !

কৃপ ।। বলব, বলব অশ্বত্থামা ... তোকে আমি বলে যাব সব ! মাটির কথা ... মৃত্তিকার অণু পরমাণু ভেঙে ভেঙে দেখিয়ে যাব এক আশ্চর্য আলোক ... মহাবিশ্বব্যোমব্যাপী মঙ্গলের আলোক ! তোকে আমি দিয়ে যাব সব!

অশ্ব ।। ধীরে ধীরে ভুলে যাব ফেলে আসা জীবনের সব কথা ! আহার বিহার বসন ভূষণ ... সব ! সব রক্ত মুছে ফেলব ! নীরবে নিভৃতে অশ্রুপাত করে ধুয়ে দেব দু চোখের অন্ধতা ।"[১০৪]

এই কাব্যলোক নির্মাণেই মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপের স্বাতন্ত্র্য। এ যেন গদ্যে লেখা কবিতা। 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকেও সংলাপ কাব্যধর্ম লাভ করেছে। বিশেষত, হেকিম যেখানে তার দাওয়াইয়ের প্রস্তুতি বর্ণনা করেছে ঃ

" হেকিমের দাওয়াই ফুলের সুরভি খায়, ফজরের নেহের খায় ... মধু খায়, মৃগনাভি খায়, বনের সবুজ খায় ... অনেক ক্ষুধা তার ! আসমানের দিগন্তজোড়া কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝলকানি উঠলে, সেই ঝলকানিটিও খায়।"[১০৫]

ব্যাধির মতো শত্রুর সঙ্গে লড়তে দাওয়াইয়ের চাই শক্তি এবং সৌন্দর্য — হিম্মৎ এবং রোশনাই। মনোজ মিত্র বিশ্বাস করেন, সেই শক্তি এবং সৌন্দর্যের নিদান আছে প্রকৃতিতে। সেই বিশ্বাসই সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে। নাটক রচনায় তিনি যত পরিণতির দিকে এগিয়েছেন ততই যেন তাঁর দার্শনিক সত্তা আরো বেশি করে ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য 'ছায়ার প্রাসাদ', 'পালিয়ে বেড়ায়', 'নাকছাবিটা', 'যা নেই ভারতে' প্রভৃতি নাটকের কথা। 'ছায়ার প্রাসাদ'-এ প্রকৃতির অন্তর্লীন চেতন সত্তাকে উপলব্ধি করেছে দ্বৈপায়ন ঠাকুর। এই উপলব্ধি আসলে নাট্যকারেরই ঃ

> "গাছপালা পাহাড় ঝর্ণা ... তুমি তাদের ডেকে কথা বলো না, তারাও তাই চুপ করে থাকে। ডাকো ডাকো না ঐ তারাটিকে ... (বিন্দু সারের কাঁধে হাত দিয়ে) ঐ যে আকাশের তারাটি ... তুমি যদি তাকে আদরের ছোটবোনটি বলে মানো বাবা ঘাতক, দেখবে সেও নেমে এসে তোমাকে ভাইফোঁটা দিয়ে যাবে ... "[১০৬]

এই সংলাপ নাট্যকারের গভীর বিশ্বাসবোধ থেকেই উত্থিত। 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকে অদ্ভুত চরিত্র রূপচাঁদ ওরফে নন্তু হালদার, যে কিনা পালিয়ে গিয়ে সংসারে নিজের গুরুত্ব যাচাই করতে চায়। বহু ঘাটের জল খাবার পর সেই রূপচাঁদের দার্শনিক উপলব্ধি জেগেছে ঃ

> "ছোটবেলায় ভাবতাম, আমি মরে গিয়ে কদমগাছে বসে আছি - আর সবাই আমার জন্যে মাথা ফাটাফাটি করছে ... হেঁ হেঁ ... আসলে কেউ কাউকে ফিরে চায় না ... সারারাত ধানবনে পড়েছিলাম ... হেঁ হেঁ সন্ধ্যারানিও ডাকেনি ... শিখারানিও না ... কেউ কাউকে ডাকে না ... "[১০৭]

এই উপলব্ধি কি আসলে মানুষ মাত্রেরই নয় ? মানুষের এরকম সাধারণ উপলব্ধির আরেকটি বিশেষীকৃত রূপ দেখা যায় 'নাকছাবিটা' নাটকে। জানকীর জীবনটাই যেন একটা হেঁয়ালি। দুঃখ, জ্বালা, ভোগ, ভোগান্তি সবই যেন বড়ো মিথ্যে তার। কিন্তু তবু জীবন অন্তহীন রহস্যে মোড়া, প্রতি মুহূর্তে সেখানে নতুনত্বের সম্ভাবনা — সেজন্যই তো বাঁচা, সেজন্যই তো এগিয়ে চলা ঃ

> "দ্যাহো না নুকু, শঙ্খমুক্তার নাকছাবিটা হারাইছ বইলা — আমরা একখান বানাইছি। দাম বেশি না, সত্তর টাকা। পাথর সমেত। (কৌটোর নাকছাবিটা বার করে ঘুরিয়ে দেখে) ঝুটা পাথর। কিন্তু কে কইতে পারে, আগামীকাল কেউ আবিষ্কার করতেও পারে, ঝুটা না, এইখানাই আসল শঙ্খমুক্তা। সমুদ্রের গর্ভে ঝিনুকে জন্ম নিছে ... ভারি শুদ্ধ, ভারি পবিত্র ... "[১০৮]

মনোজ মিত্রের নাটক মানুষকে আহ্বান জানায় জীবনের এই মনোরম অনিশ্চয়তার দিকে, এই রহস্যময়তার দিকে। সত্যিই তো, কোন্‌টা ঝুটা আর কোনটা সাচ্ — সে বিচার কি সঙ্গে সঙ্গে হয় ? হয় কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হতে হতে।

তত্ত্বগত বিভিন্ন ধরণের সংলাপ রচনার পাশাপাশি মনোজ মিত্রের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি নিজস্ব রীতিও আছে। একশ্রেণির চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন, যারা ধূর্ত না বোকা, সরল না কৌশলী তা বুঝে ওঠা যায় না। তাদের সংলাপেও এই আলো-আঁধারি রক্ষিত হয়েছে। এমনভাবে এমন কথা তারা বলে ফেলে যে, ধন্দে পড়ে যেতে হয়, বুঝে বলছে অথবা না বুঝেই। এই বিশিষ্ট ভঙ্গিটি একান্তভাবেই মনোজ মিত্রের নিজস্ব। 'পরবাস' নাটকে গজমাধব যেমন নানা অজুহাতে 'টাইম কিল' করে — ঘর ছেড়ে আর বেরোয় না। অন্য ভাড়াটে প্রতিবেশী যারা এসেছে সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিতে, গজমাধব

এবার তাদের ঘরেই আশ্রয় চায়। এই চাওয়ার ভঙ্গিটি বিশেষভাবে মনোজের নিজস্ব ঃ

"গজ || আজ্ঞে না না না ! ভেতরে ভেতরে চিন্তা তো ছিলই। তবে আপনাদের সহৃদয় আন্তরিক ব্যবহার দেখে ভাবছি, কেন এতো ভাবছি আমি ! এমন করে যারা আমার বিছানা বেঁধে দিতে পারে, তারা কি আর একটু স্থান না দিতে পারে ! হে হে হে ...

ভুতু || বিছানা বেঁধে দিলাম বলে পেতে দিতে হবে ।

পরাগ || ওটা ভদ্রতা !

গজ || আজ্ঞে না না না ! আমি ধরে ফেলেছি আন্তরিকতা! সহৃদয়তা ! (দাদুকে) কি করবেন এখন ? কি হ'ল ... বসে থাকলে চলবে না ভাইটি। ওদিকে যে আসছে।

পরাগ ও ভুতু || কে ?

গজ || যম !

পরাগ ও ভুতু || যম !

গজ || আপনার যম, আমার যম, সবার যম ... করালী দত্ত ! যম আসছে রে ভাইটি !

ভুতু ও পরাগ || অ্যাঁ।

গজ || হ্যাঁ, দশটা বাজে ... আর তো সে আমায় দেরি করতে দেবে না ! ভুতুবাবু ... পরাগবাবু কি করবেন আমাকে নিয়ে ... আমি তো এখন আপনাদের ঘাড়েই বহাল হলুম ! কোথায় নামিয়ে রাখবেন আমায় ! যা হোক একটা ঠাঁই-ঠুঁই ভজিয়ে দিন ভাই ... আমার যে আর সময় নেইকো ..."[১০৯]

যেন প্রতিবেশীদেরই দায় তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। সময় নেই বলে তাড়া দেবার ভঙ্গিটিও লক্ষণীয়। গজমাধবের এই সংলাপ নিজের অসহায়তাকে কৌতুকের আবরণে চাপা দেবার মরিয়া প্রয়াস নাকি সে অত্যন্ত ধূর্ত — তা যেন বুঝে ওঠা যায় না। এই ধরণের সংলাপ সবচেয়ে সার্থক হয়েছে 'সাজানো বাগান' নাটকে বাঞ্ছারামের মুখে। নকড়ি এসেছে বাঞ্ছার সঙ্গে মাসকিস্তি বন্দোবস্ত করতে, প্রলুব্ধ করছে বাঞ্ছাকে ঃ

"নকড়ি || পয়লা তারিখে জোড়াপাত্তি !

মোক্তার || দুধ খাবে ...

নকড়ি || ঘি খাবে ...

মোক্তার || এই যে শীতে ছেঁড়াক্যাঁথা ...

নকড়ি || এরপর কাশ্মীরি শাল চাপিয়ে ঘুরবে বাঞ্ছা ...

বাঞ্ছা || (হঠাৎ চিৎকার করে) শালা বড্ড নোভ !"[১১০]

খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাঞ্ছার এই চিৎকার বাগানের প্রতি নকড়ির লোভের কারণে বলেই মনে হয়। কিন্তু বাঞ্ছাদের তো সেই সাহস থাকতে পারে না যে, জমিদারের মুখের ওপর এমন কথা বলবে, তাই হতচকিত নকড়ি ও মোক্তারের কাছে পরের সংলাপেই বাঞ্ছা বদল করে নেয় অভিমুখ ঃ "... আমার গো, আমার! একখানা শালের পরে বড্ড ঝোঁক আমার !"[১১১] প্রশ্ন হ'ল, বাঞ্ছা এগুলো বুঝে করে অথবা না বুঝে ? মনোজ মিত্র এই রহস্যটা কিন্তু ভাঙেন না। নকড়ির টাকায় বাঞ্ছা ক্রমশ সতেজ সজীব হয়ে উঠেছে।

নিজেই এসেছে কিস্তির টাকা নিতে। এসময় বাঞ্ছার সংলাপ ঃ

> "টাকাটা দেবেন কত্তা ! (কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ) হে হে, কী অনাচার। কী অনাচার। চিরটাকাল আপুনারাই লোকের দরজায় তাগাদায় গেছেন – নোকে দিয়েছে – আপুনারা নিয়েছেন – আজ আপুনারা দেবেন – আমরা নেবো ! (নকড়ি পকেট থেকে টাকা বার করে।) ভাববেন না বাবু, ধরণী এ অনাচার বেশিদিন সইবে না – মরণের ঘন্টা শুনতে পাচ্ছি – আর এট্টা মাস – এট্টা মাস দ্যান কত্তা!"[১১২]

কোনো স্লোগান নেই, আরোপিত বিপ্লব নেই, অথচ দিনবদলের কথা উচ্চারিত হয়ে গেছে। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন একটাই, বাঞ্ছা কি বুঝে ব্যঙ্গ করছে নকড়িকে অথবা স্বাভাবিক সরলতাই তার এই সংলাপের উৎস ? বাঞ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখবেই পদ্ম, গুপী ও চোর। তাই বলবর্ধক নানা জিনিস খাওয়াচ্ছে তাকে। কিন্তু বাঞ্ছার বলবৃদ্ধি হলে নকড়ির যে সর্বনাশ। তাই বাঞ্ছার হাতে হরলিক্স ও ডিম দেখে সে আঁতকে উঠেছে ঃ

"নকড়ি ।। (বাঞ্ছার হাতে হরলিক্স ডিম দেখে) একী !

বাঞ্ছা ।। (কেঁদে ওঠে) কত্তা !

নকড়ি ।। খাচ্ছো ?

বাঞ্ছা ।। কোন বেজন্মা খায় ! আমি কিছু খাচ্ছিনে – সব ওই শালারা খাওয়াচ্ছে !

নকড়ি ।। তুমি কি কচিখোকা, খাওয়ালেই খেতে হবে !

বাঞ্ছা ।। ঘেন্নার পরমায়ু ! যতো চোর ছ্যাঁচোড়ের জন্য এই পরমায়ু ধোপার গাধার মতো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে গো –

নকড়ি ।। তোমায় আমি একজন ভালো লোক বলে জানতাম বাঞ্ছা –

বাঞ্ছা ।। (আকাশের দিকে হরলিক্সের গ্লাস তুলে) পোভু ন্যাও – এই ভাইটামিন যেন আমার শেষ ভাইটামিন হয় পোভু –"[১১৩]

বাঞ্ছা কি সত্যিই নিজের পরমায়ুকে 'ঘেন্না' করে, নাকি একথা বলে নকড়ির কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে ? 'শেষ ভাইটামিন' বলে নিজের যে মৃত্যু কামনা তাও নকড়ির প্রতি নির্মম ঠাট্টারই ভ্রান্তি (?) জন্মায়। 'যুব করা' ছেলে কোঁৎকাকে নিয়ে এসেছে নকড়ি বাঞ্ছাকে হুমকি দেবার জন্য। কিন্তু পদ্মকে কে নিয়ে যাবে তাই নিয়ে বাপ-ছেলের বিরোধ বেঁধেছে। সেইসময় বাঞ্ছার ভূমিকাটি লক্ষণীয় ঃ

"বাঞ্ছা ।। আচ্ছা, বাবার বয়েস বেশি, মেয়েমানুষটা বাবাই নিক্ না !

কোঁৎকা ।। (ছুরি নিয়ে তেড়ে) আবে এই সুড্ডা, দেব ঢুকিয়ে

.....

বাঞ্ছা ।। আচ্ছা, খোকার বয়েস কম, বায়না ধরেছে যখন মেয়েটারে না হয় ওই নিক!"[১১৪]

বাঞ্ছা কি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাপ-বেটাকে খেলাচ্ছে, অথবা সে নিতান্তই সরল – বোঝা যায় না। এই বোঝা-না-বোঝার আলো-আঁধারিতেই মনোজ মিত্রের এ ধরনের সংলাপের সার্থকতা। 'নৈশভোজ' নাটকে ঢ্যাঙা চৌকিদার, 'মহাবিদ্যা' নাটকে ধাঙড় তুলসীদাস, 'পাকে বিপাকে' নাটকে হাবলা জনার্দন প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপে বিশেষ কৌশল ব্যবহার করেছেন তিনি, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। সাধারণ অবস্থায় এই প্রান্তিক মানুষেরা শোষকের কাছে কেঁচো হয়ে থাকে,

কিন্তু নেশা বা শোকগ্রস্ততার আড়ালে এদের দিয়েই নাট্যকার উচ্চারণ করিয়েছেন অন্তরের ক্ষোভ এবং ঘৃণা। সরকারি চৌকিদার ঢ্যাঙা রাতের ডালরুটি পেয়ে থাকে চক্রধরের কাছ থেকে। সেই ডালরুটির বিনিময়ে চক্রধর দাবি করে ঢ্যাঙার কৃতজ্ঞতা, দাবি করে নিজের অপকর্মে ঢ্যাঙার সহযোগিতা। কিন্তু নিজেরই শ্রেণির মানুষ তুষ্টুর মড়ার টিপছাপ নিয়ে তুষ্টুর ভিটে যখন গ্রাস করতে চায় চক্রধর তখন ঢ্যাঙা ফুঁসে ওঠে ঃ

"ঢ্যাঙা ।। জ্যাঠা, আপুনি এত বড় চোট্টা !

চক্র ।। হ্যাঁ ...

ঢ্যাঙা ।। এট্টা মরা মানুষ, বোধহয় ভালো করে এখনও মরেও নি... এরই মধ্যে তার টিপছাপ নিয়ে তার ভিটেমাটি গিলে খাবেন ? আপুনি মুনিষ্যি না শকুনি ?

চক্র ।। অ্যাই ঢ্যাঙা, কাকে কী বলছিস ?

ঢ্যাঙা ।। (ভয়ঙ্কর গলায়) তোমারে, তোমারে! কী ভেবেছো কি তুমি ? জ্যান্ত মানুষেরে বাঁশ দাও বলে মরা মানুষেরেও দেবা? তাও কারে ? না তুষ্টুরে ! কেন, মরে গেছে বলে তার কেউ নেই ?

চক্র ।। অ্যাই ঢ্যাঙা –

ঢ্যাঙা ।। চাউকিদার, চাউকিদার বলো। গাছে লাশ ঝুলছে! আইনত ও লাশের দায় এখন চাউকিদারের! যে ঐ লাশের গায়ে হাত দেবে, চাউকিদারের লাঠি তার মাথায় পড়বে ... সে যেই হোক্ ..."[১১৫]

ঢ্যাঙার এই শ্রেণিগত সহমর্মিতার পেছনে কোনো আদর্শবাদের সন্ধান বা আরোপ করেন নি মনোজ মিত্র। কারণ নিজেদের জীবন-চর্চায় আদর্শবাদকে লালন করতে অপারগ ঢ্যাঙারা। তাই তুষ্টুর মড়ার টিপছাপ নেবার সাক্ষী হতে প্রথমে রাজি না হলেও চক্রধর যখন তার খাতায় জমা ঢ্যাঙার অসংখ্য টিপছাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তখন সে চক্রধরের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চায়। এখানেই মনোজ মিত্রের চরিত্রের স্বাভাবিকতা। নিজেদের সীমাবদ্ধতা তারা জানে, সেই সীমাবদ্ধতা তারা অতিক্রম করতেও পারে না। কিন্তু সীমার মধ্যে রেখেই তাদের দিয়ে প্রয়োজনীয় কথাটি বলিয়ে নেন নাট্যকার- এই বলানোটা ঘটে চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করেই। নেশার ঘোরে ঢ্যাঙা তাই গর্জে ওঠে ঃ

" ঢ্যাঙা ।। বড্ড অস্ ! অ্যাঁ ? গরিবের মড়ায় বড্ড অস্ ? অস্ একেবারে মাটো করে ছেড়ে দেব।

চক্র ।। এ ব্যাটার নেশা এখনো কাটেনি দেখছি !

ঢ্যাঙা ।। কী করবি ? রুটি দেয়া বন্ধ করবি ? খাবো না তোর রুটি। দিস তো চারখানা রুটি এই বিশাল দেহটারে। যা খাবো না! ধ্বজা,

গদা ও বাবলা।। অ্যাই ঢ্যাঙা!

ঢ্যাঙা ।। কী করবি? চাকুরি খাবি? খা শালা, এতো গাধার চাকুরি, গাধার তক্মা! কিন্তু শুনে রাখ শালারা, যতক্ষণ না চাকুরি খাচ্ছিস ... ততক্ষণ আমি চাউকিদার!"[১১৬]

এই সংলাপ শুনে মনে হয়, শিকল ছাড়া যার হারাবার কিছু নেই, সেই সর্বহারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনোজ মিত্র সর্বহারাকে কেবল রাজনৈতিক পরিচয়ে দেখেন নি, বিশ্বাস করেন নি স্লোগান-সর্বস্বতায়। তাই ফুঁসে ওঠার পরমুহূর্তেই নিস্তেজ হয়ে যেতে হয় ঢ্যাঙাদের – জীবনের বাস্তবতা

মেনেই এটা দেখান তিনি। ঢ্যাঙাদের পক্ষে যেভাবে প্রতিবাদ জানানো সম্ভব, সেভাবেই প্রতিবাদ জানায় তারা। নাট্যকারের কৌশল এইখানে যে, বলার কথাগুলো তারা সচেতনভাবেই বলে না নিতান্ত ঘোরের মধ্যে সে বিষয়ে রহস্যটা শেষপর্যন্ত ভাঙেন না তিনি। 'মহাবিদ্যা' নাটকে তুলসীদাসও সাত্ত্বীকে উচিত কথা বলে বিব্রত করে নেশার ঘোরে না নেশা কেটে যাওয়া অবস্থায় — তা বুঝে ওঠা যায় না। 'পাকে বিপাকে' নাটকে দিনমজুর হাবলা জনার্দন নিজের বুদ্ধিহীনতার আড়াল নিয়ে জোতদার নবকৃষ্ণকে যত গালাগাল দিয়েছে তাতে উন্মেচিত হয়ে গেছে নবকৃষ্ণের স্বরূপ। এখন জনার্দন সত্যি সত্যিই বুদ্ধিহীন নাকি সে বুদ্ধিহীনতার ভাণ করে সেই ধোঁয়াশাটা মনোজ মিত্র কাটতে দেন না, কিন্তু তাকে দিয়ে প্রয়োজনীয় কাজটি করিয়ে নেন ঃ

"নবকৃষ্ণ || তোর ভয় নেই, না ?

জনার্দন || ভয় কিসের, ভয় ! আমার জমিও নেই ঘরও নেই ! ছিল একটা গাই ... সেও এতোক্ষণ ছুরি খেয়েছে ... তো ভয় কিরে শালা।

নবকৃষ্ণ || তুই কি নিজে থেকে বলছিস, না আর কারো ... ?

জনার্দন || নিজের কথা ! তোর ঠাকুদ্দা ছিল ডাকাত। ঠ্যাঙাড়ে। ঐ নদীর পাড়ে বসে থাকত। রাতদুপুরে যত নৌকো লুট করত। ডাকাতি করে জমিদার হয়েছিল তোর ঠাকুদ্দা ! শালা বন্দুক নিয়ে ধান লুট ঠেকাতে এলি ! ও ধান তোর বাপের ধান ? ঝড়ে জলে এক বুক কাদা ঠেলে যারা ফসল ফলাল, তারা না খেয়ে মরবে, আর তুই ঢ্যামনা — আবাগীর পুত — গতরখেগোর পুত — ঘরে বসে ঠ্যাং নাচাবি আর সব পেটে পুরবি ! (একসঙ্গে গড়গড় করে বলে জনার্দন হাঁপাতে থাকে)

নবকৃষ্ণ || তোর কী হ'লো বলতো জনার্দন ... কার চালে পড়লি ?

জনার্দন || (ভেউ ভেউ করে কাঁদে) আমার মাথাটা খারাপই হয়ে গেছে কত্তা !"[১১৭]

শোষকের চরিত্র উদঘাটনের পাশাপাশি শোষিতের লড়াইয়ে নিজের মতো করেই সাহায্য করে জনার্দন। বাঁশের মাচানের নিচে সেঁধিয়ে খুঁটির বাঁশ ধরে ঝাঁকুনি দেয় — যাতে নবকৃষ্ণের বন্দুকের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই পদ্ধতি বিপ্লবের পক্ষে কতটা উপযোগী তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু জনার্দন চরিত্রের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। স্বজাতের লোকেদের বাঁচাতে এই উপায়ই তার যথাযথ মনে হয়েছে। একেবারে শেষে নবকৃষ্ণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জনার্দন যে বন্দুক কেড়ে নিয়েছে এবং স্বজাতের লোকেদের ধান কেটে নিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়েছে তা প্রচলিত বিপ্লব ভাবনার অপ্রয়োজনীয় প্রসার বলেই মনে হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, কৌতুক সৃষ্টির ঝোঁকে বা রঙ্গমঞ্চে নাটক জমিয়ে দেবার তাগিদে মনোজ মিত্র অনেকসময় এমন সংলাপ সৃষ্টি করেছেন যা কিনা তরল হয়ে পড়েছে। এমনকি, কমেডির ছাঁচেও সেগুলি কিছুটা বেমানান মনে হয়। রঙ্গমঞ্চ-নির্ভরতা বোধহয় নাট্য সংলাপের এরকম ত্রুটি ঘটিয়ে থাকে। কারণ প্রেক্ষাগৃহের সবধরণের দর্শককে তৃপ্ত করার তাগিদ থাকে নাট্যকারের। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়গুণে এসব সংলাপ উত্তরে গেলেও পাঠ্য হিসেবে এগুলি নাটকের মান যে কিছুটা হলেও অবনমিত করে তা অস্বীকার করা চলে না। যেমন, 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ঃ

"রাক্ষস || (খস্‌খস্ করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে) ইঃ ! ইঃ ! কুটু-কুটু-কুটু !

ধনপতি || কুটু-কুটু-কুটু ?

রাক্ষস || কুটু কুটু করছে। খোল্ ! খোল্!

সেনাপতি || না, না, ওকী করছেন ! খুলবেন না প্রভু এখন খুললে লাগাবে কে ?

রাক্ষস || উকুন উকুন ! মাথা জ্বলছে – ইঃ-ইঃ-ইঃ কুটু কুটু কুটু - "[১১৮]

'পরবাস' নাটকে গজমাধবের 'টাইম কিল' করার কৌশল হিসেবে একজন আত্মীয় (?) সম্পর্কে রতনের সঙ্গে যে কথোপকথন তা কিছুটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে কৌতুকের ঝোঁকে। ফলে শেষাংশ অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে ঃ

"রতন || মশাই, আমি কি গাছকে ফোন করব ?

গজ || না না না ... আমার সেজোমামার মেজোশালাকে

রতন || দূর মশাই, লোকটি কে ?

গজ || আমার মামার শালা !

রতন || দূর শালা ! শালাটি কে ?

গজ || আজ্ঞে ভালো শালা ...

রতন || দূর শালা ...

গজ || খুব ভালো শালা ...

রতন || দূর শালা !

গজ || মামার শালা ... ভালো শালা ...

রতন || দূর শালা ! দূর শালা !"[১১৯]

'সাজানো বাগান' নাটকে এরকম সংলাপ শোনা যায় বাঞ্ছার মৃত্যুকামনায় আয়োজিত যজ্ঞানুষ্ঠানে। সিনেমার নায়িকার আকর্ষণে দেদার টাকা ওড়াচ্ছে যে হোঁৎকা, তাকে পুরুতের কাছে মা এনেছেন আশীর্বাদের জন্য ঃ

"গিন্নি || ... বল্ না, ভটচায্যি মশাইকে খুলে বল্ না তোর বিন্তির কথা!

পুরুত || বিন্তি ! তাসের বিন্তি ?

গিন্নি || হরতনের বিবি ! কতো বল্লাম, সিনেমা লাইনে যাস্‌নে ! খেপে খেপে টাকা নিয়ে গিয়ে ঢেলেছে আর বিন্তি –

পুরুত || টুয়েন্টিনাইন খেলে কেটে পড়েছে !

(হোঁৎকার হাতে ফুল দিয়ে) ... কও, ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা - যা বিন্তি ফুটে যা

গিন্নি || হ্যাঁ, ফুটবে ! এই দেখুন তার তসবীর বয়ে বেড়াচ্ছে – (হোঁৎকার হাত থেকে বিন্তির ছবি নিয়ে পুরুত দেখে।)

পুরুত || নায়িকা ! সিনেমার প্লেয়ার ! (ছবিটি হোমকুন্ডে ঢুকিয়ে) নায়িকা অগ্নয়ে স্বাহা-হোঁৎকা ।। বিন্তিদি! বিন্তিদি !

পুরুত || (কুন্ড থেকে খানিকটা ছাই দিয়ে) রাখো, পকেটে রাখো একমুঠো অ্যাসেজ ... মাঝে মাঝে বুকে কোরো ম্যাসেজ !"[১২০]

নিছক মজার বাইরে এসব সংলাপ আর কিছুই দিতে পারে না। 'নরক গুলজার' নাটকে এই মজা সৃষ্টি হয়েছে দেবতাদের ভ্রান্ত সংস্কৃত বা হিন্দি উচ্চারণে। যেমন, ব্রহ্মা-যমের কথোপকথন ঃ

"ব্রহ্মা ।। (যমকে) তুই তোর কাজে যাবি কি না ! গচ্ছ ... ঝটিতি গচ্ছ ... মমাদেশ ...

যম ।। (ভেংচি কেটে) গচ্ছ ! ঝটিতি গচ্ছ ! মমাদেশ! বুড়োভাম ! দেবভাষাকা শ্রাদ্ধ করতা হ্যায় –

ব্রহ্মা ।। (জোরে) গচ্ছতু !

যম ।। (ভেংচি কেটে) যাচ্ছিতু ! "[১২১]

এসব সংলাপেও যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হ'ল স্বতঃস্ফূর্ততা। কখনোই মনে হয় না, এই সংলাপ চেষ্টাকৃত সৃজন। বরং এ যেন কথার ঝোঁকে কথা বানিয়ে চলা। এই স্বতঃস্ফূর্ততা মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে নাটক-মাধ্যমেই নিজের বক্তব্য প্রকাশ করে চলেছেন মনোজ মিত্র। এই অর্ধশতাব্দী জুড়ে বহু বিচিত্র চরিত্রের মুখে সংলাপ যুগিয়েছেন তিনি। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিতে যে তিনি সিদ্ধহস্ত, সে ব্যাপারে সমালোচকেরা সকলেই মোটামুটি একমত। ছোটোখাটো কিছু অনুযোগ ছাড়া সকলেই এ ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্বকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, সংখ্যার দিক থেকে তাঁর নাটকের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সামান্য দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া সংলাপের ধরণে পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি কোথাও। সৃজনকর্মে প্রাণের আনন্দ মিশে থাকলেই বোধহয় এরকম স্বতঃস্ফূর্ততা সম্ভব। অনুযোগ তাঁর সম্পর্কে যা করা হয়েছে, সে কেবল প্রত্যাশার অপূর্ণতা থেকে। কারণ সংলাপ রচনায় তাঁর শক্তি সম্পর্কে সকলেই অবহিত। সেই শক্তির ঊন ব্যবহার বা অপব্যবহারে বাংলা নাটকের ক্ষতি বলেই সেই অনুযোগ। সৌমিত্র বসু যেমন বলেছেন ঃ

"হালকা চাট্টার বাইরে জীবনের সত্য উন্মোচন তিনি করতে পারেন না এমন নয়। গজ-মাধবের শেষ দিককার সংলাপ হঠাৎ-ই বুক চেপে ধরে আমাদের, 'সাজানো বাগান'-এ বাঞ্ছার শেষ সংলাপ, যেখানে সে নবজাত শিশুর কাছে বাগানের বর্ণনা করে – ভোরের জলকণাময় বাতাসের মতো মনে হয়। অথচ 'শিবের অসাধ্যি'তে মনোজ এড়িয়ে যান এই গভীরতা, 'নরক গুলজার'-এ মানিক-ফুল্লরার অংশও মনে হয় চিৎকৃত, বানানো।"[১২২]

সংলাপের যে গভীরতার মান মনোজ মিত্র নিজেই তৈরী করে নিয়েছেন 'অশ্বত্থামা' বা 'তক্ষক'-এর মতো নাটকে, সেই গভীরতাই প্রত্যাশা বাড়িয়েছে সকলের। তাই 'মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র' প্রথম খন্ডের ভূমিকায় পবিত্র সরকার যেমন আক্ষেপ করেন 'অশ্বত্থামা'র মতো নাটক মনোজ আর লেখেন নি বলে, তেমনি পঞ্চম খন্ডের ভূমিকায় চন্দন সেন বলেন ঃ

"তবু এই অনুজ ভূমিকালেখকের বারবার মনে হয়েছে সেই 'অশ্বত্থামা' কিম্বা 'তক্ষকের' কাব্যময় সংলাপ, যার মধ্যে অন্য এক শক্তিমান কবিমনকে আবিষ্কার করেছিলাম – তেমন নাটক আর কেন লিখছেন না, লিখবেন না মনোজ মিত্র ? সমকাল আর তার ভন্ডামি, নীচতা, ক্ষুদ্রতা নিয়ে যে আয়রনি, ব্যঙ্গ, রঙ্গ, কৌতুকের প্রিয় সাজানো বাগান পার হয়ে কবে মনোজ মিত্র নিজের সঙ্গে আরো গভীরভাবে কথা বলতে বসবেন অসীম চরাচরে ! "[১২৩]

এমনতর অনুযোগ সত্ত্বেও সংলাপ রচনায় মনোজ মিত্রের সিদ্ধিকে কিন্তু অস্বীকার করেন নি কেউই।

কুমার রায় যেমন তাঁর নাটকের মঞ্চনির্দেশের কাব্যময়তাকে নাটককে পাঠ্য করে তোলার আয়োজন মনে করেছেন। মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপের একাধিক বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে তাঁর বিশ্লেষণে ঃ

> "বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যে উপমার রীতি চলে এসেছিল মনোজ তারও উত্তরসূরী। রস-রসিকতায়, রঙ্গ-ব্যঙ্গে উপমার ছড়াছড়ি মনোজের নাটকে। তবে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগেও মনোজ সিদ্ধহস্ত। বারাসত-বসিরহাট-টাকি-মালঞ্চপুরের আঞ্চলিক টান তার সংলাপের আর এক বৈশিষ্ট্য।"[১২৪]

নাট্যকার চন্দন সেনও মনোজের নাটকের অমোঘ আকর্ষণের অন্যতম কারণ হিসেবে সংলাপকেই চিহ্নিত করেছেন ঃ

> "কখনো তৎসম শব্দ, কখনো চলতি ইংরেজি হিন্দি শব্দকে চলিত বাংলার সঙ্গে মিশিয়ে অদ্ভুত আকর্ষণীয় খেলা, কখনো শব্দ নিয়ে শ্লিষ্ট-সদৃশ পান্, কখনো নির্মেদ সংক্ষিপ্ততম প্রতিক্রিয়ায় রঙ্গকে গভীর ব্যঙ্গে উত্তরণ -- গত কয়েক দশকের বাংলা নাট্যদর্শক তো মনোজ মিত্রের নতুন নতুন নাটকের সামনে দীঘা কিম্বা পুরির সম্মোহন নিয়ে বারবার ছুটে এসেছে, এসেছে তাঁর জমাট গপ্পো, রঙ্গ আর ব্যঙ্গের অদ্ভুত-কিম্ভূত রস আর মন তোলপাড় করা সংলাপের অমোঘ আকর্ষণে।"[১২৫]

মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপ সম্পর্কে প্রায় একই রকমের কথা অন্তত ১৩-১৪ বছর আগে বলেছেন পবিত্র সরকার 'মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র' প্রথম খন্ডের ভূমিকায়, যা উদ্ধৃত হয়েছে এই অধ্যায়ের প্রথমদিকে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) নাট্যকার মনোজ মিত্র - পবিত্র সরকার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড-এর ভূমিকা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৩

২) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, অগ্রাহায়ণ ১৪০১, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৫৫

৩) তক্ষক - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪০২, পৃ. ৪১৯

৪) ঐ, পৃ. ৪৩৫

৫) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৪৮

৬) দর্পণে শরৎশশী - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২০১

৭) ঐ, পৃ.২৫৯

৮) গল্প হেকিমসাহেব - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ১১১

৯) ঐ, পৃ. ১১১

১০) রাজদর্শন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড -পৃ.৮৫

১১) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ২৭৬

১২) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, চতুর্থ খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪০২ - পৃ. ২৯

১৩) ঐ, পৃ.৩২

১৪) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১৭

১৫) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৮১

১৬) মনোজ মিত্রের কমেডির ভাষাভাষ্য - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - এর ভূমিকা – শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১১৮

১৮) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১১৮

১৯) পরবাস - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ২৪৫

২০) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৪

২১) ঐ, পৃ. ৪৫

২২) গল্প হেকিসাহেব - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.১২৩-২৪

২৩) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৮১

২৪) ছায়ার প্রাসাদ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ: ১২৫

২৫) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ. ৬০

২৬) মুন্নি ও সাত চৌকিদার- মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ. ১৯৮

২৭) ঐ, পৃ.১৯৯

২৮) কুহুযামিনী - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ.৮৪

২৯) যা নেই ভারতে - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ. ২৯

৩০) ব্রিজের ওপর বাপি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ. ২০৬

৩১) টাপুর-টুপুর - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৫৬

৩২) ঐ, পৃ. ৩৫৯

৩৩) ঐ, পৃ. ৩৬১-৬২

৩৪) ঐ, পৃ. ৩৬৬

৩৫) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১১২

৩৬) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ২৬২

৩৭) নিউ রয়্যাল কিস্‌সা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ. ২৬৫

৩৮) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৬

৩৯) সন্ধ্যাতারা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৩৬

৪০) দন্তরঙ্গ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ. ৩০৯

৪১) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৫৯-৬০

৪২) তক্ষক - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৪৩৬-৩৭

৪৩) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ২৬৬

৪৪) নিউ রয়্যাল কিস্‌সা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ. ২৭১

৪৫) চাক ভাঙা মধু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৪৪-৪৫

৪৬) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৬৩

৪৭) কুহুযামিনী - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.৫৪

৪৮) নিউ রয়্যাল কিস্‌সা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.২৭৪

৪৯) বাবুদের ডালকুকুরে - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৫১

৫০) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৮৪-৮৫

৫১) চোখে আঙুল দাদা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৭১

৫২) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.১২৯

৫৩) শিবের অসাধ্যি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২৯১

৫৪) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১৪

৫৫) তেঁতুলগাছ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪৪৭

৫৬) নিউ রয়্যাল কিস্‌সা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.২৭৬

৫৭) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.১১৩

৫৮) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২৭৫

৫৯) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২৭৫

৬০) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩৫

৬১) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৬৯

৬২) কুহু যামিনী - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.৫৯

৬৩) চাক ভাঙা মধু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.১২

৬৪) চাক ভাঙা মধু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২৬

৬৫) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৩

৬৬) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৫১

৬৭) গল্প হেকিসাহেব - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ১৫৯

৬৮) বনজোছনা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.২৫৩-২৫৪

৬৯) চাক ভাঙা মধু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ২০

৭০) ঐ, পৃ. ২৯

৭১) বৃষ্টির ছায়াছবি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৯৭

৭২) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৬১

৭৩) ঐ, পৃ.৮০

৭৪) ঐ, পৃ.৯৫

৭৫) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৬৪

৭৬) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৮৮

৭৭) ব্রিজের ওপর বাপি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.২০৪

৭৮) বনজোছনা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.২৪১

৭৯) চাক ভাঙা মধু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৯

৮০) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৫৩

৮১) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪৭

৮২) দম্পতি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.২২০

৮৩) আত্মগোপন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩১৫-১৬

৮৪) রঙের হাট - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.১১৭

৮৫) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১০৪

৮৬) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.২৯

৮৭) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৮৫

৮৮) পাখি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৪৩৪-৩৫

৮৯) দন্তরঙ্গ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩১৬

৯০) আকাশচুম্বন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.২৭৬

৯১) ঐ, পৃ.২৭৯

৯২) ঐ, পৃ.২৮৫

৯৩) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৩৪

৯৪) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২

৯৫) দম্পতি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.২১৬-১৭

৯৬) কিনু কাহারের থেটার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.২৭২

৯৭) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৯০

৯৮) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৬৩-৬৪

৯৯) মেষ ও রাক্ষস - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৮৫

১০০) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৯৯

১০১) রাজদর্শন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৩৫

১০২) তক্ষক - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৪৩৮

১০৩) ঐ, পৃ. ৪৩৮

১০৪) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৬

১০৫) গল্প হেকিমসাহেব - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.১৪৮-৪৯

১০৬) ছায়ার প্রাসাদ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১১৭

১০৭) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৯৭

১০৮) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৫৩

১০৯) পরবাস - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ২১২-১৩

১১০) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০

১১১) ঐ, পৃ. ১১

১১২) ঐ, পৃ. ৩১

১১৩) ঐ, পৃ. ৩৫

১১৪) ঐ, পৃ. ৩৭

১১৫) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ২৬৮

১১৬) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ২৮৭

১১৭) পাকে বিপাকে - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৩৫

১১৮) মেষ ও রাক্ষস - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৮১

১১৯) পরবাস - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ২৩৩-৩৪

১২০) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪৩

১২১) নরক গুলজার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৬৫

১২২) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস্ - ১৯৯৩, পৃ. ৮৮

১২৩) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - এর ভূমিকা - চন্দন সেন, পৃ.৯

১২৪) মনোজের মনোভূমি - কুমার রায় - স্যাস্ - ১৯৯০, পৃ. ৩৫৭।

১২৫) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - এর ভূমিকা - চন্দন সেন, পৃ. ৮

সংগীত ব্যবহার

পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল যেমন ট্র্যাজেডির অন্যতম উপাদান হিসেবে 'সংগীত'কে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি প্রাচ্য তাত্ত্বিক আচার্য ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' সামবেদ থেকে গৃহীত 'গীত'কে নাটকের অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য উভয় নাট্য সাহিত্যেই গান ব্যবহৃত হয়ে আসছে উদ্ভবকাল থেকেই। প্রাথমিক অবস্থায় নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয় প্রভৃতি শিল্প ছিল পরস্পর সংশ্লিষ্ট। পৃথিবীর অনেক দেশেই গান-সম্বলিত নৃত্য থেকেই নাটকের উদ্ভব হয়েছে, ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। ড. অজিতকুমার ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> "প্রাচীন ভারতেও সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য ও নাট্য ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। প্রেক্ষা অথবা নাট্য বলতে নৃত্য, গীত ও বাদিত্র বোঝাত। এই তিনটি শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে 'সঙ্গীত' কথাটির দ্বারা এই তিনটি শিল্পকেই একসঙ্গে বোঝানো হ'ত। প্রেক্ষাগৃহেরও অপর নাম ছিল সঙ্গীতশালা।"[১]

ক্রমে নাটক যত বিকশিত হয়েছে, তত সঙ্গীতের মাত্রা কমে সংলাপের মাত্রা বেড়েছে। সঙ্গীত হয়েছে সংলাপ ও নাট্যক্রিয়ার সহযোগী। নাট্যসঙ্গীতের সঙ্গে সাধারণ সঙ্গীতের পার্থক্য আছে। নাট্যসঙ্গীতকে অবশ্যই নাটকীয় তাৎপর্যে মন্ডিত হতে হয়। এ বিষয়ে ড. অজিতকুমার ঘোষের সুচিন্তিত অভিমত ঃ

> "নাট্যসঙ্গীত সম্বন্ধে প্রথমেই একটা কথা বলা দরকার যে, এ-সঙ্গীত নাটকের প্রয়োজনেই প্রধানত প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সুতরাং এ-সঙ্গীতের ভাষা, ভাব ও সুর একটি বিশেষ নাট্য-পরিস্থিতি অথবা কোনো বিশেষ চরিত্রের নাট্য প্রয়োজনের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। যেখানে সঙ্গীত নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের গতিবেগ পরিস্ফুটনে কোনো সহায়তা করে না, সেখানে তা স্বতন্ত্রভাবে যতই সুললিত ও সুমধুর হোক না কেন, নাটকের মধ্যে তার কোনোই মূল্য নেই। আবার যেখানে সঙ্গীত নাটকের অনুগামী না হয়ে অগ্রগামী হতে চেষ্টা করে, অনাবশ্যক আড়ম্বর এবং আতিশয্যের দ্বারা নাটকের স্বাধীন বিকাশের বাধা ঘটায় সেখানেও তা নাটকের সম্পদ না হয়ে বিপদ হয়েই দেখা দেয়।"[২]

নাট্যসঙ্গীতের কথা-সুর-লয়কে নাটকীয় করে তুলতে হয়, অর্থাৎ নাট্য-পরিস্থিতির উপযোগী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ ব্যক্ত করতে হয় নাট্যসঙ্গীতের মাধ্যমে। প্রখ্যাত নাট্যতাত্ত্বিক ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> "গানের কথা ব্যক্ত করে চরিত্রের বক্তব্যকে, সুর ব্যক্ত করে চরিত্রের ভাবাবেগের প্রকৃতিকে এবং লয় ব্যক্ত করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতাকে, উদ্দীপনার তীব্রতাকে, কিন্তু এ কথাও মনেরাখতে হবে যে নাটকীয় কার্যের আরোহণের সঙ্গে ঘটনার গতিবেগের সঙ্গে -- সুর ও লয়ের সঙ্গতি থাকা চাই। চরিত্রের 'mood'-এর সঙ্গে থাকা চাই সুরের সঙ্গতি এবং 'tempo'-র সঙ্গে থাকা চাই লয়ের সঙ্গতি।"[৩]

নাটকে গান ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে এভাবে ঃ

১. ঘটে যাওয়া বা অনতিবিলম্বে ঘটবে এরকম কোনো ঘটনার পরিচয়দান।

২. এমন কোনো আবেগ-অনুভূতি, ভাষায় যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সুরের মাধ্যমে তাকে ব্যক্ত করা।

৩. কোনো শ্বাসরুদ্ধকারী বা ট্রাজিক ঘটনার পর ড্রামাটিক রিলিফ দেওয়া।

৪. নাটকের বিশেষ আঙ্গিকের অনুষঙ্গ সৃষ্টি করা।

৫. পরিবেশ রচনা করা।

৬. নিছক মনোরঞ্জন।

আধুনিক কালের নাটকে এর সঙ্গে আরো কিছু প্রয়োজনীয়তা যুক্ত হয়েছে। একালে উক্ত কারণগুলি ছাড়াও গান ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ

১. গ্রামীণ উৎসবের অনুষঙ্গ সৃষ্টি করতে।

২. পুরনো গানের সুরে আধুনিক অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে কৌতুকময় ব্যঙ্গ সৃষ্টি করতে।

৩. সূচনা ও সমাপ্তিতে ব্যবহার করে বিশেষ আঙ্গিক নির্মাণ করতে।

৪. সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে।

৫. নাচ-গানের মাধ্যমে এপিক নাটকের ধরণ সৃষ্টি করতে।

বাংলা নাটকে উদ্ভবলগ্ন থেকেই গানের ব্যবহার যথেষ্ট। এর মধ্যে সব গানই যে নাটকীয় তাৎপর্যে মন্ডিত এমন নয়। অনেকসময় নিছক মনোরঞ্জন বা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনেও গান ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন – গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনেক নাটকে গানের বাহুল্য সবসময় প্রয়োজনাত্মক নয়। 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু হবার পর বাংলা নাটক যখন প্রতিবাদের পথ ছেড়ে সস্তা মনোরঞ্জনের দিকে ঝুঁকল, তখন এমন অনেক গান ব্যবহৃত হতে থাকল যেগুলি নাট্য তাৎপর্যের দিক থেকে নিতান্তই মূল্যহীন। বাংলা নাটকে গানের ব্যবহারকে সার্থকতার শীর্ষে নিয়ে গেলেন যিনি, তিনি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নাটকে গানগুলি মূল তত্ত্বকে ব্যঞ্জিত করেছে, ঘটে যাওয়া বা সম্ভাব্য ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছে, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে। তাঁর ঠাকুরদা বা ধনঞ্জয় জাতীয় চরিত্র গানের মাধ্যমেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও তাঁর নাটকে গানের সার্থক ব্যবহার করেছেন। নিজেই গীতিকার ও সুরকার ছিলেন বলে তাঁর নাটকের গানগুলি যথার্থ নাটকীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত হতে পেরেছে। এরপর আধুনিক কালের নাট্যকারেরা নাটকে গান ব্যবহারকে আবশ্যিক বলে মনে করেন নি, কেবল যেখানে গানের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে সেখানেই গান ব্যবহার করেছেন।

মনোজ মিত্র তাঁর প্রায় পঁচিশটি (পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক) নাটকে গান ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয় যে, গান প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে পুরাণ, রূপকথা বা ইতিহাস-আশ্রিত নাটকগুলিতেই। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পরিবেশ রচনায় গান এসব নাটকে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। পালা বা লোকনাটকের মতো আঙ্গিক যেখানে ব্যবহার করেছেন, সেখানেও গানের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনোজ

মিত্রের এইসব নাটকে সঙ্গীত ব্যবহার প্রসঙ্গে ব্রেখটীয় সঙ্গীত ধারণাটি প্রাসঙ্গিক। ব্রেখট তাঁর এপিক থিয়েটারে সঙ্গীতকে অন্যতম প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরিশীলিত সঙ্গীত এবং যন্ত্র-সমন্বিত যে অর্কেস্ট্রা ইন্দ্রিয়বোধকে ভোঁতা করে দেয় তিনি তা বাতিল করেন। তাঁর মতে ঃ

> ''কনসার্টে যে দর্শক ও শ্রোতৃমন্ডলী হাজির হয় তাদের দিকে এক ঝলক তাকালেই বোঝা যায় যে সঙ্গীতের মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক বা দার্শনিক বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া কী অসম্ভব ব্যাপার! আমরা দেখি সারি সারি মানুষ এক বিচিত্র মাদকতার স্তরে পৌঁছে গেছে – সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বিভোর, এমন যেন মাদকদ্রব্য সেবনে নিদ্রাচ্ছন্ন। তাদের মুখভঙ্গি এবং বিস্ফারিত চোখ থেকেই সংকেত পাওয়া যায় যে এই মানুষেরা অসহায় এবং সীমাহীন আবেগের দাস ... এই ধরণের সঙ্গীতে স্রেফ ব্যবসায়িক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট নেই।''[৪]
>
> (উইলেট / ব্রেখট অন থিয়েটার পৃ.৮৯)

এপিক থিয়েটারের মূল কথাই হ'ল সম্মোহন থেকে দর্শককে মুক্ত রাখা এবং ভঙ্গিগত চমক সৃষ্টি করা। সঙ্গীত সেখানে চমক সৃষ্টির উপায় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রেখটের কাছে থিয়েটার সংগ্রামের হাতিয়ার, সমাজ বদলের উপায়। মূলত মেহনতি মানুষের জন্যই তিনি নাটক লিখেছেন বলে উপকথা, রূপকথা, প্যারাবল বা এপিকের সরল ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। সেই কারণেই সঙ্গীত তাঁর নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। হাসি-মজা-হুল্লোড় এপিক থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য উপকরণ। থিয়েটারের ক্ষেত্রে ব্রেখট যে 'গেস্টুস' (Gestus)-এর কথা বলেছেন, বিশেষ থিয়েটারি পরিস্থিতির সেই মৌলিক গেস্টুস দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের সাহায্য অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেছেন। তাঁর মতে ঃ

> ''এই নতুন 'gestic language' – নাট্যিক, লিরিক ও এপিকধর্মী কাব্যের সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন 'gestische musik' যেখানে সঙ্গীতের সার্বভৌমত্ব এবং প্রকাশ, নাটকীয়ত্ব ও সমাজবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যের কাছে নতি স্বীকার করবে।''[৫]

মনোজ মিত্রও তাঁর অনেক নাটকেই উপকথা বা রূপকথার আদল ব্যবহার করেছেন। বাংলাদেশে একসময় বহুল প্রচলিত লোকনাট্যের আঙ্গিকও তাঁর অনেক নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব লোকনাট্যেও সঙ্গীত ছিল অপরিহার্য। ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন ঃ ''লোকনাট্যের মধ্যে সাধারণত সংলাপ অপেক্ষা সঙ্গীতেরই প্রাধান্য। খোলা জায়গায় দূরের দর্শকবৃন্দকে ধরে রাখতে হ'লে সঙ্গীতের প্রয়োগ বেশি হওয়া প্রয়োজন। শুধু কথা সেখানে অচল।''[৬] নাগরিক পটভূমির নাটকেও তিনি গান ব্যবহার করেছেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি বিখ্যাত কোনো গীতিকারের জনপ্রিয় গান, যা পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োগের কৃতিত্ব নাট্যকারের।

সূচনায় ও সমাপ্তিতে গান তাঁর একাধিক নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনোটিতে আঙ্গিকের কৃৎকৌশল, কোনোটিতে বা শুরু এবং শেষের logical যোগসূত্র নির্মাণ। যেমন 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে সংস্কৃত নাটকের মতো 'প্রস্তাবনা' দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। নটী গানের মধ্যে দিয়ে নাটকের মূল সূত্র এবং বার্তা ধরিয়ে দিয়েছে ঃ

"মানুষ কত ভেড়া হয়, চেয়ে দ্যাখো না।

লোভে ভেড়া, ভয়ে ভেড়া, ভেড়া অভাবে

ঘরে সিংহ বাইরে ভেড়া, ভেড়া স্বভাবে

লোকে তাদের ধরতে পারে না।"[৭]

'কিনু কাহারের থেটার' লোকনাটকের আঙ্গিকে রচিত। লোকনাটকের শুরুতে নাচ-গানের মাধ্যমে যেভাবে আসর জমিয়ে তোলা হয়, এই নাটকেও সেই ধরণটি গৃহীত হয়েছে। ভাঁড় বিচিত্র ভাষায় এবং ভঙ্গিতে দর্শকদের আহ্বান জানিয়েছে ঃ

"গিজতাঘিচাং গিজতাঘিচাং গিজতাঘিচাং ঘ্যাং ...

জ্যান্ত মানুষের কাটবো গলা, এক কোপে ঘ্যাচাং !

মারবো ঝাঁপ অন্ধকূপে, আগুন খাবো গিলে ...

শালা চমকে যাবে পিলে !

মোশনমাস্টার কিনু কাহার গিজতাঘিচাং ঘ্যাং

আমি ব্যাটা গাধার বাচ্চা, চারটে আমার ঠ্যাং !"[৮]

এই গানের ভাষা, ছন্দ, ভঙ্গি – সবই লোকজীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই দুটি নাটকের শেষেও রয়েছে গান। 'মেষ ও রাক্ষস'-এ মূল কাহিনি শেষ হবার পর আবার এসেছে মঞ্চাধ্যক্ষ ও নটী। তাদের পরস্পরের কথোপকথনের শেষে নগরবাসীরা গান গাইতে গাইতে ঢুকে রূপকথাসুলভ সমাপ্তি ঘটিয়েছে। 'কিনু কাহারের থেটার'-এও শেষে ইলিউশন ভেঙে কিনু এবং তার দল গান গাইতে গাইতে এসেছে। আধুনিককালে আমরা এই রীতিকে 'ব্রেখটীয়' বলে অভিহিত করলেও মনোজ মিত্র চেনেন দেশজ শিকড়কে। তাই তিনি জানেন, এভাবেই শেষ হ'ত বাংলার লোকনাটক। 'নৈশভোজ' নাটকে সূচনা এবং সমাপ্তির গান logical ঐক্যসূত্রে বিধৃত। শেয়ালের মতোই ধূর্ত আর লোলুপ মানুষও। সূচনায় জোড়া শেয়ালের গানে সেই লোলুপতার প্রকাশ। রাতের অন্ধকারে শেয়াল এবং স্বার্থপর মানুষ খোঁজে ভোজ ঃ

"খোঁজ খোঁজ ভোজ খোঁজ ...

চাই প্রোটিন হেভি ডোজ ...

কোথা মিলে কাঁহা ভোজ ...

কাঁহা কাঁহা কাঁহা কাঁহা "[৯]

তুষ্টুর ঝুলন্ত দেহ দেখে উল্লসিত হয়েছিল যেমন শেয়ালেরা, তেমনি ধ্বজাধর-গদাধর-চক্রধর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারো আশাই পূরণ হয় নি। জ্যান্ত তুষ্টু নেমে এসেছে গাছ থেকে। তখন গলা জড়াজড়ি করে শেয়াল ও তিন ভাইয়ের যে কান্না, তা প্রকাশ করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ছিল গান। মনোজ মিত্র সেই উপায়েরই সদ্ব্যবহার করেছেন ঃ

"আজ রাতে খাওয়া জোটেনি

জোটেনি ... জোটেনি

রাত উপোষে শেয়াল মরে

হাতি মরে ...শেয়াল মরে ...

খালি পেটে করব কি

ভির্মি খেয়ে মরব কি..."[১০]

সূচনা এবং সমাপ্তির দুটি গানেই নাট্যকারের সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। 'অপারেশন ভোমরাগড়'-এ বাইরের খোলসটি রূপকথার। সেই খোলসের কারণেই নাটকের সূচনা ও সমাপ্তি সংগীতময়। সাধারণ যুদ্ধপ্রিয় রাজার তুলনায় ভ্রমরচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্ত হয়েছে সূচনার গানে ঃ

"ভোমরাগড়ের ভোমরারাজা রাজার মত নয়

রাগরাগিণী নিয়ে সদা থাকেন মহাশয়

রাজা রাজার মত নয়।"[১১]

এই নাটকের শেষেও রূপকথার মতোই রাজকন্যা-রাজপুত্রের মিলনের সম্ভাবনাময় গান প্রযুক্ত হয়েছে ঃ

"ভেঁপুর বাঁশি জানে কি কেবল ঘুম পাড়াতে ...

পারে নাকি নীরব বনের মন রাঙাতে ...

পারে নাকি ছোট্ট নদীর ঢেউ খেলাতে ...

মৌমাছিদের ডানায় ডানায় সুর ছড়াতে ..."[১২]

বাংলার লোকনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহার সার্থক রূপ পেয়েছে 'দেবী সর্পমন্তা' নাটকে। গ্রামীণ আসরে কথকঠাকুর যেভাবে কাহিনিক্রম বর্ণনা করে যেতেন, এই নাটকেও তেমনি সঙ্গীতের মাধ্যমে কাহিনিসূত্র রক্ষা করেছে কথক। নাটক শুরু হয়েছে দেবী সর্পমন্তার বন্দনার মধ্য দিয়ে ঃ

"ও দেবী তোর কেমন পা, ধূলা লাগে না

ধূলায় গড়া পুতলি, ধূলা ধরে না।"[১৩]

পরেও একাধিকবার কথকের গান মূল নাটক থেকে বিযুক্ত অবস্থায় কাহিনিধারার অগ্রগতি নির্দেশ করেছে, সম্ভাব্য ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছে, সূত্র ব্যাখ্যা করেছে। মিনার্ভা রেপার্টরির প্রযোজনায় লোকনাট্যের আঙ্গিকে এই নাটকের অভিনয়ে সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। ১৯৮৯-৯০ সালে লেখা 'পুঁটি রামায়ণ' নাটকেও মূল নাটকের বাইরের দুটি চরিত্র বক্কেশ্বর ও টেঁপা গানের মধ্য দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে রামায়ণী কথার সুর। নাটকের মাঝেও কথকঠাকুরের মতোই ঢুকে গিয়ে তারা একাধিকবার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছে, টিপ্পনী কেটেছে, ব্যঙ্গের খোঁচা দিয়েছে। সে সামাজিক কলুষের দিকে আঙুল তুলতে চান নাট্যকার, তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে বক্কেশ্বর-টেঁপার গানের মধ্য দিয়ে। তারাই বলে দিয়েছে – 'আধুনিক হতে মামা কুলাঙ্গার চাই' এবং ঃ

"সবচেয়ে যে লোকটা হীন নীচ জঘন্য

বসেন তিনি উচ্চাসনে মহামান্যগণ্য !

তফাৎ কোনো থাকে না ইতরে ঠাকুরে ..."[১৪]

এইসব গান মূল নাটকের বাইরের চরিত্ররা গেয়েছে বলে পাঠক-দর্শকের সম্মোহন সৃষ্টির সুযোগ নেই, কিন্তু লোকনাট্যের আদলটি রক্ষিত হয়েছে এবং সেই আদলের মধ্যেই আসল কথাটি বলে দেওয়া গেছে।

'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের এক বিশেষ কালপর্বের অভিনেত্রীদের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের অভিনয়ের শেষ দিনে অভিনয় বন্ধ রাখার কারণ জানিয়ে এবং পুনরায় অভিনয় শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে গান গাওয়া হয়েছিল, মনোজ মিত্র এই নাটকে সেই গানটিকে মিলিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী মনোরমার জীবনের সঙ্গে। প্রস্তাবনা অংশে মনোরমা গেয়েছে ঃ "কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়"[১৫] এ যেন রঙ্গমঞ্চ থেকে তার করুণ বিদায়ের আর্তি। নাটকের শেষে একই গানের শেষাংশকে নাট্যকার চমৎকার মিলিয়ে দিয়েছেন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে। উপসংহারে আবার ফিরে এসেছে মনোরমা। তার সামনে সিতিকন্ঠ-শরৎশশী। অভিনীত হচ্ছে 'নীলদর্পণে'র দৃশ্য। মনোরমা গাইছে ঃ

"নির্মাইয়ে নাট্যালয়

আরম্ভিব অভিনয়

পুনঃ যেন দেখা হয়

এ মিনতি পায়"[১৬]

ব্যঞ্জনায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এই সত্য, মনোরমাদের স্থান নিয়েছে শরৎশশীরা, অভিনয় বন্ধ থাকে নি — নাট্যশালা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। 'রঙের হাট' নাটকের শুরুতে মাদারি মাস্টারের গানে ব্যক্ত হয়েছে বিশ্বময় কেনাবেচার হাটের কথা ঃ

"আয় হাঁস আয় আয় চৈ চৈ

সন্ধেবেলা রঙের হাটে

তোর সাথে মনের দুটো কথা কই ..."[১৭]

নাটক জুড়ে বাজারসর্বস্ব দুনিয়ার কথা। কিন্তু আশাবাদী মনোজ মিত্র এর মধ্যেও ভুলতে দেন না স্নেহ-মায়া-মমতার অস্তিত্বকে। তাঁর দৃষ্টিতে বাজারের ওপরে উঠে যায় এইসব অমূল্য জিনিস। নাটকের শেষে মাদারি মাস্টারের গানে সেই বিপরীতেরই উচ্চারণ ঃ

"তারে যায় না বেচা

যায় না কেনা

যায় না গো যায় না ...

ওই তারায় বোনা আকাশখানা

কেনাবেচা যায় না ...

দয়া মায়া ভালোবাসা

যত প্রেম যত পিপাসা

ওগো মনের মেঘে আনাগোনা

তারে মোছা যায় না।''[১৮]

প্রথম গানটিতে সামাজিক অবস্থার ব্যাখ্যা এবং পরেরটিতে সেই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার উপায় ব্যক্ত হয়েছে।

একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে 'চোখে-আঙুল দাদা' নাটকের সূচনায় সুরকন্যাদের গান একদিকে যেমন স্বর্গের আবহ রচনা করেছে, অন্যদিকে তেমনি নিয়তি ও কর্মফলের অনিবার্যতাকে ব্যক্ত করেছে ঃ

''হিসাব দিতে হবে

ভবে কী কর্ম করে এলে

জবাব দিতে হবে''[১৯]

এই জবাব দিতে গিয়ে নাকাল হয়েছে চোখে-আঙুল এবং নিজেরই সৃষ্টি উদ্যত হয়েছে তাকে ধ্বংস করতে। এই পোয়েটিক জাস্টিসও নাটকের শেষে ব্যক্ত হয়েছে গানের মাধ্যমে ঃ

''কেমন মজা ... কেমন মজা

পেলি তুই কেমন সাজা

ওরে ও সর্বনাশা কর্মনাশা

যাবি আর লোকের গায়ে দিতে খোঁচা

কেমন মজা ... কেমন মজা ...''[২০]

এই দুটি গানও নাট্যকারের সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল। 'মদনের পঞ্চকান্ড' শুরু হয়েছে একটি প্রচলিত গান দিয়ে। এরপর প্রতিটি কান্ডের শুরুতেই সেই কান্ডের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গান প্রযুক্ত হয়েছে। শেষেও একটি প্রচলিত গান ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

''সিং নেই তবু নাম তার সিংহ

ডিম নেই তবু অশ্বের ডিম্ব ...

গাঁয়ে লাগে ছ্যাঁকা ভ্যাবাচাকা

হাম্বা হাম্বা ... গোঁ গোঁ গোঁ''[২১]

এই নাটকের গানগুলি যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তা বলা যাবে না। তবে মদনের কথনভঙ্গির সরসতার সঙ্গে এগুলি খাপ খেয়ে গেছে। 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা'র সূচনার গান হবুচন্দ্র-গোবুচন্দ্রের চিরচেনা আর্কেটাইপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে ঃ

"ছেলে চেনে, বাপে চেনে, চেনে ঠাকুরদাদা
মুখে মুখে নিয়ে তাকে চলে কিস্‌সা ফাঁদা ..."[২২]

রূপকথার ধরণেই নাটকের শেষেও গান প্রযুক্ত হয়েছে ঃ

"ছেড়ে দে ছেড়ে মোর পাখি ...
যদি দেখা পাইগো আবার ...
শেকল খুলে রাখব না তার
কভু আমি বুঁজবো না আর
এই পোড়া দুটি আঁখি ..."[২৩]

'শিবের অসাধ্যি' শুরু হয়েছে নন্দী-ভৃঙ্গীর গানে শিববন্দনার মধ্য দিয়ে। গঞ্জিকাবিলাসী শিবকে এই গানে অনুরোধ করা হয়েছে জেগে উঠে জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে। এই দৃষ্টিপাত করতে বলা যেন পাঠক-দর্শককেও। সমকালীন যে সামাজিক অবস্থাকে তুলে ধরতে চান নাট্যকার, সূচনার গানের চমকের মধ্য দিয়ে সে বিষয়ে পাঠক-দর্শককে সচেতন করে তোলা ঃ

"জাগো বাবা পূর্ণশশী গঞ্জিকাবিলাসী
মধু-মধু হাসিখুশি সদাই উদাসী।
জাগো ভোলা সর্বভোলা বাবা ভোলানাথ
জাগো জাগো আশুতোষ করো নেত্রপাত।"[২৪]

এই সমাজও ভোলানাথের মতোই উদাসী। সেই উদাসীনতা ঘুচিয়ে সমাজকে সক্রিয় করতে চান নাট্যকার। তাই নাটকের মাঝখানেও কৌতুককর গানের মধ্য দিয়ে সামাজিক সত্যের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে।

মানসিকতা এবং মূল্যবোধে মনোজ মিত্র একটু পুরনো ধারণায় বিশ্বাসী। তাঁর নাটকের থিমে যেমন তার প্রকাশ, তেমনি গান ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি পুরনো বিভিন্ন গানের সুর ব্যবহার করেছেন। সে সুরে কখনো রূপ পেয়েছে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া গ্রামীণ উৎসব, কখনো স্নিগ্ধ মানবিক সম্পর্ক, আবার কখনো বা কৌতুকমুখর ব্যঙ্গ। যেমন 'শিবের অসাধ্যি'তে বাসিনীর প্রতি নন্দী-ভৃঙ্গীর আবেগ প্রকাশে ব্যবহার করেছেন পুরাতনী গান - "বঁধু ধরো ধরো...মালা পরো গলে..."। এই নাটকেই আবার বাংলাদেশের গ্রামীণ কবির লড়াইয়ের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। গাঁয়ের চাষীরা কবিগানের সুরে হাঁদু সিংগির সঙ্গে শিবের লড়াইয়ের সম্ভাব্য পরিণাম নিয়ে তরজা করেছে। 'দম্পতি' নাটকে শুক-সারীর গান বিষয়ের সঙ্গে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। সেই গানে কৃষ্ণ-রাধার ছদ্ম-বিরোধের কথা ব্যক্ত। নাটকে কর্তা-গিন্নীর বিরোধও তেমনি ছদ্ম — আসলে ভেতরে রয়েছে গভীর প্রণয়। 'কিনু

কাহারের থেটার' নাটকের বিষয়ই হ'ল বাংলাদেশের পুরনো লোকনাট্য। সেখানে যেভাবে ব্যবহৃত হ'ত, মনোজ মিত্র সেভাবেই ব্যবহার করেছেন পাঁচালী ধরণের গান ঃ

''দাঁড়াও দাঁড়াও মণি বারেক ফিরে চাও।

অনাথিনী আমি নারী একটা পয়সা দাও।।''[২৫]

কবিগানের মত চাপান-উতোর এবং বাকোবাক্য পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়েছে ঘন্টাকর্ণ ও তার স্ত্রী জগদম্বার সংলাপে। 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে পুরনো দিনের অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে রাজকৃষ্ণ রায়ের একটি নাটকের গান ঃ

''তোমার মনের কথা শুনব বলে

প্রেমের কথা শুনব বলে

আমাদের এই কথা তোলা''[২৬]

সেকালের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে এরকম গান প্রায়ই ব্যবহার করতেন। মনোজ মিত্র সেই আবহটি ধরতে পেরেছেন গানের মাধ্যমে। 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে হেকিমের কবরে এক একটি পাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফকির গেয়েছে মুশকিল আসান। নাটকে বিবৃত কালপর্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছায়েমের গলায় মনোজ মিত্র দিয়েছেন অনুপ্রাসবহুল ঢপ গান ঃ

''এ কলা নহে সে কলা ...

কলা দোকলা ...

ছুলিলে কলা ছলাকলা ...''[২৭]

'দেবী সর্পমস্তা' নাটকে আদিবাসী বৃদ্ধ ডাহুক তার স্ত্রী কুন্ডলার গলায় মরকতমালা পরিয়ে দিয়ে যে গান গেয়েছে তার ভাষা ব্রজবুলি, সুর বৈষ্ণব পদাবলীর ঃ

''কন্ঠ পরে মালিকা ...

কী রূপ ধরে বালিকা ...

চলহ চলহ কান্তা লো

গোকুল করহ আলা লো ...''[২৮]

এই গানের ভাষা এবং সুর বিকল্প সংস্কৃতির আবহ রচনা করেছে। কীর্তন বা অনুরূপ গান মনোজ মিত্র তাঁর একাধিক নাটকে ব্যবহার করেছেন মূলত রঙ্গ-কৌতুক-ব্যঙ্গ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। 'মদনের পঞ্চকান্ড', 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' বা 'দন্তরঙ্গ' একাঙ্কগুলির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মদন দাড়িবাবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে গেয়েছে ঃ

''ভজ দাড়িবাবা কহ দাড়িবাবা

লহ দাড়িবাবার নাম রে ...

যে জন দাড়িবাবা ভজে

সে হয় আমার প্রাণ রে ...''[২৯]

পঞ্চকান্ডেরই আরেক কান্ডে তথাকথিত এক আধুনিকার রূপসজ্জা প্রসঙ্গে মদন গেয়েছে ঃ

''সখিরে ...

রাগে মুখ বাঁকানো ... ঐ ভুরু পাকানো

তবু কেন মনে হয় ... এতো মধু মাখানো ... ''[৩০]

'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা'য় ভন্ড গুরু গেয়েছে ঃ

''এই করোহে দয়াল গুরু

ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ...

যেন নোবেল হতে কোনমতে

না হয় রাজা বঞ্চিত''[৩১]

'দন্তরঙ্গ' নাটকে ব্রহ্মচারী দাঁতের বেদনা ভোলার জন্য যেভাবে গুরুর শরণ নিতে বলেছেন তা কৌতুক সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে ঃ ''দয়াময় গুরুর নামে জয় দে জয় দে।।''[৩২] তবে বৈষ্ণবীয় গানের অনুষঙ্গ ব্যবহার সবচেয়ে সার্থক হয়েছে 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে। কীর্তনের সুরে রাক্ষসের গান এখানে সুপ্রযুক্ত। রাক্ষসের বীভৎসতা এবং কীর্তনের কোমলতার বৈপরীত্য এখানে অদ্ভুত এক নাটকীয়তা সৃজন করেছে। রঙ্গমঞ্চেও এই গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল ঃ

''দ্যাখ কেমন সেজেছি

ওরে সুবল ওরে সুদাম

দ্যাখ কেমন সেজেছি...

আমি তিলক কেটেছি

আমি খড়ম ধরেছি

আমার অন্তরে বিষম খাঁই

তাই বাহিরে মেখেছি ছাই

ওরে তোরা সব দ্যাখনা চেয়ে

কালো অঙ্গ কেমন আমি ঢেকে ফেলেছি''[৩৩]

কৃষ্ণের মতোই কালো অঙ্গ, কৃষ্ণের মতোই সখাসান্নিধ্য, অথচ কী ভীষণভাবে বিপরীত। এই বৈপরীত্যের উপস্থাপনাতেই এই গান যথার্থ নাট্যতাৎপর্যে মন্ডিত।

গানকে ব্যঙ্গের শর হিসেবে ব্যবহার করেছেন মনোজ মিত্র তাঁর অনেক নাটকে। দেবীর আগমনী যে আসলে সাধারণের ওপর অনুষ্ঠিত জোতদারের পীড়নমাত্র, তা স্পষ্ট হয়েছে 'শিবের অসাধ্যি' নাটকের আগমনী গানে ঃ

"এসে বসেছে ...

দশমায়া এসে বসেছে ...

...

না কাঁদিস ও গ্রামবাসী ...

ওরে ও অবোধরাশি ...

মুখে আন খুশির হাসি

গলায় পর চাঁদার ফাঁসি

দেখবি সকল ভাল হয়েছে!"[৩৪]

সাধারণ মানুষের কাছে উৎসব মানেই এই 'চাঁদার ফাঁসি'। বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে দেবতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুকের ঐতিহ্য অনেক পুরনো। মনোজ মিত্র তাঁর অনেক নাটকে এই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক আলোচিত নাটকটি হ'ল 'নরক গুলজার'। নিদ্রিত পিতামহ ব্রহ্মার পালঙ্কের সামনে নারদমুনি গাইছেন ঃ

"কথা বলো না কেউ শব্দ করো না

ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন

গোলযোগ সইতে পারেন না।...

ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন

দায়ভার বইতে পারেন না।"[৩৫]

সাতের দশকে রাজ্য তথা দেশের যখন চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা, চতুর্দিকে যখন নরক গুলজার, তখন শিল্পীর কাছে এরকম ব্যঙ্গই প্রাপ্য সর্বোচ্চ শাসকের। অভিনয়ের সময় দেবাশিস দাশগুপ্তের সুরে এই গান অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। কৌতুককর গানের মধ্য দিয়ে আধুনিক সমাজ-পরিস্থিতিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন মনোজ মিত্র। দেশবাসীর অর্থে মুক্তিপণ দিয়ে নেতা-মন্ত্রীর আত্মজনকে দস্যুর কবল থেকে মুক্ত করে আনার বিষয়টিকে 'অপারেশন ভোমরাগড়' নাটকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি হাতি আহ্লাদিকে ছাড়িয়ে আনার প্রসঙ্গে ঃ

"এসো এসো দেশবাসী ...

ডাকে সাড়া দাও ... দাও সাড়া দাও ...

মুক্ত হস্তে হস্তিত্রাণে

দান করে যাও ... দান করে যাও।"[৩৬]

একাঙ্ক নাটকের মধ্যে 'চোখে আঙুল দাদা' নাটকে সুরকন্যাদের গানের মধ্য দিয়ে আধুনিককালের নিষ্কর্মা আঁতেলদের ব্যঙ্গ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ

"চোখে আঙুল দাদা ... এ কেমন তরো ভূত ...

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সবাই খেটে মরে ...

কাজের নামে টুঁ টুঁ ইনি লোকের খুঁত ধরে ...

চোখে-আঙুল দাদা ... এ কেমন তরো ভূত ..."[৩৭]

অন্ত:সারশূন্য আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি মদনের গানেও ঃ

"ফ্যাশনেবল লেডি তিনি

ম্যাক্সি মিনি পরেন ...

টাকার যোগান থামলে বরের

কাছা ধরে টানেন ..."[৩৮]

ঘটে যাওয়া বা আসন্ন নাট্যঘটনার বর্ণনা বা ইঙ্গিতও একাধিক নাটকের গানে দিয়েছেন মনোজ মিত্র, যা নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। 'শিবের অসাধ্যি'তে শিব জোতদারের সঙ্গে প্রজাদের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে কেটে পড়ছেন। নন্দী-ভৃঙ্গীর গানে সেই নাট্যঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে শিবের চরিত্রের পরিচয় ফুটেছে ঃ

"খুনসুটিতে বাবার আমার জুড়ি মেলা ভার

কেমন গুটিগুটি কেটে পড়ে ক্ষেপিয়ে জোতদার"[৩৯]

'নৈশভোজ' নাটকে কাঁঠালগাছের ডালে ঝুলন্ত তুষ্টুর দেহ দেখে দুই শেয়াল হুক্কা-হুয়ার ভোজের আশায় যে সাংগীতিক উল্লাস তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে নাটকের পরবর্তী ঘটনাক্রমে একাধিক মানুষের তুষ্টুর দেহকে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাবার বিজাতীয় উল্লাসে ঃ

"তাইরে নারে তাইরে নারে তাইরে নারে না ...

...

আজ কত খাবি খা ...

টাক ডুমাডুম টাক

নিজেই মরে ব্যাটা আজ দিল ভোজের ডাক"[৪০]

জমে উঠেছে তুষ্টুর দেহ নিয়ে খেলা। বাবলার পরামর্শে ধ্বজাধর-গদাধর-চক্রধর তিন ভায়েরই স্বার্থসিদ্ধির উপায় হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছে শৃগালেরা। গানের মধ্য দিয়ে তারা আক্ষেপ করেছে। গানের শেষ লাইনটিতে পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত আছে ঃ

ওরে বিধি এই যদি ছিল তোর মনে ...

অকালে মারিলি কেন তুষ্টু বাপধনে ...

...

দে দে ছেড়ে দে ঝড় ভূমিকম্প ...

ডালপালা ঝালাপালা তুষ্টু মারে ঝম্প ...''[৪১]

এর কিছুক্ষণ পরে সত্যিই তুষ্টু ঝাঁপ দিয়ে নেমেছে গাছ থেকে। সে মরে নি। সকলের আশা ভেঙে গেছে। শেয়ালের আক্ষেপের সঙ্গে মিশে গেছে মানুষেরও আশাভঙ্গের বেদনা। 'কিনু কাহারের থেটার'-এ বহু যুগ আগের মোশন মাস্টার কিনু আর তার স্ত্রী জগদম্বা উপস্থিত হয়ে গানের মধ্য দিয়ে জানিয়েছে একালের মানুষের কাছে নিজেদের সেই সেকালের 'থেটার' তুলে ধরার কথা। 'পুঁটি রামায়ণ'-এ একাধিক দৃশ্যের সূচনায় বক্কেশ্বর-টেঁপা উপস্থিত হয়ে দৃশ্যে ঘটতে চলেছে এমন ঘটনার কথা পাঠক-দর্শককে জানিয়ে দিয়েছে। 'দেবী সর্পমস্তা'য় প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের শেষে কথকের গানে পরবর্তী ঘটনাক্রমের ইঙ্গিত আছে। কথকের কথা এবং গান এই নাটকে অনেকটা 'কোরাসে'র মতো ভূমিকা পালন করেছে ঃ

''রোষবশে ফোঁসে গৌরী দেবী সর্পমস্তা

কী যে তার ভাগ্যে লিখা কেবা জানিস তা।

কী বা হৈল সিংহগড়ে, বাঁচে কারা বেঁচে মরে

সাহেবসুবার মিত্রতা আক্রা নাকি শস্তা

কী যে কার ভাগ্যে লিখা, কেবা জানিস তা''[৪২]

'নাকছাবিটা' নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে জানকীর যে গান তা এক অনির্দেশ্য বিষাদের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ঃ

''সমাজসংসার মিছে সব

মিছে এ জীবনের কলরব ...''[৪৩]

নাটকের পরবর্তী ঘটনাক্রম সেই বিষাদকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। 'রঙের হাট'-এ মাদারি মাস্টার বিভিন্ন সময়ে তার গানে হাটের পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছে, সাতরঙের হাটখোলার সঙ্গে বিশ্ববাজারের তুলনা করেছে, আবার কখনো বা পৌঁছে গেছে এক দার্শনিক উপলব্ধিতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গানটি হ'ল ঃ

''বাজার ... বাজার ... বাজার

বাজার বসেছে বাজার

দেখো ভাই কেয়া কারবার ...

ভাও চড়ছে ভাও পড়ছে

খোলা চপার শান মারছে

সিনা গর্দান কিঁউ বাঁচাবে ভাই

বেচা হো গ্যায়া পুরা কলিজাটাই''[৪৪]

বিশ্বজোড়া বাজারে চলছে কেবল 'ভাও' ওঠাপড়া। এই বিশ্ববাজারের কথা বলতে বলতেই মাদারি মাস্টার পৌঁছেছে দার্শনিক উপলব্ধিতে ঃ

''ও মন আইলাম এ কোন আজব হাটে

ওরে কে যে কার আগে মরে

মারণযজ্ঞ বিশ্বজুড়ে ...

আহা মরি মরি বুঝতে নারি

কেন যে তোদের তাড়াতাড়ি

ওরে পরম কসাই আছেন যিনি

পারবি তারে হার মানাতে ...''[৪৫]

ভবের হাটে সকলের বেচাকেনাই একদিন শেষ হবে, তবু মানুষ মরার মূল্য চায়, নিজের মৃত্যুকে অন্যের চেয়ে মহান করতে চায়। 'অপারেশন ভোমরাগড়'-এর অন্যতম প্রধান ঘটনা সাদা হাতি আহ্লাদির ডাকাতির ঘটনাটি ব্যক্ত হয়েছে গানের মধ্য দিয়ে, আবার তুবড়ি বাঁশি হাতে আসার পর ডাব্বু-ভ্রমরের কথোপকথনও হয়েছে গানে গানে। রাজা 'রাগ-রাগিণীর ভক্ত' বলে এসব গানের প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নি।

গান অনেকসময় মনোজ মিত্রের নাটকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। যেমন 'নরক গুলজার'-এ খগেন নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছে গানের মাধ্যমে ঃ

''আমি হলাম ঘুষের রাজা ... ঘুষ ছাড়া ভাই নড়ি না ...

কড়ি যদি নাই পড়ে ... চোরকে আমি ধরি না''[৪৬]

এরকম ক্ষেত্রে গান যে অপরিহার্য ছিল এমন নয়। মনোজ মিত্র এখানে গানকে কৌতুকের উপাদান হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। তবে 'কিনু কাহারের থেটার'-এ বাসিনী যে গানের মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিয়েছে তা অসঙ্গত হয় নি এই কারণে যে, দেহোপজীবিনীর সঙ্গে গানের সম্পর্ক ওতপ্রোত। 'পুঁটি রামায়ণ'-এ মাছরাঙার গান তার হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করেছে। বিয়ের অধিকার পেয়েছে দাসী মাছরাঙা। উচ্ছ্বসিত নারীর কন্ঠে জেগেছে সুর ঃ

''বৌদিদিলো আজ চুল বেঁধেছি ...

আজ প্রজাপতি গায়ে উড়ে বসলো রে ...

বৌদিদিলো, তোর ননদিনী এতদিনে খসলো রে...''[৪৭]

'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকে শ্মশানঠাকুর দ্বৈপায়নের গানে তার আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে ঃ

"প্রভাতে দাও মা কন্যাচিন্তা

নিদাঘে দাও মা পুত্রচিন্তা ..."[৪৮]

'নাকছাবিটা' নাটকের নেপথ্যে অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীরেশ্বরের যে গান শোনা গেছে তা তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। এই গান বীরেশ্বরের যে ছবি আঁকে পাঠকচিত্তে, বীরেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে সে ধারণা ব্যাহত হয়। এই বৈপরীত্য সৃষ্টিও একটি নাটকীয় কৌশল। 'রঙের হাট'-এ প্রচলিত একটি চটুল গানের মধ্য দিয়ে শান্তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ঃ

"ঝুমকা গিরা রে ...

বারিলিকে বাজার মে ...

ঝুমরা গিরা রে ..."[৪৯]

স্ব-সৃষ্ট গান ছাড়াও মনোজ মিত্র তাঁর বিভিন্ন নাটকে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী বহু পরিচিত বিখ্যাত গানের কলি ব্যবহার করে নাট্যমুহূর্তকে সার্থক করে তুলেছেন। যেমন 'দম্পতি' নাটকে এক আবেগঘন রোমান্টিক মুহূর্তে বকুল-শ্যামল মিলে গেয়েছে বিখ্যাত সিনেমার ততোধিক বিখ্যাত গানের সামান্য পরিবর্তিত রূপ ঃ

"এ পথ যদি না শেষ হয়

তবে কেমন হত তুমি বলো তো

তুমি বলো ..."[৫০]

পরমুহূর্তেই সেই রোমান্টিসিজম ভেঙে দিয়ে শ্যামল বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা বাতিল করেছে, যা নাটকীয় বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। 'নাকছাবিটা' নাটকে নুকু গেয়েছে 'কবি' উপন্যাসের সেই বিখ্যাত গান ঃ

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে

কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি দুনয়নে ..."[৫১]

নাটকে বিধৃত ঘটনাকালের সঙ্গে 'কবি' উপন্যাসের সময়কালের সঙ্গতি লক্ষণীয়। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে মনের খুশিতে উচ্ছ্বসিত ধৃতিকান্ত গেয়েছে "আমি বন ফুল গো ... ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে ..."[৫২] আর মুন্নি গেয়েছে ধৃতিকান্তর প্রিয় 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে...' রবীন্দ্র সংগীতটি। 'পাখি' একাঙ্কটিতে প্রথমে গ্রামোফোনের রেকর্ডে এবং তারপর শ্যামার গলায় বেজেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ

"ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ ...

এই আঁধার সাঁঝে মনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ..."[৫৩]

একসময় এই গান ছিল শ্যামার প্রিয়। আজ সংসারের চাপে সবই হারিয়ে গেছে। পঞ্চম বিবাহবার্ষিকীতে

নীতিশ ভাড়া করা গ্রামোফোনে সেই গান বাজালে মুহূর্তের জন্য যেন শ্যামা ফিরে গেছে বিবাহিত জীবনের প্রথম দিককার দিনগুলিতে। গানের বাণীও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জোনাকি চন্দ্র-সূর্য নয়, কিন্তু নিজের জীবন পূর্ণ করে যে আলো সে জ্বালে তার মূল্যও কম নয়। সে আলো পূর্ণ করে তার জীবনকে। তেমনি নীতিশ-শ্যামার একদিনের উৎসবও পূর্ণতা দেবে তাদের জীবনকে, বাইরের লোকের কাছে সে উৎসব যত তুচ্ছই হোক না কেন। 'মদনের পঞ্চকান্ড' বর্ণনা শুরু হয়েছে একটি প্রচলিত গানের মাধ্যমে ঃ ''গোলেমালে গোলেমালে পিরীত করো না ...''[৫৪] প্রথম কান্ডে এক নাগরিক দম্পতির অবৈধ প্রণয়ের কাহিনি বর্ণনার মধ্যে এই গান প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে যায়। 'প্রভাত ফিরে এসো' নাটকের শুরুতে ঝুমুর গেয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ ''আমি কান পেতে রই ...''[৫৫] এই গান কোন এক অনাগতের জন্য অপেক্ষাকে ব্যঞ্জিত করে। নাট্যকাহিনি ক্রমে সেই ব্যঞ্জনাকেই স্পষ্ট করে প্রভাতের আগমনের মধ্যে এবং ঝুমুরের ধারণার বিপরীত আচরণে প্রভাত সৃষ্টি করে নাটকীয় মোচড়। 'বৃষ্টির ছায়াছবি'তেও রবীন্দ্র -গানের সার্থক ব্যবহার। আগন্তুক ছেলেটি যখন গেয়েছে ঃ

''তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো বলো।

তোমার নয়ন কেন এমন ছলো ছলো''[৫৬]

তখন সেই গানের বাণী মিলে গেছে রাহুল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত চন্দনার সঙ্গে। 'রূপের আড়ালে' একাঙ্কিকাটিতে দুটি রবীন্দ্রসংগীত প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথমটি ইলা স্টিমারে বসে গেয়েছে মনের আনন্দে ঃ

''আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়

লুকোচুরির খেলা ... লুকোচুরির খেলা

নীল আকাশে কে ভাসালে

সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই ... লুকোচুরির খেলা''[৫৭]

তখনো পর্যন্ত ইলার মনের নীলাকাশে ভাসছে সাদা মেঘের ভেলা, অচিরেই যে আকাশ ঢেকে যাবে সন্দেহের বিষবাষ্পে। আরম্ভের এই উচ্ছ্বাসের বিপ্রতীপে শেষের সন্দেহমুখর উক্তি নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় গানটিও গেয়েছে ইলা ঃ ''যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে ...''[৫৮] মনে তখনও পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্না যখন সন্দেহের অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন গানটি পাঠক-দর্শকের চিত্তে ফিরে আসে আবেদনের তীব্রতা নিয়ে।

অর্থাৎ মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে বিচিত্র অনুষঙ্গে গান ব্যবহার করেছেন। নিজের নাটকে গানের ব্যবহারকে তিনি যোগাযোগের (communication) জন্য নতুন পদ্ধতির ব্যবহার বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ঃ

> '' অনেক কথা যা মুখে বলে চরিত্ররা দর্শকদের ধরাতে পারছেন না। এবং অনেক কথা বহু নাটকে ব্যবহার হয়ে এমন একঘেয়ে হয়ে গেছে, কথার ভঙ্গী এবং মোচড়গুলো এমন চেনা হয়ে গেছে যে, দর্শকরা তা শুনে আর react করেন না। অথচ সেই কথাগুলো আজ যদি গানে বলা যায় দেখছি তাঁরা কথাও শোনেন আবার গানটিও উপভোগ করতে পারেন।''[৫৯]

নাট্যবিভাগের অধ্যাপক হিসেবে একদিকে তিনি পরিচিত সংস্কৃত নাটকের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের সঙ্গে, অন্যদিকে দেশজ বিচিত্র আঙ্গিকের নাট্যকর্মের সঙ্গে। ফলে নিজের নাটক রচনার সময় এই সমস্ত অর্জিত জ্ঞানকে তিনি উদ্দিষ্ট নাট্যোপযোগী করে ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর নাটকে গান যেমন এসেছে প্রস্তাবনা বা উপসংহার অংশে, আবার দেশজ লোকাভিনয়ের আঙ্গিক হিসেবেও গান প্রযুক্ত হয়েছে। সব গানই সবসময় নাট্যতাৎপর্যে মন্ডিত হতে পেরেছে এমন নয়, তবে কোনো গানই প্রয়োগে অসঙ্গত হয় নি। পরিবেশ-পরিস্থিতি-চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে গানগুলি হয়ে উঠেছে নাটকের সম্পদ। বাংলাদেশের মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে গানের মাধ্যমে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবটাই যে ছিল গেয় – সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন বলেই তাঁর নাটকে গানের ব্যবহার এত সাবলীল এবং প্রাণবন্ত। লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর নাটকে গান ব্যবহৃত হয়েছে কৌতুককর আবহে। সে কৌতুক কখনো ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসরণে দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টায় কখনো প্রচলিত সমাজ-রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে, কখনো বা মানুষের চরিত্রগত দোষ-ভ্রান্তি-দুর্বলতাকে কটাক্ষ করে। হাসি-মজা-কৌতুকের অনুষঙ্গে এসব গানে এপিক থিয়েটারের লক্ষণ আবিষ্কার করা গেলেও মনোজ মিত্রের ঋণ প্রধানত দেশজ ঐতিহ্যের কাছে। তিনি দেশীয় মাটিতে শিকড় ছড়িয়েছেন, সেই শিকড়-সঞ্জাত ফুল-ফল লাভ করেছে পাশ্চাত্যের সমধর্মিতা। প্রতিদিনের পরিচিত জগৎকে মঞ্চে হাজির করে তার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করানোর জন্য যে ভঙ্গিগত চমকের কথা বলেছিলেন ব্রেখট, মনোজ মিত্রের নাটকের গানে সেই বিষয়টিও লক্ষণীয়। সামাজিক সত্যকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং মানুষের সামাজিক চেতনার উদ্বোধনে এই গানগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) নাটকে সঙ্গীত - ড. অজিতকুমার ঘোষ - নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ - দে'জ পাবলিশিং - কলকাতা-৭৩ - দ্বিতীয় সংস্করণ - আগস্ট ১৯৯৭, পৃ.১৬৪-৬৫

২) ঐ, পৃ.১৬৬

৩) নাটকে সঙ্গীত এবং তার সুর ও লয় - সাধন কুমার ভট্টাচার্য - নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ - দে'জ পাবলিশিং - কলকাতা-৭৩ - প্রথম দে'জ সংস্করণ - নভেম্বর ২০০২, পৃ.১৪৪

৪) 'বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার - সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে উৎকলিত - পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি - ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ.৫৮

৫) বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার - সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ.৬১

৬) বাংলার লোকনাট্য - ড. অজিতকুমার ঘোষ - নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, পৃ.১৮০

৭) মেষ ও রাক্ষস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলি - ৭৩, মাঘ ১৪০৩ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ.৫৪

৮) কিনু কাহারের থেটার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলি - ৭৩, মাঘ ১৪০২, পৃ.২৩০

৯) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২৫০

১০) ঐ, পৃ.২৯২

১১) অপারেশন ভোমরাগড় - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র -পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলি - ৭৩, মাঘ ১৪১৩, পৃ.১৪১

১২) ঐ, পৃ.১৮৫

১৩) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩৩৯

১৪) পুঁটি রামায়ণ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৩৩১

১৫) দর্পণে শরৎশশী - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলি - ৭৩, পৃ.৩৩৯ অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ. ২০১

১৬) ঐ, পৃ.২৬০

১৭) রঙের হাট - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.৯৯

১৮) ঐ, পৃ.১৩৬

১৯) চোখে আঙুল দাদা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৬৯

২০) ঐ, পৃ.৩৮২

২১) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলি - ৭৩, কার্তিক ১৪১০, পৃ.৪০০

২২) নিউ রয়্যাল কিস্‌সা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ. ২৫৯

২৩) ঐ, পৃ.২৮৩।

২৪) শিবের অসাধ্যি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২৬৫

২৫) কিনু কাহারের থেটার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.২৩২

২৬) দর্পণে শরৎশশী - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২৫৩

২৭) গল্প হেকিমসাহেব - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.১৪৪

২৮) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.১৪৯

২৯) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৯০

৩০) ঐ, পৃ.৩৮৬

৩১) নিউ রয়্যাল কিস্‌সা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.২৭৩

৩২) দন্তরঙ্গ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.২৯৮

৩৩) মেষ ও রাক্ষস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৭৫

৩৪) শিবের অসাধ্যি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২৭১

৩৫) নরক গুলজার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৬১

৩৬) অপারেশন ভোমরাগড় - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.১৫৬

৩৭) চোখে আঙুল দাদা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৭৪

৩৮) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৮৮

৩৯) শিবের অসাধ্যি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২৮৮

৪০) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২৬৭

৪১) ঐ, পৃ.২৮৭-২৮৮

৪২) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩৫৬

৪৩) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.২১

৪৪) রঙের হাট - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.১১১-১১২

৪৫) ঐ, পৃ.১২৪-১২৫

৪৬) নরক গুলজার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৭৪

৪৭) পুঁটি রামায়ণ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৩১০

৪৮) ছায়ার প্রাসাদ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১১৯

৪৯) রঙের হাট - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.১১৯

৫০) দম্পতি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.১৭৭

৫১) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.২৭

৫২) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৬৫

৫৩) পাখি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৪৩৫

৫৪) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৭৮

৫৫) প্রভাত ফিরে এসো - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৫৯

৫৬) বৃষ্টির ছায়াছবি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪০৯

৫৭) রূপের আড়ালে - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.২৮৯

৫৮) ঐ, পৃ.২৯৩

৫৯) চেতনা নাট্যোৎসবে মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, ১৯৭৬

রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক

ব্যক্তি হিসেবে মনোজ মিত্র কৌতুক এবং রঙ্গপ্রিয় মানুষ। প্রথম পরিচয়ের দূরত্বটুকু অতিক্রম করে যেতে পারলেই যে তিনি একজন মজাদার মানুষ - একথা তাঁর ঘনিষ্ঠ মানুষেরা বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন। কমেডির স্রষ্টা প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই হতে পারেন, যাঁদের উচ্চ রসবোধ থাকে। মনোজ মিত্র সেই রসবোধের অধিকারী। এই রসবোধ তিনি যে শৈশবের জীবনচর্যার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন, সেকথা নিজেই জানিয়েছেন একাধিক লেখায়। খুলনা অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক রসবোধ সঞ্চারিত হয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি পেয়েছেন ময়মনসিংহের বক্র রসিকতার ধারাটি। নিজের নাট্যকথনভঙ্গিতে তিনি একদিকে যেমন ব্যবহার করেছেন জীবনের রসবোধ, অন্যদিকে তেমনি বক্র রসিকতা। তাঁর নাট্যরচনার ভঙ্গিকে বিষ্ণু শর্মার গল্পকথনের ভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করেছেন সমালোচক ঃ

> ''তাঁর কথন শৈলীতে বিষ্ণুশর্মার ভঙ্গি আছে। ভঙ্গির মূল উপাদান সরসতা। দুঃখ, দুর্যোগ, বিপন্নতার মধ্যেও মুখে স্মিত হাসি ছড়িয়ে তিনি মানুষের জন্য প্রতীক্ষারত ...। চাক ভাঙা মধু থেকে শুরু করে শোভাযাত্রা পর্যন্ত এক ডজনেরও বেশি নাটকে বিষয়ের বহুমুখিনতায় দারিদ্র্য, অভাব, লাঞ্ছনা, নির্যাতন, শঠতা-সঙ্কুল বাস্তব পৃথিবীই ফুটে উঠেছে। ধ্বংসাত্মক, আগ্রাসী এই প্রবৃত্তিগুলির অন্তরালে কিন্তু বয়ে চলেছে আনন্দের মূল স্রোত। উদ্ধত, মূর্খ রাজপুত্রদের বিষ্ণুশর্মা যে পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন, মনোজ মিত্রের পদ্ধতিও তাই।''[১]

কৌতুক তাঁর প্রধান অস্ত্র। সমাজ-রাজনীতি-পরিবারে যেখানেই তিনি দেখেছেন ভন্ডামি আর ভ্রষ্টাচার - সেখানেই ব্যবহার করেছেন এই অস্ত্র। তবে তাঁর অস্ত্র সহানুভূতির মোড়কে আবৃত। ব্যঙ্গ তাঁর নাটকে একেবারে নেই এমন নয়, তবে স্নিগ্ধ কৌতুক এবং হিউমারেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ।

এই কৌতুকবোধ বাঙালির সহজ জীবনপ্রবাহ থেকেই আহৃত। বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ঃ ''চড়া গলা, কড়া প্রকৃতি, লাল চোখ বাঙালির স্বভাববিরুদ্ধ। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার নানা শাখায় যে বাঙালিকে পাওয়া যায়, সে হল নরম, কোমল, হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল, স্নেহপ্রীতিতে সমাচ্ছন্ন, স্বপ্নাতুর।''[২] বাঙালির এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ মনোজ মিত্রের কৌতুকবোধ। দেবতাদের নিয়ে মজা হোক কিংবা এক নিরাশ্রয় মানুষের অসহায়তা - সব কিছুই তিনি উপস্থাপিত করেছেন বাঙালি মানসের অনুকূল করে। বাস্তব জীবনের দুঃখ, কাঠিন্য, রূঢ়তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সেগুলি তাঁর কৌতুকবোধকে নষ্ট করে দেয় নি। জীবনের অন্তর্নিহিত আনন্দের ধারাটিকে তিনি সবসময় সজীব ও প্রাণবন্ত রেখেছেন। একদিকে এই আনন্দের উপলব্ধি, অন্যদিকে প্রবল সহানুভূতি রয়েছে তাঁর সমস্ত রঙ্গ-কৌতুকের মূলে। সহানুভূতি প্রবল বলেই ব্যঙ্গে তিনি ততটা নিপুণ নন। একমাত্র যে কয়েকটি নাটকে তিনি ক্রুদ্ধ, সেখানে ব্যঙ্গ শাণিত। অন্যত্র ব্যঙ্গও কৌতুকের রসে দ্রব। ভূত, স্বর্গের দেবদেবী, শেয়াল, কাক বা খাসি-পাঁঠার মতো মনুষ্যেতর প্রাণী প্রভৃতি সবকিছুকেই তিনি ব্যবহার করেছেন কৌতুক সৃষ্টির কাজে।

মনোজ মিত্রের নাটকের মূল ধাঁচটি কমেডির। এমনকি ট্রাজেডির চরম সম্ভাবনাকেও অনেকসময়

প্লটের আকস্মিক মোচড়ে তিনি কমেডিতে পরিণত করেছেন। অ্যারিস্টটল কমেডিকে বলেছেন ঃ ''নিম্নতর নরনারীর জীবনের অনুকরণ। নিম্নতর বলতে অবশ্য হীন বা খারাপ বোঝাচ্ছে না। কিন্তু হাস্যকর হল নিম্ন বা অসুন্দরের শ্রেণীভুক্ত। এ হল একধরণের ত্রুটি বা অসুন্দরতা, তবে তা আমাদের বেদনা দেয় না, বা আহত করে না।''[৩] ট্রাজেডির নায়ক সম্পর্কে যেমন তিনি সাধারণের চেয়ে উচ্চস্তরের মানুষের কথা বলেছিলেন, কমেডির নায়ক সম্পর্কে তেমনি বলেছেন নিম্নস্তরের হীন মানুষের কথা। এই হীন অর্থ নীচ নয়, এ হ'ল মানুষের একরকমের অপূর্ণতা। মনোজ মিত্রের অনেক নাটকের নায়কের মধ্যে এই অপূর্ণতা লক্ষ করা যায়। এরা কেউ সমাজের বিরাট কেউকেটা নয়, ছেঁড়া-ফাটা মানুষ। কিন্তু এদেরও আছে জীবনের আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের সাধ এবং তার প্রতিকূলতার মধ্যে টানাপোড়েনেই সৃষ্টি হয় মনোজ মিত্রের কমেডি। কমেডির চরিত্রের মধ্যে একটা দোটানা লক্ষ করেছেন সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দোটানার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

> ''বাইরের বৃহত্তর জটিলতর জীবনের অতিকায় চাপ থেকে কোনক্রমে বাঁচিয়ে-বুঁচিয়ে স্বামী-স্ত্রী-সন্তান-সন্ততির ছোট্ট সংসারটাকে ন্যূনতম সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টায় মানুষ কোথাও যেন জীবনটাকেই বা অস্বীকার করে, যেন বলতে চায়, ওসব কিছু নয়, ওসবে কিছু আসে যায় না, আবার আরেকটা কোথাও জীবনটাকেই বড় ভালোবাসায় আঁকড়ে ধরে। বড় জীবন আর ছোট জীবন - কোনটা আসলে বড়, আর কোনটা ছোট, তাই বা কে বলবে! --এই দুয়ের টানাপোড়েনে বিমূঢ়-বিপর্যস্ত পাত্র-পাত্রীকে দূর থেকে বা বাইরে থেকে দেখতে কৌতুককর লাগতেই পারে।''[৪]

মনোজ মিত্রের কমেডির চরিত্ররাও এরকম আকাঙ্ক্ষা আর অতৃপ্তির দোটানায় ভোগে। নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তোলার, গুরুত্বপূর্ণ মনে করার জন্য তাদের প্রাণান্তকর চেষ্টা, অথচ সমাজ-সংসারের কাছে তাদের বারবার জোটে প্রত্যাখ্যান - এই পরস্পর-বিপরীত টানাপোড়েনেই তারা হয়ে ওঠে কৌতুককর।

কার্ল মার্কস থেকে শুরু করে ব্রেখট পর্যন্ত অনেকেই কমেডি সম্পর্কে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছেন। মার্কস মনে করেছেন ঃ

> ''বিশ্ব ইতিহাসের ভঙ্গির শেষ পর্ব হ'ল কমেডি। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফলে যারা অনেক কিছু হারাবে বা যারা মনে করে তারা অনেক কিছু হারাবে অথবা যারা এই পরিবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত তারা সেই পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে কিংবা এমন আচরণ করে যেন এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন আদৌ ঘটছে না, অর্থাৎ তারা সময় বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে থাকতে চায়, পুরনো কাঠামো আঁকড়ে থাকতে চায়।''[৫]

তিনি পুঁজিবাদ বস্তুটিকেই কমেডি বলে মনে করেছেন। কারণ ঃ ''পুঁজিবাদের মধ্যেই স্ববিরোধিতা নিহিত রয়েছে - যেমন পুঁজিবাদই প্রলেতারিয়েতের জন্ম দেয়, কারণ তার বিকাশের জন্য তা প্রয়োজন এবং একদিন ওই প্রলেতারিয়েতই ওই পুঁজিবাদ ধ্বংস করবে।''[৬] এও একধরণের অসঙ্গতি। বিখ্যাত নাট্য সমালোচক হ্যাজলিট অসঙ্গতিকেই কমেডি বলেছেন ঃ ''সমাজে যা কিছু বেখাপ্পা অর্থাৎ যা আছে এবং যা হতে পারে এ দুয়ের মধ্যে যে ফারাক তাই হ'ল কমেডি''[৭] ব্রেখটও কমেডিকে এক ''আপাতবিরোধী, বেখাপ্পা, সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন -- সামাজিক ব্যাখ্যা''[৮] বলেছেন। দর্শকের

সঙ্গে নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের দূরত্ব স্থাপনে এপিক থিয়েটারে তিনি কমেডিকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় বলে মনে করেছেন। মনোজ মিত্রের অনেক নাটকেও আমরা দেখি, নাচ-গান-হাসি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে বা নাট্যঘটনা ও চরিত্রকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'নরক গুলজার', 'মেষ ও রাক্ষস', 'পুঁটি রামায়ণ', 'রঙের হাট' প্রভৃতি নাটকে কমেডির আধারে গান দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। মার্কস যে পুঁজিবাদকে কমেডি বলেছিলেন, তার সাদৃশ্য আমরা পাই 'সাজানো বাগান' নাটকে। প্রলেতারিয়েত বাঞ্ছা জোতদার ছকড়ি-নকড়িরই সৃষ্টি। সেই বাঞ্ছারই হাতে তাদের ধ্বংস। তাই ছকড়ি-নকড়ি কমিক। বাঞ্ছার মতো, গজমাধবের মতো, জটার মতো, রূপচাঁদের মতো, বঙ্কিমের মতো প্রান্তিক, অবহেলিত, অবজ্ঞাত মানুষদের জীবনের অসংখ্য অসঙ্গতিকেই কমেডির আধারে ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র। যে জীবন হতে পারত ট্রাজিক, তাকেই কমেডিতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন তিনি।

কমেডির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল হাস্যরস সৃষ্টি। হাস্যরসাত্মক কোনো উপাদান নেই, অথচ মিলনান্তক - এরকম নাটককে কমেডি বলা হলেও সাধারণভাবে আমরা সেইসব নাটককেই কমেডি বলে মনে করে থাকি, যেখানে কৌতুক ও আনন্দ বর্তমান। হাস্যরসের প্রকৃতি বিচারে সমালোচকেরা চার প্রকার হাস্যরসের কথা বলেছেন - হিউমার, উইট, স্যাটায়ার এবং ফান। হিউমারকে বলা যেতে পারে কারুণ্যমিশ্রিত হাস্যরস। সহানুভূতি এই শ্রেণির হাস্যরসের উৎস। হাসতে হাসতে যেখানে দু'চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলমল করে ওঠে সেখানেই হিউমার সৃষ্টি যথার্থ। হাসির সঙ্গে এখানে মিশে থাকে বেদনা। হিউমারের যিনি স্রষ্টা, তাঁর মন কৌতুকে উজ্জ্বল নয়, বরং বিষাদে অভিষিক্ত। এ প্রসঙ্গে Meredith-এর উক্তি উদ্ধার করেছেন ড. অজিত কুমার ঘোষ ঃ "The stroke of the great humourist is worldwide with lights of Tragedy in his laughter."[৯] হিউমারিস্ট যাঁদের নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেন, নিজেকেও তাদেরই একজন বলে মনে করেন। ফলে হাস্যরস এখানে যন্ত্রণাবিদ্ধ। হিউমারের আবেদন হৃদয়ের কাছে, কিন্তু উইটের আবেদন মানুষের বুদ্ধির কাছে। একে বলা যেতে পারে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস। সহানুভূতি নয়, স্বাতন্ত্র্য এই শ্রেণির হাস্যরসের মূল। সচেতন স্রষ্টা এখানে উপভোক্তার বুদ্ধির দুয়ারে নাড়া দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেন। হিউমারের সঙ্গে উইটের পার্থক্য প্রসঙ্গে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন ঃ

> "হিউমার মানব জীবনের গভীর ও মৌলিক সমস্যাগুলি এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়া উপভোগ করে, উইট আমাদের ভাসমান জীবনের বুদ্বুদগুলি চকিত আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। হিউমার মৃদু ও গভীর কিন্তু উইট তীব্র ও ক্ষণিক। হিউমার আমাদিগকে আবিষ্ট ও অভিভূত করে, কিন্তু উইট আমাদিগকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। হিউমার-এ অভিজ্ঞতার প্রকাশ, উইট-এ পান্ডিত্যের বিকাশ। হিউমার-এর রস চরিত্র ও ঘটনা-সংস্থানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু উইট-এর দীপ্তি তীব্র, তীক্ষ্ণ, বিরুদ্ধধর্মী বাক্যের উপর নির্ভর করে।"[১০]

স্যাটায়ার হাসি ঠিকই কিন্তু তা যার দিকে নিক্ষিপ্ত হয় তার মনকে আনন্দিত না করে তিক্ত করে তোলে। ব্যঙ্গ আসলে আঘাত। সহানুভূতি বা বুদ্ধিদীপ্ততার কোনো মোড়ক থাকে না বলে এই আঘাত তীব্র এবং নির্মম। সামাজিক অসঙ্গতির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ এবং সমাজশোধন এই শ্রেণির হাস্যরসের লক্ষ্য। অনেকেই মনে করে থাকেন যে, হাস্যরসের সবরকম শ্রেণির মধ্যে স্যাটায়ার নিকৃষ্ট। কৌতুক বা Fun

-কে বলা যেতে পারে নিছক হাসি। উদ্ভট পরিস্থিতি এবং অতিরঞ্জিত চরিত্রকল্পনার সাহায্যে এই শ্রেণির হাসির সৃষ্টি। সূক্ষ্ম চিন্তা, গূঢ় ব্যঞ্জনা প্রভৃতি এতে নেই। উদ্ভটত্ব ও অতিরঞ্জন এখানে মনকে ধাক্কা দিয়ে সচকিত ও আনন্দিত করে তোলে। মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে এই চার শ্রেণির হাস্যরসই সৃষ্টি করেছেন, তবে নিতান্ত ক্রোধের সময় ছাড়া ব্যঙ্গ তাঁর রচনায় কম। উইট এবং ফান-এর ব্যবহারই তাঁর নাটকে বেশি, কয়েকটি নাটকে অবশ্য হিউমার সৃষ্টিতেও তিনি সার্থকতার শীর্ষ স্পর্শ করেছেন।

হাসির মূল কারণ নিঃসন্দেহে অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতি সৃষ্টি হতে পারে ঘটনা, চরিত্র বা বাক্যে। রবীন্দ্রনাথ অসঙ্গতিকে কমেডি ও ট্রাজেডি উভয়েরই বিষয় বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, অসঙ্গতি মনের উপরিতলে আঘাত করলে কমেডি এবং গভীরে আঘাত করলে ট্রাজেডি সৃষ্টি হয়। অসঙ্গতির তার চড়াতে চড়াতেই বিস্ময় পরিণত হয় হাস্যে এবং হাস্য পরিণত হয় অশ্রুজলে। হাসি যখন অশ্রুজলে পরিণত হয়, তখনই সৃষ্টি হয় হিউমার। বের্গসঁ মনে করেছেন, হাসির উপাদান ঘটনা, চরিত্র বা বাক্যেই নিহিত থাকে। সেই নিরিখে তিনি "ঘটনাগত কমিক বস্তু (comic in situation), বাক্যগত কমিক বস্তু (comic in words) এবং চরিত্রগত কমিক বস্তু (comic in character)"[১১১]-এর উল্লেখ করেছেন। যে ঘটনা, চরিত্র বা বাক্য স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না, তা-ই অসঙ্গত এবং তা-ই আমাদের হাস্যরসের উদ্রেক ঘটায়। মনোজ মিত্রও এরকম অসঙ্গতির কথা বলেছেন তাঁর একটি গ্রন্থে ঃ " প্রাপ্তবয়স্কের মুখে চোখে শিশুর অপ্রাপ্তমনস্কতা ভারী মজার ঠেকে। সিরিয়াস ব্যাপারস্যাপারে শিশুসুলভ প্রতিক্রিয়া - যাকে বলে Less-than mature level, নিরানব্বুই ভাগ কমেডির রসবস্তু।"[১১২] জীবন - পিপাসা এবং প্রতিকূলতার অসঙ্গতি যেমন তাঁর নাটকে হাস্যরসের বিষয় হয়েছে, তেমনি পরিস্থিতিগত অসঙ্গতিকেও তিনি হাস্যরস সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন। এইসব তত্ত্বগত বিষয় ছাড়াও হাস্যরস সৃষ্টিতে মনোজ মিত্রের কতগুলি নিজস্ব ধরণ আছে। বক্র রসিকতা, যা তিনি জেনেছেন শৈশব-অভিজ্ঞতার সূত্রে, তাঁর অনেক নাটকেই হাস্যরস সৃষ্টির উপায়। বিশেষ ধরণের বাচনভঙ্গি, জীবনঘনিষ্ঠ অশ্লীলতা প্রভৃতিও তাঁর রচনায় কৌতুকের উপাদান হয়েছে। নিজে অভিনেতা এবং নির্দেশক বলে থিয়েটারের কৃৎ-কৌশল মনোজ মিত্রের জানা। কথার বিশেষ কোন্ ভাঁজ বা চরিত্রের বিশেষ কোন্ ভঙ্গি কমেডি নাটকের উপযোগী তা তিনি স্পষ্ট জানেন দীর্ঘদিন মঞ্চাভিনয়ের সুবাদে। তাঁর নাট্যরচনায় সেই মঞ্চ-অভিজ্ঞতা অনেকসময়ই কাজে লেগেছে।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়গুলিতে আমরা মনোজ মিত্রের বিভিন্ন নাটকের যে আলোচনা করেছি, প্রসঙ্গক্রমে সেগুলিতে হাস্যরস সৃষ্টির প্রসঙ্গ কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এই উপ-অধ্যায়ে আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি নাটক অবলম্বনে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক সৃজনে মনোজ মিত্রের কৃতিত্ব বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। 'পরবাস'(১৯৭০) হিউমারিস্ট মনোজ মিত্রের সার্থক সৃষ্টি। অসংখ্য হাসির সিচুয়েশন এবং হাস্যরসের সংলাপ সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'পরবাস' কি সত্যিই হাসির নাটক? নাটকের শেষে তবে একটা বুকচাপা যন্ত্রণা চাগিয়ে ওঠে কেন? একজন অসহায় মানুষ, যে কিনা ভালো বাসা এবং ভালোবাসার সন্ধানী, তাকে তুলে ধরতে গিয়ে নাট্যকার কোনো ভারী তত্ত্বকথার আশ্রয় নেন নি। হাসাতে হাসাতেই পাঠক-দর্শককে পৌঁছে দিয়েছেন বিষাদের প্রান্তে। কখন যেন গজমাধবের জন্য

চোখের কোণে জমে ওঠে দু'ফোঁটা অশ্রু। হাসি দিয়ে জীবনের অসঙ্গতিকে দূর করার আপ্রাণ এবং অক্ষম প্রয়াস গজমাধবকে করে তোলে করুণ। প্রথম থেকে 'বাসা' রক্ষার জন্য গজমাধবের একের পর এক কৌশল কৌতুকের উদ্রেক করলেও মন্দিরা আসার পর থেকে গজমাধব যখন একে একে সব কৌশল পরিত্যাগ করে পথে নেমেছে তখন কাহিনি হয়েছে বিষাদ-ভারাক্রান্ত। হাসি থেকে বিষাদে উত্তরণের এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন সমালোচক ঃ

> ''যখনই নতুন ভাড়াটের গৃহিণীর (?) মমতা অর্জনে সে সমর্থ হ'ল, তখনই সে তার সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করল, অনাত্মীয়ের স্নেহ তাকে পরমাত্মীয়ের স্নেহের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনল, সে খালি হাতে আসন্ন সন্ধ্যায় বাসা ছেড়ে ঠিকানাহীন পৃথিবীর যে কোন অংশে হারিয়ে গেল।''[১৩]

এই হারিয়ে যাওয়াতেই গজমাধব উত্তীর্ণ হয়ে যায় পাঠক-দর্শকের সহমর্মিতায়। আস্তানা রক্ষার জন্য তার পূর্ব প্রয়াসের বৈপরীত্যে এই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া তার চরিত্রকে তুলে নিয়ে যায় প্রাত্যহিক বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে। তার মধ্যে যে কোনো অনিকেত মানুষ, সংসারে অবাঞ্ছিত মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করেন তখন। প্রথম থেকে হাসির পথ বেয়ে আসা নাটকে নাট্যকার তখন আমাদের দৃষ্টি ফেরান ভিন্নতর এক বোধের দিকে ঃ ''জীবনের শেষের দিনগুলোয় শূন্যতাবোধ কি তবে সত্যই এত অনিবার্য, এমন অমোঘ ?''[১৪]

বাংলায় হাসির নাটকের নতুন সংজ্ঞা যেন তৈরি করল 'সাজানো বাগান'। বক্র রসিকতা এই নাটকের প্রধান অবলম্বন। উল্লাস এবং কারুণ্য এখানে হাত-ধরাধরি করে চলেছে। পাঠক-দর্শক অনায়াসে লগ্ন হয়ে গেছে বাঞ্ছারামের সঙ্গে, তার সংগ্রামের সঙ্গে। ঢাকার কুট্টি বা সাতক্ষীরার চাষীদের কথাবার্তায় যে বক্র রসিকতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকেই মনোজ মিত্র উপস্থাপিত করেছেন বাঞ্ছারামের মধ্যে। যেমন, নকড়ির উদ্দেশ্যে বাঞ্ছার সংলাপ ঃ

> ''থু: থু: ! ভালো লাগে না ... আমারও ভালো লাগে না এইভাবে বেঁচে থাকতে ! কত্তা, চেরটাকাল আমি খেটে খেয়েছি, আজ বসে বসে এট্টা মড়া বাদুড়ের মতো তোমার রক্ত চুষে চুষে খেয়ে উঠে দাঁড়াতে - ভালো লাগে না ... থু: থু:। এ জীবন তো আমার দস্তুর না কত্তা ! লোকের পয়সা মেরে খেয়ে বাঁচা ! থু: !''[১৫]

এই সংলাপে বাঞ্ছা ঘৃণার থুতু নিক্ষেপ করে নিজের প্রতি, অথবা রক্তচোষক নকড়ির প্রতি তা যেন ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। শোষক আর শোষিতের লড়াইয়ের মতো বিষয়কেও যে সার্থক কমেডির আধারে প্রকাশ করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'সাজানো বাগান'। যে অসঙ্গতি হাসির উৎস, সেই অসঙ্গতিকে সংযমের দ্বারা বেঁধেছেন নাট্যকার। সমালোচক সেই সংযম লক্ষ করেছেন সিকোয়েন্স ও মুড এর বৈপরীত্যেঃ

> ''যখন এক একটা দমকা হাসির ঝড় বয়ে যাচ্ছে তখনই ভিতরে ভিতরে জমা হচ্ছে ঘৃণা। হচ্ছে এই পালিশ করা মেকি ভদ্রতার কথা ভেবে, যেখানে একজনের মরা বা না মরা নির্ভর করছে তার নিজের সুখস্বাস্থ্যের উপরে নয়, অন্য কিছু লোকের স্বার্থের টানাপোড়েনের উপর। কিন্তু নাট্যকার কখনই এই টানাপোড়েনকে চিৎকারে সাজান নি, বরং দেখিয়েছেন অসহায় কৌতুকের ভিতর দিয়ে।''[১৬]

সংলাপ এই নাটকে কৌতুকের প্রধান উপাদান। টাকী-বসিরহাট-হাসনাবাদ অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে হুবহু তুলে এনেছেন নাট্যকার। সেই ভাষায় কৌতুকের প্রকাশ অনবদ্য। যেমন, নকড়ির হতাশায় সহমর্মী বাঞ্ছারামঃ ''বোঝো না, একটু নাভের আশায় নোকটা মাসকিস্তির ফিকির করেছে! এরপরে আমি যদি ছ-মাস একবছর বেঁচে যাই... তো তার পক্ষে নোকসান হবে না? না-না, আমার পক্ষে বাঁচাটা, তার পক্ষে ঘোরতর অলেয্য হবে!''[১৭] কিন্তু বাঞ্ছা কিছুতেই মরতে পারছে না, 'এ শালার বগলে বৌ... ও শালার বগলে নারকেল' - দুজনে মিলে তাকে চরম দোটানায় ফেলেছে। বাঞ্ছার সংলাপ আঞ্চলিক অশ্লীলতাসহ জীবনের তাপে সঞ্জীবিত। নকড়ির সংলাপে মাঝে মাঝেই ভিন্ন ভিন্ন অনুষঙ্গে 'লুজ ক্যারেকটার' কথাটির ব্যবহার কৌতুক সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। এই নাটকের কৌতুকরসকে সমসময়ের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন দেবাশিস মজুমদার ঃ

> ''সেই সত্তর দশকে আমাদের প্রতি দৈনিকে বেঁচে থাকায় মৃত্যু এবং হত্যা সমাজকে ক্রমশ ছায়ার আবর্তে সংকীর্ণ করে তুলতে চাইছিল। তারই বিপরীতে দাঁড়িয়ে যখন বেঁচে থাকা এক বৃদ্ধকে দেখি তখন কোথাও আমাদের জীবনের বিস্তারের ইঙ্গিতকেই স্পষ্ট করে তোলে। আর সেই অনুভবেই কি দর্শকের হাসির সঙ্গে মিশে যায় চোখের জল! মিশে যায় কারণ, দর্শক সামনে বসে কখন বুঝি বাঞ্ছারামের বেঁচে থাকার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলে।''[১৮]

এই যুক্ত হওয়াতেই সার্থক হয় নাট্যকারের হিউমার সৃষ্টি। হিউমারের সার্থক দৃষ্টান্ত চোরের সেই সংলাপটিও, যেখানে বাগান নিয়ে চুক্তি করার জন্য সে বাঞ্ছাকে দোষারোপ করে, নকড়ির হাতে বাগান গেলে আর 'মাল গেঁড়িয়ে' সংসার চালাতে পারবে না বলে অসহায় ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে।

'শিবের অসাধ্যি', 'নরক গুলজার', 'মেষ ও রাক্ষস', 'রাজদর্শন', 'নৈশভোজ', 'চোখে আঙুল দাদা' প্রভৃতি নাটকে মনোজ মিত্র কিছুটা ক্রোধী, ফলে কৌতুক প্রকাশিত ব্যঙ্গের আধারে। নাটকে ব্যঙ্গের ব্যবহার সম্পর্কে মনোজ মিত্রের বক্তব্য ঃ ''তাৎক্ষণিক ঘটনাশ্রয়ী ব্যঙ্গ নাটক থিয়েটারকে যেমন দ্রুত জনপ্রিয় করিয়া তোলে, তেমনই দ্রুততায় তাহাকে পথে বসাইতেও পারে - যদি সেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সঠিক এবং দায়িত্বশীল বোধবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজভাবনা দ্বারা পরিচালিত না হয়।''[১৯] ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সবসময়ই বাস্তব জীবন-অভিমুখী। এই ব্যঙ্গের শক্তি প্রবল। মনোজ মিত্র জানেন ঃ

> ''রঙ্গ এবং ব্যঙ্গের সুতা একযোগে তাঁতে চাপাইলে তাহার টানাপোড়েনে বহু রুই কতলা শিঙ্গী মাগুরই জড়াইয়া পড়িবেন। ... ব্যঙ্গের অয়োমুখ বাণগুলি সর্বদাই কোনো-না-কোনো ভণ্ড নষ্ট দুষ্ট কর্তাব্যক্তির বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইবে, তাহার বুক ফুঁড়িয়া পশ্চাতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রশাসনিক অব্যবস্থাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করিবে। স্যাটায়ার নির্ঘাৎ বিঘাতক শক্তি ধরে। ট্র্যাজেডির মতো অপরাধীকে সে প্রাণে মারে না বটে, তবে তাহার কাছা কোঁচা খুলিয়া দেয়।''[২০]

এই শক্তিকে তিনি ব্যবহার করেছেন উল্লিখিত নাটকগুলিতে। 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য জোতদার এবং তার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির যোগসাজশ। তীব্র ব্যঙ্গে তিনি আক্রমণ করেছেন রেশন ব্যবস্থার ভেঙে পড়া, লোডশেডিং, নির্বাচন-জালিয়াতি, মন্ত্রিদের স্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয়কে। এই ব্যঙ্গের অভিমুখ যে সমকালের পশ্চিমবঙ্গের শাসকশক্তির দিকে ঘোরানো তা সহজেই বোঝা যায়। শাসক দলের গোষ্ঠী-রাজনীতি, জোতদারের ওপর রাষ্ট্রের আশীর্বাদের হাত প্রভৃতি প্রকাশ করেছেন তিনি শ্লেষ এবং

ব্যঙ্গের মাধ্যমেই। 'নরক গুলজার' নাটকে সত্তরের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, জরুরি অবস্থা ইত্যাদি বিষয়কে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। পুলিশ-মস্তান-জোতদার-ধর্মগুরু-নেতা মিলে সমকালের পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল, তার দিকে ব্যঙ্গের শর নিক্ষেপ করেছেন নাট্যকার। তীব্র ব্যঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক ব্রহ্মাকে দিয়ে তিনি বলান ঃ ''উৎকোচ ছাড়া আমাদের ইনকামটা কী, অ্যাঁ ? আমরা কি খাটি, না এগ্রিকালচার করি, না মেসিন বানাই ?''[২১] যে সংগ্রাহক শক্তি কেবল উৎপাদকদের শ্রমের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে এবং সেই উৎপাদকদের ওপরই অত্যাচার করে, তারা এভাবেই নাট্যকারের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। অস্ত্র উঁচিয়ে রেখে আলোচনা, রাজনীতিকদের পরিজনদের মুক্তিপণ হিসেবে অন্যায়ের সঙ্গে আপস ইত্যাদি সমকালের সমস্ত অনুষঙ্গই এসেছে এই নাটকে। ক্রোধী মনোজ মিত্র রাজনৈতিক নেতাদের না-মৃত্যুর সম্ভাবনাকে নিয়েও ব্যঙ্গ করেছেন ঃ

''যমদূত ।। আজ্ঞে মোটরগাড়ির দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মারুন না...

যম ।। ঘোড়ার ঘেঁচু ! মাঝে পড়ে ড্রাইভারটি মারা যাবে। দেখা যাবে বাঁটুল এ গাড়িতে ছিল না ... সে গাড়িতে আছে!''[২২]

দেশ যে ক্রমশ গাভীদের দেশ বা গাভীদের রাজত্বের দিকে এগোচ্ছে সেই ইঙ্গিত দিতেও এই নাটকে দ্বিধাগ্রস্ত নন ব্যঙ্গশিল্পী মনোজ মিত্র।

'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে ব্রেখটীয় রীতিতে রূপকথার আদলে মনোজ মিত্র ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপ করেছেন সাধু সেজে থাকা সেই শাসককে, যারা নিজেদের স্বার্থে খুনে বাহিনী তৈরি করে অবিরাম রক্ত ঝরায়। শাসকের সহায়ক শক্তিকে চিত্রিত করেছেন 'প্রেত' হিসেবে। খলচরিত্র এই নাটকে কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত। একইরকমভাবে খল চরিত্রকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন 'নৈশভোজ' নাটকে। ক্রুদ্ধ নাট্যকার এখানে লোভী মানুষকে উপমিত করেছেন শেয়ালের সঙ্গে। রাজনীতিকদের বলেছেন 'পলিটিশিয়াল'। কেবল রাজনীতিক নয়, মস্তান, ধর্মগুরু, অসৎ ব্যবসায়ী কেউ-ই রেহাই পায়নি তাঁর নিক্ষিপ্ত শর থেকে। 'চোখে আঙুল দাদা' একাঙ্কটিও ব্যঙ্গে তিক্ত। যে ছিদ্রান্বেষী কেবল অন্যের খুঁত ধরে বেড়ায়, অথচ নিজে কোনো কাজই করে না, তাকে ব্যঙ্গের চাবুকে আহত করেছেন নাট্যকার। এই চোখে-আঙুল বিধাতারও খুঁত ধরে চলেছে অবিরাম। সে গর্বের সঙ্গে বলে ঃ ''ফলানোটা আমার কাজ নয়, যারা ফলায় তাদের ভ্রান্তিগুলো ফলাও করাটাই আমার জব!''[২৩] আর্যভট্ট থেকে সত্যজিৎ রায়, আলু থেকে জোনাকি-সবকিছুতেই 'অগাধ' জ্ঞান এই চোখে-আঙুলের, কিন্তু সে জ্ঞান কোনো সৃজন বা উৎপাদনের কাজে লাগে না। সুরকন্যাদের গানে সেই ছিদ্রান্বেষী চোখে-আঙুল দাদার প্রতি ব্যঙ্গের শর নিক্ষেপ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ

''চোখে আঙুল দাদা... এ কেমনতরো ভূত...
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সবাই খেটে মরে...
কাজের নামে টুঁ টুঁইনি লোকের খুঁত ধরে...
চোখে-অঙুল দাদা... এ কেমন তরো ভূত...''[২৪]

'রাজদর্শন' নাটকেও অযোগ্য শাসক এবং তার পারিষদদের ব্যঙ্গ করতে গিয়ে মনোজ মিত্র অযোধ্যা রাজ্যের প্রেক্ষাপটে কাহিনি স্থাপন করেছেন। প্রেক্ষাপট পুরনো দিনের হলেও ব্যঙ্গের লক্ষ্য সমকাল, যে কালে ত্রাণভান্ডার হ'ল শাসকের 'আড়ায় ঝুলিয়ে রাখা কলার কাঁদি', যে কালে নিজের লোক কর্মপ্রার্থী হ'লে তার কোনো যোগ্যতারই দরকার নেই, যে কালে রাজত্ব রক্ষা করতে গেলে 'পিশাচের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধতে হয়', যে কালে মানুষকে অপরাধ করার সুযোগ দিয়ে তারপর তাকে ব্ল্যাকমেল করা

হয়। সাধারণভাবে সমাজ-রাজনীতির বিভিন্ন ভণ্ডামি এবং নষ্টামির বিরুদ্ধে কটাক্ষ তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটকেই আছে। যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন নানা অসঙ্গতিকে।

কিন্তু ব্যঙ্গ নয়, নাট্যকার মনোজ মিত্রের প্রকৃত বিচরণ ক্ষেত্র প্রসন্ন কৌতুকের ভূমি। জীবনের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিই এই কৌতুকের উৎস। জীবনকে তিনি দেখেছেন প্রধানত আনন্দময় রূপে। আমাদের চারপাশের চেনা পরিবেশে, চেনা মানুষগুলির মধ্যে যে এত কৌতুকের উপাদান আছে, মনোজ মিত্রের দৃষ্টিতে তা আবিষ্কার করে আমরা বিস্মিত হই। এই কৌতুক তিনি কখনো সৃষ্টি করেছেন পরিস্থিতিগত বৈচিত্র্যে, কখনো চরিত্রের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের আশ্রয়ে, আর সবচেয়ে বেশি করে করেছেন সংলাপে আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত মোচড় সৃষ্টি করে।

'কেনারাম বেচারাম' নাটকে একাধিক জায়গায় হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। নগেন পাঁজা যেভাবে বক্তৃতার তোড়ে কেনারামকেই বেচারাম বলে চালাতে চেয়েছে, কেনারামও যেভাবে ক্রমে উভয়পক্ষকে 'খেলাতে' অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তাতে পরিস্থিতিগত হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। ভাগ্নে ভৈরব এক বিরাট মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এসেছে কিন্তু সে হাঁড়ি ফাঁকা - মামার বাড়ি থেকে মিষ্টি ভরে নিয়ে যাবে বলে সে ফাঁকা হাঁড়ি এনেছে। নগেনকে পুলিশের ভয় দেখালে সে নিজেই যেভাবে পুলিশ ডাকতে চেয়েছে, পুলিশ ইন্সপেক্টরকে নেতাজীর শূন্যস্থানে 'ফিট করতে' চেয়েছে - প্রভৃতি সবই নাটকে একের পর এক হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। 'নৈশভোজ' নাটকে তুষ্টুর 'লাশ' নিয়ে মিছিলের জন্য মস্তান বাবলা প্রয়োজনীয় জিনিসের যে ফিরিস্তি দিয়েছে তার মধ্যে আছে পাঁচশো ছাতা! শোকমিছিলের ব্যাজ হবে সেই ছাতার কালো কাপড়ে - এই সংবাদে উচ্ছল হাস্যরস সৃষ্টি হয়। 'পুঁটি রামায়ণ'-এ বিংশ শতাব্দীর কাচের গ্লাস, কাঁটাচামচ প্রভৃতি দিয়ে রাবণের রাজসভায় যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে পুঁটিরাম, তা উচ্ছ্বসিত হাসির অনুষঙ্গ তৈরি করেছে। কাঁটাচামচ দিয়ে পাটিসাপটা খেতে গিয়ে স্লিপ করে কাঁটাচামচ ঢুকে গিয়ে রাবণের গলায় আটকে গেছে। বের করার জন্য পুঁটিরাম নিজের ঝোলা থেকে টর্চলাইট বের করে একজনকে বলেছে আলোটা রাবণের হাঁ-এর ভেতর ফেলতে। কিন্তু বিশ শতকের এই অদ্ভুত আলো দেখে রাজসভার সকলেই বিস্মিত - নিজেরা সেই আলো নিয়ে দেখছে, খেলছে - আর রাবণের গলায় কাঁটাচামচ আটকেই আছে। হাতে হাতে জ্বলতে জ্বলতে ব্যাটারি ফুরিয়ে আলো নিভে গেছে - রাবণের অবস্থা করুণ। বিরতির ঠিক আগে এই পরিস্থিতি সৃজন পাঠক-দর্শককে উতরোল হাসিতে উচ্ছ্বসিত করে তোলে। নাটকের শেষে প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতা বুঝে ফেলা লঙ্কাবাসীরা পণ্ডিতকে বলেছে 'চালিয়ে যা'। পণ্ডিত মন্ত্র ক্রমশ চালিয়ে গেছে - ঝুলে থেকেছে বিয়ে - ঝুলে থেকেছে ফাঁসি। 'দম্পতি' নাটকেও পরিস্থিতিগত হাস্যরস প্রচুর। শিঙি আর বেলে নিয়ে কর্তা-গিন্নির কলহ এর একটি দৃষ্টান্ত। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বড়খোকা-তাতাই-এর সঙ্গে কর্তার কথোপকথনের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ঃ

তাতাই ।। ঠাম্মা কোথায়? ঠাম্মাকে দেখছি না। ও ঠাম্মা ...

কর্তা ।। তোর ঠাম্মা নেইরে দাদাভাই!

বড়খোকা ।। অ্যাঁ? কবে?

কর্তা ।। আজ আড়াইটে!

বড়খোকা ।। কী হয়েছিলো!

কর্তা ।। সেটা জিতেনডাক্তার জানে। আড়াইটের সময় তোমার মাকে নিয়ে বাবুঘাটে চলে গেলো।

বড়খোকা ।। বাবুঘাটে কেন? নিমতলাঘাট তো কাছেই ছিলো!''[২৫]

পাঠক-দর্শক এখানে আগে থেকেই জানেন যে, গিন্নি আসলে মারা যান নি, গিয়েছেন জিতেন ডাক্তারের সঙ্গে বেড়াতে। কিন্তু কর্তার সংবাদ জ্ঞাপনের ধরণে বড়ছেলের যে ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় পাঠক-দর্শককে।

বিশেষ বিশেষ চরিত্রের সাহায্যেও মনোজ মিত্র বিভিন্ন নাটকে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। 'কেনারাম বেচারাম'-এ ভৈরব বা পিন্টু, 'পরবাস'-এ করালী দত্ত, 'সাজানো বাগান'-এ মোক্তার-ডাক্তার-গণৎকার-পুরোহিত, 'দর্পণে শরৎশশী'-তে কুঞ্জবিহারী বা তুফান, 'দেবী সর্পমস্তা'য় বিদূষক, 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার'-এ পমমামা-লতুমাসি বা গায়ক হরিশ্চন্দ্র বা দেহরক্ষী খাসনবীশ, 'বাবুদের ডালকুকুরে'-তে গিন্নি, 'যা নেই ভারতে'-তে কঞ্চুকী, 'ব্রিজের ওপর বাপি'-তে অনিল মান্না প্রভৃতি চরিত্র কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত। আবার কিছু কিছু এমন চরিত্রও তাঁর নাটকে আছে, যারা প্রাথমিকভাবে কৌতুককর হ'লেও বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বা পরিণতিতে অন্যতর মাত্রা পেয়ে যায়। 'পরবাস'-এর গজমাধব ছাড়াও এই শ্রেণির চরিত্রের দৃষ্টান্ত 'কেনারাম বেচারাম'-এর নগেন পাঁজা, 'পালিয়ে বেড়ায়'-এর রূপচাঁদ, 'নাকছাবিটা'র কাব্যতীর্থ বা 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার'-এর ধৃতিকান্ত ঘোষাল। হাসতেও হাসতেও কোথায় যেন এদের জন্য মনটা কেমন করে ওঠে।

সংলাপ রচনায় মনোজ মিত্রের দক্ষতা এবং সাফল্য প্রশ্নাতীত। অনেকে মনে করে থাকেন যে, সংলাপই তাঁর নাটকের প্রধান জোরের জায়গা। কৌতুক সৃষ্টিতেও তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন সংলাপের ক্ষিপ্রগতি, আকস্মিকতা এবং অপ্রত্যাশিত জবাব। 'কেনারাম বেচারাম'-এ পিন্টু নিজের প্রেমিকা সম্পর্কে যেমন বলেছে ঃ ''ক্যান্সারও বোধহয় একদিন ঠেকানো যাবে। কিন্তু কাকাতুয়াকে কোন দিন ঠেকানো যাবে না!''[২৬] নগেন পাঁজা 'তালিকা' মিলিয়ে 'ফিট' করছে কেনারামকে ঃ '' মিলিয়ে নিন ... এই দেখুন পরণে লাল লুঙ্গি ... গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি ... খোঁচা খোঁচা দাড়ি ... চোখে চশমা ... বগলে ছাতা ... হাঁপানি চেয়েছিলেন, তাও আছে।''[২৭] 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে চুড়ো এবং বিজনের সংলাপে প্রচলিত প্রবাদের যে ভিন্ন অর্থ নিষ্কাশন করেছেন তা কৌতুক সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে ঃ

''চুড়ো ।। স্মৃতিশক্তি আপনার ভালোই আছে। কিন্তু ঠিক কি বলতে চান বলুন তো ...?

বিজন ।। বলতে চাই সেই বিষয়-আশয় না দেখে আমার ধেড়ে শ্যালকটি শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ল কেন?

চুড়ো ।। যেহেতু মানুষের মাথায় শিঙ না রাখাই ভালো। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি না ভেঙে তাতে তেল মাখাতে চান, মাখান।''[২৮]

'টু-ইন-ওয়ান' নাটকে ফৈজী যেভাবে পিঠের দিকে পরস্পর-যুক্ত যমজ পুত্রকে জোড়া ফলের সঙ্গে তুলনা করেছে তাও কৌতুক সৃষ্টি করেছে ঃ ''ক্যালা যদি জোড়া হইতে পারে, পোলা হইব না ক্যান? মালেক, জোড়া ক্যালার মতো জোড়া পোলা হইছে আপনের।''[২৯] আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার এখানে কৌতুককে উচ্ছ্বসিত করেছে। প্রবাদকে সামান্য ভিন্নরূপে ব্যবহার করে কৌতুক সৃষ্টির আরেকটি নজির 'কুহুযামিনী' নাটকের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ঃ

''এলোকেশী ।। থাকতেই পারে, মানুষের যা যা থাকে, তাঁরও তাই থাকে। মানুষের চেয়ে তিনি কম যাবেন কেন? ঐ যে আপনাদের বড় বড় পণ্ডিতে বলে গেছেন না, মানুষের মধ্যে ভগবান আছে? ভুল থিওরি!

সারেঙ্গি ।। তোমার থিওরি কী বলে?

এলোকেশী ।। উল্টো। ভগবানের মধ্যে মানুষ আছে!

সারেঙ্গি ।। দুটোর তফাত!

এলোকেশী ।। আছে না? মানুষের মধ্যে ভগবান থাকলে, মানুষে বর্তাবে ভগবানের গুণ! আর ভগবানের খোলে মানুষ সিঁধোলে, মানুষের সব কীর্তিকলাপে মেতে উঠবেন তিনি। মানুষে ভগবানে তখন এক কালচার! ভগবান তখন জবরদখল রাহাজানি সব করবে!''[৩০]

'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে কৌতুকের বিপুল আয়োজন। প্রতিটি সংলাপেই প্রায় উপচে ওঠে হাসি। ধৃতিকান্ত, খাসনবীশ, পমমামা-লতিকা, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি সব চরিত্রই এখানে কমিক। স্বাভাবিকভাবেই তাদের সংলাপও অনাবিল কৌতুকের উৎস। যেমন, মদ্যপান সম্পর্কে ধৃতিকান্তর সংলাপ ঃ ''আগে গলা পর্যন্ত মদে ডুবে থাকতাম ... ডাক্তার বলে দিয়েছে, সারাদিনে মাপা দুটি পেগ! তাই দিনে যতবার খাই, দু'পেগ করেই খাই।''[৩১] মুন্নিকে কাছে আনার জন্য কৌশল আবিষ্কার করেছে খাসনবীশ পমমামার 'সাইকোলজি স্টাডি' করে ঃ

''খাসনবীশ ।। মামায় যাতে ছাড়ে সেই ব্যবস্থা করুন। নার্সিংহোমে শুইয়া আপনে খালি লতু-লতু আর্তনাদ ছাড়বেন -

ধৃতিকান্ত ।। না, না - মুন্নি ... মুন্নি ...

খাসনবীশ ।। শোনেন না, লতু মাসিরে ডাকলেই আপনি যারে চান তারেই পাইবেন শিয়রে! পম আঙ্কেলের সাইকোলজি স্টাডি কইর‍্যা যা বুঝছি, ওনার বইনরে ডাকলেই উনি ভাগ্নেবউরে ঠেইলা দিবেন। উল্টা প্যাঁচে কাম সারতে হইব।''[৩২]

'স্মৃতিসুধা' নাটক থেকে সংলাপের মোচড়ে কৌতুক সৃষ্টির একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ

''ভেলটু ।। ভেলটু ভট্টর নাম শুনেছেন। সুইমার ভেলটু ভট্ট।

মোহনবাঁশি ।। সোজাসুজি বলুন, আপনি সাঁতারু?

ভেলটু ।। ইয়েস ফোর হানড্রেড মিটারস্ ফ্রী-স্টাইলে অদ্বিতীয়। বাটারফ্লাইতে অদ্বিতীয়। ফ্লোটিং-এ অদ্বিতীয়।

লবঙ্গ ।। সবেতেই অদ্বিতীয়!

ভেলটু ।। ইয়েস! জীবনে কখনো দ্বিতীয় হই নি! প্রত্যেকবার থার্ড বা ফোর্থ কিংবা ফিপথ অথবা সিকসথ অথবা টুয়েলফথ্!''[৩৩]

এরকম বাক্‌কৌশল এবং non-sequitur-এর আরো অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে 'সংলাপ' উপ-অধ্যায়ে। পুনরুক্তি এড়াতে সেগুলির উল্লেখ এখানে করা হ'ল না, কিন্তু কৌতুক সৃষ্টিতে সেই সংলাপগুলিও অনবদ্য। কথার এই মারপ্যাঁচ বা শব্দ নিয়ে খেলায় মনোজ মিত্রের জুড়ি নেই। অতি সহজ সাধারণ

কথাকেও এভাবে মোচড় দিয়ে তার ভেতর থেকে রস নিষ্কাশনের ক্ষমতা তাঁর অসীম। নিজে মজাদার মানুষ বলেই জীবনে তিনি ছড়ানো দেখেছেন অসংখ্য মজার উপকরণ। সেই উপকরণগুলি তাঁর দৃষ্টিতে অভিনব রূপ ধারণ করে উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের কাছে। তাঁর এই কৌতুকপ্রিয়তা আর পরিহাস-রসিকতাকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ

> "ব্যঙ্গে পরিহাসে তির্যক কৌতুকে মনোজ মিত্র ব্যক্তিজীবনে আর লেখকজীবনে সমান অনুরাগী। দুঃখ, যন্ত্রণা, শোক, হাহাকার, সন্তাপ যখনই শ্রাবণের অনিবার্য মেঘের মতোই তাঁর কোন নাট্যদৃশ্যের আকাশ ভারী করে দেয়, - দর্শক বা পাঠক সেই বিষণ্ণতার মেঘছায়ায় বিধুর হতে হতেই পরক্ষণে আবিষ্কার করেন, ক্রুদ্ধ মেঘের শোকার্ত চাদর সরিয়ে দগ্ধজীবনের বিরস উঠোন থেকে কুড়িয়ে তোলা কয়েকটি তির্যক রশ্মিবিচ্ছুরক কাঁচ কিংবা অনাদরে পড়ে থাকা কিছু নিঃসঙ্গ ফল হাতে নিয়ে মনোজ মিত্র তার থেকে আলো আর রসের মজা বার করছেন।"[৩৪]

এই আলো আর মজাই তাঁর অন্বিষ্ট। সব পাঁক মাড়িয়ে, সব অন্ধকার পার করে পাঠক-দর্শককে তিনি অবগাহন করাতে চান অনাবিল কৌতুকের স্রোতে। জীবনের অন্ধকারকে অস্বীকার করেন না তিনি, কিন্তু তবু বিশ্বাস করেন, জীবন মূলত আনন্দময়।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) বিষ্ণু শর্মার মতো দুর্যোগেও তাঁর স্মিত হাসি - শৈবাল মিত্র - আজকাল, ০৯.০৮.১৯৯২

২) ঐ

৩) কমেডির উদ্ভব - অ্যারিস্টটল - পোয়েটিক্স্ - অনু. শিশিরকুমার দাস - প্যাপিরাস - গণেন্দ্র মিত্র লেন - কোলকাতা-০৪, আগস্ট ১৯৮৬

৪) মনোজ মিত্রের কমেডির ভাষা-ভাষ্য - শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খণ্ড-এর ভূমিকা - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ০ কলিকাতা-৭৩, মাঘ ১৪০২

৫) বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার - সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় - পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি - ১৯৯৯, পৃ.১৪

৬) ঐ, পৃ.১৪

৭) ঐ, পৃ.১৩

৮) ঐ, পৃ.১৪

৯) The Idea of Comedy Meredith,P.84 - বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা - ড. অজিতকুমার ঘোষ-এর গ্রন্থে উৎকলিত। পৃ. ৩৬

১০) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা - ড. অজিতকুমার ঘোষ - তৃতীয় সংস্করণ - করুণা প্রকাশনী - কলকাতা-০৯ - ১৯৮৯, পৃ. ৩৯

১১) নাটকের কথা - ড. অজিতকুমার গোষ - পঞ্চম সংস্করণ - সাহিত্যলোক - কলকাতা-০৬ - মাঘ ১৪১২ গ্রন্থে আলোচিত। পৃ. ৯৮

১২) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৮১

১৩) প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের চিঠি, ০৫.১২.১৯৭৫

১৪) অজিত দে-র চিঠি - তারিখ অনুল্লেখিত

১৫) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ. ৪৯

১৬) সুন্দরমের সাজানো বাগান - সুরজিৎ ঘোষ - অমৃত, ২৮.০৪.১৯৭৮

১৭) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ. ২৩

১৮) সাজানো বাগানে চোখ রেখে - দেবাশিস মজুমদার - দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ০৬.০৮.২০০৫

১৯) ব্যঙ্গের প্রয়োজন কী চাণক্য! - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন - কলকাতা-০৯ - ২০০১। পৃ. ৪৮

২০) ঐ, পৃ. ৪৬

২১) নরক গুলজার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - মাঘ ১৪০২, পৃ. ৭২

২২) ঐ, পৃ. ৮০

২৩) চোখে আঙুল দাদা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ. ৩৭৬

২৪) ঐ, পৃ. ৩৭৪

২৫) দম্পতি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - মাঘৎ ১৪০২, পৃ. ২০১

২৬) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খণ্ড - দ্বিতীয় মুদ্রণ - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - মাঘ ১৪০৩, পৃ. ১০৬

২৭) ঐ, পৃ. ১১৭

২৮) দর্পণে শরৎশশী - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ. ২০৫

২৯) টু-ইন-ওয়ান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ.৪১৭

৩০) কুহুযামিনী - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৮৩-৮৪

৩১) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা-৭৩ - কার্তিক ১৪১০, পৃ. ১৫৮

৩২) ঐ, পৃ. ১৮৮

৩৩) স্মৃতিসুধা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খণ্ড, পৃ.২৬৫

৩৪) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ - চন্দন সেন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খণ্ড-এর ভূমিকা

উপসংহার

উপসংহার

মনোজ মিত্র নিজেকে গণনাট্য ধারার উত্তরসূরী বলতে গর্ব বোধ করেন, কিন্তু গণনাট্য সংঘ যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়ে গেছে তাকে চালাকি করে খাটানোকে সমর্থন করতে পারেন নি। বাংলা নাটক ও থিয়েটারে সমকালে এই চালাকির ব্যবহার দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। স্পষ্ট বলেছেন ঃ

> ''চালাকিটা এখানেই যে আমরা বুঝতে পেরে গেছি, কি জিনিস দিলে মানুষ নেবে, নাটকে কি জিনিস থাকলে তা বহুলোককে টানবে, বহুলোকের বাহবা কুড়োনো যাবে। তাতে আমরা বিশ্বাসী হই বা না হই, তাকে আমরা চিনি বা না চিনি। আমরা আমাদের ছক জানি, আর জানি তত্ত্ব। এই দুটোকে আমরা মিলিয়ে ছেড়ে দিই।''[১]

নিজের নাটকে এই চালাকি করবেন না বলে মনোজ মিত্র উপস্থিত করলেন চোখে দেখা জগৎকে, নিজের চেনা মানুষ এবং পরিবেশকে। যে মানুষদের তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর প্রথম নাটক থেকে শুরু করে পরবর্তী সবগুলি সৃষ্টিতে তারা সবাই তাঁর অভিজ্ঞতার জগতের অধিবাসী। তাদের লোভ-ক্ষুধা-দারিদ্র্য, দুঃখ-হাসি-কান্না প্রভৃতি সবই তাঁর অতিপরিচিত। সেই পরিচিত মানুষকে দোষ-গুণ, ভাষা-আচরণসহ উপস্থিত করলেন তিনি।

মনোজ মিত্রের নাট্যকর্মের সামগ্রিক আলোচনার পর কতগুলি বিষয় আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, নিজের নাটকের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন দেশীয় ভূমি থেকে। পাশ্চাত্য বিভিন্ন নাট্যকলা সম্পর্কে অবহিত থেকেছেন, কিন্তু দেশীয় নাট্যকলাই তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয়। এই নাট্যকলার চর্চা ও সংরক্ষণে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। পাশ্চাত্য রীতির দ্বারা কখনো প্রভাবিত হ'লেও তাকে ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ দেশীয় অনুষঙ্গে। দ্বিতীয়ত, তাঁর নাটকের বিষয় মূলত সামাজিক। সামাজিক বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য তিনি কখনো ইতিহাসের পটভূমি ব্যবহার করেছেন, কখনো পুরাণকে আশ্রয় করেছেন, কখনো রূপকের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন, কখনো বা সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর নাটকে একদিকে যেমন আছে মানবিকতার প্রবল অভিঘাত, অন্যদিকে পাই সামাজিক নানা কলুষের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশ। সেই আক্রোশকে একটা তত্ত্বচেতনায় গড়ে তোলার চেষ্টা এবং সামাজিক সমস্যা ও সংকট দূরীকরণে তাঁর নিজস্ব ভাবনা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দৃঢ়। তৃতীয়ত, নিজের নাটকে তিনি প্রধানত দেখাতে চেয়েছেন বহু বিচিত্র মানুষকে। মানুষের ভেতরকার মানুষ — যে মানুষ অসংখ্য বৈপরীত্যের সমবায়ে সম্পূর্ণ — সেই মানুষই তাঁর অবলম্বন। এই মানুষেরা বেশিরভাগই প্রান্তিক মানুষ, অসহায় মানুষ, দারিদ্র্য-লোভ-ধূর্ততায় মিশ্রিত মানুষ, ছেঁড়া মানুষ। নিজের নাট্যজীবনে তিনি এঁদের নিয়েই কাজ করেছেন। তাঁর নাটকে এইসব মানুষদের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করেছেন চন্দন সেন ঃ

> ''মনোজ মিত্রের নাটকীয় তন্তুজালে ঘটনা-উপঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কত কালোচিত বৈচিত্র্য এল, — কিন্তু লৌকিক-অলৌকিক, বাস্তব-পরাবাস্তবের মাঝখান থেকে হাঁটতে থাকা এইসব গাঁয়ের মাটি কিম্বা শহুরে ধুলো লেগে থাকা মানুষগুলোর অপ্রাপ্তি আর হাহাকার, নিঃসঙ্গতা আর বিচ্ছিন্নতার খুব বেশি অদলবদল হোল কি ? হয়তো মনোজ মিত্র এই ভীষণ ব্যস্ত, ধূর্ত, কুচুটে সময়েও ঐ একটা লেখারই চেষ্টা করে চলেছেন।''[২]

সেই লেখাটি হ'ল মানুষের জীবনপিপাসার উচ্চারণ -- সব প্রতিকূলতাকে সরিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবার প্রত্যয়। চতুর্থত, দীনবন্ধু মিত্রের মতো মনোজ মিত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য 'সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি'। এই সহানুভূতি যেমন বর্ষিত হয়েছে নায়ক চরিত্রের প্রতি, তেমনি খলচরিত্রও তা থেকে বঞ্চিত হয় নি। তাঁর নায়ক যেমন সর্বগুণের আধারমাত্র নয়, ভিলেনও তেমনি দোষের আকর নয়। একাধিক প্রেক্ষণ-বিন্দু ব্যবহার করে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো মুহূর্তে অসহায়। পঞ্চমত, মনোজ মিত্র আধুনিক নগরজীবনে বাস করলেও অন্তরে লালন করেছেন শৈশবের একান্নবর্তী পরিবার এবং গ্রামজীবনের প্রতি মমতা। আধুনিককালের অনিবার্য পরিবর্তনকে তিনি অস্বীকার করেন নি, নিজের নাটকে সেই পরিবর্তনের চিত্রও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারাশঙ্করের মতোই পুরনোর জন্য তাঁর দীর্ঘশ্বাসটি গোপন থাকে নি। ষষ্ঠত, সমাজ এবং পরিবারে যে কোনো মূল্যে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান মনোজ মিত্র। তিনি দেখেছেন, আধুনিক জীবনে মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটেছে। কেবল সেই অবক্ষয়ের চিত্রাঙ্কনেই শেষ হয় না তাঁর নাটক। কীভাবে তার নিরসন সম্ভব -- সে বিষয়েও তাঁর নির্দিষ্ট ভাবনা প্রকাশ পায়। সপ্তমত, আঙ্গিকের দিক থেকে যেমন তিনি একাঙ্ক ও বহুঅঙ্কবিশিষ্ট নাটক রচনা করেছেন, তেমনি রীতির দিক থেকে গণনাট্য, নবনাট্য, এপিক থিয়েটার, দেশজ নাট্যকলা প্রভৃতির ব্যবহারে একধরণের Composite নাট্যরচনা-রীতি উদ্ভাবন করেছেন।

মনোজ মিত্রের নাটকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির উত্তাপ কম। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কোনোদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সেভাবে যুক্ত থাকেন নি। তবে তাঁর কোনো কোনো নাটকে, বিশেষত প্রথম দিককার নাটকে শোষক-শোষিতের যে সংগ্রাম এবং পরিণামে শোষিতের জয় দেখানো হয়েছে তা বিশেষ রাজনৈতিক তত্ত্বেরই পরিপোষক। এই পর্বে তিনি মূলত ক্রোধী। কিন্তু ক্রমে তাঁর নাটকে রচনারীতির বদল ঘটতে থাকে। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিকতার পরিবর্তে তিনি বেছে নেন রূপকের আবরণ, Epic form বা ফ্যান্টাসির আবহ। তাঁর নাটকে রাজনীতির উপস্থিতির ধরণটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক কুমার রায় লিখেছেন ঃ

> "Political issues are not directly dealt with Manoj and Mohit's plays, but both weave elaborate fantasies or imageries to carry a political message which are more often liberal humanist than overtly marxist."[৩]

এই উদার মানবতাবাদ যখন যে রাজনীতির দ্বারা আক্রান্ত বা ধ্বস্ত হয়েছে, তখন সেই রাজনীতিই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। কাউকেই তিনি ছেড়ে কথা বলেন নি। বিশেষ কোনো দলীয় আনুগত্যের দায় নেই বলে সত্যভাষণে তিনি অকুণ্ঠিত।

নাটক রচনায় মূলত কমেডির ধাঁচ ব্যবহার করেছেন মনোজ মিত্র। যদিও প্রথম দিকে serious বক্তব্যের নাটক দিয়েই তাঁর পথ চলা শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে রচিত নাটকগুলিতে পরবর্তীকালের 'সিরিয়োকমিক' নাট্যকার মনোজ মিত্রের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। 'কেনারাম বেচারাম' বা 'পরবাস'-এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি একদিকে গণনাট্যের তত্ত্বভাবনার পথের পথিক ('নেকড়ে', 'চাক ভাঙা মধু', 'কালবিহঙ্গ'), অন্যদিকে ব্যক্তি সমস্যার রূপদানকারী ('মৃত্যুর চোখে জল', 'পাখি', 'টাপুর টুপুর') কিংবা পুরাণ-নির্ভর ('অশ্বত্থামা', 'তক্ষক')। তাঁর নাট্যরচনার প্রাথমিক পর্বটিকে সমালোচক

চিহ্নিত করেছেন এভাবে ঃ

> "In the begining Manoj's plays (in the Chak Bhanga Madhu phase) may have given an impression that Manoj would take Bijon's way - with its elemental presentation of birth, death, hunger and existence with a comic use of dialects - but soon Manoj forged his own way."[৪]

'চাক ভাঙা মধু' নাটকে কৌতুকের কিছু উপাদান থাকলেও এই পর্যায় পর্যন্ত মনোজ মিত্র মুখ্যত serious এবং কোথাও কোথাও ক্রোধী। ক্রমে seriousness-কে তিনি আবৃত করেছেন রঙ্গ-কৌতুকের আবরণে, ক্রোধকে রূপান্তরিত করেছেন শ্লেষ বা ব্যঙ্গে। তবে সহানুভূতি গুণের কারণে ব্যঙ্গের চেয়ে কৌতুকেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ।

পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)-এর খুলনা জেলার ধূলিহর গ্রামে মনোজ মিত্রের শৈশবের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর নাটকের আলোচনায় আমরা দেখেছি, জীবনের প্রতি তিনি তাকিয়েছেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে। তিনি মূলত ক্ষমাপরায়ণ শিল্পী। সব ত্রুটি-বিচ্যুতি-দোষ ঝেড়ে শুদ্ধ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন তাঁর লক্ষ্য। তিনি মানুষকে আরো একবার সুযোগ দেবার পক্ষপাতী। এই স্নিগ্ধ, শান্ত, উদার, ক্ষমাপরায়ণ পরিবেশেই তাঁর মানসিক স্বস্তি, কিন্তু সমাজ-রাজনীতির ক্রূরতা এবং ভন্ডামি যখন প্রবল, তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ। তাঁর সেই ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের কথাই উল্লেখ করেছেন বাংলা নাটকের ইতিহাসকার ঃ

> ''মাঝে মাঝে তাঁহাকে একটু বিষণ্ণ কিংবা ক্রুদ্ধ মনে হয়, কিন্তু আবার অন্য সময়ে তাঁহার দৃষ্টি প্রজাপতির মতো হাল্কা ডানা বিস্তার করিয়া রম্য বস্তুর সন্ধানে উড়িয়া চলে। তাঁহার ক্রুদ্ধ মেজাজ বাস্তবের প্রতিহিংসা ও বীভৎসতার মধ্যে কখনো কখনো এক জ্বালাময় রূপ ধারণ করে, কিন্তু মনে হয় ইহা তাঁহার ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি মাত্র। তাঁহার স্বাভাবিক মেজাজ প্রকাশ পায় প্রসন্ন জীবনের উপলব্ধিতে এবং স্নিগ্ধ কৌতুকরসের আস্বাদনায়।''[৫]

এই কৌতুকই তাঁর প্রধান অস্ত্র। সেই অস্ত্রেই তিনি অভ্রান্ত নিশানায় লক্ষ্যভেদ করেছেন।

নাট্যকার মনোজ মিত্র একাধারে অভিনেতা এবং নির্দেশকও। ফলে নাটকের মঞ্চরূপ তাঁর কাছে সবসময়ই স্পষ্ট। বিষয়কে যে উপযুক্ত এবং মনোগ্রাহী শিল্পরূপের আধারে প্রকাশ করতে হয়, নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি সেদিকে বিশেষ সচেতন থেকেছেন। তাঁর নাটক তাই শিল্পবস্তু হিসেবে সার্থক এবং মঞ্চসফল। সিচুয়েশন তৈরি করা থেকে প্লটের বুনন, আঙ্গিকের বিশিষ্টতা থেকে সংলাপ রচনার নৈপুণ্য, চরিত্রের বহুমাত্রিকতা থেকে সংগীত ব্যবহারের বিশিষ্টতা – সব ক্ষেত্রেই তিনি অনবদ্য। ফলে তাঁর নাটক মঞ্চে অনুবাদের সময় অদ্ভুত এক স্বাদুতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ বিশেষ কিছু চরিত্র তাঁর অভিনয়ের গুণেই চিরস্থায়িত্ব পেয়ে যায়। কেবল নিজের দল নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নাটকই যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দল এবং শৌখিন গোষ্ঠীগুলি অভিনয় করে থাকে, তার কারণ শিল্পবস্তু হিসেবে এগুলি সার্থকতার শীর্ষ স্পর্শ করে। উৎপল দত্ত বলেছিলেন ঃ

> ''নাট্যকারের খুব কৌতুকবোধ থাকা দরকার বলে আমার ধারণা ... সেখানে দর্শকদের প্রথমেই হাসিয়ে দিয়ে তার মনোসংযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব। আর কোন রকমেই সম্ভব বলে আমার ধারণা

নেই এবং আস্তে আস্তে সেই হাস্যরস করুণরসে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। সেটাকে প্রচন্ড ক্রোধে পরিণত করা যায়।"[৬]

মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে ঠিক এই কাজটিই করেছেন। কৌতুক দিয়ে শুরু করে তারপর নিজের ইচ্ছে মতো পাঠক-দর্শককে নিয়ে গেছেন কখনো তীব্র বিদ্রূপের জগতে, কখনো প্রচন্ড ক্রোধে।

মনোজ মিত্রের নাটকে সমস্যা সমাধানের একটি বিশেষ ধরণ আছে। ভাঙনের একেবারে কিনার পর্যন্ত নিয়ে এসে তিনি নিজেই শিউরে ওঠেন ভাঙনের ভয়াবহতা দেখে। এই ভাঙন রোধের জন্যই তাঁর নিরন্তর প্রয়াস। এটা তাঁর কাছে একধরণের লড়াই। সেই লড়াইয়ে তিনি জয়ী করেন প্রান্তিক মানুষকে, আপাত-গুরুত্বহীন মানুষকে। এই কারণে তাঁর নাটককে অনেকসময় ইচ্ছাপূরণ বলে মনে হ'তে পারে। আসলে 'যা হলে ভালো হয়' এবং 'যা হয়' — সে দুইয়ের মধ্যে অদ্ভুত ব্যালেন্স করতে পারেন তিনি। শরৎচন্দ্রের মতোই তিনি জানেন, বাঙালি পাঠক-দর্শকের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা 'যা হলে ভালো হয়'-এর জন্য। সেখানেই তিনি শেষ পর্যন্ত নাটককে পৌঁছে দেন, কিন্তু আকস্মিকভাবে নয়, বরং সমস্তরকম নাট্যিক শর্ত রক্ষা করে। নাটকের যে পরিণতি তিনি দেখান, তা যে সব সময় বাস্তবে সম্ভব বা প্রত্যক্ষ তা নয়, তবে তিনি পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে এমন কিছু চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টি করেন যাতে তাদের আর অবাস্তব মনে হয় না। এই Poetic Construction-এর কারণে তাঁর নাটক পাঠে বা অভিনয় দর্শনে এক ধরণের স্নিগ্ধ স্বাদুতা সৃষ্টি হয়। সেইসঙ্গে থাকে কৌতুকের অনাবিল প্রস্রবণ। তাঁর নাটকের আকর্ষণ তাই অপ্রতিরোধ্য। মনোজ মিত্র, সুতরাং, সেই নাট্যকার, যাঁকে নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বে বাঁধা যায় না এবং যাঁর আকর্ষণ উপেক্ষা করা যায় না।

১৯৮৫ সালে সোনারপুর কৃষ্টি সংসদের মুখপত্র 'কৃষ্টি'তে একটি সাক্ষাৎকারে মনোজ মিত্র বলেছিলেন ঃ

"আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে লিখতে চাই, সেটা হলো দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার দীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মত উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে কোন ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি - মানুষের এই সংগ্রামকেই ধরতে চাই।"[৭]

অসহায়, দীন মানুষের এই অনভিজাত সংগ্রামই আজও পর্যন্ত মনোজ মিত্রের নাটকের উপজীব্য। সেই বিষয়কে উপযুক্ত শিল্পরূপের আধারে প্রকাশ তাঁর লক্ষ্য। আরো আগে, ১৯৭৬ সালে চেতনা নাট্যোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন ঃ

"দেশী-বিদেশী মৌলিক নাট্যরূপ পুরাতনী আধুনিক কিছুতেই আমাদের আপত্তি নেই - Brecht এবং Stanislavsky, realistic অথবা absurd সবরকম form নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও আমরা অরাজী নই, তবে সর্ত একটাই - সেটি 'ঠিক' নাটক হওয়া চাই - এবং আমাদের দেশের মানুষের কাজে লাগা চাই।"[৮]

এই হ'ল মনোজ মিত্রের নাটক সম্পর্কে সার কথা। তিনি নাটক রচনায় নির্দিষ্ট একটি বিষয় চান, যে বিষয় 'দেশের মানুষের মনকে স্পর্শ' করবে, দেশের মানুষের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে এবং সেই বিষয় প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শিল্পরূপের আধার রচনাকে অবশ্যকৃত্য বলে মনে করেন।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) নাট্যচিন্তা - প্রথম বর্ষ - নবম-দশম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৮২

২) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ - চন্দন সেন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩ - এর ভূমিকা

৩) Post 1980 Plays ঃ Bangla - Kumar Roy - Theatre India, পৃ.১০

৪) ঐ, পৃ.৭

৫) অজিতকুমার ঘোষ - বাংলা নাটকের ইতিহাস - অষ্টম সংস্করণ - জেনারেল - ১১৯ - জুন ১৯৯৯ - লেনিন সরণি - কলিকাতা-১৩, পৃ.৪৫৬

৬) উৎপল দত্ত - 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটি রামায়ণ' সংকলনে উৎকলিত। সম্পা.রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - অপেরা - ৬৫ সূর্য সেন স্ট্রীট - কলকাতা-০৯ - শ্রাবণ ১৪১২,পৃ.১২

৭) কৃষ্টি - সোনারপুর কৃষ্টি সংসদের মুখপত্র - সম্পা. সচ্চিদানন্দ চৌধুরী, ডিসেম্বর ১৯৮৫

৮) চেতনা নাট্যোৎসবে মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, ১৯৭৬

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

মনোজ মিত্র রচিত নাটকের কালানুক্রমিক তালিকা ঃ

ক্রমিক	নাটক	রচনা	প্রথম প্রকাশ	পুন:/পরি:	গ্রন্থাকারে প্রকাশ	অতিরিক্ত তথ্য
১	মৃত্যুর চোখে জল (এ) নাটক সমগ্র-১	১৯৫৯	১৯৬০,'ত্রিংশ শতাব্দী' পত্রিকায়		মে-জুন,১৯৮১ 'মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক'সংকলনে	
২	পাখি (এ) নাটক সমগ্র-১	১৯৬০	১৯৬০,'ফসল' পত্রিকায়'পাখির চোখ' নামে।	পুন.-১৯৭৬ 'পাখি' নামে	১৯৭৬ 'পাখি' নামে	
৩	নীলকন্ঠের বিষ (পূ) নাটক সমগ্র-৪	১৯৬০	১৯৬০, 'গন্ধর্ব' পত্রিকায়		কার্তিক ১৪১০ নাটকসমগ্র-৪	
৪	মোরগের ডাক (পূ)	১৯৬১				
৫	আলোক ঝরণা (পূ)	১৯৬২				
৬	অবসন্ন প্রজাপতি (পূ)	১৯৬৩				
৭	অশ্বত্থামা (এ) নাটক সমগ্র-২	১৯৬৩	১৯৭৮,'বহুরূপী', শারদীয়া সংখ্যা	পুন.-১৯৭২-৭৩	১৯৮৬'অশ্বত্থামা ও তিন একাঙ্ক'সংকলনে	
৮	ব্ল্যাক প্রিন্স (পূ)	১৯৬৪				
৯	নীলা (পূ)	১৯৬৫				
১০	আরক্ত গোলাপ (পূ)	১৯৬৫	১৯৬৫, গ্রন্থাকারে, পলাশী			
১১	বেকার বিদ্যালংকার (এ)	১৯৬৬				
১২	সিংহদ্বার (পূ)	১৯৬৬				
১৩	টাপুর টুপুর (এ) নাটক সমগ্র-২	১৯৬৭	'কোথায় যাবো' ও 'টাপুর টুপুর' একত্রে, ১৯৭২			
১৪	তক্ষক (এ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৬৭	১৯৬৭, গ্রন্থাকারে	পুন.-১৯৮১		
১৫	কালবিহঙ্গ (এ) নাটক সমগ্র-২	১৯৬৮	১৯৬৮,'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকায়		মে-জুন,১৯৮১'মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক'	
১৬	নেকড়ে (পূ) নাটক সমগ্র-২	১৯৬৮	১৯৭৩, গ্রন্থাকারে	পুন.-১৯৭৩ পরি.-১৯৮৩		
১৭	কোথায় যাবো (এ)	১৯৬৯	১৯৭২,'কোথায় যাবো' ও 'টাপুর টুপুর' একত্রে			
১৮	চাক ভাঙা মধু (পূ) নাটক সমগ্র-১	১৯৬৯	১৩৭৮ বঙ্গাব্দ,'এক্ষণ' পত্রিকা, নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা	পুন.-১৯৭১	১৯৭২	

নাটক সমগ্র = মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলি-৭৩
পূ = পূর্ণাঙ্গ, এ = একাঙ্ক, পুন. = পুনর্লিখন, পরি. = পরিমার্জনা

ক্রমিক	নাটক	রচনা	প্রথম প্রকাশ	পুন:/পরি:	গ্রন্থাকারে প্রকাশ	অতিরিক্ত তথ্য
১৯	কেনারাম বেচারাম (পূ) নাটক সমগ্র-১	১৯৭০		পুন.-১৯৭৭ পরি.-১৯৯৩		প্রথমে 'বাবাবদল' নামে রঙমহলে অভিনীত হয়
২০	পরবাস (পূ) নাটক সমগ্র-১	১৯৭০		পুন.-১৯৭৫		'কোথায় যাবো' একাঙ্কটির রূপান্তর
২১	শিবের অসাধ্যি (পূ) নাটক সমগ্র-২	১৯৭৪				
২২	নরক গুলজার (পূ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৭৪	শ্রাবণ, ১৩৮৪, গ্রন্থাকারে	পরি.-১৯৭৬		
২৩	আমি মদন বলছি (এ) নাটক সমগ্র-২	১৯৭৪	উৎপল দত্তের সম্পাদনায় 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায়		মে-জুন, ১৯৮১, 'মনোজ মিত্রেরশ্রেষ্ঠ একাঙ্ক' সংকলনে	
২৪	মদনের পঞ্চকান্ড (এ) নাটক সমগ্র-৪	১৯৭৪			মাঘ ১৪০৭ 'মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্ক' সংকলনে, অপেরা	
২৫	চোখে আঙুল দাদা (এ) নাটক সমগ্র-২	১৯৭৬	গ্রন্থাকারে, 'মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক' সংকলনে			নামটি প্রমথনাথ বিশীর একটি ছোট গল্পের নাম থেকে নেওয়া
২৬	সাজানো বাগান (পূ) নাটক সমগ্র-২	১৯৭৬-১৯৭৭	বৈশাখ ১৩৮৫, গ্রন্থাকারে			'বাঞ্ছারামের বাগান' নামে চলচ্চিত্রায়িত
২৭	পাহাড়ী বিছে (পূ)	১৯৭৬-১৯৭৭	আষাঢ় ১৩৮৫, গ্রন্থাকারে, অপেরা			
২৮	দম্পতি (পূ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৭৮	বৈশাখ ১৩৮৯ 'শুকসারী' নামে	পুন.১৯৮৫	মাঘ ১৩৯৭ 'দম্পতি' নামে	১৯৭৯-৮০ সালে একাঙ্ক 'সন্ধ্যাতারা'য় রূপান্তরিত
২৯	মেঘ ও রাক্ষস (পূ) নাটক সমগ্র-১	১৯৭৯	১৯৮০, গ্রন্থাকারে			
৩০	তেঁতুল গাছ (এ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৭৯	১৩৮৮, 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা		মাঘ ১৩৮৮, 'রঙ্গব্যঙ্গের একাঙ্ক সংকলন'-এ	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাখাল কড়াই' গল্পের ছায়া আছে
৩১	সন্ধ্যাতারা (এ) নাটক সমগ্র-২	১৯৭৯-১৯৮০	১৯৭৯		মে-জুন, ১৯৮১'মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক'	'শুকসারী' বা 'দম্পতি' -এর একাঙ্ক রূপ
৩২	ঘোমটা (এ)	১৯৮০				
৩৩	রাজদর্শন (পূ) নাটক সমগ্র-২	১৯৮১	১৯৮১, শারদীয়া 'দেশ'		শ্রাবণ ১৩৮৯	

নাটক সমগ্র = মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলি-৭৩

পূ = পূর্ণাঙ্গ, এ = একাঙ্ক, পুন. = পুনর্লিখন, পরি. = পরিমার্জনা

ক্রমিক	নাটক	রচনা	প্রথম প্রকাশ	পুন:/পরি:	গ্রন্থাকারে প্রকাশ	অতিরিক্ত তথ্য
৩৪	সত্যি ভূতের গপ্পো (এ) নাটক সমগ্র-৫	১৯৮১	১৯৮১, গ্রন্থাকারে			পূর্ণাঙ্গ 'নরক গুলজার' -এর ছায়া অবলম্বনে
৩৫	বাবুদের ডালকুকুরে (এ) নাটক সমগ্র-৪	১৯৮১	১৯৮১, গ্রন্থাকারে			
৩৬	কাকচরিত্র (এ) নাটক সমগ্র-১	১৯৮২	১৯৮৩ 'মহানগর' পত্রিকায়		নভেম্বর ১৯৮৩	
৩৭	ঘন্টাকর্ণ (পূ)	১৯৮২				
৩৮	নৈশভোজ (এ)	১৯৮৩			আঙ্কি ১৪০৯'একাঙ্ক নয়' সংকলনে, অপেরা	
৩৯	নৈশভোজ (পূ) নাটক সমগ্র-১	১৯৮৪-১৯৮৫	শ্রাবণ ১৩৯৩, গ্রন্থাকারে			একাঙ্ক থেকে পূর্ণাঙ্গ
৪০	মঞ্চে চিত্রে (এ) নাটক সমগ্র-৫	১৯৮৫			২০০১,'মঞ্চে চলচ্চিত্রে' নামে 'বাংলা নাট্য : হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' গ্রন্থে	
৪১	পাকে বিপাকে (এ) নাটক সমগ্র-৪	১৯৮৫	১৯৮৫'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকা	পুন.১৯৮৭	আঙ্কি ১৪০৯'একাঙ্ক নয়' সংকলনে, অপেরা	
৪২	মহাবিদ্যা (এ) নাটক সমগ্র-১	১৯৮৬	১৯৮৬, 'আজকাল' শারদীয়া সংখ্যা			
৪৩	ঘড়ি আংটি ইত্যাদি (এ) নাটক সমগ্র-৪	১৯৮৬	১৯৮৬,'শূদ্রক' শারদীয়া সংখ্যা		আঙ্কি ১৪০৯'একাঙ্ক নয়' সংকলনে, অপেরা	
৪৪	অলকানন্দার পুত্রকন্যা (পূ) নাটক সমগ্র-১	১৯৮৮	১৯৮৯,'দেশ' শারদীয়া সংখ্যা		১৯৯০	
৪৫	কিনু কাহারের থেটার (পূ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৮৮	কার্তিক ১৩৯৫, গ্রন্থাকারে			'কিনু কাহারের থিয়েটার'নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন (২৬ আগস্ট ১৯৮৩)
৪৬	প্রভাত ফিরে এসো (এ) নাটক সমগ্র-২	১৯৮৮	নভেম্বর ১৯৮৮, 'দেশ' পত্রিকায়		জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯ 'ওয়ান অ্যাক্ট' সংকলনে	
৪৭	রাজার পেটে প্রজার পিঠে (পূ)	১৯৮৮	১৩এপ্রিল,১৯৮৮ 'আনন্দমেলা'	পরি.১৯৯২	মাঘ ১৩৯৯ অপেরা	
৪৮	পুঁটিরামায়ণ (পূ) নাটক সমগ্র-১	১৯৮৯-১৯৯০	সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায়		অগ্রহায়ণ ১৩৯৭	
৪৯	সাহেববাগানের সুন্দরী (এ)	১৯৮৯	১৯৮৯, 'আনন্দবাজার' পূজা স্পেশাল		মাঘ ১৪০৭, 'মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্ক' সংকলনে, অপেরা	

নাটক সমগ্র = মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলি-৭৩

পূ = পূর্ণাঙ্গ, এ = একাঙ্ক, পুন. = পুনর্লিখন, পরি. = পরিমার্জনা

ক্রমিক	নাটক	রচনা	প্রথম প্রকাশ	পুন:/পরি:	গ্রন্থাকারে প্রকাশ	অতিরিক্ত তথ্য
৫০	শোভাযাত্রা (পূ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৯০	জানুয়ারি ১৯৯৯ 'দেশ'		মাঘ ১৩৯৮	
৫১	আঁখিপল্লব (এ) নাটক সমগ্র-১	১৯৯০	১৯৯০, 'কলকাতা' শারদীয়া সংখ্যা		জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯, 'ওয়ান অ্যাক্ট' সংকলনে	
৫২	দর্পণে শরৎশশী (পূ) নাটক সমগ্র-২	১৯৯১	৯ নভেম্বর ১৯৯১, 'দেশ'	পুন. ১৯৯২	বৈশাখ ১৪০০	
৫৩	বেকার বিদ্যাংলকার (পূ)	১৯৯১			আশ্বিন ১৩৯৮	একই নামের একাঙ্ক নাটকের রূপান্তর
৫৪	টু-ইন-ওয়ান (এ) নাটক সমগ্র-২	১৯৯১	১৯৯১,অশোক মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে The States-man: Festival issue-তে		জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯ 'ওয়ান অ্যাক্ট' সংকলনে	
৫৫	নিউ রয়্যাল কিস্‌সা (এ) নাটক সমগ্র-৫	১৯৯২	১৯৯২, গ্রন্থাকারে			
৫৬	গল্প হেকিমসাহেব (পূ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৯২- ১৯৯৩	১৯৯৩, 'দেশ', শারদীয়া সংখ্যা		পৌষ ১৯৯৪	
৫৭	স্মৃতিসুধা (এ) নাটক সমগ্র-৪	১৯৯৩	১৯৯৩, 'প্রতিবেদন', পূজাসংখ্যা	পরি.১৯৯৪	আশ্বিন ১৪০১, 'বৃষ্টির ছায়াছবি' ও 'স্মৃতিসুধা' একত্রে, অপেরা	
৫৮	বৃষ্টির ছায়াছবি (এ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৯৩	১৯৯৩, 'স্যাস্', পূজাসংখ্যা	পরি.১৯৯৪	আশ্বিন ১৪০১, 'বৃষ্টির ছায়াছবি' ও 'স্মৃতিসুধা' একত্রে, অপেরা	
৫৯	আত্মগোপন (পূ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৯৪	১৯৯৪, শারদীয়া 'আজকাল'	পুন.১৯৯৫	মাঘ ১৪০২ নাটক সমগ্র-৩-এ	
৬০	আকাশচুম্বন (এ) নাটক সমগ্র-৪	১৯৯৪	১৯৯৪, 'যুগান্তর', শারদীয়া সংখ্যা		কার্তিক ১৪১০ নাটক সমগ্র-৪-এ	
৬১	দেবী সর্পমস্তা (পূ) নাটক সমগ্র-৩	১৯৯৫	১৯৯৫, শারদীয়া 'আজকাল'		মাঘ ১৪০২ নাটক সমগ্র-৩-এ	
৬২	ছায়ার প্রাসাদ (পূ) নাটক সমগ্র-৪	১৯৯৭	১৯৯৭, 'দেশ', শারদীয়া সংখ্যা	পরি.২০০৩	আশ্বিন ১৪০৫ মিত্র ও ঘোষ পাবলি-শার্স প্রাঃ লিঃ	
৬৩	পালিয়ে বেড়ায় (পূ) নাটক সমগ্র-৪	১৯৯৮- ১৯৯৯	১৯৯৯, শারদীয়া 'আনন্দলোক'		ফাল্গুন ১৪০৬ অপেরা	

নাটক সমগ্র = মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলি-৭৩

পূ = পূর্ণাঙ্গ, এ = একাঙ্ক, পুন. = পুনর্লিখন, পরি. = পরিমার্জনা

ক্রমিক	নাটক	রচনা	প্রথম প্রকাশ	পুন:/পরি:	গ্রন্থাকারে প্রকাশ	অতিরিক্ত তথ্য
৬৪	নাকছাবিটা (পূ) নাটক সমগ্র-৪	২০০০	২০০০, শারদীয়া 'দেশ'		ফাল্গুন ১৪০৮ 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' এর সঙ্গে, অপেরা	
৬৫	মুন্নি ও সাত চৌকিদার (পূ) নাটক সমগ্র-৪	২০০১	২০০১, শারদীয়া 'দেশ'		ফাল্গুন ১৪০৮ 'নাক-ছাবিটা'-এর সঙ্গে, অপেরা	
৬৬	যখন কুলীন ছিলাম (পূ)	২০০১				
৬৭	চমচমকুমার (এ) নাটক সমগ্র-৫	২০০২	জুন ২০০২ 'আনন্দমেলা'		আশ্বিন ১৪০৯,'একাঙ্ক নয়' সংকলনে, অপেরা	
৬৮	হারানো প্রাপ্তি (এ)	২০০২	জানুয়ারি ২০১০, গ্রন্থাকারে, 'অষ্টধাতু' গ্রন্থে, অপেরা			
৬৯	কুহুযামিনী (পূ) নাটক সমগ্র-৫	২০০২	২০০১ 'দেশ', পূজা সংখ্যা		মাঘ ১৪১৩ নাটক সমগ্র-৫-এ	
৭০	অপারেশন ভোমরাগড় (পূ) নাটক সমগ্র-৫	২০০৩	২০০৩,'আনন্দমেলা' পূজা সংখ্যা		মাঘ ১৪১৩ নাটক সমগ্র-৫-এ	
৭১	জয়বাবা হনুনাথ (এ) নাটক সমগ্র-৫	২০০৪	২০০৪, 'গণশক্তি', শারদ সংখ্যা		মাঘ ১৪১৩ নাটক সমগ্র-৫-এ	
৭২	রঙের হাট (পূ) নাটক সমগ্র-৫	২০০৪	২০০৪, 'আজকাল', শারদ সংকলন		মাঘ ১৪১৩ নাটক সমগ্র-৫-এ	
৭৩	যা নেই ভারতে (পূ) নাটক সমগ্র-৫	২০০৫	২০০৫, শারদীয় 'প্রতিদিন'		মাঘ ১৪১৩ নাটক সমগ্র-৫-এ	
৭৪	ব্রিজের ওপর বাপি (পূ) নাটক সমগ্র-৫	২০০৬	২০০৬, শারদীয় 'প্রতিদিন'		মাঘ ১৪১৩ নাটক সমগ্র-৫-এ	
৭৫	রূপের আড়ালে (এ) নাটক সমগ্র-৫	২০০৬	২০০৬, দৈনিক স্টেটসম্যান, বিশেষ পূজা সংখ্যা		মাঘ ১৪১৩ নাটক সমগ্র-৫-এ	
৭৬	বনজোছনা (এ) নাটক সমগ্র-৫	২০০৬	২০০৬, 'প্রতীচী'		মাঘ ১৪১৩ নাটক সমগ্র-৫-এ	
৭৭	ভেলায় ভাসে সীতা (পূ)	২০০৭				
৭৮	ওই চাঁদ (পূ)	২০০৮				
৭৯	হনুমতী পালা বা মন্দোদরী হরণ (এ)	২০০৯	২০০৯, 'প্রতীচী', শারদ সংখ্যা		জানুয়ারি ২০১০ 'অষ্টধাতু' গ্রন্থে কলাভূৎ পাবলিশার্স	

নাটক সমগ্র = মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলি-৭৩

পূ = পূর্ণাঙ্গ, এ = একাঙ্ক, পুন. = পুনর্লিখন, পরি. = পরিমার্জনা

ক্রমিক	নাটক	রচনা	প্রথম প্রকাশ	পুন:/পরি:	গ্রন্থাকারে প্রকাশ	অতিরিক্ত তথ্য
৮০	গন্ধজালে (এ)	২০০৯	'পূর্ব পশ্চিম' বার্ষিক নাট্যপত্র		জানুয়ারি ২০১০, 'অষ্টধাতু' গ্রন্থে কলাভৃৎ পাবলিশার্স	
৮১	ফ্যানসি ও ন্যানসি (এ)	২০০৯	২০০৯, 'চিরসবুজ লেখা উৎসব'		জানুয়ারি ২০১০, 'অষ্টধাতু' গ্রন্থে কলাভৃৎ পাবলিশার্স	
৮২	জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ (এ)					
৮৩	রঙিন মাছেরা (এ)					

২০০৯-এর পর রচিত নাটক

৮৪	ওড়না পাখি ওড়না (এ)					
৮৫	আশ্চৌর্য ফান্টুসি (পূ)					
৮৬	ছোট ছোট বাড়ি (পূ)					
৮৭	ম্যাক্কাঁও (এ)					
৮৮	ভগীরথের মূর্তি (এ)					

নাটক সমগ্র = মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলি-৭৩

পূ = পূর্ণাঙ্গ, এ = একাঙ্ক, পুন. = পুনর্লিখন, পরি. = পরিমার্জনা

গবেষণা পত্রে ব্যবহৃত মনোজ মিত্রের নাটকের তালিকা ঃ

মিত্র মনোজ - নাটক সমগ্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - কোলকাতা-৭৩

১ম খন্ড - দ্বিতীয় মুদ্রণ - মাঘ ১৪০৩

২য় খন্ড - অগ্রহায়ণ ১৪০১

৩য় খন্ড - মাঘ ১৪০২

৪র্থ খন্ড - কার্তিক ১৪১০

৫ম খন্ড - মাঘ ১৪১৩

মিত্র মনোজ - আরক্ত গোলাপ - পলাশী - কোলকাতা, শ্রাবণ ১৩৭২

মিত্র মনোজ - নেকড়ে - অপেরা - কোলকাতা-০৯, বৈশাখ ১৩৯৭

মিত্র মনোজ - বেকার বিদ্যালংকার - চতুর্থ সংস্করণ - অপেরা - কোলকাতা-০৯, আশ্বিন ১৩৯৮

মিত্র মনোজ - পাহাড়ী বিছে - চতুর্থ সংস্করণ - অপেরা - কোলকাতা-০৯, আশ্বিন ১৩৯৯

মিত্র মনোজ - রাজার পেটে প্রজার পিঠে - অপেরা - কোলকাতা-০৯, মাঘ ১৩৯৯

মিত্র মনোজ - দুই রসের দুই নাটক - অপেরা - কোলকাতা-০৯, আশ্বিন ১৪০১

মিত্র মনোজ - আত্মগোপন ও আকাশচুম্বন - অপেরা - কোলকাতা-০৯, আষাঢ় ১৪০৪

মিত্র মনোজ - ছায়ার প্রাসাদ - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - কোলকাতা-৭৩, আশ্বিন১৪০৫

মিত্র মনোজ - পালিয়ে বেড়ায় - অপেরা - কোলকাতা-০৯, ফাল্গুন ১৪০৬

মিত্র মনোজ - মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্ক - অপেরা - কোলকাতা-০৯, মাঘ ১৪০৭

মিত্র মনোজ - মুন্নি ও সাত চৌকিদার এবং নাকছাবিটা - অপেরা - কোলকাতা-০৯, ফাল্গুন ১৪০৮

মিত্র মনোজ - একাঙ্ক নয় - অপেরা - কোলকাতা-০৯, আশ্বিন ১৪০৯

মিত্র মনোজ - বনজোছনা - কলাভৃৎ পাবলিশার্স - কোলকাতা-০৯, আগস্ট ২০০৭

মিত্র মনোজ - অষ্টধাতু - কলাভৃৎ পাবলিশার্স - কোলকাতা-০৯, জানুয়ারি ২০১০

মিত্র মনোজ - মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক -দ্বিতীয় সংস্করণ - কলাভৃৎ পাবলিশার্স - কোলকাতা-০৯, মে ২০১০

গ্রন্থ ঃ

আচার্য অনিল (সম্পা.) - অনুষ্টুপ - নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা-২ - কোলকাতা,১৪০৭

অ্যারিস্টটল - কাব্যতত্ত্ব -অনু. শিশিরকুমার দাশ - প্যাপিরাস - কোলকাতা-০৪,ডিসেম্বর ১৯৯৪

গুপ্ত দেবনারায়ণ - নাট্যসংলাপের বিবর্তন - এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড - কোলকাতা-৭৩

গোস্বামী সনাতন - বাংলা একাঙ্ক নাটক ঃ রূপ ও রূপকার - বামা পুস্তকালয় - কোলকাতা-৭৩, জুলাই ২০০৩

ঘোষ অজিতকুমার - নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ - দ্বিতীয় সংস্করণ - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩, আগস্ট ১৯৯৭

ঘোষ অজিতকুমার - বাংলা নাটকের ইতিহাস - অষ্টম সংস্করণ - জেনারেল - কোলকাতা-১৩, জুন ১৯৯৯

ঘোষ অজিতকুমার - রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩,জ্যৈষ্ঠ ১৪০১

ঘোষ অজিতকুমার - নাটক ও নাট্যকার - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩, বৈশাখ ১৪০৭

ঘোষ অজিতকুমার - নাটকের কথা - পঞ্চম সংস্করণ - সাহিত্যালোক - কোলকাতা-০৬, মাঘ ১৪১২

ঘোষ অজিতকুমার - বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা - তৃতীয় সংস্করণ - করুণা প্রকাশনী - কোলকাতা-০৯,১৯৮৯

ঘোষ জগন্নাথ - বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব - বামা পুস্তকালয়, ১৯৭৭

ঘোষ জগন্নাথ - রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস - প্রজ্ঞাবিকাশ - কোলকাতা-০৯, ২০০৯

চট্টোপাধ্যায় কুন্তল - সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - চতুর্থ সংস্করণ - রত্নাবলী - কোলকাতা-০৯, অক্টোবর ২০০৪

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম - বঙ্কিম রচনাবলী - দ্বিতীয় খন্ড - কোলকাতা -

চট্টোপাধ্যায় হীরেন - সাহিত্য প্রকরণ - তৃতীয় সংস্করণ - বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ - কোলকাতা-৭৩, পৌষ ১৪০৬

চন্দ্র দীপক - বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা - দ্বিতীয় সংস্করণ - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩, ২০০১

চৌধুরী দর্শন - বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - পুস্তক বিপণী - কোলকাতা,১৯৯৯

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ - রবীন্দ্র-রচনাবলী - ষষ্ঠ খণ্ড - পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফাল্গুন ১৩৯২

দত্ত সুধীন্দ্রনাথ - সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩

দত্ত সুনীল - নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর - সুনীল দত্ত - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ - কোলকাতা, ১৯৮৭

দাস পুলিন - বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক (১ম ও ২য় খণ্ড) - এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড - কোলকাতা-৭৩

১ম খণ্ড - দ্বিতীয় সংস্করণ - আশ্বিন ১৪০৩

২য় খণ্ড - প্রথম সংস্করণ - ভাদ্র ১৩৯৮

দাস কাশীরাম - মহাভারত - অক্ষয় লাইব্রেরী, শ্রাবণ ১৩৯৩

বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ (সম্পা.) - 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটি রামায়ণ' সংকলন - অপেরা - কোলকাতা-০৯, শ্রাবণ ১৪১২

বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ - বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক - দ্বিতীয় সংস্করণ - পুস্তক বিপণী - কোলকাতা-০৯, বৈশাখ ১৪০০

বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিপদ - প্রসঙ্গ গণনাট্য - তৃতীয় সংস্করণ - গণমন প্রকাশন - কোলকাতা-৫০, ডিসেম্বর ২০০০

বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য - বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার - পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি - কোলকাতা-২০, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

বসু বিষ্ণু - বাংলা নাট্যরীতি - পুনশ্চ - কোলকাতা, ১৯৯৬

বসু বিষ্ণু - রাজনীতি নাটকে রাজনীতি থিয়েটারে - ডেল্টা ফার্মা - কোলকাতা,১৯৮৮

বসু বিষ্ণু - অলকানন্দার পুত্রকন্যায় চিত্রা সেন অত্যন্ত সাবলীল - গণশক্তি, ১৬.০১.১৯৯০

বসু বিষ্ণু - বাংলা নাট্যরীতি - পুনশ্চ

বসু ব্রাত্য (সম্পা.) - ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় সংখ্যা - কোলকাতা-৮৯, নভেম্বর ২০১১

বসু শুদ্ধসত্ত্ব ও যতীন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা.) - নীলদর্পণ - বিশ্বাস বুক স্টল - কোলকাতা-০৯, ২০০১

ভট্টাচার্য আশুতোষ - বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) - ষষ্ঠ সংস্করণ - এ.মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড - কোলকাতা-৭৩, ২০০৪

ভট্টাচার্য আশুতোষ - বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) - চতুর্থ সংস্করণ - এ.মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড - কোলকাতা-৭৩, ২০০৩

ভট্টাচার্য বিজন - নবান্ন - সপ্তম সংস্করণ - প্রমা প্রকাশনী - কোলকাতা-১৭, ২০০০

ভট্টাচার্য সাধনকুমার - এরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব সপ্তম সংস্করণ - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩, মাঘ ১৪

ভট্টাচার্য সাধনকুমার - নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩, নভেম্বর ২০০২

ভাদুড়ি সত্য (সম্পা.) - স্যাস্ - কোলকাতা-৭৩ - ১৯৯৩ ও ২০০০

মিত্র দিলীপকুমার - আধুনিক ভারতীয় নাটক - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩, মাঘ ১৪১১

মিত্র মনোজ - বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - কোলকাতা-৭৩, মাঘ ১৪০৬

মিত্র মনোজ - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন - কোলকাতা-০৯,২০০১

মিত্র মনোজ - মনের কথা নাট্যকথা - আজকাল - কোলকাতা-৯১, জানুয়ারি ২০০৭

মিত্র মনোজ - ও অমর মিত্র - ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১১

মিত্র শম্ভু - সন্মার্গ সপর্যা - তৃতীয় সংস্করণ - এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড - কোলকাতা-৭৩, আশ্বিন ১৪০৮

মুখোপাধ্যায় অশোক - প্রসঙ্গ অভিনয় - অপেরা - কোলকাতা-০৯, আশ্বিন ১৪০৪

মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ (সম্পা.) - নীলদর্পণ - তুলসী প্রকাশনী - কোলকাতা-০৯, ১৯৯৭

মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ - সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান - সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০০০

রায়চৌধুরী সজল - গণনাট্য কথা - গণমন প্রকাশন - কোলকাতা-৫০, মে ১৯৯০

লাহা চিত্তরঞ্জন - বাংলা নাটকের টেকনিক - পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭

শাস্ত্রী শিবনাথ - রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ - বিশ্ববাণী প্রকাশনী - কোলকাতা, ১৯৮৩

সরকার পবিত্র - নাটমঞ্চ নাট্যরূপ - প্রমা প্রকাশনী - কোলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৭

সাহা নৃপেন্দ্র ও রথীন চক্রবর্তী - নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৩ - পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি - কোলকাতা-২০, ১৯৯৩

সাহা নৃপেন্দ্র - নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৭ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি- কোলকাতা-২০, ১৯৯৯

ব্যবহৃত ইংরেজি গ্রন্থ ঃ

Bulton Marjorie - The Anatomy of Drama - Kalyani Publications - New Delhi-Ludhiana,1990

Frederick Lumley - New Trends in 20th Century Drama - Fourth Revised edition Barrie and Jenkins Ltd. - London,1972

Hatlen Theodore - Orientation to the Theatre - Peter Owen - London - First British Commonwealth Edition, 1962

Nicoll Allardyce - The Theory of Drama - Doaba House - Delhi,2002

Peter Szondi - Theory of the Modern Drama - Edited and Translated by Michael Hays - Polity Press - Cambridge, 1965

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, প্রতিবেদন এবং চিঠিপত্র ঃ

আজিজুল হক হাসান - সাজানো বাগানে চোখ রেখে - *দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান*, ৬ আগস্ট ২০০৫

গঙ্গোপাধ্যায় রঞ্জন - বাংলা থিয়েটারে অনন্য অভিজ্ঞতার সংযোজন - *পশ্চিমবঙ্গ* বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২৩, ২০.১২.১৯৯১

গঙ্গোপাধ্যায় রঞ্জন - সুন্দরমের 'শোভাযাত্রা' ঃ সীমা জয়ের নাটক - *পশ্চিমবঙ্গ*- বর্ষ ২৫, সংখ্যা ২৯, ৩১.০১.১৯৯২

গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল - নাট্যকার মনোজ মিত্র অভিনেতা মনোজ মিত্র - *অমৃত*, ০৭.০৪.১৯৭৮

গুহ পিনাকীরঞ্জন - শেয়াল ও মানুষ যে নৈশভোজে একাকার - *বর্তমান*,০৩.০৭.১৯৮৬

ঘোষ নিত্যপ্রিয় - বিপর্যয়েও মানবিকতা - *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২০.০৪.১৯৯০

ঘোষ সুরজিৎ - সুন্দরমের সাজানো বাগান, ২৮.০৪.১৯৭৮

ঘোষ সুরজিৎ - জনপ্রিয়তা না প্রিয় জনতা? - *দেশ*,১৩.০৩.১৯৯০

চক্রবর্তী দীপেন্দু - যা নেই ভারতে - *দেশ*

চট্টোপাধ্যায় চৈতালী - মেষ ও রাক্ষস - *রবিবাসরীয় জনতা*,২৩.১১.১৯৮০

চট্টোপাধ্যায় তীরেন্দ্র - চিরন্তন মাতৃত্বের সঞ্জীবনী ঃ অলকানন্দার পুত্রকন্যা - *সিনে অ্যাডভান্স*, ০৪.০৫.১৯৯০

চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র - চিঠি -তারিখ অনুল্লেখিত

দত্ত পার্থসারথি - গানের পর নৈশভোজ-এ কাঁঠাল এবং লাশ - *আজকাল*,২৯.১০.১৯৮৬

দাশগুপ্ত মঞ্জুষ - অলকানন্দার পুত্রকন্যা ঃ অভিনয় ও উপস্থাপনায় উজ্জ্বল নাট্য প্রযোজনা - *চতুরঙ্গ*, জুন ১৯৯০

দাস রানা - মেষ ও রাক্ষস - *দেশ*, ২৫.০৪.১৯৮১

দাস রানা - মেষ ও রাক্ষস - *দেশ*, ২৫.০৪.১৯৮১

দাস রানা - সুন্দরম্-এর শোভাযাত্রা ঃ ব্যক্তি থেকে সমষ্টি চেতনার নাটক - *ওভারল্যান্ড*, ২৬.০৩.১৯৯৩

দে অজিত - চিঠি - তারিখ অনুল্লেখিত

দেব রায় রবীন মেষ ও রাক্ষস ঃ রূপনগরের রূপকথা - *আবর্ত*, অক্টোবর ১৯৮০

ধর নির্মল - তৃণমূল স্তরের নাটক 'গল্প হেকিমসাহেব' - *প্রতিদিন*, ১৫.০১.১৯৯৫

নিজস্ব প্রতিনিধি - সুন্দরম্ প্রযোজিত মেষ ও রাক্ষস - নাটমঞ্চ - *দর্পণ* - ২৩ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ৭নভেম্বর ১৯৮০

নিজস্ব প্রতিনিধি - সুন্দরম্-এর অলকানন্দার পুত্রকন্যা ঃ ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন - *আজকাল*, ০৩.০৭.১৯৮৯

নিজস্ব প্রতিনিধি - অলকানন্দার সংসার - *সাপ্তাহিক বর্তমান*,১০.০৩.১৯৯০

নিজস্ব প্রতিনিধি - প্রয়োজনীয় নাটক 'গল্প হেকিমসাহেব' - *সানন্দা*,০৫.০৮.১৯৯৪

নিজস্ব প্রতিনিধি - সুন্দরমের শোভাযাত্রা - *বর্তমান* - ৮ম বর্ষ চতুর্দশ সংখ্যা,৪পৌষ ১৩৯৮

পাঠক শ্রীমন্ত - সুন্দরমের 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে ধ্রুপদী আধুনিকতা - *উল্টোরথ*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯

পালিত দিব্যেন্দু - বিষয়ে অভিনব, অভিনয়েও দুর্দান্ত - *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৭.০৫.১৯৯৪

প্রসাদ জয়নারায়ণ - সহজ নাটক নহী হ্যায় শোভাযাত্রা - *জনসত্তা*, ২৪.০৩.১৯৯২

বসু শিখা - দুই বাংলার দুই নাটকে নারী মহিমা - *যুগান্তর*

বসু সৌমিত্র - নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - *স্যাস*, ১৯৯৩

ব্যানার্জী সৌমেন - নাট্যকর্মীদের কলম

ভট্টাচার্য বিজয় - সুন্দরম ঃ মেষ ও রাক্ষস - *অভিনয়*, শারদসংখ্যা ১৯৮২

ভট্টাচার্য মেঘনাদ - একজন বড় মাপের মানুষ - *আজকাল*, ০৯.০৮.১৯৯২

ভট্টাচার্য রতন -পদ্মা-গঙ্গা উৎসবে গল্প হেকিমসাহেব - *গণশক্তি*, ৩১.০৭.১৯৯০

ভট্টাচার্য রবীন্দ্র - চিঠি - তারিখ অনুল্লেখিত

ভট্টাচার্য শিবাণী - সুন্দরম ঃ নৈশভোজ - *ভারতকথা*,১০.০৪.১৯৮৬

ভট্টাচার্য শ্যামল - নাট্য সমালোচনা - *গ্রুপ থিয়েটার*, শারদীয়া ১৯৮৮

মজুমদার দেবাশিস - বারবার দেখা যায় গল্প হেকিমসাহেব - *সোনার বাংলা*, ০৭.০১.১৯৯৪

মজুমদার দেবাশিস - দুর্লভ সময়ের দর্পণ - *আজকাল*, ০৬.১২.১৯৯৪

মজুমদার মনসিজ - মনোজ মিত্রের অসামান্য অভিনয় - *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ০৩.০৭.১৯৯৯

মজুমদার দেবাশিস - সাজানো বাগানে চোখ রেখে - *দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান*, ০৬.০৮.২০০৫

মজুমদার সমরেশ - শূন্য রথে বসে আছি ঃ শোভাযাত্রা - *দেশ*, ১৫.০২.১৯৯২

মজুমদার স্বপন - আখ্যানবয়নের বৈশিষ্ট্যে অন্য মাত্রা

মিত্র মনোজ - প্রতিবেদন - *নাট্যচিন্তা* - প্রথম বর্ষ - ৯-১০ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৮২

মিত্র মনোজ - অভিনয় ঃ এতটুকু স্মৃতি - *চারণিক* - বিশেষ স্মারক সংখ্যা, ১৯৮৮

মিত্র মনোজ - ডায়েরি - *আজকাল*, ২২.০৪.১৯৯৩

মিত্র স্মারক - সাজানো বাগান - *দেশ*, ২৮.০১.১৯৭৮

মিশ্র ভগীরথ - মনোজ মিত্রকে লেখা চিঠি, ০৪.১০.১৯৯৪

মুখোপাধ্যায় অশোক - সাজানো বাগান - *বারোমাস*, জুলাই ১৯৭৮

মুখোপাধ্যায় অশোক - একটি চমৎকার নাট্য অভিজ্ঞতা - *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ০৬.১২.১৯৯১

মুখোপাধ্যায় অশোক - মতান্তরকে শ্রদ্ধা করে, মনান্তর ঘটতে দেয় না - *আজকাল*, ০৯.০৮.১৯৯২

মুখোপাধ্যায় অশোক - অস্থির আবর্তমান সময়ের নাট্যচিত্র 'ছায়ার প্রাসাদ' - *প্রতিদিন*, ৩০.১০.১৯৯৮

মুখোপাধ্যায় আশিসতরু - অপরাজিতা অলকানন্দা - *যুগান্তর*, ০৭.০১.১৯৯১

মুখোপাধ্যায় বিজয়ার চিঠি - প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা

মৈত্র কিরণ - আত্মদর্শনের নাটক 'মেষ ও রাক্ষস' - *পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ*, ২৮ চৈত্র ১৩৮৯

রায় অমিত - নৈশভোজ - *দেশ*, ০২.০৮.১৯৮৬

রায় কুমার - মনোজের মনোভূমি - *স্যাস*,১৯৯০

রায় সুশীল - চিঠি, ০৩.০৩.১৯৭৬

শ.র.চ. - সুন্দরম্-এর মেষ ও রাক্ষস - *আনন্দলোক*, ২৫.০৪.১৯৮১

সমাদ্দার শেখর - নাটকে কবিতায় এক জীবনশিল্পীর গাথা - *প্রতিক্ষণ*, জানুয়ারি ১৯৯৫

সরকার গৌরাঙ্গ - নৈশভোজ একটি নিটোল নাটক - *দৈনিক বসুমতী*, ০৯.০৯.১৯৮৬

সরকার পবিত্র - মানবিকতার কবোষ্ণ ছবি - *আজকাল*, ০১.০৬.১৯৯৪

সাহা নৃপেন্দ্র - সুন্দরমের শোভাযাত্রা - *গণশক্তি*, ১১.০২.১৯৯২

সাহা নৃপেন্দ্র - ৭৭-এর সমবেত শিল্প ঃ জগন্নাথ-দানসাগর-সাজানো বাগান - *গ্রুপ থিয়েটার* - ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মে-জুলাই ১৯৭৮

Bandyopadhyay Samik - Political theatre : fantasy acquires some polish - *Business Standard*, 07.09.1980

Chakrabarti Partha - Group theatre in its glory - *Calcutta*, 19.09.1982

Drama Critic - Sajano Bagan - *Frontier* - December 24, 1977

Dutta Ella - 'Sajano Bagan` - *The Economic Times*,23.07.1978

Dutta Rita - Of heart and humour - *The Economic Times*, 16.06.1991

Ghosh Dharani - The dinner that never was - *PCP*, 25.09.1986

Ghosh Dharani - The Doctor's Dilemma - *The Statesman*, 09.08.1994

Ghosh Dharani - No room for equivocation - *The Statesman*, 27.11.1991

Ghosh Dharani - Man of the Match - *The Statesman*,13.10.1990

Lal Ananda - Exciting in parts - *The Telegraph*, 16.01.1990

Lal Ananda - Personal tour de force - *The Telegraph*, 06.02.1991

Lal Ananda - The Bengal that was - *The Telegraph*, 07.02.1992

Lal Ananda - One of Calcutta's best troups scores again - *The Telegraph*, 02.09.1994

Mazumdar Debu - The best of Manoj Mitra - *The Hindusthan Times*, 08.12.1986

Mazumdar Debu - Absorbing family drama - *The Hindusthan Times*,16.01.1991

Mitra Manoj - The tree haunted me - *PCP* - 25.10.1986

Roy Kumar - Post 1980 Plays : Bangla - *Theatre India*

Roy Prithwiraj - Mother goddess - *The Statesman*, 06.07.2001

সাক্ষাৎকার ঃ

মিত্র মনোজ ঃ চেতনা নাট্যোৎসবে মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, ১৯৭৬

মিত্র মনোজ ঃ *কৃষ্টি* পত্রিকার পক্ষ থেকে গৃহীত মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৫

মিত্র মনোজ ঃ থিয়েটার যদি পণ্যের চেহারা নেয় ক্ষতিটা কী - শৈবাল বিশ্বাস কর্তৃক গৃহীত মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার - *প্রতিদিন* - ৮ অক্টোবর, ১৯৯২

মিত্র মনোজ ঃ কথোপকথন ঃ নাট্যভাবনা - অনুষ্টুপ পত্রিকার পক্ষ থেকে গৃহীত মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার - *অনুষ্টুপ নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা* - ২, ১৪০৭

মিত্র মনোজ ঃ চেষ্টা করে নাটককে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখব কী ভাবে? - সঞ্জয় সিংহ কর্তৃক গৃহীত মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার

মিত্র মনোজ ঃ মঞ্চের মানুষ - রবিশঙ্কর মিশ্র কর্তৃক গৃহীত মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার - *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৮.১২.১৯৯৩

মিত্র মনোজ ঃ বিপ্রতীপ দে কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার - *দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান*, ৬ আগস্ট ২০০৫

Mitra Manoj : To preserve and nourish Values - *The statesman* - 28.10.2005